উদ্বোধন



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

শ্রাবণ, ১৩৭৪

৬৯ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

সর্বান্ বেদানধীয়ীত শুশ্রূষুর্ব্রহ্মচর্যবান্ ।
ঋচো যজূংষি সামানি যো বেদ ন স বৈ দ্বিজ ॥ ২৪৮।২
জ্ঞাতিবৎ সর্বভূতানাং সর্ব বিৎ সর্ববেদবিৎ ।
নাকামো ম্রিয়তে জাতু ন তেন ন চ বৈ দ্বিজঃ ॥ ৩
কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্ ।
কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৭ —মহাভারত, শান্তিপর্ব

সর্ববেদাধ্যায়ী যেই, ব্রহ্মচর্যব্রতধারী, গুরুসেবারত,
ঋক্ সাম যজুর্বেদ কণ্ঠস্থ যাহার—
কেবল তাহারি বলে ব্রাহ্মণ সে হয় না কখনো,
ব্রাহ্মণত্বে অধিকার আসে না তাহার।
সর্ববিদ্ সর্ববেদবিদ্ হইবার সাথে সাথে
প্রসারিত হয়ে যায় হৃদয় যাঁহার—সর্বভূতে যিনি দয়াবান—
আপন আত্মীয় বোধে সবা'পরে স্নেহ ঝরে যাঁর,
কামনাবিহীন যিনি, তিনিই ব্রাহ্মণ।
নিষ্কাম হইলে তাঁর ব্রাহ্মণত্বে আসে অধিকার।
নিষ্কাম সে মৃত্যুঞ্জয়ী— তার পাশে কোনকালে আসে না মরণ।
(জন্ম-মৃত্যু-কারাগারে বাঁধিয়া রাখার তরে)
বন্ধন বলিতে শুধু কামবন্ধন-ই মাত্র আছে,
বন্ধন বলিতে হেথা আর কিছু নাই—
কামবন্ধনেরে যিনি ছেদন করিয়া মুক্ত হন
ব্রহ্মজ্ঞান সদা তাঁর করায়ত্ত রয়।
(নিষ্কাম, হৃদয়বান, বেদবিদ্, ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রাহ্মণের এই পরিচয়।)

কথাপ্রসঙ্গে

জীবনবীণায় সুর বাঁধা

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনবীণার সুর আলাদা আলাদা। মোটামুটি কয়েকটি ভাগে তা বিভক্ত করা যায় সত্য, কিন্তু বিস্তারিতভাবে দেখিলে দেখা যায়, কোনটির সঙ্গে কোনটি হুবহু মিলে না। মিলে শুধু তখন যখন যন্ত্রটি বাঁধা হইয়া যায় বিশ্বজীবনের সব সুর যে মূল তন্ত্র হইতে ঝঙ্কৃত হইয়া বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহার সঙ্গে। উদাহরণ রূপে একটি ঘটনার অবতারণা করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জনৈক সন্ন্যাসীর মনে বহুদিন হইতে একটি দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। তিনি তখন কলিকাতায় থাকিতেন। অন্তর্দ্বন্দ্বটির নিঃসংশয় সমাধানের জন্য একদিন বেলুড় মঠে আসিয়া তিনি মন্দিরে গেলেন, সেদিনই ইহার সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণচরণে মনে মনে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া নীচে নামিলেন। মন্দির তখন মঠের পুরাতন বাড়ীতে, দোতলায়। নীচে নামিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী-সন্তান স্বামী শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বামী শিবানন্দ তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরতরে মিটাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসীটি তখন স্বামী শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তো আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলি নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিয়াছি। আপনি জানিলেন কিরূপে?" উত্তরে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, "তারের যন্ত্র দেখেছ তো? যে যন্ত্রে অনেকগুলো তার একই পর্দায় বাঁধা থাকে, সেখানে সেগুলোর যে কোন একটাতে আঘাত করলেই সেই পর্দায় বাঁধা সব তারগুলোতেই ঝঙ্কার ওঠে। এও ঠিক সেই রকম জানবে।"

বহুবিচিত্র হইলেও মানুষের জীবনের ভাবধারার মধ্যে কতকগুলি মূল সুর আছে; যেমন কয়েকটি মাত্র পর্দা অবলম্বনে অসংখ্য রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়। কতকগুলি মূল ধর্ম পৃথিবীর সব মানুষের মনেই এক। বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব প্রকৃতির এক অদ্ভুত বিধান। যেমন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দেহের আকৃতি দু-জনের ঠিক একরকম হয় না, অথচ দেহযন্ত্রের গঠন-প্রণালী, ক্রিয়া, ধর্ম প্রভৃতি সব মানবদেহেই এক।

সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, প্রভৃতি সবই আমাদের জীবন-পরিকল্পনার অন্তর্গত। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে মানুষ বিভিন্ন প্রকারে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং এগুলির উন্নতিকল্পে বা অন্য প্রয়োজনবোধে এগুলিকে নূতন করিয়া গড়িবার বা এগুলির সংস্কার করিবার চেষ্টাও সর্বযুগে চলিয়াছে। বর্তমান যুগে কয়েকটি যুগান্তকারী জীবন-পরিকল্পনার সম্মুখীন হইয়াছে মানুষ। উহাদের ভিতর কয়েকটিকে আবার পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হওয়ার ফলে পৃথিবীব্যাপী সংঘর্ষের ও অন্তর্দ্বন্দ্বের আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে।

ক্যাপিট্যালিজম না কম্যুনিজম, ঈশ্বরবিশ্বাস-ভিত্তিক না নাস্তিক্যবাদ-ভিত্তিক সমাজ ও শিক্ষা—এই ধরনের বহু প্রশ্ন আজ জগতের সর্বত্রই ব্যষ্টিমনে জাগিতেছে। বিভিন্ন মতে দৃঢ়বিশ্বাসী রাষ্ট্রশক্তি এ সব প্রশ্নের মীমাংসা একভাবে করিতে চাহিতেছে। আজ পৃথিবীকে বিজ্ঞান ছোট একটি দেশের মতই করিয়া দিয়াছে বলা চলে—রাশিয়া-চীন-আমেরিকায়, আরব-ইসরাইলে, ভিয়েটনামে যাহা কিছু

ঘটিতেছে তাহার আঁচ লাগিতেছে পৃথিবীর সব মানুষেরই মনে। সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে কঠোর বিভীষিকার মধ্য দিয়াই হউক, বা স্থির কল্যাণ-বুদ্ধি সঞ্জাত বিবেকের মধ্য দিয়াই হউক, একদিন আমাদের প্রশ্নের উত্তর বাস্তবরূপ লইবেই। মনে হয় ক্যাপিট্যালিজম ও কম্যুনিজমের ভিতরকার খারাপ জিনিসগুলি বাদ দিয়া এবং উহাদের ভিতরকার ভাল জিনিসগুলি লইয়া সেগুলির সমন্বিত রূপই হইবে ভবিষ্যৎ জগতের মানুষের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক রূপ আর সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি হইবে যে কোন আকারেই হউক ঈশ্বরবিশ্বাস-ভিত্তিক। কারণ ভাল-মন্দকে ঠিকভাবে চিনিয়া পৃথিবীর সব মানুষই একদিন ভালটিকে গ্রহণ করিবেই, এবং যাহা যুক্তিবিরোধী বা অবৈজ্ঞানিক নয়, অথচ হৃদয় যাহা চায়, তাহাও গ্রহণ না করিয়া পারিবে না। কিন্তু ব্যষ্টিগতভাবে মানুষের ততদিন এই দ্বন্দ্বের দোলায় দোলা ও সংঘর্ষের উৎকট সুরে জীবনকে ভরাইয়া তোলা ছাড়া আর কিছুই কি করিবার নাই ?

আছে, এবং দেশ জাতি-বর্ণ-মতবাদ-নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষই তাহা করিতে পারে, নিজনিজ জীবনকে রাষ্ট্র- ও সমাজ-নিরপেক্ষ ভাবে একটি নিঃসংশতায়, আলোকে, শান্তিতে ভরা সুরের পর্দায় বাঁধিতে সচেষ্ট হইতে পারে। মন যে কোন রাষ্ট্রে, যে কোন সমাজে যতই উদ্‌ভ্রান্ত, চঞ্চল অবস্থায় থাকুক না কেন, অভ্যাসের বলে উহাকে নিজের ইচ্ছামত পর্দায় বাঁধা যায়, ইহা সর্বজনীন সত্য। আমরা ইচ্ছা করিলে সকলেই প্রত্যহ প্রভাতে দৈনন্দিন কর্ম আরম্ভ করিবার পূর্বে অন্ততঃ একবার মনকে শান্ত ও চিন্তাশূন্য বা একাগ্র করিবার চেষ্টা করিতে পারি। যেমন দৈহিক ব্যায়াম করি, সেইভাবে ইহাকে মানসিক ব্যায়ামরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ঈশ্বরে বিশ্বাসী যাঁহারা, মনকে ভগবৎচিন্তার মাধ্যমে একাগ্র করাই তাঁহাদের পক্ষে ইহার শ্রেষ্ঠ উপায়, বহুযুগ-পরীক্ষিত 'ডক্কামারা' উপায়। যাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা মনকে চিন্তাশূন্য করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, মনে যখনই যে চিন্তা উঠিতেছে তখনই উহা হইতে বিরত হইবার সজাগ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ইহা করিতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার কারণ নাই। ইচ্ছা থাকিলে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য সময়ের অভাব হয় না, প্রতিদিনের জীবনে বহুবিধ নিত্যকর্মে আমাদের অনেক সময় দিতে হয়। ফল কি হয় না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যও অন্ততঃ কিছুকাল নিয়মিতভাবে ইহা করিয়া দেখিতে দোষ কি ?

কি হইবে ইহাতে ?—এই সামান্য প্রচেষ্টাই নিয়মিতভাবে ও যথাযথভাবে করিতে পারিলে লাভ হইবে প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশী। জীবনের সুর বাঞ্ছিত পর্দাটিতে প্রতিদিন বাঁধা হইতে থাকিবে, বিশ্বজীবনের মূল সুরের সঙ্গে ক্রমশঃ মিলিতে থাকিবে। মন ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিবে ইহাতে, স্থিরভাবে কিছু ভাবিয়া উহার ভালমন্দ বুঝিবার যোগ্যতা প্রতিদিন বর্ধিত হইবে, মনের শক্তি বাড়িবে, এবং অতিরিক্ত লাভ হইবে—একটা অকারণ আনন্দের প্রলেপ মনে লাগিয়া থাকিবে। এভাবে মানসিক শক্তিকে ক্রমবর্ধিত ও উন্নততর পর্যায়ে লইয়া যাইতে পারিলে তখন যাহাই করি না কেন, আমরা তাহা আরও ভালভাবে করিতে পারিব, যাহাই ভাবি না কেন তাহা আরো ভালভাবে ভাবিতে পারিব। জীবনের সব কিছুর ভালমন্দ বুঝিবার, যাচাইয়া লইবার নিজস্ব শক্তিটুকু অন্ততঃ তখন আসিবে, অপরের কথায় অন্ধভাবে আর কোনকিছুর পিছনে ছুটিয়া জীবনের চরম বিপর্যয়ের পরে

বুঝিতে হইবে না যে ভুল করিয়াছি। আর প্রতিদিনের জীবন হইতে মনশ্চাঞ্চল্যজনিত অশান্তি ক্রমশঃ ইহাতে কমিতে থাকিবে, যেমন কোন পাত্রে রক্ষিত জল যদি শূন্য তাপমাত্রায় রাখা যায়, তাহা হইলে অনেক-খানি তাপ দিবার পর তাহা ফুটিয়া উঠিবার মত অবস্থায় আসে, তেমনি মনকে যদি প্রতিদিনের কর্মারম্ভের পূর্বে একাগ্র করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে শান্ত অবস্থায় আনা যায়, দৈনন্দিন কর্মচাঞ্চল্য ও বিরোধ-সংঘর্ষাদির ফলে সে মনের বিরক্তি- ও তিক্ততা-পূর্ণ হইতে এবং যুক্তিবিচারের ও আয়ত্তের বাহিরে যাইতে অনেক সময় লাগিবে। প্রারম্ভে প্রশান্তির মাত্রা আরও গভীর করিয়া লইতে পারিলে উহার সে অবস্থা আসিবেই না। ইহাতে প্রতিদিনের জীবনে লাভবানই হইব আমরা।

পৃথিবীর সর্বত্রই একাগ্রতার অভ্যাসের মাধ্যমে এভাবে জীবনের সুর বাঁধিবার প্রচেষ্টা মানুষ যদি করিতে পারে, বিশেষ করিয়া শিক্ষার মাধ্যমে ইহার বহুল প্রসারের ব্যবস্থা, জীবন সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ বাস্তব অপেক্ষা আরো সূক্ষ্ম বাস্তবের সন্ধান সে সহজেই পাইবে, এবং জীবনপরিকল্পনার যে রূপগুলির কথা আজ বর্তমান জগৎ চিন্তা করিতেছে, তাহার ভাল ও মন্দ দিকগুলি বুঝিবার, তাহার গভীরে প্রবেশ করিবার শক্তি অধিক সংখ্যক মানুষের আসিবে, বিশ্বমানব যাহার প্রতীক্ষায় আছে, তাহার আগমনের পথ প্রশস্ততর হইবে।

ভারতের জাতীয় প্রাণের সুর

আমাদের, ভারতবাসীদের আর একটি কথা ভাবিবার আছে। বর্তমান সময়ে ইহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। একটি সুরে আমাদের জাতীয় জীবন হাজার হাজার বছর ধরিয়া বাঁধা আছে—ধর্মের সুরে। সকাল-সন্ধ্যায় ভগবচ্চিন্তার মাধ্যমে মনকে একাগ্র করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতির জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। জাতির উপর বিভিন্ন যুগে কত বিপরীত ভাবধারার প্রচণ্ড আঘাত সত্ত্বেও, বর্তমান কালেও শিক্ষাব্যবস্থার এ বিষয়ে অবহেলা এবং জড়বাদের বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও 'যাহার কুয়াশা ভেদ করিতে কিংবদন্তীও সঙ্কুচিত', সেই যুগ হইতে আজ পর্যন্ত একটি দিনও এমন যায় নাই যেদিন না সারা ভারত জুড়িয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহকোণে, মন্দিরে পুণ্যতোয়া তটিনীতীরে, হিমাচলের কোণে প্রভাতে সন্ধ্যায় অগণিত চিত্ত প্রতিদিনের জীবনের অসংখ্য বহির্বিষয়ক চিন্তাকে দুহাতে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একাগ্র হইবার প্রচেষ্টা করিয়াছে ভগবচ্চিন্তায়, একলক্ষ্য হইয়া ধাবিত হইয়াছে শ্রীভগবানের দিকে—জপ-ধ্যান-প্রার্থনাদির মাধ্যমে চেষ্টা করিয়াছে বিশ্বজীবনের মূল সুরটির সঙ্গে নিজের জীবনের সুরকে বাঁধিবার।

ধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় জাতি জীবনের সুর বাঁধিতে চাহিয়াছে চিরদিন। ধর্ম প্রথমেই এই শিক্ষা দেয়—জীবনের কর্মক্ষেত্র যাহাই হউক, নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা মনকে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভারত তাই রাজার—রাষ্ট্র-নায়কের—জীবনে ধর্মনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনের উপর জোর দিয়াছে সর্বাধিক, কারণ জনমনের উপর তাঁহার প্রভাব প্রচণ্ড। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি আদর্শ ক্ষত্রিয়গণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মত বিষম কর্মে নিযুক্ত থাকা কালেও প্রত্যহ প্রভাতে কর্মারম্ভের পূর্বে স্নানাদির পর ভগবদারাধনা করিয়া লইতেন। আধুনিক কালে ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির বিপুল সহায়ক দুটি জীবনও একইভাবে

প্রত্যহ জীবনের সুর বাঁধিয়া লইতেন কার্যারম্ভের পূর্বে। মহাত্মাজী নিয়মিত নিজস্ব সময় ছাড়াও প্রকাশ্য সভায় উহা করিতেন —সকলকে এবিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য। নেতাজী যুদ্ধ পরিচালনা কালেও নিয়মিত ভাবে উহা করিতেন। ভারতীয় জাতির জীবনের সুর বাঁধিতে হইলে ধর্মের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, এই পথেই বাধা স্বল্পতম। জাতির রাজনৈতিক. অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিকাদি উন্নতির জন্য কোন্ পথ অবলম্বনীয়, সে বিষয়ে আজ বিভিন্ন মত দেখা যাইতেছে। পথ আমরা যাহাই নির্বাচন করি না কেন, জীবনপরিকল্পনা যেভাবেই করি না কেন, কোনও ক্ষেত্র হইতে যেন আমাদের জীবনের সুর বাঁধিবার সর্বোত্তম সহায়ক ও প্রেরণাদায়ী ধর্মকে বাদ না দিই। বরং জনমনে ধর্মজীবনকে উৎসাহিত করিয়া কিছু করিতে পারিলে তাহাই জাতীয় উন্নতিবিধানে সর্বাধিক ফলপ্রসূ হইবে।

ইহার বিপরীত কিছু করিবার সর্ববিধ প্রচেষ্টাই পরীক্ষামাত্রে এবং পরিণামে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। বছর পঁয়ত্রিশ আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কয়েকজন সাঁওতাল কুলি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্রে কাজ করিত। খৃষ্টান মিশনারীগণ তাহাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন একজন সাঁওতাল চাঁদার জন্য আশ্রমবাসী জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট আসিল। তাহারা কালীপূজা করিবে। সন্ন্যাসীটি প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা তো খৃষ্টান, কালীপূজা করবে কি?" উত্তরে সে বলিল, "খৃষ্টান হয়েছি বলে ধর্ম ছেড়েছি নাকি?" ভারতীয় জাতির জীবনের মূল সুরকে ধর্মহীন যে কোন পর্দায় বাঁধিতে গেলে তাহার পরিণাম ইহার বেশী কিছু হইবে না।

"সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে। ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান উপদেশ সমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী **পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়াবিশ্বাস রূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া** দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি-জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণ ভরসা।

আলমবাজার মঠ,
১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ সাল

My dear old Mohanta of the Alambazar Math,

তোমরা নির্বিঘ্নে ৺রামনাথ দর্শন করিয়া মাদ্রাজ আসিয়াছ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। তোমাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে বড় বলবতী হচ্ছে। এখন কি করি বল দেখি? তুমি আমাকে ভুলে গেছ না একটু একটু মনে আছে? নূতন মোহান্তজী খুব energetically শ্রীশ্রীজীর সেবা করিতেছেন। তবে তাঁহার delicate health-এর দরুন ইচ্ছানুরূপ পারিতেছেন না। মঠে প্রায় উপস্থিত যাহারা আছে তাহাদের শরীর তত ভাল নয়। একটা গঙ্গাতীরে স্থান না হইলে বড় সুবিধা নয়। জানি না শ্রীশ্রীগুরুদেব কবে আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন।

তোমরা অনেকগুলিন একসঙ্গে জমিয়াছ, দেখো যেন তোমার কার্যের ক্ষতি না হয়। Duty is duty, একথা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে। খরচপত্র যেন বিবেচনা করিয়া করিবে, কোনমতে বেশী না হয়। কাহারও whims শুনিয়া চলিবে না, you need not care for the opinions of others, only do your own duty which is proper and best. স্বামীজী বড় অসন্তুষ্ট হন যাহারা সাধন ভজন কিংবা work না করিয়া idly and aimlessly বেড়ায়। তিনি সম্প্রতি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তোমাকে নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

"অমুকের কাছে যে টাকা ····এ পর্যন্ত এসেছে তার হিসাব চেয়ে পাঠাবে। ধর্ম-প্রচারের জন্য যে টাকা তাহা গুলতোন বেঁধে রামেশ্বর যাত্রা করে হেঙ্গামা করবার জন্য নহে, আমি অসুস্থ শরীরে টাকাটির উপর টাকাটি সংগ্রহ করছি আর ওদের রসবৃদ্ধি দেখে কে। যদি হিসাবপত্র না দেয় তবে তাকে recall করবে। আমি কাজ চাই—don't want any humbug, যাদের কাজ করবার ইচ্ছা নাই যাদু এইবেলা ···।"

উপরোক্ত স্বামীজীর চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠ করে যাহা বিবেচনা হয় করিবে। এক একজন মনে করে যে তাদের জমা টাকা আছে দিতেই হইবে। মঠে সম্প্রতি স্বামীজী লিখেছেন, এক পয়সাও দেশভ্রমণের জন্য সখকরে দেওয়া হইবে না। তুমি খুব সাবধানে খরচা করিবে। অথবা· কে খরচ করিতে বলিবে। তুমি কোনরূপ চক্ষুলজ্জা করিবে না!

আমি দেখিয়াছি চক্ষুলজ্জা করে কাহাকেও please করা যায় না। খোকা কেমন আছে, তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে, আর আর সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবে ও জানিবে। ইতি—

Afftly yours

S. B.

(২)

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা।

বাগবাজার,

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

প্রিয় মোহান্ত,

তিন চার মাস পূর্বে তোমার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণের জন্য এক প্যাকেট নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলাম, আশা করি তুমি তাহা পাইয়াছ। এ বৎসর উৎসবের আয়োজন একটু অস্বাভাবিক বিলম্বে শুরু হইতেছে। তুমি উৎসবের জন্য যতটা সম্ভব টাকা সংগ্রহ করিয়া তোমার সুবিধামত সত্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিও। দক্ষিণেশ্বরের জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রৈলোক্যবাবুর সর্তের সঙ্গে একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মঠনির্মাণের উদ্দেশ্যে নদীতীরস্থ বেলুড় গ্রামে ৪০,০০০৲ (চল্লিশহাজার) টাকায় ২০ (কুড়ি) বিঘা জমি ক্রয় করার চুক্তিপত্র লেখা হইয়াছে। যদি সেই জমিসংক্রান্ত দলিলপত্র এটর্ণি ও অন্যান্য আইন ব্যবসায়ীগণ অনুমোদন করেন তবে উহা একমাসের মধ্যেই ক্রয় করা হইবে। একথা তুমি গোপন রাখিও এবং যে পর্যন্ত আমরা ক্রয় না করি সে পর্যন্ত উহা প্রকাশ করিও না। তোমার কাজকর্ম কেমন চলিতেছে? আমাদের প্রিয় খোকা ও তুলসী কেমন আছে? রামেশ্বর হইতে গোপালদা ফিরিয়াছেন কি? আশাকরি ভগবানের আশীর্বাদে তুমি ভালই আছ। স্বামীজী আজকাল মঠেই বাস করিতেছেন। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানিবে।

প্রীতিবদ্ধ

ব্রহ্মানন্দ

পুনশ্চ: গোবিন্দানন্দের নিকট হইতে আমি একখানা পত্র পাইয়াছি। কাজের চাপে তাহার পত্রের জবাব দিতে পারি নাই। উৎসবের পর তাহাকে লিখিব।

(স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত*)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা।

The Math,
P.O.—Belur,
Dist.—Howrah, 29th April, 1898.

শ্রীচরণেষু,

গতকল্য নিত্যগোপালের পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। তোমার শরীর এখনও ভালরকম সারে নাই শুনিয়া আমরা যারপর নাই ভাবিত আছি, পত্রপাঠ কেমন থাক লিখিয়া সুখী করিবে।

কলিকাতায় ৪।৫ দিনের মধ্যে ১০।১২টি plague cases হইযাছে, তাহার মধ্যে ৮।১০টি মারা পড়েছে এবং বাকি (যাহারা) তাহাদের জীবনের আশা খুব কম, Dr. Sasi প্রভৃতি analysis দ্বারা জানাইয়াছেন যে real plague. Govt. এখনও বাহিরে কিছু প্রকাশ করেন নাই। শীঘ্রই মন্তব্য বাহির করিবেন। এখন হইতে কলিকাতা হইতে বিস্তর লোক পলাইতেছে। একটা খুব panic হইযাছে। বোধহয় ২।৪ দিনে অনেক লোক চলিয়া যাইবে।

অদ্য সকালে যোগেন মঠে আসিয়াছিল শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করিতে। Dr. Sasi এবং আমাদের অনেকের মত যে (তিনি) কামারপুকুরে গিযা থাকেন। যদ্যপি শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায plague না spread করে এবং বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে আবার আসিবেন। এ বিষয়ে তোমার কি মত জানিতে পরিলে সেইরূপ কার্য করা যাইবে।

তোমার নিজের শরীর যদ্যপি দুর্বল থাকে তাহা হইলে Dr. কে জিজ্ঞাসা করিয়া নীচে আসিবে, যদ্যপি Dr-রা বলে যে ২।১ দিন অপেক্ষা করিতে (হইবে) তাহা হইলে না হয় অপেক্ষা করিবে। এখানে আসিয়া তুমি Mrs. Bull প্রভৃতির সহিত America চলিয়া যাও এইটী আমার ইচ্ছা। কলিকাতার report প্রত্যহ তোমাকে পাঠাইব। তুমি সেখানে একটু সাবধানে থাকিবে; আহারাদির কোন প্রকার অত্যাচার যেন না হয়। তুমি কেমন থাক প্রত্যহ একখানা করিয়া চিঠি নিত্যগোপাল দ্বারা লেখাইবে। Mrs. Bull প্রভৃতি তাহারাই বা কি করিবে এ বিষয় তুমি consider করিয়া তাহাদিগকে একখানা চিঠি আলাহিদা লিখিবে। তুমি আমাদের নমস্কার জানিবে। ইতি

দাস
Rakhal

---

* দার্জিলিং-এ

ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আমাকে মাঝে মাঝে লোকে প্রশ্ন করে—ঠাকুর নিজে চলে গেলেন—মা ঠাকরুণকে রেখে গেলেন কেন ?

শ্রীশ্রীমা 'নরেন' প্রভৃতি সন্তানদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রামকৃষ্ণ মিশন গ'ড়ে তুলেছেন। তিনিই ছিলেন কেন্দ্রশক্তি। শুধু তাই নয়, মঠমিশনের নানা দুরূহ সমস্যার সহজ মীমাংসা তিনি করে দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারীদের কিভাবে চলতে হবে সে সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, বড়লোকের বাড়ীর দাসী মালিকের ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসা দেখায়, মুখে বলে—'এ আমার খুব ন্যাওটা', কিন্তু মনে জানে—এ তার কেউ নয়, তার নিজের ছেলে ভাঙা কুঁড়েতে তার জন্য কাঁদছে, মন প'ড়ে থাকে সেখানে, ঠিক তেমনি সংসারে সবাইকে 'আপন, আপন' বলবে কিন্তু জানবে ভগবানই একমাত্র আপনার। ঠাকুর আরও বলেছেন—নৌকা জলে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকাতে যেন জল না থাকে। তুমি সংসারে থাকো ক্ষতি নাই কিন্তু তোমাতে যেন সংসার না থাকে। এই হল সংসারীদের আদর্শ।

কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে বিন্দুমাত্র সংসার ছিল না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সংসারের বাইরের লোক। কাজেই, সংসারীদের প্রতি এই সব উপদেশ দিলেও, নিজের জীবনে আচরণ করে দেখাবার সুযোগ তাঁর হয়নি। তাই, লোকে বলতে পারে—এ আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করা অসম্ভব, ঠাকুর শুধু মুখেই বলেছেন, নিজের জীবনে আচরণ করেন নি।

শ্রীশ্রীমা কিন্তু বাস করতেন সংসারের মধ্যে। বাড়ীতে তাঁর ভাইরা ছিলেন ঘোর সংসারী। মায়ের এক ভাইঝি ছিলেন খামখেয়ালী ও চিররুগ্না। এঁদের নিয়ে মা জয়রামবাটীতে সংসারীদের মতই নানা অশান্তির মধ্যে কাটাতেন। তার ওপর মাতৃচরণ-দর্শনপ্রার্থী ভক্তদের আসার বিরাম ছিল না। তাদের থাকার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় মাকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত। বাইরে থেকে দেখে মনে হত সাধারণ সংসারীর মতো তিনি বাড়ীর সব কাজ নিখুঁত ভাবে করছেন—কিন্তু মন ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন কিভাবে সংসারীর আদর্শ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ জীবনে রূপায়িত করতে হয়। দু'হাতে ভগবানকে আঁকড়ে ধরে সংসার করার এই আদর্শ দেখাবার জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে রেখে গিয়েছিলেন।

এই সংসারে 'আমি আর আমার' এই বোধ থেকে যত দুঃখের সৃষ্টি হয়। এই 'আমি আর আমার' ছাড়তে না পারলে ঈশ্বরে মন যায় না। 'আমি আমি' ছেড়ে 'তুমি তুমি' না বলতে পারলে মন থেকে সংসার যাবে না। 'আমার ছেলে,' 'আমার স্বামী' ইত্যাদি না ভেবে তাঁদের ঈশ্বর-বুদ্ধিতে সেবা করতে হবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ

* কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৪.৪.৬৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন—শ্রীমাধুর্যময় মিত্র

প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।"

"স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে; কারণ সে আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে। স্ত্রীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে।" স্বামীর মধ্যে, স্ত্রীর মধ্যে আত্মা আছেন বলেই তাঁরা প্রিয় হন। স্বামীজী যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে বলেছেন, সেও এই একই জিনিস। সবারই মধ্যে নারায়ণ আছেন এই জ্ঞানে সংসার করতে হবে।

ঠাকুর 'নরেন' প্রভৃতি ত্যাগী সন্তানদের খুব ভালবাসতেন, স্বামীজী একদিন ঠাকুরকে বললেন—আপনি রাতদিন 'নরেন, নরেন' করেন, শেষে আপনার জড়ভরতের অবস্থা হবে! বালকস্বভাব ঠাকুর চিন্তিত হয়ে মন্দিরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন। মা ব'লে দিলেন—তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিস তাই ভালবাসিস। যেদিন ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না। এই নারায়ণজ্ঞানে সকলকে ভালবাসা, এইটাই হল মূল কথা।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ। তার ফলে মনে নানা বাসনার বুদ্‌বুদ উঠছে। তা থেকে লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি হচ্ছে। এর ফলে আমরা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। সর্বদা বিচার করে চলতে হবে; মন থেকে বাসনা দূর না করলে সাধনভজন হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে ধ্যানযোগের উপদেশ দিলেন, অর্জুন তখন বলেছিলেন—"এই মন বাতাসের চেয়েও চঞ্চল। এই মনকে সংযত করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই ধ্যানযোগের উপদেশগুলি কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়।" উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"অর্জুন, তুমি যা বলছ তা ঠিক, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সংযত করা সম্ভব। আমি ধ্যানযোগে যা উপদেশ দিয়েছি তা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়।"

মানুষের মন একটা পুকুরের মতো। পুকুরের জল যখন শান্ত থাকে তখন তাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব সুন্দরভাবে দেখা যায়। কিন্তু যদি পুকুরের জলে একটা ঢিল ছুড়ে ফেলা হয়, অমনি তরঙ্গ ওঠে। চাঁদের প্রতিবিম্ব আর স্পষ্ট দেখা যায় না। বাসনা হল ঐ ঢিল। আমাদের মনরূপ পুকুরে বাসনা-রূপ ঢিল অনবরত তরঙ্গের সৃষ্টি করছে, যার ফলে আমরা আমাদের স্বরূপকে জানতে বা দেখতে পারছি না। এই মনকে শান্ত ও সংযত করলেই আত্মানুভূতি সম্ভবপর। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহায়ে এই মন শান্ত হয়। বাতাস না থাকলে প্রদীপের শিখা যেমন নিষ্কম্প থাকে, বাসনা না থাকলে মানুষের মনও সেইরূপ নিষ্কম্প হয়। যোগী পুরুষরা এইরূপ নিষ্কম্প মন নিয়ে আত্মোপলব্ধি করেন। আত্মোপলব্ধি মানে আমরা স্বরূপতঃ যা, তাই উপলব্ধি করা। আমরা স্বরূপতঃ আত্মা বা ব্রহ্ম। এই স্বরূপ-উপলব্ধির, নিজেকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করার নামই আত্মোপলব্ধি।

মানুষ মরতে চায় না—এর কারণ কি? এর কারণ মৃত্যু তার স্বভাব-বিরোধী—সে জন্মমৃত্যু-রহিত, সে আত্মা। আত্মা সৎ অর্থাৎ সর্বকালে আছেন এবং অবিনশ্বর। এই বোধ তার মধ্যে আছে, তাই মানুষ মরতে চায় না।

মানুষ অজ্ঞানকে ঘৃণা করে, মানুষ সবকিছু জানতে চায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি

সবকিছু জানবার জন্য মানুষের অনন্ত আগ্রহ। এর কারণ তার আসল সত্তা যে 'চিৎ', অর্থাৎ সে যে জ্ঞানস্বরূপ, এই বোধ তার মধ্যে আছে।

মানুষ সর্বদা দুঃখকে পরিহার করতে চায়, আনন্দ খোঁজে। এই আনন্দের সন্ধান চলছে তার সকল কাজের মধ্যে। এর কারণ, সে যে আনন্দস্বরূপ এ বোধ তার মধ্যে আছে।

আমাদের এই প্রকৃত স্বরূপকে জানাই, সৎ-চিৎ-আনন্দ যে আমাদের সত্তা তা জানাই হল আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরলাভ।

এক হউক

ডক্টর মতিলাল দাশ

[ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত]

হে হুতাশন, প্রভু, তুমি কাম্য ফল দাতা,
ব্যাপ্ত তুমি বিশ্বপ্রাণে বিশ্বপ্রাণের পাতা !
বেদীর পরে ঋত্বিক সে করবে প্রজ্বালন
পূর্ণ কর মোদের যাহা কাঙ্ক্ষিত সব ধন। ১
তোমরা চল একসাথে সব একই কথা কহ
সবাই মিলে ভালবাসায় একটি হৃদয় বহ।
দেবতারা পূর্বে যেমন যজ্ঞভাগের লাগি'
একটি মতে মিশল সবে তেমনি রহ জাগি। ২
হোক তোমাদের মন্ত্র সমান হোক সমিতি তুল্য,
মন তোমাদের একই প্রকার হোক হে হৃদয় ফুল্ল
আনতে ঐক্য একই মন্ত্রে সবার দীক্ষা হবে
তোমাদেরি যজ্ঞকাজে একই হবি রবে। ৩
সংকল্প সে একই হবে তোমরা ব্রতী যত !
হোক তোমাদের হৃদয়গুলি একই ভাবে নত,
হৃদয়গুলি মিলুক সবার এক মিলনের সুরে,
একতার-ই ছন্দে সবার হৃদয় উঠুক পুরে। ৪

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার ভূমিকা

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক।

একজন লোক ঘর থেকে একটা ভারি পিয়ানো বার করবে। ঠেলাঠেলি করে সেটাকে দরজার মাঝামাঝি এনেছে, তারপর আর পারছে না। এমন সময় অন্য একজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে এসে প্রথম লোকটিকে বললে, "ভাই, আমি কি তোমায় সাহায্য করতে পারি ?"

"ধন্যবাদ, খুব ভালো হয় তাহলে ?"

দ্বিতীয় লোকটি এসে হাত লাগাল। দুজনে মিলে খুব চেষ্টা করল। কিন্তু কী যে হল, পিয়ানোটা আর নড়েই না।

প্রথম লোকটি তখন বললে দ্বিতীয় জনকে, "ভাই, তুমি তো আমায় খুবই সাহায্য করলে কিন্তু কী আর করা যাবে বলো, পিয়ানোটা আর বার করা গেল না।"

"বার করা ?" সবিস্ময়ে বলল দ্বিতীয় ব্যক্তি, "তুমি এটাকে বার করতে চাইছ নাকি ? আমি তো এতক্ষণ এটাকে ভিতরে ঢোকাতেই সাহায্য করছিলাম।"

গল্পটি শুনেছিলাম স্বামী নিখিলানন্দজীর মুখে। কলকাতায় তাঁর এক বক্তৃতাকালে।

গল্পটির তাৎপর্য এই যে, কোন বিষয় আলোচনা করতে গেলে, কে কোন্ পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিষয়টি বিবেচনা করছেন সে-সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য।

॥ দুই ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া দরকার কোন্ রামকৃষ্ণকে আমরা চাইছি ?

তিনি অনন্তভাবময়, একথা মনে রেখে সাধারণভাবে বলা যায় যে, তিনটি ইতিমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে (তথা যে-কোন অবতারকে) দেখা সম্ভব—(১) ঐতিহাসিক, (২) তাত্ত্বিক এবং (৩) মরমী। এই তিন দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে পারে। আবার একই ব্যক্তি ধাপে ধাপে, একটি থেকে আর একটিতে উত্তীর্ণ হতে পারেন। আবার একই জনের যুগপৎ তিনটি দৃষ্টিই সমন্বিতভাবে থাকতে পারে। যদিচ শেষোক্ত ক্ষেত্রে সেই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হবেন মুখ্যত মরমী বা প্রেমিক।

মরমীদের মনের চূড়ান্ত কথাটি এই রকম : " কৃষ্ণের সত্যতা পৌরাণিক না ঐতিহাসিক এ নিয়ে মাথা বকানো নিষ্ফল, যেটা অনুধাবনীয় সেটা এই যে তাঁর আবির্ভাব চিরন্তন কিনা—তিনি বৃন্দাবন-বিহারী ছিলেন কিনা এ বিচারে কাজ কী—আমরা চাই হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবন-বিহারী কিনা। এই-ই হ'ল চিরন্তন কৃষ্ণ যিনি বলেছিলেন : 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—শুধু অবতারের চিন্ময় বিগ্রহে নয়—নাস্তিক্যের মৃন্ময় আধারে, অর্ধ-উন্মীলিত শিশু-নয়নের দৃষ্টিপথে - সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের হৃদয়ের সংশয়ান্ধকার ঝড়তুফানের গর্ভকোষে। 'জন্মাষ্টমী'-র অর্থ…এই-ই…।" (ভাগবতী কথা, ভূমিকা, পৃঃ ২২-২৩, শ্রীদিলীপকুমার রায়।)

মরমী ছাড়া কে বলতে পারেন নির্দ্বিধায়ঃ "If it is proved that Christ is outside truth, I would prefer to be with Christ rather than with that truth."

ভাবার্থঃ "যদি প্রমাণিত হয় যে, খ্রীস্ট সত্য-বহির্ভূত, তাহলে সেই সত্যকে পরিহার করে আমি খ্রীস্টের সামিল হব।"

এমন কথা শোভা পায় শুধু মরমীর মুখেইঃ
"ভগবান অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন।
থাকে যেন প্রভু আর মার পদে মন॥"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, পৃঃ ২১১)

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত হওয়া স্বাভাবিক হয় কয়েকটি কারণে।

প্রথমত, তিনি কালের দিক দিয়ে আমাদের খুব কাছের মানুষ। শ্রীযুক্ত ক্রিসটোফার ইশারউড-এর ভাষায়ঃ

"Ramakrishna's teaching is our modern gospel. He lived and taught for us, not for men of two thousand years ago, and the Ramakrishna Movement is responsible for the spreading of his gospel among us, here and now." (Foreword, History of the Ramakrishna Math and Mission by Swami Gambhirananda, p ix.)

ভাবার্থঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত শিক্ষাই আমাদের আধুনিক শাস্ত্র। তাঁর জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষাদান আমাদেরই জন্য, দু-হাজার বছর আগেকার মানুষদের জন্য নয়। আর রামকৃষ্ণ-আন্দোলন তাঁর বাণীপ্রচারের দায়ভাগী—আমাদের মধ্যে এখানে এবং এখন।"

অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন তিনিঃ

"...Ramakrishna's life, being comparatively recent history, is well documented. In this respect, it has the advantage over the lives of other, earlier phenomena of a like nature. We do not have to rely, here, on fragmentary or glossed manuscripts, dubious witnesses, pious legends." Ramakrishna and his Disciples, p l.)

ভাবার্থঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, তুলনামূলক বিচারে সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিষয় বলে, তার সম্পর্কে পর্যাপ্ত নথিপত্র রয়েছে। এদিক দিয়ে দেখলে, অতীতের অনুরূপ সংঘটনগুলির তুলনায় তার অনুধ্যান সহজতর। এখানে আমাদের নির্ভর করতে হয় না—খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, টীকাকণ্টকিত, মন্তব্য-পরিকীর্ণ পাণ্ডুলিপি, সন্দেহজনক সাক্ষ্য বা শুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কথা ও কাহিনীর উপর।"

অনুরূপ কথা আরও সহজ ও ঘরোয়া ভাবে বলেছেন স্বামী শিবানন্দ, "কি বলছো হে! স্বয়ং ভগবান্ নরদেহ ধারণ ক'রে এসেছিলেন—এই তো সেদিনের কথা। আমাদের চোখের উপর সব কাজটা হয়ে গেল। কি কঠোর সাধনার অগ্নিই না তিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন! এখনও তার আঁচ লোকের গায়ে লাগছে।" (শিবানন্দ-বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩)

দ্বিতীয়ত, রামকৃষ্ণ-জীবনে, রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে একঘেয়েমির কোন স্থান নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ভাষায়ঃ "একঘেয়ে হওয়াটা হীনবুদ্ধির কাজ।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-২৮০)

তৃতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্পর্কে বিচারকে, যাচাইকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। তাঁর সন্তানরাও অনুরূপ মনোভাবই অবলম্বন করতেন তাঁর বিষয়ে। "ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ-নিজ মন-বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে উহাতে দুষ্য কিছুই নাই, কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি—একথা মনে না করিলেই হইল।"—বলেছেন

পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড, নিবেদন, পৃঃ ৩)

আসলে, যদি কারও অনুসন্ধান আন্তরিক হয়, সংস্কারে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বোপরি ঠাকুর যদি তাকে টানেন ("কৃপা বিনা অবতারে নাহি ধরিবার"—পুঁথি, পৃঃ ১৭৭) তাহলে যেভাবেই তার রামকৃষ্ণ-চর্চা শুরু হোক না কেন, অন্তে তা রামকৃষ্ণ-প্রেমে উপনীত হতে বাধ্য। এ অন্বেষণ স্বাদু স্বাদু পদে পদে। এ পরমান্নের প্রতি গ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি, পুষ্টি। যদি সংস্কারের দোষে, প্রচ্ছন্ন কামনা-বাসনার পিছুটানে, বিদ্যার গর্বে বা অহংকারের প্রাবল্যে—কেউ কিছুদূর এগিয়ে থেমে যান বা হটে যান, তাহলেও তিনি ততটুকু পরিমাণেও লাভবান হবেন।

মনে পড়ে স্বামী সারদানন্দজীর কথা: "...আমরা এ অদৃষ্টপূর্ব দেবমানবের কথা যতদূর জানি বলিয়া যাই, আর তুমি এই সকল কথা যতটা ইচ্ছা 'ন্যাজামুড়া বাদ দিয়া' নিজের যতটা 'রয় সয়' ততটা লইও, বা ইচ্ছা হইলে 'কতকগুলো গাঁজাখুরি কথা লিখিয়াছে' বলিয়া পুস্তকখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিত্য নূতন ফুলে 'বিষয়-মধু' পান করিতে ছুটিও। পরে সংসারে বিষম ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যদি কখন 'বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'ল, কামাদি-কুসুমসকলে'—এমন অবস্থা তোমার ভাগ্যদোষে (বা গুণে?) আসিয়া পড়ে, তখন এ অলৌকিক পুরুষের লীলাপ্রসঙ্গ পড়িও—নিজেও শান্তি পাইবে এবং আমাদের ঠাকুরেরও 'কদর' বুঝিবে।" (লীলাপ্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫)

॥ তিন ॥

পূর্বোক্ত—ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক এবং মরমী দৃষ্টিকোণগুলি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে কীভাবে দেখা যেতে পারে? আর সব ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও আমাদের পরম দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভ্রাতৃবৃন্দ।

যেমন ধরা যাক, স্বামীজী ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন যখন বলেছেন, "বঙ্গদেশের সুদূর পল্লী-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নিরক্ষর বালক কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তিবলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে তাহা দান করিয়া গেলেন—আর সে সত্যকে জীবন্ত রাখিবার জন্য কেবল কয়েকজন যুবককে রাখিয়া গেলেন।" (মদীয় আচার্যদেব, বাণী ও রচনা ৮ম, পৃঃ ৪০৮)

আবার: "এই ব্যক্তি তাঁর একান্নবর্ষব্যাপী একটা জীবনে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন।" (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ১৮)

ইতিহাসের ভিত্তিতেই বলেছেন স্বামী সারদানন্দ, "ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানবজগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০০)

ইতিহাস-চেতনা থেকেই বলেছেন স্বামীজী, "হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।...

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ

করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।" (হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৬)

অনুরূপ চেতনা থেকেই আরও বলেছিলেন তিনি, "...শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষাগ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে।" (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ১৮)

এই উক্তিরই সম্প্রসারিত রূপ : "... কোন মহান আদর্শপুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, এমন কি কোন কাজই করিতে পারে না। রাজনীতিক, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্য জগতের কোন আদর্শপুরুষ কখন ভারতে সর্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী মহাপুরুষগণের নামে আমরা সম্মিলিত হইতে চাই—সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর না হইলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা এমন এক ধর্মবীর—এমন একটি আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।

"... আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন, আর আমরা কিছু করি বা না করি, যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন।" (বাণী ও রচনা, ৫ম, পৃঃ ২১১-১২)

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর সন্তানদের সিদ্ধান্ত, স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায়, "...শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র জীবনের আমরা যতই অনুশীলন করিয়াছি, ততই উহাকে বৈদিক সার্বজনীন ও সনাতন অধ্যাত্ম ভাববৃক্ষের সারসমষ্টিসমুদ্ভূত প্রথমোৎপন্ন ফলস্বরূপেই নির্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ২)

স্বামীজী বলেছেন, "তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোকবর্তিকা, যার তীব্র রশ্মি-সম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ সত্যসত্যই বুঝতে সমর্থ হবে।" (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ১৪)। আবার, "বেদ-বেদান্ত পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না।" (ঐ, পৃঃ ৪৪)

'জৃম্ভিত-যুগ ঈশ্বর' (যিনি যুগের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত)—এই একটি শব্দে এ বিষয়ে স্বামীজীর তাবৎ চিন্তা সংহৃত। আর তা-সোচ্চার তাঁর অপূর্ব প্রণাম-মন্ত্রে—

'স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥'

ধর্মের সংস্থাপক, সকলধর্মস্বরূপ, অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে রামকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম করি। (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ২৫৬)

আর 'মমৈকশরণদাতা' রামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রেমিক স্বামীজীর আবেগমথিত কয়েকটি উক্তি—

১. 'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম'—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করিয়াছি। (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩২৮)

২. "...না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া

একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম না-হয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, কিছুমাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই 'ভাবের ঘরে চুরি'। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করিব? একঘেয়ে বলো বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাডে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালোবাসি। আমার মতো অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেবো? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।" (বাণী ও রচনা. ৭ম, পৃঃ ১৬১-১৬২)

৩. "তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম?" (ঐ, পৃঃ ৬৪)

৪. "যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।" (ঐ, পৃঃ ৫০)

৫. "· আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটিই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি ·। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! —যাই প্রভু যাই।" (বাণী ও রচনা, ৮ম, পৃঃ ১৩১-১৩২)।

৬. এই ভাবেরই কাব্যময় প্রকাশ—

"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে।
তব গতি নাহি জানি,
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপ-তপ সাধন-ভজন,
আজ্ঞা তব, দিয়েছি তাড়ায়ে;
আছে মাত্র জানাজানি-আশ,
তাও প্রভু কর পার।
... ...
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
... ...
তত্ত্বজ্ঞের নহে এ বারতা।"

(বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ২৭২-২৭৩)

এখন তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমরা চাই প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। যার অর্থ, আমরা চাই তাঁর ভক্ত হতে।

সেই সঙ্গে ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে চাই আমরা।

আরও চাই, তত্ত্বের দিক দিয়ে যথাসাধ্য বুঝে নিয়ে প্রণাম জানাতে অবতারবরিষ্ঠ রামকৃষ্ণকে।

কিন্তু আবার বলি—আমাদের যাত্রার শুরুতে ও সারায় আছেন প্রিয়তম শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই আমাদের নীড় এবং তিনিই আমাদের আকাশ।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীন ভারত

শ্রীপিনাকেশ সরকার

(১)

শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একই সঙ্গে যুগজাতক এবং যুগাতিশায়ী। "সাম্প্রতে"-র জটিলতা এবং যন্ত্রণাকে তিনি রূপায়িত করে তোলেন এবং অতীত-ভবিষ্যতের সুদূর অধ্যায়ের অভিমুখেও তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। কেননা, যিনি কবি তিনি শেষ পর্যন্ত এক অসীম অখণ্ড সত্যকেই পরিপূর্ণভাবে দেখতে চান, এবং সেই পূর্ণদর্শনের জন্য অনেক সময় খণ্ডিত কালসীমাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে তাঁর সহায়ক, অতীতের ঐতিহ্য তাঁকে দীক্ষিত করে তোলে বর্তমানের দর্শনে, ভবিষ্যতের ধ্যানে। একথা শুধুমাত্র রোম্যান্টিক কবিদের সম্বন্ধেই সত্য নয়, জগতের যে-কোনো মহাকবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মিলটন 'প্যারাডাইস লস্ট' এবং 'প্যারাডাইস রিগেইনড্'-এর কাহিনী-নির্বাচনে বাইবেলকেই আশ্রয় করেছিলেন, কালিদাসের একাধিক কাব্য-নাটকের উপাদান রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ, আর অতদূরে যাবারই বা কী প্রয়োজন? আমাদের মধুসূদন, যিনি বস্তুতঃ বাংলা কাব্যের একমাত্র 'মহা-কবি', তিনি সনেটগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত কাব্যেরই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন পুরাণ-মহাকাব্য থেকে।

অবশ্য এই অতীতপ্রীতি নানা সূত্রে দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ, অতীত যেখানে গতানুগত প্রথা, নির্জীব নিঃসহায় অনুবর্তন। যেমন—মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের তথাকথিত মহাকাব্যে। দ্বিতীয়তঃ, অতীতকে অবলম্বন করে যেখানে বর্তমানের ভাষ্য রচিত হয়। অতীত সেখানে উপকরণমাত্র, কবির আসল উদ্দেশ্য অতীতের শিলাখণ্ডগুলি-মাত্র গ্রহণ করে বর্তমানের মহামন্দির-রচনা। যেমন—মধুসূদনের মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনা কাব্যে। তৃতীয়তঃ, অতীত যেক্ষেত্রে কবির স্বপ্নচারণার আশ্রয়, তাঁর ক্লান্ত শ্রান্ত বিক্ষত হৃদয়ের কোমল উপশম, এমন কি আদর্শ জীবনের রূপ। যেমন—কীট্‌সের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায়।

অন্যান্য যে-কোনো রোম্যান্টিক কবির মতোই রবীন্দ্রনাথ অতীতের ছায়াধূসর পথে বারংবার ফিরে গেছেন। সে অতীত একদিকে স্থানকালপাত্ররহিত 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশ', চূড়ান্তভাবে বিশুদ্ধভাবে পুরাতন। পুরাতন বললেও বোধহয় ভুল হবে, বলা উচিত 'অনন্ত'। 'অনাদিকালের হৃদয় উৎস' সেই অতীতের ঠিকানা। সে অতীতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, কাল নেই, পাত্র নেই। তার কোনো সুস্পষ্ট রূপচিত্র অঙ্কন করা যায় না। এই 'পুরাতন' একটি শাশ্বত, রূপহীন, দার্শনিক সত্যের মতো।

কিন্তু আরেক রবীন্দ্রনাথকেও আমরা চিনি, যিনি অতীতের একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপশ্রী রচনা করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। সে অতীতে ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল স্বপ্নকল্প নগরী, শ্যামচ্ছায়া-ঘন জনপদ—সমগ্রভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষ। আরও দূর অতীতে, আশ্রম-জীবনের সন্নিধানেও কবি ফিরে গেছেন। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রধ্বনিত তপোবন-জীবনকে, সভ্যতার সেই অরুণলগ্নকেও কবি নানাভাবে স্মরণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ

বলে রাখা ভালো, অতীত ভারত বলতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, এবং কালিদাসের যুগের ভারতকেই বুঝিয়েছেন। সংঘর্ষচিহ্নিত পাঠান বা মুঘলযুগ তাঁকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। 'কথা ও কাহিনী'র অনেক কবিতায় পাঠান-মুঘল যুগের পটভূমি রয়েছে সত্য, কিন্তু সেখানে তিনি মূলতঃ আদর্শ-লোকের স্রষ্টা, বিশুদ্ধ স্বপ্নকল্পনা সেখানে নেই।

(২)

মানসী কাব্য রচনার সময় থেকেই অতীত-প্রীতির সূচনা এমন বললে ভুল হবে না। মানসীর 'একাল ও সেকাল' কবিতায় বর্ষার মেঘমেদুর সজলগম্ভীর রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে করতে কবির চেতনা ফিরে গেছে অতীতের স্বপ্নমধুর উৎসে। বিশেষতঃ কালিদাসের কাল এবং বৈষ্ণব কাব্যে বর্ণিত প্রাচীন বৃন্দাবনকেই কবিহৃদয় লীলাঙ্গনরূপে নির্বাচন করেছে। বলা বাহুল্য, এর পেছনে রয়েছে 'মেঘদূত' এবং বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ্মপ্রভাব। 'পত্র' কবিতাতে 'মেঘদূত' কবিতায় এই অতীতমোহ সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম উজ্জ্বল রেখায় সুপরিস্ফুট হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে 'নবমেঘদূত' রচনা করেছেন, 'মেঘদূতে' বর্ণিত প্রাচীন ভারতের জীবনচিত্রকে প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করে তুলেছেন, অথচ তার মধ্যে কোনো সচেতন প্রয়াসের চিহ্ন নেই। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিবিচিত্রা তাঁকে এমনভাবে আবিষ্ট করেছিল যে তাকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ উপাদানের মতোই গ্রহণ করেছিলেন। 'মেঘদূতে'র অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি আক্ষরিকভাবে কালিদাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মেঘদূতে'র অষ্টম স্তবকের প্রায় সবটুকু এবং নবম স্তবকেরও কিছু কিছু অংশ কালিদাসের আক্ষরিক অনুসরণ। 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের অতীতপ্রয়াসী কল্পনার একটি সার্থক সৃষ্টি।

প্রাচীন ভারতের এই মায়ামেদুর কল্প-জগৎকে রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'কল্পনা' কাব্যে। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে বর্ষাচিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে পরিস্ফুট হয়েছে কালিদাসীয় ভারতবর্ষের পটভূমি। ঋতুসংহার, মেঘদূত এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দের বর্ণসম্পাতে রবীন্দ্রনাথ এখানে যে পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন তা সর্বতোভাবে কালিদাসের যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'ক্ষণিকা'র একাধিক কবিতাও (সেকাল/ জন্মান্তর) প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের কবিতাতে ঠিক এই ধরনের কল্পলোক সৃষ্টির আবেগতপ্ত বাসনা দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের উল্লেখ সেক্ষেত্রে হয় তো আছে, কালিদাসের প্রভাবও কিছু কম নেই—কিন্তু কবি সেখানে মুখ্যতঃ রূপদর্শী নন, তত্ত্বদর্শী। প্রসঙ্গতঃ 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বিচ্ছেদ' কিংবা 'সানাই' কাব্যের 'যক্ষ' কবিতার কথা মনে করা যেতে পারে। দুটি কবিতাতেই বিরহ-তত্ত্বের পরিস্ফুটনই কবির লক্ষ্য। কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষের যে উল্লেখ আছে তা মেঘদূতের অনুগত হলেও, সেই কল্পলোকসৃষ্টির বিশদ আকাঙ্ক্ষা (যা মানসীর 'মেঘদূতে' বা 'কল্পনা' কাব্যে আমরা দেখেছি) এখানে অনুপস্থিত। বলা যেতে পারে, শেষপর্বের কবিতায় কালিদাসের যুগ রোম্যান্টিক কবির কাছে আর সেই তীব্র জীবনবাসনার তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয় নি—হয়, কবির বিভিন্ন বক্তব্যের অনুষঙ্গে এসেছে, নতুবা চিত্রগীতময়ী বিশদ বর্ণনার বদলে এক প্রতীকী মহিমায় উপস্থিত হয়েছে।

(৩)

প্রাচীন ভারতবর্ষ যে কবির কাছে শুধুমাত্র কল্পবিলাসের আশ্রয় ছিল না, তা যে একটি গভীর বিশ্বাসের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা 'চৈতালি'-কাব্যরচনার যুগ থেকেই পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কবি-প্রতিনিধি কালিদাসের কাব্যেই আধুনিক কবি শাশ্বত প্রাচীন ভারতকে দেখতে পেলেন। তবে মনে রাখতে হবে, প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি কবির এই অনুরাগ মূলতঃ কালিদাসের কাব্য ও নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কবির এই অনুরাগ যে কাব্য থেকেই সংক্রামিত, তত্ত্ব বা ধর্মপ্রণালী থেকে নয়, তার বাহ্য প্রমাণ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি থেকেই পাওয়া যেতে পারে—

"আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বারবার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।"

[আত্মপরিচয় : ৬-সংখ্যক প্রবন্ধ]

'চৈতালি' কাব্যের একাধিক কবিতায় তপোবন-জীবনাদর্শের বন্দনাগীতি গাওয়া হয়েছে। যেমন 'তপোবন' কবিতায়—

"মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাত বায়ে,···
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা, পক্বকেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।"

'বনে ও রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'প্রাচীন ভারত' প্রভৃতি কবিতাতেও প্রাচীন জীবনাদর্শেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। এখানেও অবশ্য কালিদাসের স্মৃতিমূলক কয়েকটি কবিতা আছে (যেমন—'কালিদাসের প্রতি', 'কাব্য', 'মানসলোক'), কালিদাসকে অনুসরণ করে কয়েকটি কবিতায় কল্পলোক-সৃষ্টির প্রয়াস আছে (যেমন—'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'মিলনদৃশ্য', 'কুমারসম্ভব গান'), কিন্তু মুখ্যতঃ কল্পচারণা অপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই এই সময় থেকে রবীন্দ্রকাব্যে অধিকতর প্রাধান্য পেতে শুরু করে। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন—"Aesthetics ছাড়িয়া এখন Ethics সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে।"

'কথা ও কাহিনী' প্রেরণার দিক থেকে প্রাচীন ভাবাদর্শ এবং আকারে ও অবয়বে প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের অনুসরণ করেছে। এগুলির আবির্ভাব ভারতীয় ত্যাগ ও শক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত কবিমানস থেকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের যে সহজ অবস্থানভূমিতে একদিকে ছিল রাজ্যলিপ্সা, ধর্মবিদ্বেষ, হত্যা, ব্যভিচার, ঈর্ষা প্রভৃতি এবং অন্যদিকে ক্ষমা, ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, ধর্মসাধনা, নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ—রবীন্দ্রনাথ সেই পাপপুণ্যের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাপীঠে দাঁড়িয়ে এই দ্বৈত জীবনলীলার সঙ্গে একটি গভীর একাত্মতা অনুভব করেছেন। বিশেষতঃ 'কথা'-য় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা, ধর্মসাধনা ও সাধারণ পারিবারিক জীবনসমস্যা কবিসত্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ধর্মের দৃপ্ত অনুশাসন ও ইতিহাসের অবোধ্য ঘটনাসঙ্কট—এই দ্বিবিধ প্রেরণায় মানবমনের বিচিত্র প্রতিক্রিয়াই 'কথা'য় বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধযুগ-সম্পর্কিত কাহিনীর মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'মূল্যপ্রাপ্তি'

ও 'নগরলক্ষ্মী'—এই পাঁচটি কবিতাই উল্লেখ্য। বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ কবিতাগুলিতে নিবিড় ছায়াপাত করেছে। 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় সুপ্রিয়ার সংযত আত্মআবিষ্কারে বৌদ্ধধর্মের শান্তরসাস্পদ দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 'পূজারিণী' ও 'অভিসার' কবিতাদ্বয়ে সৌন্দর্যের ও আবেগের বর্ণময়তা সঞ্চারিত হয়েছে। 'পূজারিণী'র প্রথমাংশেই বিম্বিসার-অজাতশত্রুর ধর্মাদর্শের বৈপরীত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচিত হয়েছে—

"অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।"

এই বিরোধের প্রেক্ষাপটেই শ্রীমতীর সকরুণ আত্মদানের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মসাধনা থেকেও কবি প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন। 'প্রতিনিধি' কবিতায় শিবাজির গুরু রামদাসের ভিক্ষাব্রত সম্বন্ধে সংশয়-নিরসন, গুরুর প্রতি রাজ্যসমর্পণ ও গুরুর প্রতিনিধিরূপে নিষ্কামভাবে রাজ্যপরিচালনার দুরূহ দায়িত্ব-গ্রহণ—এই আদর্শময় আখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। 'অপমান বর'-এ কবীরের ঈশ্বরসাধনায় সম্মান-বিমুখতা ও অহেতুক নিন্দাবরণ—রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনদর্শনের অনুরূপ হিসাবে সমর্থন লাভ করেছে। এছাড়াও 'স্বামীলাভ' ও 'স্পর্শমণি' কবিতাদুটি মধ্যযুগের ভারতবর্ষের আদর্শসুন্দর মাহাত্ম্যের পরিচায়ক।[১]

'কথা'র অবশিষ্ট কবিতাবলীতে ইতিহাসের তীব্র প্রাণস্রোত ও দুরূহ জীবনসমস্যার প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। শিখজীবনের আদর্শ অবলম্বনে লেখা 'গুরুগোবিন্দ', 'শেষ ভিক্ষা', 'বন্দীবীর' কবিতাগুলি স্মরণীয়। স্বদেশ-চেতনার মহামন্ত্রে উদ্বোধিত কবিসত্তার পরিচয় এই কবিতাগুলি বহন করে। এই কবিতাবলীতে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসকেই গ্রহণ করেছেন এবং তার বর্ণাঢ্য রূপচিত্রণ অপেক্ষা আদর্শ-অনুসন্ধানেই অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। রাজপুত ও মারাঠা জীবন অবলম্বনে লেখা 'নকলগড়', 'হোরিখেলা', 'বিবাহ' 'রাজবিচার', 'মানী', 'বিচারক' কবিতাগুলি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য।

'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলির বিষয়বস্তু প্রায়ই অতীতযুগের ইতিহাসাশ্রয়ী, বর্তমান জীবন থেকে সুদূর ব্যবধানে সন্নিবিষ্ট, এবং উদার ও মহান ভাবের বাহন। এখানে কবির রূপতন্ময়তার কোনো নিদর্শন নেই, বরং মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেশপ্রীতি ও বীরত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ ও নৈতিক সমুন্নতির আদর্শটিকে কবি আবিষ্কার করেছেন।

নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়মাস। উপনিষদের প্রতি কবির স্বকীয় অনুরাগ এই সময় থেকেই যথার্থ পরিস্ফুট হতে শুরু করে। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যাদর্শের ও ধর্মাদর্শের প্রতি অনুরাগ মোটামুটি ১৩০৩ থেকেই কবিচিত্তকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ 'নৈবেদ্য' কাব্যে আমরা প্রথম রবীন্দ্রনাথের গভীর ভগবদনুরাগের পরিচয় পেলাম। এর পূর্বে কবি ইতস্ততঃভাবে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা

১ মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ত্যাগ ও আদর্শমহিম রূপটি রবীন্দ্রনাথকে বারংবার আকর্ষণ করেছে; কবিতায় নানাভাবে সেই আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'শুচি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নানসমাপন' কবিতাগুলি স্মরণীয়।

করলেও বাহ্য প্রেরণার বশবর্তী হয়েই তা করেছেন, মনে হয় এত গভীরতায় তাঁর মন তখনো প্রবেশ করে নি। নৈবেদ্যের ব্রহ্মসঙ্গীত-গুলি এদিক থেকে অনেক পরিমাণে স্বতঃ-উৎসারিত বলা যেতে পারে।

নৈবেদ্যের চতুর্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্বন্ধে কবির দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। এখানে কবি শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতের রূপচিত্র অঙ্কন করে বা সেই যুগের স্তুতিরচনা করেই ক্ষান্ত হন নি—এখানে তিনি প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শকেই বর্তমান জড়তাগ্রস্ত ভারতবর্ষের মুক্তির পন্থা বলে মনে করেছেন। কবি এখানে বারংবার বর্তমান ভারতের পাশ্চাত্য-মোহ-গ্রস্ত অবিবেকী জীবন-ধারাকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনধর্মের ত্যাগ ও তিতিক্ষার মন্ত্রে।[২] ৬০-সংখ্যক কবিতায় সেই প্রাচীন ভারতের মর্মকথাকে, উপনিষদের একটি মন্ত্রকে কবি স্মরণ করেছেন—

"একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্‌প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।'"

জীবনের উপান্তে এসেও এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েই কবি বলতে পেরেছেন—

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃত-রূপে বিশ্বের প্রকাশ।"

(রোগশয্যায় : ২৫-সংখ্যক কবিতা)

নৈবেদ্যের ২৪-সংখ্যক সনেটে প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগের শিক্ষাকেই পরম অভিজ্ঞান স্বরূপ জেনেছেন কবি। তাই বলেছেন—

"ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখ সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষ বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথ-কে আকর্ষণ করেছে তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে। কখনো তা হয়ে উঠেছে শুধু কল্পনার চারণতীর্থ,

---

২ এই তপোবন-আদর্শের সুন্দর ব্যাখ্যা আছে 'শান্তি-নিকেতন' প্রবন্ধমালার প্রথম খণ্ডে 'আশ্রম' ও 'তপোবন শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে।

(ক) "এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূত-কালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করছে।"

[শান্তিনিকেতন—প্রথম খণ্ড : পৃ : ২৩০]

(খ) "যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি…… মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়াম'এর দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা; ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।"

[সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের ভূমিকা : 'রবীন্দ্র-জীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬]

আবার কখনো বাস্তব জীবনসমস্যায় প্রপীড়িত সমাজের প্রস্থানভূমি—আদর্শ-জীবনের আশ্রয়। কখনো সুদূর অতীতকে তিনি উজ্জ্বল বর্ণবিভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে রোমান্টিকের স্বভাব-রতে, আবার কখনো সেই অতীতের ভাবাদর্শ-টুকুকে সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু জীবনপীঠে। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সার্থক, কারণ ভারতবর্ষ তাঁর কাছে এক অখণ্ড সত্যবোধ হয়ে দেখা দিয়েছিল, ঐতিহ্যের রসকে তিনি মর্মকোষে ধারণ করেছিলেন আজীবন। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে প্রাচীন ভারত তাই একটি জীবন্ত সত্তারূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং সেই সত্যের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে নিঃসন্দেহে তাঁর বিভিন্নযুগের কবিতাধারায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা-নিধান হে রামকৃষ্ণ, জাগো হে হৃদয়-তীরে
স্বার্থ, দ্বন্দ্ব সবই যে আজিও আছে অন্তর ঘিরে।
জীবনে আঁধার আসিছে নামিয়া
আলোর রেখাটি দেখে না তো হিয়া—
হেথায় সেথায় ঘুরিয়া কেবল আঁধারে আসিছে ফিরে॥

উঠিয়াছে ঝড়, উঠেছে তুফান—তরীতে চলেছি একা
সে তরী ভিড়াতে যত চাই, হায়, কূল নাহি যায় দেখা।
হৃদয়েতে জাগো ওগো ভগবান
চেতনা-আলোকে ভাসাও এ প্রাণ
সব আঁধারের হোক অবসান সে-আলো-সাগর-তীরে॥

ভগিনী নিবেদিতার দান

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ভগিনী নিবেদিতার ভারতকে স্বদেশ বলিয়া মনেপ্রাণে বরণ করা সম্ভবতঃ বিশ্ব-ইতিহাসের অদ্বিতীয় ঘটনা। ইংলণ্ডের কৃষ্টি-উদ্যান হইতে সংগৃহীত এই নির্মল কুসুম ভারত-মাতার রাতুল চরণে যখন নিবেদিত হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহা এক মাহেন্দ্রক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

বহুমুখী প্রতিভা, সুবিশাল হৃদয়, শুচিশুভ্র চরিত্র আর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া এই শ্বেতাঙ্গিনী বিদুষী যেদিন ভারতবর্ষের সাগর-তীরে আসিয়াছিলেন সেদিন হইতেই তিনি আমাদের 'আত্মার আত্মীয়' হইয়া উঠিয়াছিলেন। জন্মসূত্রে বিদেশিনী হইলেও, তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন ভারতের একান্ত আপনার লোক। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাই যথার্থই বলিয়াছিলেন, 'She was an Indian through and through'. তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে পরমাত্মীয়ার বিয়োগব্যথায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখনী, চোখের জলে লিখিয়াছিলেন :

"এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া
গেলে, হায়,
চ'লে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
দেহ রাখি' শৈলমূলে—শংকরের অঙ্কে
মৃতা সতী!
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী
মোদের পুণ্যবতী।"

স্বামী বিবেকানন্দের মানসদুহিতা, রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাশ্বেতা, শ্রীঅরবিন্দের দীপশিখা; আর শ্রীশ্রীমার আদরিণী খুকী নিবেদিতার ভারতীয় সংস্কৃতিতে দান কতখানি, নিবেদিতার জীবন-কাহিনীর সহিত যাহার এতটুকু পরিচয় আছে তিনিই, তাঁহার অকুণ্ঠ জীবনভরা অবদানের আংশিক পরিচয় পাইলেও এই প্রশ্ন করিতে দুঃসাহসী হইবেন না। আবার এত অপরিমেয় তাঁহার দান যে তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ত্রুটিহীন ভাবে উপস্থাপিত করা সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূতীর ন্যায় এই 'সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনী', কল্যাণময়ী রমণী ভারতবর্ষ আর ভারতবাসীর জন্য যথাসর্বস্ব দান করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অত্যুক্তি হয় না অবনীন্দ্রনাথের সেই স্পষ্টোক্তি: "ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়"।[১] স্বামী সারদানন্দও এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন: "পাশ্চাত্যের যে সকল মহাপ্রাণা রমণী দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ভারতের কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন।"[২] উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের অভিজাত নোবল-পরিবারের দুলালী মার্গারেট আজন্ম পাশ্চাত্য ভোগ-বিলাসময় পরিবেশে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পরিবেষ্টনে মানুষ হইয়াও কি ভাবে

---

১ 'জোড়াসাঁকোর ধারে'।

২ শ্রীসরলাবালা দাসী প্রণীত 'নিবেদিতার' স্বামী সারদানন্দ-লিখিত 'ভূমিকা'।

যে দরিদ্র ভারতবর্ষের জন্য আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুতঃ এমন কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার ইতিহাস, দূরকে আপন এবং পরকে ভাই করিবার এবিধ আশ্চর্য সত্য-কাহিনী, আত্মবিলোপের এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা পুনরাবৃত্তিশীল ইতিহাসেও একাধিকবার ঘটে নাই। এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের দুর্গতি মোচনের জন্য নিবেদিতার সেই নীরব কর্মযোগ আর সরব আকুলতা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছিলেন : "নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" গুণমুগ্ধ কবি লিখিয়াছিলেন : "ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিযাছে সে নিশ্চয় ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়-ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি লাভ করি নাই।" "ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।" এই তপস্বিনী নারীর মহৎ হৃদয় তাঁহার ত্রিকালদর্শী গুরু বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ।" তিনি লিখিতেছেন, "তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশঃ, কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র···নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসে নি।" বস্তুতঃ তিনি শুধু হৃদয় উজাড় করিয়া দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান বা প্রতিষ্ঠা লাভের কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার ছিল না।

প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না নিবেদিতা ভারতে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের এই কথা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে এদেশে ব্যাপক স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার সর্বাগ্রে প্রয়োজন; সমগ্র ভারতের সর্ববিধ কল্যাণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের যৌথ শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে। বিহঙ্গ যেমন একটিমাত্র পক্ষের সাহায্যে উড়িতে পারে না, তেমনি শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যেই শিক্ষাবিস্তার করিলে দেশ উন্নত হইবে না।

তাঁহার শিক্ষাদর্শ তাঁহার আচার্যদেবের শিক্ষারই অনুবর্তী ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার সহিত তাঁহার সম্যক পরিচিতি ছিল। স্বামী তেজসানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য "নিবেদিতা আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এবং দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত পরিচিতা হইয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন ভারতীয় নারীর শিক্ষাবেদীমূলে তাহা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[৩] এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, তাঁহার রচিত শিক্ষা-সম্পর্কিত নিজস্ব মতবাদপুষ্ট 'Hints on National Education'—গ্রন্থটি আজও বিদ্বজ্জন-মহলে সমাদৃত হইতেছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বোস পাড়া লেনে'র ক্ষুদ্র বালিকা বিদ্যালয়টি আদর্শ একটি শিক্ষায়তন হিসাবে পরিগণিত হইতেছে।

শিক্ষা বলিতে নিবেদিতা শুধুমাত্র পুঁথি-সর্বস্ব বিদ্যাকে বুঝিতেন না। শিক্ষার্থীর মনের স্বাধীন ও সাবলীল পরিমার্জন ও বিকাশ, বিদ্যার্থীর সুপ্ত শৌর্যবীর্য ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, মনের উচ্চচিন্তার রুদ্ধ অর্গল মুক্ত-করণ ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাদর্শের মূল কথা।

৩ ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ

দূরদর্শিনী নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষা শুধু জাতীয়তাবোধ জাগাইবে না, ইহা দেশ-গঠনমূলকও হওয়া চাই। জাতীয়তাভিত্তিক শিক্ষাই ছিল নিবেদিতার অন্তরের কথা। কারণ, তাহার বদ্ধমূল ও নির্ভুল ধারণা ছিল শিক্ষার প্রথম ও প্রাথমিক সোপানেই আন্তর্জাতিকতার স্থান নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিবেদিতার এই 'অদৃশ্য দান'কে আপাতঃদৃষ্টিতে সামান্য মনে হইলেও নিকট ভবিষ্যতের মানুষ ইহার পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতি ছিল নিবেদিতার অকৃত্রিম অনুরাগ। প্রসঙ্গক্রমে বলা বিধেয়, উইম্বলডনে "রাস্কিন স্কুলে" অধ্যক্ষা-হিসাবে কাজ করিবার সময় ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত ভুবনবিখ্যাত শিল্পী অবেনজান কুকের সাক্ষাৎকার হয় ও চিত্র ও ভাস্কর্য বিষয়ে বহু গভীর আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে, ভারতে আসিয়া তিনি ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে এতদূর বিমোহিত হন যে তৎকালীন তরুণ শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে অজন্তায় পাঠাইয়া 'সুপটু পটুয়ার লীলায়িত তুলিকায়' অঙ্কিত গুহাচিত্রসমূহ অঙ্কন করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্রযোগে অনুরোধ জানান। নিবেদিতা-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন " নন্দলালদের কত ভালবাসতেন তিনি, কত উৎসাহ দিতেন · নিবেদিতা নইলে নন্দলালের যাওয়া হতো না অজন্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি।"[৪] শিল্পী অসিতকুমারও একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে বলেছেন, "আমরা তখনকার কয়েকজন জাতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের জন্য যে কাজ করেছি তাতে ভগিনী নিবেদিতার উৎসাহ যে বল দিয়েছে তা লিখে বোঝানো অসাধ্য"। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীগিরিজা শংকর রায়চৌধুরী নিবেদিতার এই শিল্প-জগতে অসীম দান প্রসঙ্গে লিখিতেছেন: "ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে সূতিকাগার হইতে বাহির করিয়া ইহার সুদীর্ঘ শৈশবকালে এই নবজাত শিশুকে যে-রূপ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে লালন পালন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই বিদেশিনী মহিমময়ী মহিলার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে যদি বাঙ্গালী জাতি করজোড়ে দণ্ডায়মান না হয়, তবে তাহার ললাটে অকৃতজ্ঞতাব কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। ইতিহাসে যে সম্মান ভগিনী নিবেদিতার প্রাপ্য, আমরা এ যাবৎ তাঁহাকে তাহা দিয়া আসি নাই।"[৫]

ভগিনী নিবেদিতার দান যে কত বেশী আর তাহা কত বিচিত্র আর বিভিন্নভাবে তিনি তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে করিয়া-ছিলেন সে কথা ভাবিলে বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়। আজকের দুনিয়ার মানুষ, যে সমস্ত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে যাইয়া ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের অনেকেরই জানা নাই যে এই সমস্ত মনীষিবৃন্দের পশ্চাতে সকলের অলক্ষিতে থাকিয়া এক মহীয়সী নারী কত গোপন প্রেরণাই না যোগাইয়া-ছিলেন। ১৭ নং বোসপাড়া লেনের যে ক্ষুদ্র কক্ষে ছিল নিবেদিতার বাস, সেখানে,

৪ জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ

৫ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ('শ্রীঅরবিন্দ'-নামক) প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

সেই গৃহ-প্রাঙ্গণে ভারতের তৎকালীন প্রায় সমস্ত দিক্‌পাল ব্যক্তিরই আগমন হইয়াছিল। সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ও যদুনাথ সরকার, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, শিল্পকলা-বিশারদ অবনীন্দ্রনাথ ও তদানীন্তন উদীয়মান শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার, সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডন সোসাইটির সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক দীনেশ সেন, স্বদেশ-প্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বিপিনচন্দ্র পাল, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির নাম ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখনীয়। প্রেরণার প্রতিমূর্তি নিবেদিতার নিকটে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, দেশসেবক, সমাজসংস্কারক ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রগতিশীল চিন্তানায়কগণ প্রেরণার ইন্ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্তর জীবনে ইঁহারা দ্ব্যর্থবোধহীন ভাষায় অকুণ্ঠিতভাবে সে ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র যেদিন (১০ই নভেম্বর, ১৯১৭) 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন, সেইদিন তিনি নিবেদিতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইয়া ভাবঘনকণ্ঠে বলিয়াছিলেন: "আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই মহীয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি।"

স্বামী বিবেকানন্দের পরলোক গমনের পর নিবেদিতার কর্মধারা নূতন একটি খাতে বহিতে শুরু করে। তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল তাঁহার ভাবী কর্মপন্থা। নিশ্চিতভাবে তিনি ইহা বুঝিলেন যে রাজনৈতিক পরাধীনতার নাগপাশ ভারতের উন্নতির পথের প্রধান অন্তরায়; রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ভিন্ন ভারতের দ্রুত উন্নতি সুদূর-পরাহত। ফলে শীঘ্রই তিনি সাগ্রহে নিজেকে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইল। ইহার জন্য তাঁহার কোনরূপ ভাবের পরিবর্তন হইল না। কারণ, ভারতের সার্বিক উন্নতির প্রাথমিক পর্যায়ে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই পথই সর্বতোভাবে অনুসরণীয়। অচিরেই নিবেদিতা তৎকালীন বিশিষ্ট সংবাদপত্রসমূহে* বিবিধ ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ছুটিয়া চলিলেন এক বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে অন্যটিতে। অর্ধ-জাগরিত ভারতবাসীর কর্ণকুহরে শুনাইলেন দেশাত্মবোধের অগ্নিমন্ত্র, অন্তরে জ্বালাইলেন স্বাদেশিকতার তীব্র অনল। তাঁহার এই সময়কার কার্যধারা সম্পর্কে বলিতে যাইয়া প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখিতেছেন… "her invaluable writings and speeches inspired thousands of young men with a burning passion to lead higher, truer and nobler lives". এ সময় তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ হইয়া উঠিয়াছিল স্বাদেশিকতার আগুন পোহানোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ফায়ার-প্লেস্'। সুসাহিত্যিক গিরিজাশংকর মহাশয় বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে নিবেদিতার এই সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "অরবিন্দ বিংশ শতাব্দীর প্রথমে 'আর্য' পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন,

---

* সংবাদপত্রসমূহের নাম: প্রবাসী, ডন, মডার্ন রিভিউ, নিউ ইণ্ডিয়া, নিউ ওয়ার্লড, অমৃতবাজার, হিন্দু, মহারাষ্ট্র, ইন্দুপ্রকাশ। বিদেশী পত্রিকার নাম: বোষ্টন, হেরাল্ড; ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ।

ডন সোসাইটি ছিল তাহার বীজ। এশিয়া এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার একটা প্রেরণা ইহাতে ছিল এবং এই প্রেরণা আসিয়াছিল ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে। অরবিন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে ভগিনী নিবেদিতা ডন-সোসাইটির তরুণ যুবকদের মধ্য দিয়া নূতন জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে বিপ্লবাত্মক রাজনীতি বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত প্রচার করিয়াছিলেন প্রচুর।"[৭] সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম মুক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আমাদের মতন সাধারণ মানুষের প্রতি এক দেবীর অহেতুকী ও অমলা ভালবাসার কথা, নিষ্কাম ও অশেষ অবদানের কথা লিখিবার চেষ্টা করিলাম। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার সর্বস্ব দিয়াছেন। তাঁহার অদেয় কিছু ছিল না, তিনি ছিলেন নিবেদিতা। হৃদয়পাত্র শূন্য করিয়া তিনি শুধু নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের নাম ভারতের প্রতি গৃহকোণে যতদিন মুখরিত হইবে নিবেদিতার নামও ততদিন কেহ ভুলিতে পারিবেন না। বিবেকানন্দের এই মানসকন্যা বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য-জয়ের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন।

মনীষী রোঁমা রোঁলার সেই কথাটি বার বার মনে পড়িতেছে :

"The future will always write her name of initiation, Sister Nivedita, to that of her beloved master—as St. Clara to that of St. Francis".

৭ ৫ নং দ্রষ্টব্য।

বেলুড় মঠে সন্ধ্যায়

শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী

বেলা যায় ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে,
যেতে হয় তাই যাই ডাক দেয় কিসে।
অদূরে চলেছে গঙ্গা সমুদ্রের কাছে,
যাত্রীদের নৌকাগুলি ঘাটে লাগা আছে।
ভিজে ভিজে মাটি আর মাঠভরা ঘাসে,
অশোক চন্দন তরু উল্লাসেতে হাসে,
এখানে মায়ের স্মৃতি, পৌরুষ ওখানে
উন্মনা অবাক মনে শান্ত করে আনে।

সন্ধ্যার বন্দনা গীতি, পাখোয়াজ সুর
ভেসে ভেসে চলে যায় দূর হতে দূর।
চন্দ্রমলি গোলাপেরা ফোটে মগ্ন মনে,
কেন জানি মনে হয় হেথায় এক্ষণে,
ঘরছাড়া শিশু আমি ফিরেছিনু নীড়ে,
অন্ধকারে প্রহরীরা ডাক দেয় ধীরে॥

শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ*

(৩)

ভগিনী নিবেদিতা

শিক্ষাসম্পর্কে আমাদের ধারণার মধ্যে একটা প্রাণ থাকা চাই। একটা অখণ্ড ঐক্য-বোধ থাকা চাই। শিশুকে তার হৃদয়, মন, ইচ্ছাশক্তি সব মিলিয়ে সমগ্রভাবে দেখতে হবে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তির অনুভবশক্তি ও জীবনের লক্ষ্যনির্বাচন নিয়ন্ত্রিত না হয়, ততক্ষণ সে শিক্ষিত পদবাচ্য নয়—বুদ্ধিবৃত্তি-প্রসূত যে কৌশলগুলি সে আয়ত্ত করেছে তার দ্বারা সজ্জিত হয়েছে মাত্র। ঐ কৌশল অবলম্বনে সে অন্নসংস্থান করতে পারে, কিন্তু তার আবেদন হৃদয়স্পর্শী বা জীবনপ্রদ হয় না। তাকে কোন ক্রমেই মানুষ বলে অভিহিত করা চলে না; সে একটি বুদ্ধিমান বানর মাত্র। মানুষ হবার জন্য, মনুষ্যত্ব এবং পৌরুষ লাভের জন্য না হয়ে শিক্ষা যদি কেবল নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জাহির করবার জন্য, অথবা জীবিকানির্বাহের জন্য হয় তাহলে তা এই বিপদকেই ডেকে আনে। সুতরাং শিশুকে প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষা দেবার সময় আমরা তার অন্তরের কাছে আবেদন করব। জ্ঞানের উন্নতি-পথে আরোহণের প্রত্যেকটি ধাপে শিশুর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি যেন ক্রিয়া করে। আমরা যেন কখনো তাকে কোলে করে নিয়ে লক্ষ্যের দিকে উচ্চতর ধাপে তুলে না দিই. সে যেন নিজেই ওপরে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। আমাদের কাজ হবে শিশুর সামনে মাত্র ততটুকু বাধা রেখে দেওয়া যার ফলে (সে বাধা অপসারণ করবার জন্য) তার ইচ্ছা শক্তি সক্রিয় হয়; আবার ঐ বাধা এত অল্প হওয়া চাই, যাতে সে নিরুৎসাহ না হয়। যখন জ্ঞান আহরণের সময় এবং অর্জিত জ্ঞানের পশ্চাতে একটি ব্যক্তিত্ব বা মন কাজ করে, তখন অপরের নিকট শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্তে সে নিজেই নিজেকে শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থী তখন নিরাপদ, সে নিজেই নিজের শিক্ষাভার গ্রহণ করতে পারে। বুদ্ধি পরিণত হয়েছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই প্রত্যেক বালককে বিদেশে পাঠানো হয়ে থাকে। তাকে যেন নীতির সাগরে নিক্ষেপ করা হল—সে স্বয়ং সঙ্কটের তুফান ও প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করবে বলে। আমরা ধরে নিই যে, সে সাঁতার দিতে জানে। কিন্তু এই ধারণা সুনিশ্চিত করবার জন্য আমরা কি করেছি?

পথ একটিমাত্র আছে। শিক্ষার প্রথম বৎসরগুলিতে মনে রাখতে হবে যে, অনুভূতিকে সংযত করা অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। ধীশক্তির ক্রমবিকাশের জন্য শিক্ষা-পদ্ধতির যে কোনও দিক অপেক্ষা মহৎভাবে চিন্তা এবং উদারভাবে ও সৎভাবে লক্ষ্যনির্বাচন সহস্রগুণে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। যে বালকের অন্তরে এই শক্তি যথার্থই বিদ্যমান এবং যথার্থই প্রবল, সে যে-কোন পরিস্থিতির মধ্যে সেখানে যতটা করা সম্ভব ততটা ভাল কাজই করবে। যে বালকের মধ্যে এ বস্তুটির অভাব সে সংশয়াকুলচিত্ত হতে বাধ্য, সংশয় মানে কেবল ভ্রান্তি হতে পারে অথবা এর অর্থ হতে পারে নৈতিক অবনতি।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক পিতামাতা ও শিক্ষক হৃদয়বৃত্তির এই অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করেছেন। তা হলে আমাদের ছেলেমেয়েদের

* 'Hints on National Education in India' গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

উপর এত অন্ধভাবে আমরা আস্থা স্থাপন করি কিসের উপর নির্ভর ক'রে? শিশুর বিবেক ও ভাবপ্রবণতার উপর তার গৃহ, পরিবার, ধর্ম ও স্বদেশ সাধারণভাবে যে প্রভাব বিস্তার করে, কতকটা অজ্ঞাতসারে তার উপরেই আমরা ভরসা করি। সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল নৈতিক প্রতিভা বিদ্যমান, তার ফলেই বিগত দুই তিন পুরুষ ধরে ছাত্রগণের মধ্য থেকে বহু সজ্জন ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছে। (শিক্ষাপদ্ধতির উপর) পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবের অত্যধিক গুরুত্বের জন্যই বিদেশী শিক্ষক এখানে এত অবাঞ্ছিত। শিক্ষার মতবাদ সম্পর্কে আমাদের কোন স্বদেশবাসীর যতই অজ্ঞতা থাকুক, সে অনায়াসে আমাদের ভাবাবেগপূর্ণ জীবনের সঙ্গে সুর মেলাতে পারে। তার দৈব-ক্রমে উচ্চারিত এক-আধটি কথায় শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক উৎসের দ্বার খুলে যেতে পারে, যেখানে আন্তরিকভাবে শুভাকাঙ্ক্ষী কোন বিদেশী তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো ব্যর্থ হবে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে চরিত্রগঠনের উপযোগী কোন প্রভাব বিস্তার করতে অসমর্থ, সেও ঘটনাক্রমে সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে যদি সে এবং আমরা একই ভাবলোকের অধিবাসী হই। কোন বিদেশীর পক্ষে ঐরূপ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করার সম্ভাবনাই কম। অন্য দেশের যোগ্যতম ব্যক্তি অপেক্ষা আমাদের স্বদেশের একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তিও আমাদের শিক্ষার জন্য যোগ্যতর স্কুল মাস্টার হতে পারে—এ কথা সত্য।

একবার এই নীতিকে স্বীকার করে নিলে আমরা আর ঘটনাচক্রের অধীন থাকব না। বিদ্যালয় শিশুকে গড়ে তুলছে কিনা, গৃহ থেকে শুধু এইটুকু লক্ষ্য করা হবে। এমন কি, কোন অজ্ঞ জননী যদি তাঁর সন্তানকে ভালবাসতে ও সেই ভালবাসা অনুযায়ী কাজ করতে শিক্ষা দিতে পারেন, তবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিৎ বলা হবে। এই জন্যই বর্তমান যুগের অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তি তাঁদের জননীর অবদানের এত সপ্রশংস উল্লেখ করে থাকেন। ব্রতর মাধ্যমে বালিকাগণের শিক্ষালাভের প্রাচীন পদ্ধতি হৃদয়ের আবেদনপূর্ণ, আর এই আবেদনই সেখানে শিক্ষার একমাত্র দৃঢ়ভিত্তিরূপে গৃহীত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সূত্রপাতেই এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে, এবং তার ফলে সে শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক প্রভাব-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিরই বিকাশ ঘটেছে। অতঃপর ভারতীয় জনসাধারণ এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর করবে না। এখন তারা উপলব্ধি করবে যে—সত্য বলতে কি গত কয়েক বৎসর ধরে তারা উপলব্ধি করছে—শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর বিবেকের কাছে আত্মোৎসর্গের মহৎ নীতির দ্বারা সমর্থনযোগ্য প্রতিপাদন করতে হবে; এবং এই আত্মত্যাগের নীতির অর্থ হল—শিশুকে তার নিজের মঙ্গলের জন্য নয়, পরন্তু জন-দেশ-ধর্মের জন্য উন্নত হতে হবে—পাশ্চাত্য দেশে যেমন বলা হয়, ব্যক্তির উন্নতি তার সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য।

বিদ্যালয়ে পাঠাবার সময় মা তাঁর শিশু-সন্তানকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কেন বিদ্যালয়ে যাচ্ছ?' এবং শিশু বিভিন্নভাবে এই উত্তরই দেয়—'মানুষ হতে শিখব যাতে তোমাদের সাহায্য করতে পারি', বয়স ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে তার উত্তর আরও অর্থ-ও আগ্রহ-পূর্ণ হয়। এই ভাবকে কেন্দ্র করে যার সমগ্র শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা বা স্বার্থপরতার প্রবেশের আশঙ্কা নেই।

সেবার আকুলতা, নিজের এবং স্বদেশবাসীর

উন্নতিসাধনের ইচ্ছা, সকলকে উচ্চ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করে দেওয়া—এই হল বর্তমান কালের যথার্থ ধর্ম। আর সব কিছু হল ব্যক্তিগত ধারণা, তত্ত্বকথা এবং মতবাদ। এখানেই রয়েছে জলন্ত বিশ্বাস ও কর্মের প্রেরণা। ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত ও সজাগ কোন কর্ম দিয়ে প্রত্যেকটি দিন আরম্ভ করা উচিত। কিছুক্ষণ মৌন অবলম্বন, একটি স্তব, প্রার্থনা বা একটি প্রণাম—এর যে কোন একটি যথেষ্ট কার্যকরী অনুষ্ঠান বলে স্বীকৃত হতে পারে। উপাস্যের নিকটে নয় আমাদের নিজেদের নিকটেই উপাসনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যে কোন একটি প্রতীক হলেই চলে, কোন প্রতীক না থাকলেও ক্ষতি নেই। এই কারণেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ সপ্ততীর্থের জল, তীর্থস্থানের পবিত্র রজ, গুরুর পদচিহ্ন অথবা মাতৃপূজার বিধান দিয়েছেন। এসবই আমাদের মনে 'জন-দেশ-ধর্মের' ইঙ্গিতই বহন করে আনে, যে জন-দেশ-ধর্মের নিকট আমরা নিজেদের উৎসর্গ করি, যার সেবাই আমাদের সর্বপ্রকার উদ্যমের মূল প্রেরণা। 'কোন ব্যক্তিই কেবল নিজের জন্য বাঁচতে পারে না', এ-তত্ত্বকে যতটুকু আমরা জীবন-রূপায়িত করি, আমাদের জীবন ততটুকুই মহৎ। এই ভাবকে যতটুকু আমরা শিক্ষার লক্ষ্য করব—আমাদের শিক্ষা ততটুকু সার্থকতা লাভ করবে।

রামচরিতমানসে কাক-গরুড়-কথা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

(২য় পর্ব)

ভুষণ্ডী সন্দর্শন

পূর্বে বলা হয়েছে, যে পর্বতে ভুষণ্ডীকাক কুণ্ঠাহীন মন ও অখণ্ড হরিভক্তি নিয়ে বাস করে তার কাছাকাছি পৌঁছিতেই গরুড়ের মনে পরমানন্দের উদয় হয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সকল মায়া-মোহ-শোক এককালে অন্তর্হিত হয়েছিল। সে কথার উল্লেখ ক'রে শিব বলতে লাগলেন, "পার্বতি, সরোবরে স্নান ও জলপান ক'রে গরুড় আনন্দিত মনে সেই বটগাছের তলায় এসে উপস্থিত হ'ল যেখানে বসে বুড়ো বুড়ো পাখীরা দিনের-পর-দিন ভুষণ্ডীর মুখে সুমধুর রামচরিতকথা শোনে। সেদিন ভুষণ্ডী সবেমাত্র রামকথা আরম্ভ করতে যাচ্ছে এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পক্ষিরাজ গরুড়কে সেখানে উপস্থিত হ'তে দেখে সকলেরই খুব আনন্দ হ'ল। ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ভুষণ্ডী তাকে সাদর-সম্ভাষণ জানাল এবং বসবার জন্য ভাল দেখে আসন পেতে দিল; তারপর অনুরাগের সাথে পূজার্চনা ক'রে মধুরবাক্যে বলল—

নাথ কৃতারথ ভয়উ মৈঁ তব দরসন খগরাজ।
আয়সু দেহু সো করউঁ অব প্রভু আয়হু
কেহি কাজ॥

হে নাথ, হে পক্ষিরাজ, তোমার দেখা পেয়ে আমি কৃতার্থ হলাম। হে প্রভু, তুমি যে কাজের জন্য এসেছ, আদেশ কর, তা করি।

কাকের কথা শুনে মিষ্টি ক'রে গরুড় উত্তর দিল—

সদা কৃতারথ রূপ তুম্হ কহ মৃদুবচন খগেস।
জে হি কৈ অস্তুতি সাদর নিজ মুখ কীন্হি
মহেস॥

[কাক, আজ আর নতুন ক'রে তুমি কি কৃতার্থ হবে ?] তুমি ত সর্বদাই কৃতার্থ হয়েই আছ, যেহেতু স্বয়ং মহেশ্বর অতি আদরের সাথে নিজমুখে তোমার গুণগান[১] করেছেন।

সুনহু তাত জেহি কায়জ আয়উঁ।
সোসব ভয়উ দরস তব পায়উঁ॥
দেখি পরম পাবন তব আশ্রম।
গয়উ মোহ সংসয় নানা ভ্রম॥

[কাজের কথা জিজ্ঞাসা করছ ?] হে তাত, শোন, তোমার দেখা পেতেই যে কাজের জন্য এসেছিলাম তা সিদ্ধ হয়েছে। তোমার পরম-পাবন আশ্রমের দৃশ্য চোখে পড়তেই মন থেকে সকল মোহ, সকল সংশয়, সকল ভ্রম দূর হ'য়ে গেছে।

অব শ্রীরামকথা অতি পাবনি।
সদা সুখদ দুখপুঞ্জ নসাবনি॥
সাদর তাত সুনাবহু মোহী।
বারবার বিনবউঁ প্রভু তোহী॥

হে তাত, এখন আমাকে সেই পরমপবিত্র, সর্বদা-সুখপ্রদ, সর্বদুখনাশন শ্রীরামকথা দয়া ক'রে শোনাও। হে প্রভু, তোমাকে বার বার মিনতি ক'রে বলছি।

স্বল্প ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততাও শাশ্বত মুক্তির প্রসূতি—(স্বামী বিবেকানন্দ)

ঈশ্বরীয় কথায় প্রীতি না জন্মিলে মন শুদ্ধ হয় না, আবার মন শুদ্ধ না হ'লে ঈশ্বরীয় কথায় প্রীতি জন্মে না। গরুড় পূর্বে পরমজ্ঞানী রামভক্ত শিবের দর্শন পেয়েছিল। তাঁর নির্দেশমত ভুষণ্ডীকাকের আশ্রম-সন্নিধানে উপস্থিত হ'তেই মনে এখন যে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হ'ল, তাতে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রকাশ এবং সকল শোকতাপের অবসান ঘটেছিল। এই অনুভূতির ফলেই এখন রাম-কথাকে "সদাসুখদ" ও "দুখপুঞ্জ নসাবনি" এবং "রামপথের প্রবীণ পথিক" ভুষণ্ডীকাককে পরম শ্রদ্ধাভাজন ও নিতান্ত আপনার জন বলে বোধ করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, শিব গরুড়কে বলেছিলেন—"দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ করলে তবে তোমার মন থেকে সকল সংশয় দূর হবে।" কাজেই, গরুড়ের মনের এই যে অকস্মাৎ ভাবান্তর উহা শিবের বিধানে, সাধূত্তম ভুষণ্ডী-কাকের সঙ্গের ফলে কেমন ক'রে শাশ্বতমুক্তি অথবা পরাভক্তিতে পরিণত হয়েছিল, অতঃপর ক্রমে ক্রমে সেই কথারই অবতারণা করতে দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে, আশ্রমাগত পক্ষিরাজ গরুড়ের প্রতি পরমভাগবত ভুষণ্ডীকাকের সৌজন্য দেখে মনে প'ড়ে যায়—

"যদ্যপি যাও তুমি ভবসিন্ধু পার.,
তথাপি না ছাড়িও লোকাচার।"

আর, অপর পক্ষে খগরাজ গরুড়ের নিরভিমানতা স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বৈষ্ণবোচিত লক্ষণের কথা—"উত্তম হইয়ে আপনারে মানে তৃণাধম ·।"

যা হোক, শিব বলতে লাগলেন—

সুনত গরুড় কৈ গিরা বিনীতা।
সরল সুপ্রেম সুখদ সুপুনীতা॥
ভয়উ তাসু মন পরম উছাহা।
লাগ কহই রঘুপতি গুণগাহা॥

গরুড়ের বিনীত সরল প্রেমপূর্ণ সুখদায়ক ও সুপবিত্র কথা শুনে কাকের মনে পরম

---

(১) এখানে 'অস্তুতি' অর্থে মূল অনুবাদানুযায়ী স্তব না বলে 'গুণগান' বলা হ'ল।

উৎসাহের সঞ্চার হ'ল, সে রঘুপতির গুণগান করতে আরম্ভ করল।

এইভাবে একে একে নারদের অসীম মোহের কথা, রাবণের জন্মকথা, শ্রীপ্রভুর রামরূপে অবতার হওয়ার কথা গান ক'রে, পরে সে একমনে উৎসাহের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের বাল-চরিত-কথা[২] নানাভাবে বর্ণনা করতে লাগল। পরে ক্রমে ক্রমে দশরথের রাজসভায় ঋষি-বিশ্বামিত্রের আগমন, হরধনুভঙ্গ, শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ, পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন, বনবাস-কালের নানা বিচিত্র ঘটনা, মায়াসীতা হরণ, সুগ্রীবের সাথে মিত্রতা, সেতুবন্ধন, রামরাবণের যুদ্ধ, সীতাউদ্ধার ও অবশেষে সকলের সাথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ইত্যাদি সমস্ত কথাই, [হে পার্বতি] তোমাকে আমি আগে যেমন যেমন বলেছিলাম, তেমনি ভাবেই 'ভূষণ্ডী' গরুড়ের নিকট বর্ণনা করল। শুনতে শুনতে গরুড়ের মনে পরম উৎসাহ দেখা দিল, সে আবেগভরে বলে উঠল—

গয়উ মোর সন্দেহ সুনেউ সকল রঘুপতি চরিত।
ভয়উ রামপদ নেহ তব প্রসাদ বায়সতিলক ॥

রঘুপতির কথা শুনে আমার সকল সন্দেহ দূর হয়েছে। হে কাকশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃপায় রামচরণে আমার ভক্তিলাভ হ'ল।

ইতিপূর্বে প্রথম পর্বে শিব ও পার্বতীর ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা গিয়েছিল, ঠিক যেন সেই একই ঘটনার, একই কথারই পুনরাবৃত্তি চলেছে। তফাতের মধ্যে বক্তা ও শ্রোতার চেহারাটা মাত্র বদলেছে। শিবের বদলে এবারে ভূষণ্ডীকাক, আর পার্বতীর বদলে গরুড়। পূর্বে শিবকে সম্বোধন ক'রে পার্বতীকেও শেষ পর্যন্ত অবিকল এইরূপই বলতে শোনা গিয়েছিল।

তুম্ হরী কৃপা কৃপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ।
জানেউঁ রামপ্রতাপ প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ ॥

হে কৃপাময়, তোমার কৃপায় আমি আজ কৃতকৃতার্থ হলাম। আমার আর কোন মোহ নেই। হে প্রভু, চিদানন্দস্বরূপ রামচন্দ্রের শক্তির কথা আমি জানতে পেরেছি।

এরপর, শিবের কথানুসরণে দেখতে পাওয়া যায়, পার্বতীর মতই বিগতসন্দেহ গরুড় এখন কৌতুহলবশতঃ অথবা তত্ত্বজিজ্ঞাসাচ্ছলে ভূষণ্ডীকে প্রশ্ন করছে—

মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভুবন্ধন রন মহুঁ নিরখি
চদানন্দ সন্দোহ রাম্ বিকল কারণ কবন ॥

যুদ্ধের মাঝে প্রভুর বন্ধনদশা দেখে আমার বড়ই মোহ উপস্থিত হয়েছিল এই ভেবে যে, চিদানন্দস্বরূপ রামও বিকল হ'য়ে পড়েছেন। এর কারণ কি? কেন এমনটি হয়েছিল?

পরক্ষণে নিজ প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেওয়া হচ্ছে—

দেখি চরিত অতি নর অনুসারী।[৩]
ভয়উ হৃদয় মম সংসয় ভারী ॥
সোই ভ্রম অব হিতকর মৈঁ জানা।
কীন্‌হ অনুগ্রহ কৃপানিধানা ॥

সত্যিই হুবহু মানুষের মত আচরণ দেখে আমার মনে খুব সন্দেহ হয়েছিল। এখন বুঝছি সেই ভুলই আমার পক্ষে হিতকর হয়েছে। কৃপানিধান আমাকে এইভাবেই অনুগ্রহ করেছেন।

দেখা যায়, যাকে আমরা সচরাচর মোহ বলি, উহাতে অবস্থাবিশেষে মানুষকে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে দেয়। কিন্তু মায়ার কুহক অস্ত

(২) শ্রীরামচন্দ্রের বালমূর্তিই ছিল তুলসীদাসের ইষ্ট-মূর্তি, তাই রামচন্দ্রের বালচরিত কথাতেই তুলসীর সমধিক প্রীতি দেখা যায়।

(৩) এখানে চরিতকথাটির অনুবাদে "আচরণ", ও "অতিনর অনুসারী" অর্থে, মূল অনুবাদানুযায়ী "অতিশয় মানুষের মতই" না ব'লে,"হুবহু মানুষের মত" বলা হ'ল।

না হ'লে এ রহস্য ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ভক্তপ্রবর গিরিশ-চন্দ্রের পরিণত জীবনের কথা—যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অপার্থিব স্নেহের কথা স্মরণ করে তিনি বলছেন,—"পা টিপতে দিয়েছেন, মনে করেছি ভালা বিপদ। এখন দেখছি গুরুকৃপায় সে সব ত সাধনা হয়ে গেছে।" মোহমুক্ত গরুড়ও এতদিনে এ তত্ত্বের আভাস পেয়ে, নিজ জীবনে রামকৃপার মর্মকথা উপলব্ধি ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে, প্রাণের আবেগে তাই এখন ব'লে চলেছে—

জো অতি আতপ ব্যাকুল হোঈ।
তরুছায়াসুখ জানই সোঈ॥
জোঁ নহি হোত মোহ অতি মোহী।
মিলতেউঁ তাত কবন বিধি তোহী॥

[দেখ] যে ব্যক্তি রোদের প্রখর তাপে কষ্ট পেয়েছে গাছের ছায়ায় যে কি সুখ তা সে-ই জানে। যদি আমার এমন গুরুতর মোহ উপস্থিত না হ'ত, তাহলে হে প্রিয়, বল দেখি কেমন ক'রে তোমার সাথে দেখা হ'ত?

সুন তেউঁ কিমি হরিকথা সুহাঈ।
অতিবিচিত্র বহুবিধি—তুম্হ গাঈ॥

[আর] যে অতি-বিচিত্র কথা নানাপ্রকারে তুমি গান করলে, সেই সুন্দর হরিকথাই বা কি ক'রে শুনতাম বল ত?

সন্ত বিসুদ্ধ মিলহিঁ পরিতেহি।
চিতবহিঁ রাম কৃপা করি জেহী॥
রামকৃপা তব দরসন ভয়উ।
তব প্রসাদ মম সংসয় গয়উ॥

রামচন্দ্র যাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন, বিশুদ্ধ-চরিত সাধুদের সাথে তারই দেখা হয়। রাম-কৃপাতেই তোমার দর্শন পেয়েছি, আর তোমার কৃপাতেই আমার সংশয়-সন্দেহ দূর হয়েছে।

সুনি বিহঙ্গপতিবাণী সহিত বিনয় অনুরাগ।
পুলকগাত লোচন সজল মন হরষেউ অতি কাগ॥

খগপতির এইরূপ বিনয় ও অনুরাগপূর্ণ কথা শুনে ভুষণ্ডীর শরীরে পুলক দেখা দিল, চোখে জল এল, মন উল্লসিত হয়ে উঠল।

এই অবসরে শিব একবার পার্বতীকে নিজ মনের কথাটি ব'লে নিচ্ছেন—

শ্রোতা সুমতি সুশীল সুচিকথারসিক হরিদাস।
পাই উমা অতি গোপ্য অপি সজ্জন করহিঁ প্রকাস॥

[দেখ উমা] সুমতি, সুশীল, পবিত্র তত্ত্বকথার রসগ্রহণে সমর্থ[৪] এমন হরিভক্ত শ্রোতা পেলে সজ্জনেরা পরম গুহ্যকথাও[৫] প্রকাশ ক'রে থাকেন।

যা হোক, এইরূপে শরীরে পুলক, চোখে জল, হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে কাক ভুষণ্ডী অতঃপর গরুড়কে বলতে লাগল

সব বিধি নাথ পূজ্য তুম্হ মেরে।
কৃপাপাত্র রঘুনায়ক কেরে॥
তুম্ হহি ন সংসয় মোহ ন মায়া।
মোপর নাথ কীন্হি তুম্হ দায়া॥
পঠই মোহ মিস খগপতি তোহী।
রঘুপতি দীন্হি বড়াঈ মোহী॥

হে নাথ, সকল রকমেই তুমি আমার পূজ্য। তুমি রঘুনাথের কৃপাপাত্র। তোমার আবার সংশয়-সন্দেহ কি? [বলতে গেলে বলতে হয়] তুমি আমার উপর দয়াই করেছ। হে খগরাজ, মোহের অছিলা করে তোমাকে এখানে পাঠিয়ে রঘুপতি আমার মত দীনজনকে বাড়িয়েই তুলেছেন।

(৪) "সুচিকথারসিক" এর অর্থ এরূপ হ'লেই যেন ঠিক মনে হয়। আর, (৫) "অতি গোপ্য অপি" কথার অর্থেও "অতি গোপনীয় কথাও" এরূপ না ব'লে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত কথার অনুসরণে "পরমগুহ্যকথাও" বললেই বোধহয় ভাল শোনায়।

ভূষণ্ডী কর্তৃক নানাভাবে মায়ার প্রভাব বর্ণন

তুম্হ নিজ মোহকথা খগসাঈঁ।
সো নহিঁ কছু আচরজ গোসাঈঁ॥
নারদ ভব বিরঞ্চি সনকাদী।
জে মুনি নায়ক আত্মবাদী॥
মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহী।
কো জগ কাম নচাব ন জেহী॥
তৃষ্ণা কেহি ন কীন্হ বৌরহা।
কেহি কর হৃদয় ক্রোধ নহিঁ দহা॥

হে খগরাজ, তুমি যে নিজের মোহের কথা বললে, হে গোসাঁই, ওতে ত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নারদ বল, শঙ্কর বল, ব্রহ্মা বল, সনকাদি আত্মবাদী মুনিগণই বল—মোহ যাঁকে কখনও অন্ধ করেনি, কাম যাঁকে কখনও নাচায়নি, বিষয়তৃষ্ণা যাঁকে কখনও পাগল ক'রে তোলেনি, ক্রোধ যাঁর হৃদয় কখনও দগ্ধ করেনি,—এমন কে আছে বলত ?

উপরের এবং পরবর্তী কয়েকটি দোঁহায় প্রত্যেকটি কুপ্রবৃত্তির কুফল কেমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে তাহা লক্ষণীয়। মোহের কাজ আবরণ করা—বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করতে না দেওয়া। তাই মোহ বস্তুতঃ মানুষকে অন্ধই করে। কামনা মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না, কেবলই প্রলোভনের পিছনে ঘোরায়। আবার, বিষয়তৃষ্ণা যখন নানা দিক থেকে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন বিক্ষিপ্ত মন একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। তারপর, যখন কামনা প্রতিহত হওয়ার ফলে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে, তখন সেই আগুনে অন্তরের সকল সুকোমল বৃত্তিগুলি পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। আরও লক্ষ করবার বিষয়, প্রথমে মোহের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে মনে হয়, এই মোহ অথবা অজ্ঞানই যে সকল অনর্থের মূল, প্রকারান্তরে তুলসীদাস সেই কথারই এখানে অবতারণা করেছেন।

জ্ঞানী তাপস সূর কবি কোবিদ গুনআগার।
কেহি কৈ লোভ বিড়ম্বনা কীন্হি ন এ হি সংসার॥

জ্ঞানী, তপস্বী, শূর, কবি, পণ্ডিত অথবা গুণী, এদের মধ্যে এমন কে আছে, যাকে এ সংসারে লোভ কখনও না কখনও বিড়ম্বিত না করেছে ?

শ্রীমদ বক্র ন কীন্হ কেহি, প্রভুতা বধির ন কাহি।
মৃগলোচনি লোচনসর কো অস লাগ ন জাহি॥

ধনের অহঙ্কার কাকে না বাঁকা করেছে ? প্রভুত্ব কাকে না বধির করেছে ? এমন কে আছে, যাকে মৃগনয়নীর নয়নবাণ কখনও বিদ্ধ করেনি ?

গুনকৃত সন্যপাত নহিঁ কেহী।

এমন কে আছে যে কখনও ত্রিগুণজনিত সান্নিপাতে ভোগেনি ?

মানুষের শরীরে সর্বদাই পিত্ত শ্লেষ্মা ও কফের অধিকার। যখনই এই তিনের সমতার অভাব ঘটে, তখনই শরীরে সান্নিপাতিক বিকার দেখা দেয়। তেমনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণই মানুষের মনে নিয়ত ক্রিয়াশীল। এদের অসামঞ্জস্যবশতই মানুষের চিত্তবিকার ঘটে থাকে। মনে হয়, ভবরোগের উত্তম বৈদ্য তুলসীদাস "গুনকৃত সন্যপাত" অর্থে তুলনামূলক ভাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

জোবনজ্বর কেহি নহিঁ বলকাবা।
মমতা কেহি কর জস্ন ন নসাবা॥

যৌবন-জ্বর কাকে না প্রলাপ বকিয়েছে ? এমন কে আছে, আসক্তি যার যশ নষ্ট না করেছে ?

মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লাবা।
কাহি ন সোকসমীর ডোলাবা॥

চিন্তাসাঁপিন কো নহিঁ খায়া।
কো জগ জাহি ন ব্যাপী মায়া॥

মাৎসর্য কাকে না কলঙ্কিত করেছে? শোকের বাতাস কাকে না দোল খাইয়েছে? চিন্তাসাপিনী কাকে না দংশন করেছে? জগতে এসে মায়ায় মুগ্ধ হয়নি এমন কে আছে?

কীট মনোরথ দারু সরীরা।
জেহিন লাগ ঘুণ কো অস ধীরা॥
সুত বিত লোক ঈষণা তীনী।
কেহি কৈ মতি ইন্‌হ কৃত ন মলীনী॥

জীবের শরীর যেন কাঠ, আর মনোরথ (আশা) যেন কীট (ঘুণ)। যার এই দারুময় শরীরে আশারূপ ঘুণ না ধরেছে, এমন ধীর ব্যক্তি কে আছে? এই আশাকীটের আবার তিনটি রূপ—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—এদের দ্বারা যার মতি মলিন হয়নি এমন কে আছে?

এই কীট বা ঘুণের উপমাটির বিশেষত্বও লক্ষণীয়। কাঠে যে ঘুণ ধরে, উহা কাঠের মধ্যেই জন্মায়, উহা কাঠেরই ধর্ম। তেমনি মানুষের আশা বা বিষয়তৃষ্ণাও মনের মধ্য থেকেই জন্মায়, ওকে মনেরই ধর্ম বলা যায়।

ব্যাপি রহেউ সংসার মহঁ মায়াকটক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভ কপট পাখণ্ড॥

মায়ার প্রচণ্ড সৈন্যদল সংসার জুড়ে রয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, এরা হচ্ছে সেনাপতি; আর দম্ভ, কপটতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি সৈন্যদল।

সো দাসী রঘুবীর কৈ সমুঝে মিথ্যা সোপী।
ছুট ন রামকৃপা বিনু নাথ কহউঁ পদ রোপী॥

এমন যে মায়া, সে রঘুনাথের দাসী। [আর দেখ] জ্ঞান হ'লে এমন মায়াকেও মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। কিন্তু রামের কৃপা না হ'লে মায়া ছুটে না, হে নাথ, এ কথা আমি দৃঢ়তার সাথেই বলছি।

জো মাযা সব জগহি নচাবা।
জাসু চরিত লখি কাহু ন পাবা॥
সোই প্রভু ভ্রূবিলাস খগরাজা।
নাচ নটী ইব সহিত সমাজা॥

এমন যে মায়া, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলকেই নাচাচ্ছে, যার চরিত্র আজ পর্যন্ত কেউই বুঝে উঠতে পারেনি, হে খগরাজ, সেই মায়া প্রভুর ইঙ্গিতমাত্রেই নিজ দলবল নিয়ে নটীর মত নাচতে থাকে।

এখানে ভুষণ্ডীকাকের মুখ দিয়ে তুলসী এই কথাই বলতে চাইছেন যে, ঈশ্বরকৃপায় যখন মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ হয়, কেবল তখনই সে আর মায়ার ক্রীড়নক না হয়ে, এই ভব-রঙ্গমঞ্চে দ্রষ্টারূপে মায়ার বিচিত্র লীলাভিনয় দর্শন ও সম্ভোগ করতে সমর্থ হয়। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য

[স্বচ্ছন্দ অনুবাদ]*

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১।১।১

এখানে অথ শব্দ মানে অনন্তর। আরম্ভ অর্থে ইহার ব্যবহার হয় নাই, কেননা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকার সকলের নাই। মঙ্গল অর্থ ধরিলে সমন্বয় হয় না। অনন্তর অর্থ ধরিয়া লইলে বুঝিতে হইবে—কাহার অনন্তর? ধর্ম-জিজ্ঞাসা যেমন পূর্বকৃত বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা করে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ব্যাপারে সেরূপ কিসের অপেক্ষা?

পূঃ—কেন, স্বাধ্যায়?

উঃ—পূর্বে বলিয়াছি ধর্মজিজ্ঞাসা স্বাধ্যায় বা বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা করে। এখন যদি বলি ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উভয়ই স্বাধ্যায় অপেক্ষা করে, তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিশেষ অপেক্ষণীয় বস্তু কি তাহা বলা হইল না, শুধু সাধারণ অপেক্ষণীয় বস্তুর উল্লেখ হইল মাত্র।

পূঃ—আমি বলি স্বাধ্যায়, তারপর ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও তারপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—এইরূপ নিয়ম হইবে।

উঃ—কোথায় এরূপ বিধি আছে? যজ্ঞ-কার্যে বিধি আছে বটে "অগ্রে নিহত পশুর হৃদয়-মাংস লইয়া হোম করিবে, অনন্তর তাহার জিহ্বা লইয়া হোম করিবে." কিন্তু এরূপ কোন নিয়ম আছে কি যে অগ্রে ধর্মজিজ্ঞাসা করিবে, তারপর ব্রহ্ম জানিবে? উহাদের ভিতর অগ্র-পশ্চাৎ-ক্রম নাই, যেহেতু উহাদের ফল ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। ধর্মসাধনের ফল অভ্যুদয়, তাহা অনুষ্ঠানসাধ্য, ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল মুক্তি, তাহা অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ। ধর্মজিজ্ঞাসায় ব্যাপার ভব্য অর্থাৎ তাহা জন্য বা সাধনবশতঃ হয়—পুরুষ ব্যাপারের অধীন। আর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ব্যাপার হইতেছে ভূত (অর্থাৎ হইয়াই রহিয়াছে)—নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং তিনি পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহেন। ধর্ম ও ব্রহ্ম এই দুই বিষয়ে যে সকল নিয়োজক বা বিধি-বাক্য আছে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মবিষয়ক চোদনাগুলি (উপদেশগুলি) বলে "ইহা কর", "ইহা করিও না" অর্থাৎ কর্মে নিয়োগ করে—আর ব্রহ্মবিষয়ক চোদনাসকল কেবল বলে "ইহা জান", "তাহাকে জান"। সুতরাং ধর্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কোনও ক্রম-নিয়মের অঙ্গীভূত নহে।

পূঃ—তবে অনন্তর অর্থে তুমি কি বুঝাইতে চাহ?

উঃ—এমন কিছু হইবে যাহার অনন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সম্ভব হইবে। যথা—(১) নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক (নিত্য ও অনিত্য বস্তু চিনিতে পারা); (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ (ইহ ও অমুত্র যাহা যাহা ফলভোগ হইতে পারে তাহাতে বিরাগ), (৩) শমাদি সাধন-ষটক (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা), (৪) মুমুক্ষুত্ব। এই সব শর্ত বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম-জিজ্ঞাসার পূর্বে বা পরে যে কোন সময়েই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা চলিতে পারে। তদ্বিপরীতে নহে। অতএব অথ মানে এই চতুর্বিধ শর্ত সিদ্ধ হইবার পর।

এবার বলি অতঃ শব্দের অর্থ। অতঃ মানে এই হেতু অর্থাৎ ক্রিয়াপর স্বার্গাদি ফলের অনিত্যতা-হেতু ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরম পুরুষার্থ-সাধনতা-হেতু. যথা "কৃষিকর্মাদি দ্বারা প্রাপ্ত ফল

---

* অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

(শব্দ) অনিত্য, তেমন যজ্ঞাদি দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলও অনিত্য ; পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞ পরম-পুরুষকে প্রাপ্ত হন।"

এবার বলি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কথার অর্থ। ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। ব্রহ্ম মানে পরসূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা জন্মাদি যাহা হইতে। ব্রহ্ম অর্থ জাতি বর্ণ বা ব্রহ্মদেবতা বুঝিতে হইবে না। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মানে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা হইবে না, কর্মে ষষ্ঠী হইবে যথা ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা।

জানিবার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মকে জানা মানে অবগতি। এই ব্রহ্মাবগতি হইলে নিঃশেষে সংসার-বীজরূপ অনর্থ নাশ হয়, তাই ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা পরমপুরুষার্থের জন্য ইচ্ছা।

পূঃ—যদি ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ হন, তবে তিনি ত জানাই, বেশী করিয়া কি জানিবে? যদি অপ্রসিদ্ধ হন, তবে জানিবার ইচ্ছা হইলেও তিনি অবিজ্ঞেয়।

উঃ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এই অর্থ হইতেই নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধত্বাদি বিশেষণ আসে। সকলেই 'আমি'র অস্তিত্ব স্বীকার করে। 'আমি নাই' এরূপ প্রতীতি বা ধারণা করিতে গেলেও আমি বাঁচিয়া থাকিয়াই ঐরূপ ধারণা করি। এই "আমি"ই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম এই হিসাবে অর্থাৎ সকলের আত্মা-রূপে (আমি হিসাবে) প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি সম্পূর্ণ জানা নহেন। ব্রহ্ম বিশেষভাবে জ্ঞাত নহেন। সাধারণতঃ লোকে নিজেকে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ বলিয়া জানে। কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সমষ্টিকে প্রকৃত আমি মনে করে। কেহ বা মনকেই আত্মা বলেন। কেহ বা ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই আত্মা বলেন। কেহ মনে করেন আত্মা নাই, শূন্যতাকেই আত্মা বলেন। কেহ কেহ বলেন, দেহ ভিন্ন আত্মা একজন আছেন, তিনিই দেহাশ্রয়ী হইয়া সংসারী কর্তা ও ভোক্তা হন। কেহ বলেন, না, আত্মা কর্তা নহেন, শুধু ভোক্তা। অপরেরা বলেন, এই সংসারী দেহাশ্রয়ী আত্মা ছাড়া অন্য এক স্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর আছেন, তিনিই সংসারী আত্মার খাঁটি স্বরূপ। সংসারীটি মাত্র ভোক্তা। এইরূপ যুক্তি, যুক্ত্যাভাস, বাক্য ও বাক্যাভাস অবলম্বন করিয়া বহু মত আছে। অতএব বিচার ব্যতীত 'আমি'মাত্র বোধসম্বলিত অপূর্ণ ও অসংস্কৃত অবগতির দ্বারা পরমপুরুষার্থ-রূপ মোক্ষ নিশ্চয় হয় না। এইজন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সূত্রে বেদান্তবাক্যমীমাংসা ও তৎ-অবিরোধী তর্ক দ্বারা আত্মা বা আমি-র বিশেষ জ্ঞানের প্রস্তুতি করা যাইতেছে।

সুতরাং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইলেন। এখন ব্রহ্মের লক্ষণ কি? ভগবান সূত্রকার তাই দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন :

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥১।১।২

উঃ—যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হয়। সূত্রকার শ্রুতির নির্দেশ ও বস্তুর স্বভাব অনুসরণ করিয়া প্রথমে জন্ম শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতিনির্দেশ, যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করিয়াছে)। এই বাক্যে জন্ম স্থিতি ও বিনাশের ক্রম দেখানো হইয়াছে। বস্তুর স্বভাব যথা, জন্ম দ্বারা লব্ধ-সত্তাক বস্তুরই পরে স্থিতি ও তৎপর বিনাশের সম্ভব হইতে পারে। অস্য মানে প্রত্যক্ষ ও সন্নিহিত ইদং-শব্দ বাচ্য জগৎ। সম্বন্ধে ষষ্ঠী অর্থাৎ ইহার (জগতের) জন্মাদি। যতঃ শব্দের দ্বারা কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। নানা নাম-রূপ দ্বারা অভিব্যক্ত, অনেক কর্তৃ-

ভোক্তৃ-সংযুক্ত, দেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়া-ফলের আশ্রয়—এই যে জগৎ, যাহার রচনাশৈলী মনের দ্বারা অচিন্ত্য, তাহার জন্ম স্থিতি ও বিনাশ যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মূল কারণ হইতে ঘটে, তাহাই ব্রহ্ম। বস্তুর স্বভাবের আরও তিনটি অবস্থা যাস্ক কর্তৃক কথিত হইয়াছে, যথা হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম কিন্তু তাহারা জন্মস্থিতিবিনাশের অন্তর্ভুক্ত। জগতের স্থিতিকালে ঐ তিনটি ঘটে।

জগতের যে সমস্ত লক্ষণ উপরে বলা হইয়াছে, ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত জগতের, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যতীত (১) অচেতন প্রকৃতি হইতে বা (২) পরমাণু হইতে বা (৩) শূন্য হইতে বা (৪) কোনও জন্মমরণশীল সংসারী জীব হইতে উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ সম্ভব নহে। জগৎ-উৎপত্তির জন্য, বিশেষ দেশ-কাল-নিমিত্ত-রূপ উপাদানের আবশ্যকতা-হেতু আপনাআপনি জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বলা যায় না।

পূঃ—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—এই শ্রুতি জগতের অস্তিত্ব হইতে জগদতিরিক্ত এক ঈশ্বরস্বরূপ অনুমান করিয়াছেন।

উঃ—না, তাহা নহে। বেদান্তবাক্যরূপ কুসুমসকলকে গ্রথন করাই এই সকল সূত্রের উদ্দেশ্য। সূত্রের দ্বারা বেদান্তবাক্য আহরণ করত এই সকল সূত্রে মীমাংসিত ও বিচারিত হইয়াছে। বিচারের ফলে প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্রহ্মাবগতি হয়। অনুমানাদি প্রমাণান্তরের দ্বারা নহে। অবশ্য ব্রহ্মই যে জগতের কারণ—এরূপ নানা বেদান্তবাক্য আছে। সুতরাং ঐ সব বেদান্তবাক্যের অবিরোধী ও পরিপোষক অনুমান যদি থাকে ত থাকুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা অনুমান বা যুক্তিকেও শ্রুতির সহায়কারী বলিয়া মনে করি। যেমন শ্রুতিতে আছে—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ", "যেমন পণ্ডিত মেধাবী লোক জিজ্ঞাসা করিয়া এবং অনুমান সাহায্যে গান্ধার দেশে উপস্থিত হইতে পারেন। ঠিক সেইরূপ আচার্যবান পুরুষ আচার্যের উপদেশ সহায়ে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।" দেখা যাইতেছে—শ্রুতিতে পুরুষ-বুদ্ধিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ধর্মজিজ্ঞাসা ব্যাপারে অবশ্য শ্রুত্যাদি (অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা) একমাত্র প্রমাণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যাপারে শ্রুত্যাদি সহায়কারী প্রমাণ এবং অনুভব প্রধান প্রমাণ, কেননা বিষয়টি বস্তুতন্ত্র এবং বস্তুর অনুভবের অবসানে আর শ্রুত্যাদির সহায় অনাবশ্যক। ক্রিয়ানিষ্পাদ্য ব্যাপারে অনুভবের অপেক্ষা নাই, তাই শ্রুত্যাদিই একমাত্র প্রমাণ। যেহেতু ক্রিয়া পুরুষসম্পাদ্য, তাই পুরুষ উহা করিতে পারে, না করিতে পারে এবং হয়ত অন্যরকমেও করিতে পারে; সুতরাং ক্রিয়ার ফললাভ সম্পূর্ণ পুরুষের অধীন, পুরুষতন্ত্র। যথা পুরুষ হাঁটিয়া যাইতে পারে, ঘোড়ায় যাইতে পারে আবার না-ও যাইতে পারে। যেমন আছে "অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শী যজ্ঞপাত্র লইবে না—এরূপও চলিতে পারে আবার ষোড়শী যজ্ঞপাত্র লইবে—এরূপও চলিতে পারে।" "হোমকার্য উদয়কালে কর্তব্য বা অস্তকালে কর্তব্য।" ধর্মকার্যস্থলে বিধি বা নিষেধ সমস্তই অর্থবন্ত। বিকল্প উৎসর্গ ও অপবাদ প্রত্যেকটিরই সার্থকতা আছে। কিন্তু যাহা বস্তু ব্যাপার, তাহা হয় অস্তি, নয় নাস্তি, নয় অন্যপ্রকারে অস্তি—ইহার যে কোন একটি যে বলিবে, ইহা তোমার সাধ্য নাই, কেননা ইহা বস্তুর অধীন বস্তুটি যেমন ঠিক তাই, পুরুষতন্ত্রাধীন নহে, বস্তুতন্ত্রাধীন। একটা স্থাণুকে তুমি স্থাণু বলিবে, অপরে পুরুষ বলিবে, অপর কেহ অন্যবস্তু বলিবে, তাহা হয় না। পুরুষ বলা বা অন্য বস্তু বলা মিথ্যা জ্ঞান, আর স্থাণু বলা

সত্য জ্ঞান। সুতরাং বস্তুবিষয়ে জ্ঞান বস্তুতন্ত্রাধীন। ব্রহ্মবস্তুও বস্তু বলিয়া বস্তুতন্ত্রাধীন।

পূঃ—ব্রহ্ম যদি একটি বস্তু হন তবে তাহা অন্য প্রমাণ দ্বারাও (যথা অনুমান দ্বারা) সিদ্ধ হইবে। সুতরাং বেদান্তবাক্য (অর্থাৎ আচার্যের উপদেশ বা শাস্ত্রের প্রমাণ) বিচারণা অনর্থক।

উঃ—না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অবিষয়। ইন্দ্রিয়াদি স্বভাবতঃ বহির্বিষয়মুখী, ব্রহ্মবিষয়মুখী নহে। যদি ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের বিষয় হইতেন, তবে জগৎরূপ কার্যের কারণ ব্রহ্ম বলা যাইত, কিন্তু যেহেতু কার্যাংশটুকু মাত্র ইন্দ্রিযের বোধ্য হয়, তাই জগৎরূপ কার্যের কারণ ব্রহ্ম হইবেন বা অপর কেহ হইবেন, ইত্যাকার সংশয় থাকে। সেজন্য জন্মাদি সূত্র দ্বারা বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মই কারণ। অনুমানবলে ইহা জানিতে পারা যায় না, তাহা উপরে বলিয়াছি।

পূঃ—এই সূত্রের লক্ষীভূত সেই বেদান্তবাক্যটি কি ?

উঃ—"বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন, 'ভগবান, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন।' বরুণ বলিলেন, 'যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে যদ্দ্বারা জীবিত থাকিতেছে, আবার শেষে যাহাতে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাই ব্রহ্ম'।" এইরূপে প্রশ্ন-প্রতিবচনেব পর যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহা এই :—"এই সকল ভূত আনন্দ হইতে জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে এবং অন্তকালে আনন্দেতে লীন হইবে।" এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বেদান্তবাক্যও আছে, যাহা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান জগৎ-কারণ ব্রহ্মের অববোধক।

জগৎ-কারণত্বের দ্বারা ব্রহ্ম, জগতের মধ্যে যত কিছু আছে, সমস্তই জানেন, বলা হইল, তাহাই দৃঢ় করিবার জন্য তৃতীয় সূত্রে বলিতেছেন :

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ১।১।৩

শাস্ত্র, অর্থাৎ ঋক্ যজু সাম ও অথর্বাদি বেদসমূহ, যাহা সর্ববিদ্যার আকর এবং প্রদীপবৎ সর্বাবভাসক, সেই শাস্ত্রের যিনি যোনি অর্থাৎ কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। ঈদৃশ ঋগ্বেদাদি সর্ববিদ্যার আকর বা সর্বজ্ঞত্বগুণান্বিতস্বরূপ শাস্ত্রের জনয়িতা সর্বজ্ঞ ছাড়া সম্ভবে না। লোকসমাজে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, যে যে শাস্ত্র যাহার যাহার দ্বারা কৃত, সেই সেই পুরুষ অবশ্য সেই সেই শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী হইবেন। যেমন পাণিনিকৃত ব্যাকরণে যে-জ্ঞান নিহিত আছে, স্বয়ং পাণিনি তদপেক্ষা অনেকবেশী জানিতেন। অতএব অনেক শাখাসমন্বিত, দেব তির্যক মনুষ্য, এবং বর্ণ আশ্রম প্রভৃতি বিভাগহেতু সর্বজ্ঞানের আকর, সুতরাং সর্বজ্ঞতুল্য ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহ যে মহৎ বস্তু হইতে আবির্ভূত হইয়াছে সে মহৎ বস্তু যে সর্বজ্ঞ হইতেও সর্বজ্ঞ, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এই যে ঋগ্বেদ তাহা সেই মহৎভূত হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা আয়াসে বাহির হইয়াছে", সেই মহৎভূত নিশ্চয়ই নিরতিশয় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

অথবা নিম্নোক্তরূপেও এই সূত্রের অর্থ করা যায়। উপরোক্ত প্রকার ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যাহার যোনি, বা কারণ বা জানিবার উপায়। ব্রহ্মস্বরূপ অবগতির একমাত্র উপায় হইতেছে শাস্ত্র। শাস্ত্রপ্রমাণের বলেই জানা যায় যে, জগতের জন্মস্থিতি ও ভঙ্গের কারণ হইতেছে ব্রহ্ম। সেই শাস্ত্রবাক্য যথা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি পূর্বসূত্রব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পূঃ—পূর্ব সূত্রেই যখন বলিয়াছ যে শাস্ত্রপ্রমাণের বলেই জানা যায় যে, জগতের জন্ম-

স্থিতিভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম তবে এখন আবার এই নূতন সূত্রের প্রয়োজন কি ?

উঃ—পূর্ব সূত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয় নাই যে, শাস্ত্রপ্রমাণের বলেই জানা যায় যে জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম। সেখানে মাত্র বলা হইয়াছে যে, জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম। পূর্ব পক্ষ আশঙ্কা করিতে পারে যে, অনুমানের দ্বারা এইরূপ জানা যায়। তাই এখানে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইল শাস্ত্ররূপ যোনি হইতেই ব্রহ্মস্বরূপের অবগতি হয়।

পূঃ—একথা মানিনা। জৈমিনি বলিয়াছেন, "বেদ হইতেছে ক্রিয়া-প্রতিপাদক। যাহার ক্রিয়াবিষয়ে সার্থকতা নাই সেই পদ বা বাক্য অনর্থক। সুতরাং বেদান্ত অংশে ব্রহ্মের লক্ষণ-প্রতিপাদক কিছু বাক্য থাকিলেও তাহার আনর্থক্যই সূচিত হয়। যে বস্তু সিদ্ধ হইয়াই রহিয়াছে, তাহার শাস্ত্রীয় প্রতিপাদন প্রয়োজন নাই, যেমন প্রত্যক্ষ বস্তুসমূহ। আবার দেখ—ব্রহ্ম সর্বাবস্থায় একরস হওয়ার জন্য তাহার হেয়-উপাদেয় নাই। এইরূপ হেয়-উপাদেয়-রহিত বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্র যদি কিছু বলেও তাহার সার্থকতা নাই। জৈমিনির মতে—এ সকল স্থলে, অর্থাৎ যেখানে বেদের বাক্যসমূহ হেয়কে বর্জন ও উপাদেয়কে আদর করা রূপ কোনও পুরুষার্থ জ্ঞাপক কথা বলে না এমত স্থলে সেই সব বাক্য বিধির সহিত, ক্রিয়ার সহিত একযোগে অর্থ প্রকাশ করে। যাহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু তাহার কোনও কর্তা বা ক্রিয়া বা বিধির অপেক্ষা নাই। এইরূপ বস্তুর উল্লেখ থাকিলে, তাহা ক্রিয়াবিধির শেষ অর্থাৎ প্রাপ্ত ফল হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডস্থ ব্রহ্মসূচক বাক্যাবলীকে উপাসনাদি কর্মপর ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং শাস্ত্রকে ব্রহ্মস্বরূপ অবগতির উপায় বলিয়া লইতে পার না।

উঃ—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়াই, সূত্রকার চতুর্থ সূত্রে বলিতেছেন :

তত্তু সমন্বয়াৎ ১।১।৪

[অর্থাৎ শাস্ত্রমাধ্যমে ব্রহ্মাবগতির বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষ যাহা বলিয়াছেন তাহার জবাবে সূত্রকার বলিতেছেন, সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয় করিলে এই তাৎপর্যই বাহির হয়]

তু মানে পূর্বপক্ষের শঙ্কানিরাস হেতু বলিতেছি। তৎ মানে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়-কারণ ব্রহ্ম, যেমন বেদান্তশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। কীরূপে ? সমন্বয় করিয়া। সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য এই এক অর্থ প্রতিপাদন করে। যথা "হে সৌম্য, অগ্রে অদ্বিতীয় এক সদ্বস্তুই ছিলেন," "অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ইহা একমাত্র আত্মস্বরূপ ছিল," "সেই ব্রহ্ম এই (এই জগৎ)। ইনি পূর্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন, ইনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন। অথবা, তাঁহার কারণ নাই, সুতরাং তিনি কার্য নহেন, জন্য নহেন, তাঁহার অন্তরও নাই, বাহিরও নাই অর্থাৎ তিনি একরস", "এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি সকলের অনুভূয়মান", "এসমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত" ইত্যাদি। এই সকল বেদান্তবাক্যে যে সকল পদ বা শব্দ আছে তাহাদের ব্রহ্মপরতা বিষয়ে নিশ্চয় হইলে। অর্থান্তর কল্পনা করা অযুক্ত হইবে। করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষ হইবে। [পদের শ্রুতিমাত্র যে অর্থবোধ হয় তাহার বর্জন শ্রুতহানি দোষ ও যে অর্থবোধ হয় না তাহার গ্রহণে অশ্রুতকল্পনা দোষ হয়।]

পূঃ—পদগুলি ব্রহ্মপর বটে, তবে তাহা উপাসনা বা কর্মকারীকে নিজস্বরূপ মাত্র বুঝাইয়া দেয়।

উঃ—মাত্র বুঝাইয়া দেয় না, ব্রহ্মবিজ্ঞান করাইয়া দেয়। "তৎ কেন কং পশ্যেৎ"—"সে

সময়ে কে দেখিবে, কি দিয়া দেখিবে কাহাকে দেখিবে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, তখন অর্থাৎ ব্রহ্মাবগতির পর কোনরূপ কর্ম, কারক, ক্রিয়াদির বোধ থাকে না। নিজ-স্বরূপ বলিয়া তুমি কি ব্রহ্মকে পরিনিষ্ঠিত বস্তু-বৎ (সিদ্ধবস্তু) বলিতে চাও? এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণই এবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ইহাই বলিতে চাও?

পূঃ—হ্যাঁ, এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ অবান্তর।

উঃ—তত্ত্বমসি ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্ম-ভাবের কথা আছে। এইরূপ জ্ঞান স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। ইহা শাস্ত্র ছাড়া অবগত হওয়া যায় না।

পূঃ—আমি যদি স্বরূপতঃ হেয়- ও উপাদেয়-রহিত একরস হইলাম, তবে শাস্ত্র দ্বারা আমার কোন্ পুরুষার্থ সাধন হইবে?

উঃ—বাপুহে, নিজস্বরূপকে হেয়-উপাদেয়-রহিত ব্রহ্ম বলিয়া জানিলে সর্বক্লেশ দূর হইবে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধিত হইবে।

পূঃ—যদি বলি যে অন্যত্র দেবতাপর বাক্যাদিতে যেমন দেবতার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া উপাসনার বিধি আছে, এক্ষেত্রেও সেরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করা আছে, উপাসনাবিধির লভ্য শেষ ফল হিসাবে।

উঃ—তাহা বলিতে পার না। ব্রহ্মস্বরূপ হেয়-উপাদেয়-শূন্য হওয়া হেতু এক্ষেত্রে উপাসক ও উপাসনা বিধি প্রযোজ্য হইবে না। কেননা ব্রহ্ম ও আত্মা এক বলিয়া জানিলে কোনরূপ দ্বৈতবোধের প্রবেশ সম্ভব হইবে না।

পূঃ—কর্মকাণ্ডোক্ত বেদবাক্যসকলের প্রমাণত্ব নির্ভর করে তাহাদের বিধিসংস্পর্শ আছে বলিয়া। তোমার জ্ঞানকাণ্ডোক্ত আত্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলিতেছ এখানে দ্বৈতের প্রবেশ নাই সুতরাং বিধি বা ক্রিয়ার ব্যাপার নাই, অথচ বলিতেছ শাস্ত্রমাধ্যমেই ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ জানিতেছ। শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ একথা কীরূপ?

উঃ—যতক্ষণ অবগতি না হয় ততক্ষণ শাস্ত্র-মুখেই স্বরূপ জানিতে হয়। এ ব্যাপারে বিধি-সংস্পর্শ কেন থাকিতে পারে না তাহা উপরে বলিয়াছি। অতএব জ্ঞানকাণ্ডোক্ত ব্রহ্মস্বরূপের ক্ষেত্রে বিধিসংস্পর্শ না থাকিলেও শাস্ত্রপ্রমাণ সম্ভব হইবে। ব্রহ্ম ভৌতিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সেহেতু তজ্জাতীয় অনুমানেরও বিষয় নহে, সুতরাং শাস্ত্রই এক্ষেত্রে প্রমাণ।

পূর্ব (মীমাংসক):—ধরিলাম শাস্ত্রমুখেই ব্রহ্মকে জানা যায়। কিন্তু, তোমাকে মানিতে হইবে যে, বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করে না। কর্মবিধির অথবা উপাসনা-বিধির অঙ্গরূপেই তাঁহাকে প্রতিপাদন করে। যেমন যূপ ও আহবনীয় এই দুইটি বস্তু অলৌকিক বা অপ্রসিদ্ধ। শাস্ত্র উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিভাবে? না কর্মবিধির অঙ্গভাবে।

উঃ-কেন এরূপ তাৎপর্য মনে করিতেছ?

পূঃ—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি এই দুইটির কোনও পথে অবশ্যই শাস্ত্র উপদেশ করিবে। শাস্ত্র, হয় প্রবৃত্ত করাইবে, নয় নিবৃত্ত করাইবে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড়া কেবল জ্ঞান বা কেবল বস্তুস্বরূপজ্ঞাপন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। দেখ, শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ পণ্ডিতগণ এরূপ কথাই বলিয়াছেন, "ক্রিয়াবিষয়ক বোধ জন্মানই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হয়", "চোদনা কি? না ক্রিয়াপ্রবর্তক বাক্য," "তাহার অর্থাৎ ক্রিয়ার বা ধর্মের জ্ঞান জন্মানই উপদেশ। অর্থাৎ ধর্মজ্ঞাপক বিধিবাক্যই অপৌরুষেয় উপদেশ। অন্য সকল বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ অগ্রাহ্য," "সেইহেতু, প্রসিদ্ধ অর্থবোধক পদসকলকে ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যের সহিত

মিলিত করিয়া একযোগে অন্বয় করিতে হয়।" সুতরাং পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত করায় এবং বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করায়, যখন শাস্ত্রের সার্থকতা স্থির হইয়াছে, তখন বিধিবিশেষ হিসাবে ছাড়া অন্যকিছুকে স্বতন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা অপব্যাখ্যা। বেদান্তবাক্যসকলকে এই সাধারণ নিয়মে ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের তাৎপর্য নির্ধারণ করিতে হইবে। বেদান্তবাক্যও বিধিপর হইবে। যেমন স্বর্গকামীকে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া করিতে হয়, সেইরূপ অমৃতকামীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত।

উঃ—পূর্বেই বলিয়াছি—দুইটি জিজ্ঞাসা বিলক্ষণ, বিভিন্ন। কর্মকাণ্ডে জিজ্ঞাস্য ধর্মপ্রাপ্তি কিরূপে হয়। আর জ্ঞানকাণ্ডে জিজ্ঞাস্য—নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ পূর্ব হইতেই প্রাপ্তসিদ্ধ ব্রহ্ম। অতএব অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ধর্মফল হইতে জ্ঞানফল বিলক্ষণ হইবে।

পূঃ—এরূপ হইতে পারে না। কার্যবিধির অঙ্গ বা প্রযুক্তি হিসাবেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যথা "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", "য আত্মা অপহতপাপ্মা, সোঽন্বেষ্টব্যঃ। স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ", "আত্মা ইত্যেব উপাসীত", "আত্মানমেব লোকমুপাসীত", "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—এই সমস্ত বাক্যের উপদেশ বা বিধি বিদ্যমান বলিয়া জিজ্ঞাসু জানিতে আকাঙ্ক্ষা করে "কে এই আত্মা?" "কি সেই ব্রহ্ম?" সেজন্য আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধক বাক্যসকল রহিয়াছে। যথা, ব্রহ্ম নিত্য সর্বজ্ঞ সর্বগত নিত্যতৃপ্ত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। তিনি বিজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন। তাঁহার উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক মোক্ষফল লাভ হয়। এইভাবে বেদান্তবাক্যসকলকে করণীয় বিধির অনুগত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা, শুধু "সপ্তদ্বীপা বসুমতী" "ঐ রাজা যাইতেছে" জানিয়া যেমন পুরুষের হানি বা লাভ কিছুই হয় না, বেদান্তবাক্যসকল ক্রিয়ার অঙ্গ নহে বলিয়া জানিলে তাহাদের আনর্থক্যই প্রতীত হইবে।

উঃ—অবগতিমাত্রই যে কিরূপে ফলোদয় হয় তাহা তোমাকে বলিতেছি। ইহা সর্প নহে, রজ্জু—ইহা জানার সঙ্গেসঙ্গেই ভ্রান্তি-জনিত সর্পভয় নিরস্ত হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমি অসংসারী কূটস্থ সাক্ষী—এই জ্ঞান হওয়ামাত্রই সংসারভীতি নিরস্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

মা কালী

স্বামী গীতানন্দ

দুই নিয়েই হচ্ছে 'দুনিয়া', যতক্ষণ পর্যন্ত এক রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও নেই, তুমিও নেই, জগৎও নেই; কি যে রয়েছে, তাও মুখে বলা যায় না। কারণ, বলতে গেলেই একজনকে বলতে হবে এবং একটা বিষয় সম্বন্ধে বলতে হবে। সুতরাং দুই এসে গেল। তাই বলছিলাম যে দুই না হলে জগৎ-সংসার চলে না।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ইচ্ছা হল—"আমি একা, আমি বহু হব।" এই হল সৃষ্টির আরম্ভ। "আমি বহু হব"—অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্ম নিজেকেই অনেক রূপে সৃষ্টি করলেন, কারণ তিনি ছাড়া তো দ্বিতীয় কিছু নেই।

ব্রহ্ম এবং শক্তি অভেদ। যখন তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলে ভাবা হয়, তখন ব্রহ্ম বলা হয়।

আর যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন বলে ভাবা হয়, তখন তাঁকেই শক্তি বলা হয়, কালী বলা হয়। একই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন— যেমন সাপ আর তার তীর্যক গতি, দুধ আর তার ধবলত্ব। তাই রামপ্রসাদ গান ধরলেন:

'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

ব্রহ্মের এই স্থিরত্ব এবং চঞ্চলত্ব—একই সঙ্গে কালীর প্রতিমায় রূপ নিয়েছে। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন এবং তাঁরই উপর শিবের শক্তি কালী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে চলেছেন। শিব অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই কালী তাঁর উপর এই জগৎ-প্রপঞ্চ নিয়ে খেলা করছেন।

পুরুষ এবং প্রকৃতি এক সঙ্গে না হলে কোন কাজই হয় না। প্রকৃতিই কাজ করে যান, আর পুরুষ স্থির হয়ে থাকেন; কিন্তু পুরুষকে ছাড়া প্রকৃতি আবার কাজও করতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন উপমা দিয়েছেন: 'বাড়ীর গিন্নী কাপড়ে হলুদ মেখে চারিদিকে ছুটোছুটি করে সব কাজকর্মের তদারক করছেন, আর মাঝে মাঝে কর্তার কাছে গিয়ে হাতমুখ নেড়ে সব বলে যাচ্ছেন। কর্তা হুঁকো টানতে টানতে সব শুনে যাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে দুই একবার হুঁ হুঁ করে সায় দিয়ে যাচ্ছেন।' সৃষ্টি যতক্ষণ, ততক্ষণ ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তিকে আলাদা বলে বোধ হলেও মূলতঃ ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ।

কালীরূপ হল দশমহাবিদ্যার মধ্যে একটি রূপ। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ করবেন। পৃথিবীর সবাই আমন্ত্রিত হয়েছেন, কেবল হন নাই তাঁরই এক মেয়ে উমা এবং তাঁর স্বামী শিব। কারণ শিব পাগলের মত ঘুড়ে বেড়ান, ভাঙ্গ খান আর ভিক্ষা করেন ইত্যাদি। শিব হচ্ছেন ভোলানাথ, নিমন্ত্রণ করেন নাই—বয়েই গেল, প্রজাপতি দক্ষেরই যজ্ঞ পূর্ণ হবে না, শিবহীন যজ্ঞ কখনও হয়। কিন্তু মেয়ে উমা তা শুনবেন কেন? বাবা এত বড় যজ্ঞ করছেন, আর তিনি যাবেন না তা কি হয়। উমা যেতে চাইলেন দক্ষের যজ্ঞসভায়। শিব নিষেধ করলেন, "যখন নিমন্ত্রণ করেন নাই, তখন ওখানে গিয়ে কাজ নেই—যেয়ো না।" উমা যাবার জন্য জিদ করতে লাগলেন। শিবও কিছুতেই যেতে অনুমতি দেবেন না। তখন উমা শিবের সামনে দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করলেন। প্রথমেই কালীমূর্তি। শিব ঐ মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন—দেখেন সেদিকে রয়েছেন আর এক ভয়ঙ্কর মূর্তি—তারা। এইভাবে শিব যে দিকেই ঘুরে দাঁড়ান, সেই দিকেই দেখেন এক এক মূর্তি। অবশেষে শিব বাধ্য হয়েই অনুমতি দিলেন।

ধ্যানে মা কালীর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা যেমন ভয়ঙ্কর, আবার তেমনি অদ্ভুত! প্রথমেই বলা হয়েছে মা করালবদনী, আবার পরেই বলেছে মুখমণ্ডল 'সুখপ্রসন্ন।' রুদ্র এবং মধুর ভাবের অপূর্ব সমন্বয় এই কালীমূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। মা দিক্‌বসনা, গায়ের রং ঘন মেঘের মত কালো এবং কেশপাশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সুন্দর বলতে যে ধারণা আমাদের রয়েছে, তাতে মা কালীর এই রূপ, আর যাইহোক, সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু যাঁরাই মায়ের এই রূপের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, তাঁরা বলেছেন, 'মায়ের রূপে ভুবন আলো', 'এ বড় আশ্চর্য কালো'। মায়ের চার হাত— বাম দিকের দুই হাতে নরমুণ্ড এবং খড়্গ আর ডান দিকের দুই হাতে বর এবং অভয় মুদ্রা। গলায় রয়েছে নরমুণ্ডমালা। মা জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছেন শিবের উপর। এইরূপে মা কালীকে চিন্তা করা হয়। একদিকে খড়্গ

আবার অন্যদিকে বর এবং অভয়—পালন এবং বিনাশের প্রতীক। আর মাতৃমূর্তি, তাই সৃষ্টিরও প্রতীক। বিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে এই কালীমূর্তিতে। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারী ঈশ্বরের সব ভাবেরই সমাবেশ এখানে। ঈশ্বরের সৃষ্টি ও পালন এদুটি রূপ গ্রহণ করে সাধারণতঃ তাঁর যে বিনাশের ভয়ঙ্কর রূপটিকে আমরা ভুলে থাকতে চাই, কালী হচ্ছেন মুখ্যতঃ সেই ভয়ঙ্করের প্রতীক, কালীর উপাসনা হচ্ছে তাই ভয়ঙ্করের উপাসনা। স্বামীজী কালীর রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা জীবন্ত এবং ভয়প্রদ। কবিতাটি লিখে স্বামীজী বাহ্য সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান। সেই কবিতাটির কয়েকটি লাইন (অনুবাদ) ঃ

"করালি। করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

এদিক থেকে দেখতে গেলে মাকে পাবার অধিকারী, তাঁর যোগ্য সাধক জগতে খুবই কম। তবুও মাকে ডাকবার অধিকার তো সকলেরই রয়েছে, আর কালীরূপের মধ্যেই রয়েছে বহু ভাবের সমাবেশ। মাতৃভাব তো আছেই। সুতরাং সাধক মায়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয় পায় না—জানে ভয়ঙ্করী হলেও ইনি মা।

শিবকে যদি আমাদের পরমাত্মা-রূপে কল্পনা করা যায় তা হলে, কালী হচ্ছেন আমাদের প্রকৃতি—মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়। শিব শবের মত পড়ে রয়েছেন—আত্মা নির্বিকার। বাইরের চাঞ্চল্য তাঁকে স্পর্শ করে না। আর এই আত্মার উপর অধিষ্ঠিত হয়েই মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদি নৃত্য করে চলেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ যখন হঠাৎ সেই পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, তাঁকে স্পর্শ করে ফেলে, তখন তার সমস্ত চাঞ্চল্য থেমে যায়, যেন লজ্জায় সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়—যেমন মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন শিবের ওপর জিভ বার করে। যখন আত্মার সাথে অনাত্মার মিলন হয়, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার, তখনই কালীর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

অনাদি কাল থেকেই কত সাধক ভগবানকে কালীরূপে দর্শন করেছেন। ভগবান বিভিন্নরূপে ভক্তের সামনে উপস্থিত হন—কালী তাঁরই একটি বিশেষ রূপ। রামপ্রসাদ মাকে এইরূপে দর্শন করেছেন। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কালীরূপে তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সাথে কথা কয়েছেন। আরও কত সাধক, কে তার খবর জানে!

যতক্ষণ পর্যন্ত না দর্শন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্তই কালী এবং ভগবানের বিভিন্ন রূপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে অথবা রামপ্রসাদের কাছে এ ব্যাখ্যা অর্থহীন। তাঁদের কাছে মা-ই পরম সত্য, তাঁকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ভগবানের রূপের ব্যাখ্যার প্রয়োজন ততক্ষণই, যতক্ষণ না তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারছি। তাঁকে দর্শন করলে এসবই—মনবুদ্ধি পর্যন্ত দূরে পড়ে থাকে।

স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১২ই জুন সকাল ৭-৩৫ মিঃ সময়ে ৺কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ ৮৩ বৎসর বয়সে 'ক্রনিক ইউরেমিয়া' রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ চলা-ফেরার সামর্থ্য তাঁহার প্রায় ছিল না।

বারাণসীর মণিকর্ণিকাঘাটে গঙ্গাগর্ভে তাঁহার দেহ সলিল-সমাহিত করা হয়। এই উপলক্ষে গঙ্গাতীরে বহুসংখ্যক সাধুর সমাগম হইয়াছিল।

স্বামী প্রেমেশানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য; তাঁহার রচিত অনেকগুলি পুস্তক আজিও এই নাম বহন করিতেছে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীহট্ট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র শ্রীহট্ট জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-প্রচারের কাজে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার উচ্চ আদর্শনিষ্ঠ, তপঃপূত, নিঃস্বার্থ সেবাব্রত সহজ সরল জীবনের সংস্পর্শ মানুষকে উচ্চাদর্শে আকৃষ্ট করিত; তাঁহার পূত জীবনের সংস্পর্শে আসার ফলে বেশ কয়েকজন যুবক অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন।

কিছুকাল তিনি ঢাকা ও সারগাছি আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও ছিলেন। উত্তরাখণ্ডে থাকিয়া তিনি কয়েক বৎসর তপস্যা ও সাধনভজনে অতিবাহিত করেন।

কর্মজীবন হইতে অবসরগ্রহণের পর দীর্ঘ কয়েক বৎসর কাল তিনি সারগাছি আশ্রমে বাস করিয়াছেন। এখানে দূরদূরান্ত হইতে সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ তাঁহার নিকট সমাগত হইতেন—তাঁহার আজীবন-সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক জীবনের সংস্পর্শে নিজ নিজ জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভের আশায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে বাংলায় তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কয়েকটি সুললিত ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতও তিনি রচনা করিয়াছেন, সঙ্গীতগুলি রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত ও অতি সমাদৃত। তাঁহার জীবনে উচ্চ আদর্শবাদের সহিত ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের সমভাবে প্রসারের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

তাঁহার দেহত্যাগে আমরা একজন উন্নতজীবন, হৃদয়বান, মিষ্টভাষী সন্ন্যাসীকে হারাইলাম, যাঁহার সমীপাগত হইলেই মন-প্রাণ ভরিয়া যাইত।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে মিলিত হইয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

সমালোচনা

The Concept of Self: Kamala Roy: Pp 305, Price Rs. 20/—Published by Firma K. L. Mukhopadhayay, 6/1A Banchharam Akrur Lane. Calcutta-12

আলোচ্য গ্রন্থখানি মূলতঃ লেখিকার একখানি গবেষণা-গ্রন্থ। এই গবেষণার ফলেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল্. উপাধি পেয়েছেন। গ্রন্থখানির মধ্যে সর্বত্র লেখিকার অধ্যয়নের ব্যাপ্তির ও গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের মত পরিবেশনে তিনি নির্ভীক ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থখানি মোটামুটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আত্মার স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্পর্কের দিক থেকে, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে ঐ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখিকা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতবাদ অসামান্য নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। লেখিকার মূল সিদ্ধান্ত আলোচ্য গ্রন্থের ২৭৪-৩০০ পৃষ্ঠার মধ্যে পাওয়া যাবে। প্রথমে আত্মার অবিষয়তা প্রমাণ করে লেখিকা দেখিয়েছেন যে মানুষের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা ও অখণ্ডতা সম্যক্ ব্যাখ্যা করতে হলে প্রয়োজন হচ্ছে দুটি তত্ত্বের সমন্বয়, একটি হোল অদ্বৈত-বেদান্তের সাক্ষি-চৈতন্য, অপরটি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের গতিশীল অচেতন-বাদ। অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে লেখিকা প্রমাণ করেছেন যে 'অচেতন' আসলে চৈতন্যহীন নয়, অচেতন অতি-চেতনের সঙ্গে অভিন্ন (পৃঃ ২৮৯)। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ববাদীদের 'অচেতন-'কে অবিষয় রূপে উপলব্ধি করা যায় না বলেই 'অচেতন'-কে শুদ্ধ চৈতন্য নামে অভিহিত করা সুকঠিন। লেখিকার মতে, অদ্বৈত-বেদান্তের সাক্ষি-চৈতন্য নিষ্ক্রিয়; সেইজন্য শুধু সাক্ষি-চৈতন্যের সাহায্যে আত্মার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্নতা ও অখণ্ডতা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব, 'গতিশীল অচেতন' হচ্ছে সাক্ষি-চৈতন্যের পরিপূরক। অচেতনের গতিশীলতার সাহায্যেই অনুভবের নিরবচ্ছিন্নতা ব্যাখ্যা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। লেখিকা 'সাক্ষী'র সঙ্গে 'অন্তঃকরণ-বৃত্তি'র সম্পর্ক যদি আরও গভীরভাবে, বিশ্লেষণ করে দেখতেন, তাহলে 'সাক্ষি-চৈতন্য নিষ্ক্রিয়'—এই অভিযোগ হয়ত আনতে হত না। সাক্ষী জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে অনুস্যূত, কিন্তু অন্তঃকরণ-বৃত্তি শুধু জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের মধ্যে কাজ করে। আসলে, অদ্বৈত-বেদান্ত-মতে অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাহায্যেই জীবের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা ও ক্রিয়াশীলতা ব্যাখ্যা করা যায়।

সমালোচকের চোখে বইখানির মধ্যে যে যে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, তার কয়েকটির প্রতি পাঠকের ও লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লেখিকার মতে ডেকার্ট 'সন্দেহাত্মক' ও 'মিথ্যা' একই অর্থে ব্যবহার করেছেন (পৃঃ ৯৪)। কিন্তু ডেকার্টের বইগুলি পড়লে এই মত যুক্তিসহ বলে মনে হবে না। রয়েস্ 'আইডিয়া'-র আন্তর তাৎপর্য আত্মার অবিষয়তা-প্রসঙ্গে আলোচনা করেননি, কাজেই লেখিকার

সমালোচনা (পৃঃ ৯৩) অবান্তর বলে কোন কোন পাঠকের মনে হতে পারে 'Royce grants his ideas an External Meaning as well,' (পৃঃ ৯৩) এই বাক্যে ideas কথাটি "ideas"—এই ভাবে প্রকাশ না করলে অর্থ বোঝা যায় না। কাণ্ট 'Subjectivity' কথাটি আত্মার ক্ষেত্রে প্রায় 'অবিষয়' অর্থে ব্যবহার করেছেন—লেখিকা এই মত পোষণ করেন (পৃঃ ৯৫)। এখানেও পাঠকের মনে বিভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা আছে। কারণ, কাণ্ট কখনও বিষয় ছাড়া বিষয়ীর কথা ভাবেননি। সেইজন্য তাঁর মতে analytic unity ও synthetic unity পরস্পর নির্ভরশীল। লেখিকা অদ্বৈত-বেদান্ত-মত উল্লেখ করে বলতে চাইছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টির মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই (পৃঃ ২৭৮), অথচ পরের পৃষ্ঠাতেই (পৃঃ ২৭৯) লেখিকা বলছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টির মূলে রয়েছে গতিশীলতা ও উদ্দেশ্য। সাক্ষি-চৈতন্যের কাজ কি? এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখিকা মন্তব্য করেছেন যে শাংকর বেদান্তে জীবের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা ও সমন্বয় সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে অবহেলা দেখান হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তের গ্রন্থগুলি পড়লে অবশ্য দেখা যায় যে জীবের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা, অখণ্ডতা ও ঐক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে অধ্যাসের সাহায্যে। ২৭৬ পৃষ্ঠার ১৩—১৪ পঙ্‌ক্তিতে 'those' ও 'these' শব্দদুইটির প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত নয়।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই রুচিসম্মত। প্রত্যেক দর্শনানুরাগী পাঠকের মনে বইখানি আশা ও আনন্দের সঞ্চার করবে।

—অমিয়কুমার মজুমদার

প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ বিবৃতিসমেত)—রাজানক ক্ষেমরাজ বিরচিত। অনুবাদক: শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী। প্রকাশক: মৃদুলকান্তি সেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৬০ + ৮৵. , মূল্য দুই টাকা।

'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্' প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শৈব সাহিত্যে এই গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চে। জীব স্বরূপতঃ শিবই, তাহা যখন গুরুকৃপায় জানিতে পারে অথবা স্ব-স্বরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, তখনই জীব শিবত্বে নিমজ্জিত হয়। জীবের একান্তকাম্য মোক্ষলাভের জন্যই প্রত্যভিজ্ঞা বা জীব-শিবের অভেদত্ব-প্রত্যক্ষের আবশ্যকতা।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির মূলানুগ সুন্দর অনুবাদ পাঠ করিলে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকেরও শৈব দর্শন অনুশীলন করিবার আগ্রহ হইবে। স্বনামখ্যাত দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থখানির পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ও সুচিন্তিত 'প্রাক্‌কথন' (ভূমিকা) লিখিয়া দিয়া ইহার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়াছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালা'র মধ্যে 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্' গ্রন্থখানি স্থান লাভ করায় আমরা আনন্দিত।

হিমালয়ের চারধাম—স্বামী শ্যামলানন্দ। শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ ভট্টনগর, হাওড়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৯, মূল্য দুই টাকা।

'হিমালয়ের চারধাম' পুস্তকে প্রধানতঃ কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী—এই চারধামের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে, এতদ্ব্যতীত পথের অন্যান্য তীর্থের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। গল্প বলার মত করিয়া বিষয়বস্তু পরিবেশিত হওয়ায় পড়িতে বেশ ভাল লাগে। শুধু পর্যটকের দৃষ্টি লইয়াই ভ্রমণকাহিনী পরিবেশিত হয়

নাই, শ্রদ্ধাভক্তির ভাব সমগ্র পুস্তকখানিতে পরিস্ফুট। তীর্থযাত্রীরা অনেক বিষয়ে পুস্তকটির মাধ্যমে পথনির্দেশ পাইবেন—যথা, কোন্ তীর্থে কিরূপ সুবিধা অসুবিধা, বাস-রুট, হাঁটা-পথ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছু দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে রাখার যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ-পত্র—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সংকলিত। প্রকাশক: ব্রহ্মচারী অব্যক্তচৈতন্য, ডি ২৩।৬ হাতিফটক, বারাণসী। পৃষ্ঠা ৬৩+১৩; মূল্য দুই টাকা।

মহাপুরুষগণের লিখিত পত্রাবলীর মাধ্যমে তাঁহাদের স্বরূপ এবং উচ্চ চিন্তাধারা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করিতে পারা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের ৪৯ খানি মূল্যবান পত্র তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সংকলিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখিয়া আমরা আনন্দিত। গ্রন্থারম্ভে পূজ্যপাদ মহারাজ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

Fire from the Flint Eternal—Published by Sri Ramakrishna Premananda Ashrama, Antpur, Hooghly. Pp. 10; price 25 p.

আলোচ্য পুস্তিকাখানি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিময়ী বাণীর সংকলন। স্বামীজীর ভাবাদর্শ, কর্তব্য, প্রার্থনা, শিক্ষা, নারীজাতির আদর্শ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বাণীগুলি বর্তমান সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত হইয়াছে। পকেট-সাইজ পুস্তিকাটি তরুণ সম্প্রদায়ের সর্বদা সঙ্গে রাখিবার উপযুক্ত।

ঠাকুর হরিদাস—রামকিঙ্কর দাস সংকলিত। শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর ট্রাষ্ট, শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, স্বর্গদ্বার, পুরী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬৫, মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ ও পরিকর ঠাকুর হরিদাসের স্থান ভক্তিজগতে অতি উচ্চে। তিনি ছিলেন ভক্তশিরোমণি। কত লৌহময় জীবন যে তাঁহার স্পর্শমণির স্পর্শে কাঞ্চন-জীবনে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাভক্ত শ্রীহরিদাসের একখানি প্রামাণিক জীবনচরিত। সংকলনকর্তা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত—এই গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রধানতঃ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ভক্ত পাঠকগণের নিকট গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

(১) **অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ**, (২) **মমতাময়ী মা সারদা**, (৩) **শ্রদ্ধার্ঘ্য (স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীতালেখ্য)**, (৪) **বৈয়াসকী বাসুদেবাষ্টমী**—শ্রীসুধীরকুমার দত্ত, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ১৭, ৩৩, ২১, ২০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীতি-আলেখ্যগুলি বহুস্থানে পরিবেশিত হইয়া অসংখ্য শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় সুধী লেখকের মহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও রচনামাধুর্য কিরূপ। যে উদ্দেশ্যে পুস্তিকাগুলি রচিত, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় আমরা লেখককে অভিনন্দন জানাইতেছি।

আরুণি (১৯৬৬-৬৭)—নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা, প্রকাশক: সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৯০।

'আকৃবি'তে প্রকাশিত অধিকাংশ লেখা পঞ্চম হইতে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের। বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যেকটি লেখা সযত্নকৃত এবং সুসম্পাদিত। ছোটদের রচনাগুলিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পরিস্ফুট।

ফাল্গুনী (১৯৬৬-৬৭)—নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা, প্রকাশক: সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা।

এ বৎসরের সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত 'ফাল্গুনী' পত্রিকাটিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা: ভগিনী নিবেদিতা, একটি কাল্পনিক সংলাপ, অংশীদারী কারবার, A visit to Heaven, Vidyasagar.

পত্রিকাখানি ইহার পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা—(তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৬৭) প্রকাশক: সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, কামারপুকুর, হুগলী। পৃষ্ঠা ১০৪+২৪।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মস্থান শ্রীধাম কামারপুকুরে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য বিজ্ঞান ও কৃষি--এই ত্রিধারা-সমন্বিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের আলোচ্য পত্রিকাখানিতে তরুণ ছাত্র-লেখকদের লেখায় চিন্তাধারার নিজস্বতা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বিষয় বস্তু অবলম্বনে রচিত শিক্ষকগণের অনেকগুলি ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ এবং কয়েকটি বাংলা কবিতা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ছবিগুলি ইহার শোভাবর্ধন করিয়াছে। আমরা পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

Viveka (March, 1967)—The Vivekananda College Magazine—Published by Prof. K. Srinivasam, Vivekananda College, Madras 4

মাদ্রাজের বিবেকানন্দ কলেজের নাম সারা ভারতে সুপরিচিত। এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লিখিত সুচিন্তিত রচনাবলী 'বিবেক' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটির কয়েকটি বিভাগ: ইংরেজী, তামিল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি ভাষা, হিন্দী, সংস্কৃত। প্রত্যেক বিভাগেই অনেকগুলি করিয়া লেখা দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী বিভাগটিই সর্বাপেক্ষা বড—পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪। কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত 'College Day' বিবরণীতে মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মধারার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

আশ্রম (১৩৭৩)—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম। প্রকাশক: কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৬০।

এবারের বার্ষিক পত্রিকাখানিতে আশ্রম-পরিচালিত মহাবিদ্যালয় এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। অধ্যাপক ও শিক্ষকবৃন্দের রচনাবলী সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

স্মরণিকা (১৩৭৩)—সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৭৬বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০ পৃষ্ঠা ৫০।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকাটিতে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। এই স্মরণিকা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও যুগাচার্য স্বামীজীর প্রতি সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের খরাত্রাণ সেবাকার্য

'উদ্বোধন' ও অন্যান্য পত্রিকা মারফৎ আপনারা অবগত আছেন, রামকৃষ্ণ মিশন গত মে মাস হইতে বাঁকুড়া জেলায় হাট-আসুরিয়া অঞ্চলে ও পুরুলিয়া জেলায় পরা অঞ্চলে খরাত্রাণ সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। এছাড়া আরও তিনটি অঞ্চলে—বাঁকুড়া জেলার দধিমুখী ও খাণ্ডারী এবং পুরুলিয়া জেলার হুরা অঞ্চলে মিশনের সেবাকার্য সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং বাঁকুড়া জেলার আরও কয়েকটি অঞ্চলে সেবাকার্যের প্রসারের কথা চিন্তা করা হইতেছে।

এ পর্যন্ত এই সেবাকার্যের জন্য ৯৭,০০০৲ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, আসিয়াছে মাত্র ২৯,৫০০৲। এ অবস্থায় কাজ বাড়ানো সমীচীন না হইলেও ঐ সব অঞ্চলের লোকের নিদারুণ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া মিশন ইহা না করিয়া পারে নাই।

সেজন্য জনসাধারণের নিকট পুনরায় অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। পূর্বে তাঁহারা যেমন মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া আমাদের সেবাকার্য সফল করিয়াছেন, এবারও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না নিশ্চয়ই।

এই খরাত্রাণ কার্যের জন্য নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলির যে কোনটিতে অর্থ বা দ্রব্যাদি পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক পাঠাইলে 'Ramakrishna Mission' এই নামে লিখিতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময়, পশ্চিমবঙ্গের খরাত্রাণ সেবাকার্যের জন্য যে উহা প্রেরিত, তাহা উল্লেখ করিবেন।

মধ্যবিত্ত জনসাধারণও যাহাতে অনায়াসে সাহায্য করিতে পারেন সেজন্য ৫৲.টাকার ও ১৲ টাকার কুপন ছাপানো হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে উহা পাওয়া যাইবে।

এই সব কেন্দ্রের যে কোনটিতে সাহায্য পাঠাইতে পারেন :

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

২। রামকৃষ্ণ মঠ, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯

৪। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ—বিবেকানন্দ নগর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

৫। রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

৬। রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী-১

৭। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বে ৫২-এ.এস.

৮। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট।

বেলুড়,
৩০. ৬. ৬৭

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য যথাযথভবে পরিচালিত হইতেছে। গত মে মাসে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়ঃ

(১) **বিহারে** (ক) হাজরীবাগ জেলায় ইটখোরী ও চম্পারণ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৭,০৮৫ কেজি গম, ১৩,৯২৮ কেজি বাজরা, ১ খানি ধুতি, ৩০টি পোশাক, ১ খানি গরম কম্বল, ১২৩টি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৫,৬১১। হাণ্টারগঞ্জ ব্লকে ৩,৫৬৭ জনকে কলেরা ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়াছে।

(খ) সাঁওতালপরগণা জেলায় রিখিয়া কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬১,৬২৯ কেজি গম, ৫৪৮ কেজি জোয়ার, ১,০০০টি মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট, ১৫০ কেজি গুঁড়া দুধ, ২৫ পাউণ্ড জেলি, ৫৪টি ধুতি ও শাড়ী ইত্যাদি, ৩১৮ খানি কম্বল, ১০০টি শিশু-পরিচ্ছদ, ১,১৭৯টি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা—১০,৮৬৬।

(২) **উত্তর প্রদেশে** মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৬,৪৩৯ কেজি গম, ৬৯৫ কেজি গুঁড়া দুধ, ১০৭ কেজি বিস্কুট, ৩৭.৫ কেজি শিশু খাদ্য, ২০,৩০২টি ভিটামিন ট্যাবলেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫,১৮১।

(৩) **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) পুরুলিয়া জেলায় পরা ও ঝাপড়া সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৬৯.৫ কেজি চাল বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণেব সংখ্যা—৫১৩।

(খ) বাঁকুড়া জেলায় হাট-আস্থরিয়া সেবা-কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,০০১.৫ কেজি গম ২,৮৫৮ জনকে বিতরণ করা হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় দধিমুখী নামক স্থানে আরও একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইযাছে।

বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী এবং রামহরিপুরে সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইতেছে।

কার্যবিবরণী

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লণ্ডনের এই কেন্দ্রটি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দজী মহারাজ কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ৬৮নং ডিউকস অ্যাভেনিউ, মাসওয়েল হিল, লণ্ডন এন. ১০-এ নিজস্ব ভবনে উঠিয়া আসে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৫৪ নং হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন ডব্লিউ. ১১-তে একটি নূতন বাড়ী ক্রয় করিয়া সেখানে শাখাকেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে লণ্ডনের প্রধান কেন্দ্র এবং শাখা উভয় স্থানে নির্ধারিত কর্মধারা যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে।

লণ্ডন প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত 'Vedanta for East and West' পত্রিকাখানি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পুস্তকাবলী কেন্দ্র হইতে বিক্রীত হইয়াছে।

ক্রেতাগণের মধ্যে অনেকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের এবং ইউ. এস. এ., নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী।

কমনওয়েলথ সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গত ১১ই জুন, ১৯৬৬ লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী মহারাজ ট্রাফালগার স্কোয়ারের সন্নিকট সেন্ট মার্টিন-ইন-দি-ফিল্ডস-এ বিভিন্ন ধর্মের আলোচনানুষ্ঠানে হিন্দুধর্মের আলোচনা-সভাটি পরিচালনা করেন এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই সভায় ব্রিটেনের মাননীয়া রানী, ডিউক-অব-এডিনবার্গ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

মার্লবরো-ভবনে যে সংবর্ধনা-সভা হইয়াছিল বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী ঘনানন্দজী তাহাতেও যোগদান করেন। এই সভাতেও রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ ওয়েস্টমিনিস্টারের ডিন-এর আমন্ত্রণে ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবে-তে মানবীয় অধিকার দিবসে (Human Rights Day) স্বামী ঘনানন্দজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ করেন।

স্বামী ঘনানন্দজী জুরিখ, এথেন্স, গ্রেজ-স্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত কেন্দ্র (প্যারিস হইতে ২২ মাইল) ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন এবং ধর্মালোচনা করেন। পূর্ব লণ্ডনে একটি বিদ্যালয়ে তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

স্বামী পরাহিতানন্দ ৫৪ নং হল্যাণ্ড পার্কে ৩৪টি রবিবাসরীয় সভার পরিচালনা করেন। লিসেস্টারে এবং অন্যান্য স্থানে ও সাদামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৩টি বক্তৃতা দেন।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, দুর্গাষ্টমী, খৃষ্টজন্মদিনও যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। উৎসবসমূহে এবং অনুষ্ঠিত ক্লাস-সমূহে যোগদানকারী শ্রোতৃবৃন্দের মোট সংখ্যা আট সহস্রাধিক হইবে। লণ্ডনের উভয় আশ্রমে অনুরাগীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৩—মার্চ, ১৯৬৬) প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার ১২ মাইল উত্তরে প্রশস্ত ৭০ একর ভূখণ্ডের উপর এই কেন্দ্রে বিভিন্ন শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই আবাসিক বিদ্যার্থী আশ্রম ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ৩৭টি নিরাশ্রয় অনাথ বালককে লইয়া আরম্ভ করা হয়, বর্তমানে ইহা পশ্চিমবঙ্গের একটি আদর্শ ও অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত। এখানে ৭৩১টি অনাথ বালক সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে এবং ১৫১টি বালক খরচ দিয়া থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করিতেছে। ইহা ছাড়া বেসিক ট্রেনিং কলেজের ২১২ জন ছাত্র, ২৩ জন গ্রন্থাগারিকতা-শিক্ষণকেন্দ্রের ছাত্র এবং ২০ জন ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজের ছাত্রও আশ্রমিক ছাত্রগণের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ১,১৩৭। দশজন ত্যাগব্রতী এবং ২৭৬ জন বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মী ছাত্রদের দেখাশুনা ও শিক্ষাদান করেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education): রহড়া আশ্রম বুনিয়াদী শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। এই বিভাগে অনেকগুলি বিদ্যায়তন রহিয়াছে। একটি প্রাক্-বুনিয়াদী (নার্সারি) বিদ্যালয়, ৩ হইতে ৫ বৎসরের ছেলেদের

জন্য, ছাত্রসংখ্যা ৪৫; ৫টি ইউনিট-সমন্বিত জুনিয়র বেসিক স্কুল, ৬ হইতে ১১ বৎসরের ছেলেদের জন্য, ছাত্রসংখ্যা ৮৩৩, ৪টি ইউনিট-সমন্বিত সিনিয়র বেসিক স্কুল, ছাত্রসংখ্যা ৪৫৮। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৬। স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কারুশিল্প, সূচীশিল্প, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, কৃষি প্রভৃতি শিখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১১৬ জন শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালাভ করেন।

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচনের জন্য চারটি ধারা আছে: বিজ্ঞান, সাহিত্য, যন্ত্র- ও শিল্প-বিদ্যা, বাণিজ্য। ছাত্র-সংখ্যা ৩৭৪, শিক্ষক-সংখ্যা ৪১।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিক মহাবিদ্যালয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে খোলা হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৩৫৩। ১০০ জন বিদ্যার্থী লইয়া একটি ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এবং ভোকেশন্যাল স্কুলে ২৯২ জন শিক্ষালাভ করিতেছে।

জেলা গ্রন্থাগারটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছে, ইহার পুস্তকসংখ্যা ১১,৬৮৬ এবং গ্রাহকসংখ্যা ১,০০০।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে গুরুকুল প্রথায় পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে থাকিয়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায়। আংশিক ব্যয় বা পূর্ণ ব্যয় বহনকারী নৈতিক শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাত্রও এখানে থাকে। আহার-বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পুস্তকাদি—ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাত্রেরা এখানে পাইয়া থাকে। প্রাচীন গুরুকুল প্রথার সহিত আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সমন্বয়ের আদর্শে গঠিত এই শিক্ষায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্রগঠনেরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় অঞ্চলে সমাজসেবার কাজেও বিদ্যার্থীরা অংশ গ্রহণ করে।

আলোচ্য বর্ষশেষে মোট ৯৩ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল ৬৯ জন, ১৪ জন আংশিক এবং ১০ জন পূর্ণ খরচ বহন করিয়াছে। বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৪ জন এম. এসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজনই উত্তীর্ণ হইয়াছে, একজন ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের গ্রন্থাগারে ৩,২০০ খানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ রাখা হইয়াছে। ২০টি সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্র পত্রিকা রাখা হয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ৩ বৎসরের ডিপ্লোমাকোর্স-এ শিক্ষাদান-কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান বৎসরে শিল্প-পীঠের ছাত্রসংখ্যা ৭২০।

উৎসব-সংবাদ

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক উৎসব গত ১১ই মে হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১১ই মে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বেলুড় মঠের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডঃ অসিত বন্দোপাধ্যায়, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী ও সভাপতি মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দানে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সভাপতি মহারাজ বলেন যে স্বামীজীর বাণীর জীবনরূপায়ণই বর্তমান সর্ববিধ সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায়। সভার পর কলিকাতার "নিবেদন সঙ্গীত শিক্ষার আসর" কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যলীলা গীত হয়।

১২ই মে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সাধনানন্দজী সভাপতিত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জীবনের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য ও তাঁহার সহ-শিল্পিবৃন্দ স্বামী-অভেদানন্দ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন।

১৩ই মে রবীন্দ্র জন্মোৎসব-সভায় আশ্রমের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ রবীন্দ্র-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বিদ্বৎবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। রেকর্ড-শিল্পী শ্রীসলিলকুমার মিত্র বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর পরিবেশন করেন। রাত্রে বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়ের পরিচালনায় ভারতশ্রী বিশ্বনাথ দত্ত প্রমুখ বেঙ্গল জিম্‌নাসিয়ামের সভ্যবৃন্দ ও আশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়।

১৪ই মে ছাত্রদিবস। এই দিন সকালে আশ্রমের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হয়। অপরাহ্নে কৃপাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায় কীর্তন করেন। পরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এবং স্বামী পুণ্যানন্দজীর প্রধান আতিথ্যে ছাত্রদের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে সিকদার বাগান সঙ্গীতসমাজের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাভিনয় হয়।

১৫ই মে সোমবার পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরিদর্শক শ্রীসুনীল রায়। রাত্রে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রামায়ণকথা পরিবেশনের পর পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-বার্ষিকী উৎসব গত ৬ই জুন হইতে ১২ই জুন পর্যন্ত সপ্তাহকাল অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৬ই ও ৭ই জুন রাত্রে স্থানীয় মঠাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে আলোকচিত্র সহযোগে প্রাঞ্জল ভাষায় দুইটি ভাষণ প্রদান করেন। ৮ই ও ৯ই জুন রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার অধ্যক্ষ শ্রীগণেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের সুপরিচালনায় সাধককবি রামপ্রসাদের গীতি-আলেখ্য এবং রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন ধর্মমূলক বিষয়বস্তু অবলম্বনে তরজাগান পরিবেশিত হয়।

৯ই, ১০ই ও ১১ই জুন রাত্রি ৭॥ টায় বেলুড় মঠাগত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী যথাক্রমে জননী সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও ও যুগাচার্য বিবেকানন্দের আদর্শে ত্যাগ, সেবা, সংযম, শৃঙ্খলা ও পবিত্রতার মাধ্যমে জীবনগঠনই যে বর্তমান যুগধর্ম—একথা তিনি যুক্তিসহায়ে উপস্থাপিত করেন। এই তিন দিনই জন-সাধারণের উপস্থিতিতে সভা-প্রাঙ্গণ পূর্ণ ছিল। ১০ই, ১১ই ও ১২ই জুন বক্তৃতান্তে বর্ধমান-

নিবাসী শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুর ও তাঁহার সম্প্রদায় কর্তৃক সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন, রাবণবধ ও মহিষাসুরবধ অতি সুনিপুণভাবে বর্ণিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১১ই জন রবিবার প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর ভজন, পাঠ, পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং দুপুরে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কাটিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ভক্তের উপস্থিতি আশ্রমটিকে এই কয়দিন আনন্দমুখর করিয়া রাখিয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৬৫-মার্চ হইতে ১৯৬৬-এপ্রিল) পাইয়া আমরা আনন্দিত।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত পূজাপাঠ, ভজন ও ধর্মালোচনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ১,১০০ খানি পুস্তক রাখা হইয়াছে। ১৫টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হইতেছে। বয়স্কদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৭,৫৭৮ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহায়তায় ৬৫,৯৬৮ জনকে (অধিকাংশই শিশু) গুঁড়া দুধ হইতে দুগ্ধ তৈরী করিয়া বিতরণ করা হয়।

আশ্রমটির ক্রমোন্নতিতে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন।

উৎসব-সংবাদ

ডিব্রুগড়ঃ গত ৭ই এপ্রিল হইতে ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত দিবসত্রয় ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে "শ্রীসারদা-সংঘ' কর্তৃক এখানে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। তিন দিনই অনুষ্ঠিত সভায় প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণার হৃদয়গ্রাহী ভাষণ সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। প্রঃ বেদপ্রাণা প্রথম দিন আলোচনাসভায় শ্রীশ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন জনসভায় ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগময় জীবনের এবং সমকালীন যুগে তাঁহার প্রভাবের উপর আলোকপাত করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রথম দিনের সভায় সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীগৌরীপ্রভা চালিহা। দ্বিতীয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযোগীরাজ বসু।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ২১শে ও ২২শে এপ্রিল স্থানীয় শক্তিসংঘ প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২১শে তারিখে শোভাযাত্রা, পূজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি হয়। পরে বিবেকবাণী গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় জনসভায় প্রধান অতিথি স্বামী গোকুলানন্দজী, প্রধান বক্তা অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও সভাপতি উপাধ্যক্ষ শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজীর ভাবধারার বিভিন্ন দিক লইয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। পরে পরিষদের

সভ্যগণ কর্তৃক "মহাভারতী" নাটিকা অভিনীত হয়।

২২শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এক ছাত্রসম্মেলন হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় জনসভায় প্রধান অতিথি শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। পরে ব্যায়ামকৌশল এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ" ও "ভগিনী নিবেদিতা" গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এই দিনের জনসভা ও উৎসবে পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে ১লা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ ও ১২ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পূজা-পাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা ও ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১লা বৈশাখ অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীজ্যোতির্ময়নন্দ (সভাপতি), স্বামী উপানন্দজী ও অধ্যাপক শ্রীসুশান্তকুমার দাস শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

২রা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শিশু উন্নয়ন পরিকল্পনার চলমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া স্থানীয় বালক-বালিকাদের মধ্যে একটি শিক্ষা-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা বৈশাখ ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, কথামৃত পাঠ ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

১২ই বৈশাখ সকালে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী অমলানন্দজী ও শ্রীহৃষীকেশচন্দ্র মাইতি (সভাপতি) শিক্ষায় ধর্মের স্থান এবং ব্যক্তিগত- ও সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। বিকালে স্থানীয় বালক-বালিকাদের নিকট স্বামী অমলানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন।

১২ই হইতে ১৫ই বৈশাখ, সকালে ও বিকালে প্রব্রাজিকা কৃষ্ণাপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা স্থানীয় চারিটি বালিকা বিদ্যালয়ে এবং কয়েকটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা, ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

দেলুয়া (পাবনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ৮ই হইতে ১৬ই বৈশাখ পর্যন্ত যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানীয় অসংখ্য ভক্ত জাতিবর্ণনির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। জনসভায় যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যাধ্যক্ষ স্বামী সুধানন্দ, বাগেরহাট (খুলনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী সুকুমার এবং অধ্যাপক শ্রীগৌরচন্দ্র পোদ্দার শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ব্রহ্মচারী সুকুমার ভাগবত পাঠ করেন। ঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, ৺ভবতারিণীমাতার অর্চনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষপূজা, পাঠ, ভজন, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, ২৪প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৬ই ও ৭ই মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে পূজাপাঠ এবং বৈকালে অনুষ্ঠিত সভায় বেলুড় মঠের স্বামী জীবানন্দ মহারাজ "যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব জীবন ও বাণী" প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় দিন "যুগসমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি সকলকে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলেন। সর্বশ্রী অনাদিমোহন গোস্বামী, সুরজমল আগরওয়ালা, দীনবন্ধু মণ্ডল, ভবানী-শঙ্কর ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ ভাওয়াল, শিবদারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তা সংক্ষেপে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

অহং সর্বেষু ভুতেষু ভুতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥ ৩।২৯।২১
যো মাং সর্বেষু ভুতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ২২

সর্বভুতেই রয়েছি সবার অন্তরাত্মা হইয়া
সেথায় আমারে অবহেলা করি কেবল প্রতিমা গড়িয়া
পূজিলে আমায় তাহা তো বিড়ম্বন!
(প্রতিমা আমার সবাকার দেহ-মন)—
ঈশ্বর আমি আত্মা সবার রয়েছি ভুবন জুড়িয়া—
সেথায় আমারে অবহেলা করি প্রতিমায় শুধু পূজে যে
মূঢ় সেই জন, মরে সে কেবল ভস্মে আহুতি ঢালিয়া!

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভুতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৩
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভুতগ্রামাবমানিনঃ॥ ২৪

—শ্রীমদ্ভাগবত

অপরের দেহ-দেউলে আমায় দ্বেষ করে অভিমানী যে,
আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া অপর সবারে ভাবে যে,
লোকের নিন্দা করি চলে অনু'খন,
শান্তি কখনো পায় না তাহার মন ;
প্রতিমায় মোরে পূজিলেও শত উপচারে শত ভাবে সে
তাহার সে পূজা কোনকালে হায় তুষিতে পারে না আমারে—
(সবাকার হৃদি-মন্দিরে আমি সদাই বিরাজ করি যে!)

কথাপ্রসঙ্গে

কর্ম ও কর্মযোগ

কর্ম জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত

কর্ম আমাদের সকলকেই করিতে হয়, কর্ম ছাড়া জীবনধারণ করা যায় না। কর্ম বলিতে স্থূলভাবে কি বুঝায় তাহা আমরা সকলেই জানি। অন্তরে বা বাহিরে কোন পরিবর্তন ঘটানোর নামই কর্ম। মাঠে জমি চাষ করা, কারখানায় যন্ত্র-চালানোও কর্ম; আলাপ-আলোচনা-পরামর্শদানও কর্ম, নিভৃতে চিন্তাও কর্ম। আবার আরও সূক্ষ্মস্তরে 'আমি কিছু করিতেছি না' এ বোধও কর্ম।

আমরা সকলেই জানি, কোন জাতির জনগণের কর্মশক্তি, কর্মদক্ষতা ও প্রতিদিনের কর্মের পরিমাণই সেই জাতির উন্নতির পরিমাপক, উহার সমষ্টিই জাতির শক্তি, জাতির সম্পদ।

প্রয়োজনের দিক দিয়া কুশলকর্মী ও অকুশলকর্মীর কর্মের মধ্যে অনেক প্রভেদ। জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে যথোপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মে কুশলী করিতে এবং তাহাদের কর্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, কর্মবিভাগ করিয়া বাঞ্ছিত দিকে উহা প্রয়োগ করিতে যে জাতি যত নিপুণ, সে জাতি তত উন্নত হয়, ইহাও সর্বজনবিদিত। ব্যক্তিগত উন্নতিও নির্ভর করে ব্যক্তির কর্মকুশলতা, কর্মশক্তি এবং উহার প্রয়োগের পরিমাণের উপর। কর্ম তাই আমাদের জীবনের সঙ্গে, আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

কর্মের জন্য শক্তির বিকাশ চাই-ই

কর্ম করিতে হইলে শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ চাই—নতুবা কর্ম হয় না। স্থূলজগতেও না, সূক্ষ্মজগতে—মনোজগতেও না, প্রকৃতির কোথাও কোনও স্তরে না। জড় বস্তুর তো বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাই হইল—শক্তি উহাকে ঠেলিয়া না দিলে নিজে সে নড়িতেই পারে না, আবার একবার নাড়া পাইলে শক্তির দ্বারা বাধা না পাওয়া পর্যন্ত নিজে নিজে থামিতেও পারে না। কাজেই যে কোন পরিবর্তনের জন্য শক্তির বিকাশের প্রয়োজন অনিবার্য। স্থূলজগতের মতো মনোজগতেও তাই। মানস-সাগরে তরঙ্গ তুলিতে হইলে বা উত্থিত তরঙ্গরাজিকে শান্ত করিতে হইলে উভয়ক্ষেত্রেই শক্তির প্রয়োজন। জড়জগতে এই শক্তিকে আমরা 'এনারজি' বলি, মনোজগতে বলি ইচ্ছাশক্তি।

জগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্মী তাঁহাদের মধ্যে তাই সর্বত্রই বিপুল ইচ্ছাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। কারণ কর্মে কুশলতালাভ করিতে হইলে, দেহমনকে কর্মে নিয়োজিত করিতে ও বাঞ্ছিত সময় পর্যন্ত নিযুক্ত রাখিতে হইলে ইচ্ছাশক্তি ছাড়া তাহা ঘটানো অসম্ভব। যাঁহার ইচ্ছাশক্তি যত বেশী তিনিই একার্যে তত বেশী সফল হইবেন।

ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য তাই একান্ত প্রয়োজন এই কয়টি বিষয়:—দৈহিক ও মানসিক শক্তির উদ্বোধন এবং শিক্ষার দ্বারা কর্মকুশলতা অর্জন করিয়া উহার প্রয়োগ, আর জাতীয় উন্নতির জন্য ইহা ছাড়াও প্রয়োজন ব্যষ্টিশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা ও কর্মবিভাগ করিয়া উহার প্রয়োগ করা।

কর্ম—জড়বাদ ও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিতে

জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী জাতির মধ্যে কর্ম বিষয়ে এপর্যন্ত কোনওরূপ মতদ্বৈধ নাই। বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্ম ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতির প্রয়োজনে এবিষয়গুলির প্রত্যেকটিতে বিশেষভাবে নজর দিয়াছে।

কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ইহার উপরে আরও একটি প্রয়োজনের কথা বলে। জাগতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শক্তির উদ্বোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেজন্য কর্ম সকলকেই করিতে হইবে। কারণ একমাত্র কর্মেরই মাধ্যমে শুধু জাগতিক উন্নতি-পথেরই নয়, আধ্যাত্মিক পথেরও প্রাথমিক বাধা তামসিকতাকে, জড়তাকে কাটাইয়া ওঠা সম্ভব। কিন্তু তামসিকতাকে কাটাইয়া উঠিয়া বিপুল প্রাণস্পন্দনের, বিপুল শক্তির বিকাশ ঘটাইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেই কাজ শেষ হইল না—ইহাই ধর্মের কথা, অধ্যাত্মবাদের কথা। মানুষের জাগতিক কল্যাণও যে শুধু শক্তির স্ফুরণ ও তাহার নিপুণ প্রয়োগের ফলে ঘটিবেই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? শক্তির পরিমাণ ও প্রয়োগদক্ষতার মতই কোন্ দিকে উহাকে প্রযোগ করিলে যথার্থ কল্যাণলাভ হইবে, তাহা নিশ্চিতভাবে স্থির করিয়া সেইদিকেই মাত্র উহার প্রয়োগ করিলে এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। নতুবা সাময়িক প্রলোভন- বা অজ্ঞান-বশে, অথবা জানিয়াও বাধ্য হইয়া ভুল দিকে উহার প্রয়োগ করিলে তাহাতে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই আসিবে।

আজ জগতের প্রায় সর্বত্রই ইহা ঘটিতেছেও। বর্তমান যুগ সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জাগরণের যুগ। যে সব জাতি এতদিন জড়তা-আচ্ছন্ন ছিল, তাহারা সকলেই উহা কাটাইয়া উঠিতেছে; পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আত্ম-সচেতন হইতেছে, প্রাণোচ্ছল হইতেছে। রাজসিকতা বিকাশোন্মুখ বা বিকসিত হইতেছে সর্বত্রই। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই দেখা যাইতেছে উহার প্রযোগ ঘটিতেছে এলোমেলো ভাবে—যাহার যেদিকে ইচ্ছা সে সেদিকেই প্রয়োগ করিতেছে এই বিপুল সদ্য-উন্মুক্ত শক্তিকে। ফলে, ইচ্ছার অভাবে নয়, প্রযোগের সঠিক দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারার জন্যই বহুক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফললাভ হইতেছে না অথবা বিপরীত ফল ফলিতেছে। কর্মচঞ্চল আমরা হইতেছি কিন্তু অনেক সময় বৃথাকর্মে অথবা অপকর্মে আমরা ব্যস্ত বেশী—উহাতে না হইতেছে নিজের, না হইতেছে অপরের কল্যাণ। বহুক্ষেত্রে সর্বনাশও ঘটাইতেছি অপরের, নিজের সর্বনাশের দ্বারও অধিকতর উন্মুক্ত করিতেছি।

অধ্যাত্মবাদী তাই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন শক্তির উন্মেষের দিকে যতখানি, শক্তিপ্রয়োগের দিঙ্‌নির্ণযের দিকেও ততখানি বা ততোধিক। যদি আমরা নিজেদের, জাতির, মানবজাতির সকলেরই কল্যাণকামী হই, আমাদের কর্ম তো করিতে হইবেই "ধৃতি- ও উৎসাহ-সমন্বিত" হইয়া অনলসভাবে, সেই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক সব কর্মশক্তিকে চালিতও করিতে হইবে নিশ্চিতরূপে জানা যথার্থ কল্যাণ-পথে—স্বার্থপরতা যে পথে কমে বা নির্মূল হয় সেই পথে। স্বার্থপরতা অপরের কল্যাণসাধনের পথে বাধা তো দেয়ই, নিজের পরমকল্যাণলাভের পথেও বাধা হয়।

এই দিকটিতে কর্মশক্তিকে সদাপ্রযুক্ত রাখিতে হইলে, অধ্যাত্মবাদ বলে, তোমাকে "অনহংবাদী" হইয়া কর্ম করিতে হইবে, কেবল "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ" হইলেই চলিবে

না। অহংকারই স্বার্থপরতায় মূল ভিত্তি। তোমাকে কাজ করিতেই হইবে, কিন্তু তাহা কেবল নিজের জন্য নয়, অপরের জন্যও তোমাকে ভাবিতে হইবে। খণ্ডিত দৃষ্টি নয়, একটা সামগ্রিক, বিশ্বজনীন, সর্বকালিক দৃষ্টি লইয়া কর্ম করিতে হইবে। যে কর্মচক্রদ্বারা সমগ্র জগৎ বিধৃত, যাহা মানুষের সমাজকে, জীবনকে, সমগ্র প্রাণিজগৎকে এমনকি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহারই অঙ্গ-বিশেষ তোমার কর্ম—এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং যথাসাধ্য তাহাতে সহায়তা করিতে হইবে তোমার কৃত কর্মের দ্বারা, যে জ্ঞান-ভাণ্ডার তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছ, তাহার বর্ধন ও পুষ্টি যেন তোমার কৃত কর্ম দ্বারা ঘটে, তোমার পূর্বপুরুষগণের জীবনব্যাপী কর্মের ফলে, পূর্বগ মহাজ্ঞানিগণের সাধনার ফলে আজ তুমি এ যুগে জন্মের জন্যই উন্নত জীবনপরিকল্পনার, উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছ, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা যেন তোমার কর্মে প্রকাশ পায়, যে সূক্ষ্ম শক্তি, যে নিয়ম তোমার কর্মের ফল প্রসব করাইতেছে, তাহার প্রতি, তাহার অধিকারীর প্রতিও যেন কৃতজ্ঞতা জানায় তোমার কর্ম, আর তোমার কর্মলব্ধ ফলের ভাগ অপর মানুষকেও দিতে হইবে; -তোমাকে ঋষি-যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ নৃযজ্ঞ সবই করিতে হইবে। ইহা না করিয়া যে কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, নিজের উদরপূরণের জন্য কর্ম করে, সে কি মানুষ নাকি?—"স্তেন এব সঃ"—সে তো চোর - জগতের, সমাজের মাঝে থাকিয়া সে তাহার সুবিধাটুকুই কুক্ষিগত করে, বিনিময়ে যাহা দেওয়া উচিত তাহা দেয় না। তাহার দৃষ্টি সীমিত, তাহার আত্মা স্বার্থ-সঙ্কুচিত। অপরের তো দূরের কথা, নিজের কল্যাণপথও সে চিনিতে পারে না।

অধ্যাত্মবাদ তাই কর্মের উপর যতখানি জোর দেয়, ততখানি জোর দেয় মানুষকে নিঃস্বার্থপর করিতে। আর, ইহার একমাত্র স্থিরনিশ্চিত উপায় যাহা, তাহাকেই তাহার কর্মের গতিপথরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়—কর্ম কর এবং সেইসঙ্গে অপরের ও তোমার মধ্যে যে কোন প্রভেদ নাই ইহা জানিতে ও সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। কারণ যতক্ষণ না তুমি এ বোধে স্থিত হইবে, ততক্ষণ 'অহং'-এর, স্বার্থের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। এ বোধের দিকে যত তুমি অগ্রসর হইবে, ততই তোমার স্বার্থপরতা কমিবে। ইহা ছাড়া আর কোন কিছুই, কোন নীতিই, কোন বাধ্যবাধকতাই, কোন শক্তিই তোমাকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর করিতে পারিবে না। এ বোধ ছাড়া কোন নীতির স্থায়িভাবে দাঁড়াইবার ভিত্তিই নাই। এ ভিত্তি ছাড়া কোন মত-বাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নাই, সে মতবাদ অবলম্বনে মানবজাতির নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই বা কোথায়?

কর্মযোগ

যাহার অনুসরণ, যেদিকে অগ্রগমন মানুষের স্বার্থপরতা কমাইয়া দেয়, যাহা অপরের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া দেখিতে শিখায়, তাহাকেই আমরা ধর্ম বলি, আধ্যাত্মিকতা বলি, ভগবৎ-পরায়ণতা বলি। কর্মকে সর্বদা এপথে পরিচালিত না করিলে সে কর্ম দ্বারা তামসিকতার অপসারণ হইবে ঠিক কথা, কিন্তু তাহা দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত সাময়িক উন্নতিও হইতে পারে, আবার তাহারই ফলে পরিণামে বিপরীত কিছুও ঘটিতে পারে যাহা

ব্যক্তিকে ও জাতিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ। তাই ধর্মের কথা হইল, কর্ম এবং নিজের সর্বগত স্বরূপকে জানিবার চেষ্টা একই সঙ্গে কর— "একহাতে ভগবানকে ধরে আর এক হাত দিয়ে কাজ কর"— ইহারই নাম কর্মযোগ, যাহা অবলম্বনে জাগতিক উন্নতি তো হয়ই, অধিকন্তু সেই সঙ্গে মানুষ পশুভাবপ্রধান স্তর হইতে যথার্থ মনুষ্যত্বের স্তরে, এবং সেখান হইতে দেবত্বের স্তরে উন্নীতও হয়।

ধর্মের দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে, নিঃস্বার্থপরতার দিকে কর্মকে নিয়োগ করিবার উপায়কেই গীতায় বলা হইয়াছে যোগ, কর্মের কৌশল—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" যোগস্থ হইয়া কর্ম করা মানে সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ লোকসান প্রভৃতিতে মনের স্থৈর্য ঠিক রাখিয়া কর্ম করা। এরূপ করিবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মনের শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়, তামসিকতা নিশ্চিহ্ন হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবচ্চিন্তার ফলে এই শক্তি উন্নীত হইতে থাকে শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশে, সাত্ত্বিকতায়। ফলে সত্য অধিকতর-ভাবে পবিস্ফুট হইতে থাকে তাহার অন্তরে, ক্রমে সে এই বোধের দিকে আগাইয়া যাইতে থাকে যে, এক অনন্ত সর্বব্যাপী সত্তার সঙ্গে সে এক, তার প্রতিবেশিগণও তাহাই, সব মানুষই তাহাই। এই ভাবে কৃত কর্ম ব্যক্তিগতভাবে পরমতম কল্যাণলাভের, ভগবানলাভের বা আত্মজ্ঞানলাভের পথে—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—আগাইয়া দিতে থাকে তাহাকে, এবং সেই সঙ্গে সমাজ দেশ ও সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী যন্ত্রেও পরিণত করিতে থাকে। যে স্বার্থহীন, নিজের জন্য যে কিছুই চায় না, অর্থ, উচ্চপদ, নাম, যশ কিছুই না, অথচ যে প্রচণ্ডভাবে কর্মরত, তাহার দেহ-মনের মত জগৎকল্যাণ সাধনে সমর্থ যন্ত্র আর কি হইতে পারে?

কৃষ্ণার্জুন

ইহারই নাম কর্মযোগ। গীতায় যে পবিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কর্মযোগে নিযুক্ত করিয়াছেন, যে কোন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে, আধুনিক চিন্তার দৃষ্টিকোণ হইতেও, তাহার তুল্য সর্বজনীন আদর্শ মেলা ভার। (মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ইহা অপেক্ষাও উচ্চ আদর্শ আছে, যেখানে সর্ববিধ দায়িত্বের, সর্ববিধ কর্মের ঊর্ধ্বে মানুষ উঠিয়া যায়, কিন্তু তাহার অধিকারীর সংখ্যা অতি অল্প।) সেখানে যেমন এই কর্মযোগের মাধ্যমে কিভাবে মানুষ দুঃখ ও মৃত্যুকে জয় করিয়া নিত্য, আনন্দময় পরম-ধাম প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা দেখানো হইয়াছে, তেমনি দেখানো হইয়াছে কিভাবে নির্মমহস্তে স্বার্থকে বলি দিয়া জনকল্যাণকেই কর্মযোগ মূল লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করায়। ব্যক্তি-কল্যাণ এবং সমাজ- ও দেশ-কল্যাণকে একই সূত্রে গাঁথা হইয়াছে ইহাতে, কোনটিকেই অবহেলা করা হয় নাই। গীতা উক্ত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্বক্ষণে। ইহার পূর্ব অংশ, পটভূমি এবং পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা আছে মহাভারতে, গীতা যে গ্রন্থের অংশবিশেষ। সেখানে জাতির কল্যাণের দিক হইতে ব্যক্তিগত-ভাবে ও রাষ্ট্রগতভাবে কর্মের জন্য যাহা প্রয়োজন, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মে কুশলতা অর্জন, জনগণের কর্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা ও কর্মবিভাগ করা প্রভৃতি সবই দেখানো হইয়াছে। গীতায় প্রধানতঃ দেখানো হইয়াছে এই কর্মকে কিভাবে কর্মযোগে পরিণত করিতে হয়, তাহারই কৌশল। অর্জুন ক্ষত্রিয়। জনগণের কল্যাণ-

সাধন তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু সে কর্তব্যসাধন এখানে ঘোর কর্মরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে: তাঁহার আত্মীয়গণই অন্যায়কারী, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু অর্জুন তাহা করিতে চাহিতেছেন না, আত্মীয়গণের প্রতি মমতায় তাঁহার হৃদয় আবিষ্ট হইয়াছে, সে হৃদয়-দৌর্বল্যের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিতে চাহিতেছেন কর্তব্য অবহেলা করিয়া। আর, ইহাকেই তিনি মোহবশতঃ ধর্ম বলিয়া ভাবিতেছেন, ভাবিতেছেন, এ যুদ্ধ না করিলেই ধর্মাচরণ করা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতা-সিংহনাদে মোহাচ্ছন্ন অর্জুনকে জাগাইলেন, তাঁহার এই দুর্বলতা কাটাইয়া দিলেন। বলিলেন, আপাত-দৃষ্টিতে ইহাকে ধর্ম বলিয়া তোমার মনে হইলেও ইহা ধর্ম নহে, ইহা দুর্বলতা, স্বার্থপরতা মাত্র। তোমার কর্তব্য কর্ম এই যুদ্ধ তোমাকে করিতেই হইবে, নিজের হৃদয় তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেও সেদিকে চাহিলে চলিবে না, প্রয়োজন হইলে নিজের সব কিছু আহুতি দিতে হইবে এই জনকল্যাণ-যজ্ঞে—ইহাই এই পরিস্থিতিতে তোমার পক্ষে ধর্ম, এই "ঘোর কর্মে" লিপ্ত না হওয়াই অধর্ম। তবে ইহার সঙ্গে আর একটি কাজ কর, 'যোগস্থ' হইয়া ইহা কর, তাহা হইলে তুমি যাহা চাও "শ্রেয়ঃ", ভগবান-লাভ, তাহাও এই কর্মের মধ্যেই হইবে। যোগস্থ হইয়া কাজ করা মানে স্বার্থকে নিঃশেষে বলি দিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করা (স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, Throw self overboard and work), কর্মের অনিবার্য ফলরূপে সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, জয়-পরাজয় আদি আসিয়া যখন তোমার মানসসাগরকে অবসাদে বা উল্লাসে বিক্ষুব্ধ করিতে চাহিবে, তখন উহাকে জোর করিয়া শান্ত রাখিবার চেষ্টা কর, স্বার্থ-বুদ্ধির, "অহং"-এর জন্যই এই বিক্ষোভ হয়। আর ভগবানকে স্মরণে রাখিয়া কাজ কর। ইহাই কর্মকে কার্যযোগে পরিণত করার কৌশল।

ধর্মের দোহাই দিয়া আমরা যখন কর্মত্যাগের অনধিকারী হইয়াও কর্তব্যকে অবহেলা করিতে চাই, কর্ম হইতে দূরে থাকিতে চাই, তখন যেন একথা স্মরণ করি আমরা, ধর্ম জাতিকে মোহাচ্ছন্ন করে, মানুষকে ঝিমাইয়া দেয়, একথা ভাবিয়া ধর্মকে কর্ম হইতে দূরে রাখিতে বলিবার পূর্বেও।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এখানে মানুষের স্বভাবের একটি দিক অতি স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে গীতার এই পটভূমিকায়, যে স্বভাবটির দোষগুলিই ধর্মের দোষ বলিয়া সাধারণের চোখে প্রতিভাত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এ দিকটিতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্জুন যখন আত্মীয়গণের প্রতি মমতাবশতঃ কর্তব্য অবহেলা করিতে চাহিতেছেন, যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না, তখন ইহা তাঁহার দুর্বলতাপ্রসূত হইলেও নিজের সে দুর্বলতাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিতেছেন তিনি —নানা যুক্তি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, এ যুদ্ধ করাটাই মহা অধর্মের কাজ। অধিকাংশ মানুষই ইহা করে; নিজের দুর্বলতাকে আদর্শের আবরণে ঢাকিয়া অপরের নিকট দেখাইতে চায় যে, সে যাহা করিতেছে তাহাই আদর্শ, তাহাই ধর্ম (স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, তাহারা চায় "to idealise the real")।

ভারতের বর্তমান অবস্থা

এই ধরনের তামসিকতা ও "মিথ্যাচার" এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। ভারতের মজ্জায় মজ্জায় সাত্ত্বিক ভাব, ধর্মভাব অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনো তাহা আচ্ছন্ন হইয়া আছে তামসিকতায়। তাই

অর্জুন যেভাবে উচ্চ আদর্শের দোহাই দিয়া কর্তব্যকে, "ঘোর কর্মকে" এড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ করিয়া থাকি অধিকাংশ স্থলে। তামসিকতার জন্য কর্মতৎপর হইতে পারি না, কর্তব্যকে অবহেলা করি, এমন কি নিজ আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকেও এড়াইয়া যাই অথচ কথায় সাত্ত্বিক ভাবের একটি আবরণ টানিয়া দিই এই অপারগতার উপর। ইহা ধর্মও নহে, কর্মযোগ তো নহেই, কর্মও নহে। ইহার ফলে না হয় জাগতিক, না হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি। গীতার ভাষায় বলা যায় ইহা "মিথ্যাচার"—মন বিষয়-বাসনাহীন, বিষয়চিন্তাহীন হইবার পূর্বে ত্যাগের আদর্শের দোহাই দিয়া কর্মে অবহেলা করা যথার্থ ত্যাগ নহে, উহা নিজেকে ও অপরকে প্রতারণা করা মাত্র। বলা বাহুল্য, যাঁহারা জ্ঞানী, ত্যাগের যথার্থ অধিকারী, ধর্ম তাঁহাদের কখনও কর্মের স্তরে নামিয়া আসিতে বলে না। শ্রীকৃষ্ণও বলেন নাই। যদি তাঁহাদের কর্ম করিতে দেখা যায়, জানিতে হইবে সে ভগবদিচ্ছায়, লোকশিক্ষার জন্য। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং করিয়াছেন, যেমন আচার্যগণ ও অবতারগণ—বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, আচার্য শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ করিয়াছেন ত্যাগের পথে পরমধামে পৌঁছিবার পর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া।

অপর দিকে যেখানে তামসিকতা কাটিয়া কিছু রাজসিকতা আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানেও এলোমেলোভাবে কর্মোন্মত্ত হইতেছি আমরা। তামসিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের এবং বিকশিত রাজসিকতা রূপ তেজীয়ান অশ্বের রাশ টানিয়া তাহাকে সর্বাঙ্গীণ, সর্বজনীন কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য এবং সে স্তরকেও ছাড়াইয়া মানবতার, শক্তির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিবার জন্য অপরিহার্য উপায় কর্মযোগকে অবহেলা করিয়া 'অকুশল' ভাবে কর্মোন্মত্ত হইতেছি আমরা। ভগবচ্চিন্তাকে, আত্মচিন্তাকে বাদ দিয়া কর্ম করিতেছি। মানুষের উচ্চতর অবস্থাকে ভুলিয়া কর্ম করিতেছি। বর্তমান জগতের প্রচণ্ডশক্তিশালী জাতিগুলি যেভাবে কর্ম করিতেছে, তাহারই হুবহু অনুকরণ করিতে চাহিতেছি।

বর্তমান জগৎ কিন্তু এভাবে কর্মোন্মত্ত হওয়ার ফলে কী বিষম অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা চিন্তাও করিতেছি না আমরা। জাতিগুলির অভ্যন্তরেই এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতির অতন্দ্রকর্মলব্ধ প্রচণ্ড শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে বিভিন্ন দিকে, বহুক্ষেত্রে বিপরীত দিকে। ইহার অনিবার্য ভবিষ্যৎ সংঘর্ষ। সে সংঘর্ষ যে কী ভয়ানক, তাহা কল্পনারও অতীত। বিভিন্নমুখী এই শক্তিপ্রয়োগের দিকগুলিকে কেন্দ্রাভিমুখী করিতে পারিলে, বিশ্ব ও জীবনের চরম সত্যের অভিমুখী করিতে পারিলে যে ক্ষেত্র হইতেই যে ভাবেই উহা প্রযুক্ত হউক না কেন, সংঘর্ষ কখনো হইবে না। শেষ লক্ষ্যে, কেন্দ্রে অবশ্য মিলিত হইবে সবগুলিই কিন্তু সেখানে সংঘর্ষের ভয় নাই, কারণ উহা সর্ববিধ শক্তির উৎস হইয়াও শক্তির অতীত, চির শান্ত। সেই লক্ষ্যের কথা স্মরণ রাখিয়া সেই লক্ষ্যলাভের চেষ্টাই যোগ, "কর্মের কৌশল"।

কৃষ্ণার্জুনই আবার গীতাসিংহনাদ করিয়াছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপে

দিগ্‌ভ্রান্ত রাজসিকতার বিপুল বিকাশে ভারতের রাজশক্তি যেদিন ভারতকে কল্যাণবর্ত্ম হইতে টানিয়া লইতে চাহিয়াছিল, ভারতের সেই দুর্যোগক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অর্জুনকে প্রধান অবলম্বন করিয়া আবার তাহার দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। তখন

তো তবু রাজসিকতায় বিকাশ ছিল, কর্মতৎপর জাতি জাগতিক বিষয়ে সমৃদ্ধ, উন্নত ছিল। আধুনিক কালে ভারত যখন কল্যাণপথও ভুলিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে রাজসিকতা হইতেও নীচে নামিয়া ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই সময় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপে ভারতের ভাগ্যবিধাতার পুনরাবির্ভাব ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দকে প্রধান অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ জাতিকে উন্নতির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় পরিস্নাত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহারই আদেশে লোকশিক্ষারূপ কর্মে অবতীর্ণ হইয়া বহুভাবে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন অনলস কর্মের মাধ্যমে এই ঘোর তামসিতাকে কাটাইবার জন্য এবং সেই সঙ্গে বারবার সাবধান-বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, এই কর্মোদ্ভূত শক্তি যেন কল্যাণের পথেই প্রযুক্ত হয়, কর্ম যেন কর্মযোগ হয়, ভগবানকে, ধর্মকে আঁকড়াইয়া সব কিছু করি যেন আমরা। আমাদের রাজসিকতা সেইদিন হইতেই ক্রম-বিকসিত হইতে শুরু করিয়াছে। এই সময়ই আমাদের সজাগ থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন, উহা যেন দিগ্‌ভ্রান্ত না হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়, ভগবানকে আঁকড়াইয়া থাকে।

ভারতের চিরসারথি, ভারতের অন্তরাত্মা ভারতের নিজস্ব যে পথকে যুগোপযোগী নবালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, সেই পথে চলিয়া আমরা যেদিন "জগতের সর্বাধিক উন্নতিশীল জাতিগুলির মত জাগতিক বিষয়ে উন্নত" হইতে পারিব, এবং সেই সঙ্গে "অন্তরস্থ দেবত্ব"-কেও প্রকটিত করিতে পারিব, সেদিন আমরা শুধু ভারতকেই গৌরবের শীর্ষদেশে আসীন করিব না, দিগ্‌ভ্রান্ত বর্তমান বিশ্ব-মানবের চিত্তে কর্মযোগকে যথার্থ বিশ্বকল্যাণের পথ বলিয়া দৃঢ়াঙ্কিত করিয়াও দিতে পারিব।

"করিষ্যে বচনং তব"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

গীতাশাস্ত্রের বক্তা যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথাপি শ্রোতা অর্জুনের গীতার নানা অধ্যায়ে বিকীর্ণ সংশয়, বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ পরিজ্ঞাপক প্রশ্ন ও উক্তিগুলি গীতার উপদেশ-মালাকে বুঝিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্জুনের কথাগুলি বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সম্পূর্ণ ধারণা করা যায় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপসংহারে গীতাকে তাঁহার এক তরফা বক্তৃতা না বলিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ"—ইহা হইল তোমার এবং আমার উভয়ের কথাবার্তা—যে কথাবার্তার উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা।

এই মোক্ষশাস্ত্রের বিকাশে তুমি এবং আমি দুজনেই শিল্পী। আমি যখন গাহিতেছিলাম তুমি তখন তাল দিতেছিলে, গীতা তোমার এবং আমার দ্বৈতসঙ্গীত।

গীতার অনুধ্যানে অনেক সময়ে অর্জুনের ছোট ছোট বাক্যগুলি আমাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, কেননা উহারা আমাদেরই হৃদয়ের গভীর জিজ্ঞাসা, আকাঙ্ক্ষা এবং অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের ব্যাকুল উক্তি—'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭) (শরণাগত আমাকে শিক্ষা দাও) —শাশ্বতকালের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের 'যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্' (৩।২) —(যাহাতে নিশ্চিতশ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি) সাধনজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রবল ভাবে সচেতন করে। পরমশ্রেয়োলাভই যে মানুষের সকল কর্মের উদ্দেশ্য সে বিষয়ে আমরা অবহিত হই। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে অর্জুনের জিজ্ঞাসা 'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং ?' (৩।৩৬) (কাহার প্ররোচনায় মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন অন্যায় কার্যে রত হয় ?) আমাদের চিত্তের নিত্যকার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন। ইচ্ছা হয় করি, অথচ করিতে পারি না, মনে হয় আলোক কিন্তু সম্মুখে গেলে দেখি অন্ধকার, সুখ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে যাই, ধরিলে দেখি দুঃখ, প্রতিপদে এই সংঘর্ষ কে উপস্থাপিত করে ? এই আশা-নিরাশা জয়-পরাজয় স্বাধীনতা-বন্ধন রূপ দ্বন্দ্ব কি জীবনের চিরন্তন সঙ্গী, না ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় আছে ? শ্রীকৃষ্ণ ঐ অধ্যায়ের ৩৭ হইতে অন্তিম ৪২ শ্লোক পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু সেই উত্তরের অনুধ্যানের পূর্বে অর্জুনের প্রশ্নটির গভীরতা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা, অসহায়তা এবং বন্ধনদশা যদি ঠিক ঠিক আমরা বুঝিতে পারি তবেই ঐ অবস্থা হইতে মুক্তির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা সম্ভবপর। শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহৃত তিন-প্রকার মাছের কথা স্মর্তব্য। জালে কখনও পড়ে না এমন চালাক মাছ, জালে পড়িলেও চেষ্টা করিয়া পালাইয়া যায় এমন দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎস্য এবং জালে পড়িলেও জালে যে পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে কোন হুঁস নাই এমন তৃতীয় শ্রেণীর মূর্খ মাছ। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং বহুতর কৃতিত্ব সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা যে বস্তুতঃ ঐ মূর্খ মাছের সামিল অর্জুনের 'অথ কেন' প্রশ্ন আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছে।

এইভাবে গীতার অন্যান্য অধ্যায়ে বিকীর্ণ অর্জুনের উক্তিগুলি তলাইয়া দেখিলে আধ্যাত্ম-সাধনার বহু মূল্যবান ইঙ্গিত আবিষ্কার করা যায়।

এই প্রবন্ধে আমরা বিশেষ করিয়া ১৮শ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোকে অর্জুনের "করিষ্যে বচনং তব" উক্তিটি আলোচনা করিব। গীতায় ইহা অর্জুনের শেষ উক্তি। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন এই উক্তি দ্বারাই সমাপ্ত হইয়াছে। গীতার বাকী ৫টি শ্লোক হইল সঞ্জয় উবাচ—পরিদর্শক ও উপন্যাসক সঞ্জয়ের হৃদযোচ্ছ্বাস।

করিষ্যে বচনং তব—হে প্রভু, হে আমার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সখা, হে তত্ত্বদ্রষ্টা আচার্য, তোমার কথা আমি পালন করিব। তিনটি শব্দের এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি গীতাশাস্ত্রের সার্থক উপসংহার। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ দ্বারা যদি গীতা সমাপ্ত হইত তাহা হইলে প্রশ্ন থাকিযা যাইত যে যেজন্য শ্রীকৃষ্ণ মুখ খুলিয়াছিলেন, রণক্ষেত্রের কোলাহলের মধ্যে তপোবনের শাস্ত্রোপন্যাসে রত হইযাছিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইল কিনা, শ্রীকৃষ্ণের বাণী অর্জুনের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া মর্মে প্রতিধ্বনিত হইল কিনা। অর্জুনের ঐ কথা দিয়া গীতা শেষ হওয়াতে আমাদের উক্তপ্রকার প্রশ্নের আর অবসর রহিল না। আমরা বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অরণ্যে রোদন হয নাই। অর্জুনের সংশয় দূরীভূত হইযাছে, জিজ্ঞাসা মিটিয়াছে, ভয় কাটিয়াছে, তিনি নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সাধনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন—করিষ্যে বচনং তব, তোমার কথা শুধু শুনিব না, করিব। হাজার হাজার লোকে শোনে কিন্তু করিতে চায় কয়জন? "সে দুচার জনা, (ও তার) নয়নে যে যায়গো চেনা।" অর্জুন সেই দুচার জনার মধ্যে। ভগবানের বাণীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা তিনি আচরণের দ্বারা প্রমাণ করেন, শুধু ঘাড নাড়িয়া, ধূপধূনা জ্বালিয়া, 'আহা' 'আহা' বলিয়া প্রকাশ করেন না। ইহা বড় সহজ কথা নয়। আমাদের বহুকালসঞ্চিত আলস্য, স্বার্থপরতা, ভোগলালসা ও আত্মম্ভরিতা আমাদিগকে ভগবদ্বাণী পালন করিতে দেয় না। শ্রেয়ঃ কি তাহা বুঝিতে পারিয়াও আমরা আচরণ করি না, ভগবান আমাদের দায়িত্ব লইতে চাহিলেও আমরা তাঁহার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। নিজেরাই কর্তৃত্ব করিতে চাই। 'করিষ্যে বচনং তব' এই ভ্রান্তির প্রতিষেধক। শ্রেয়স্কামী বলেন, আমি নিজের মলিন অহঙ্কারের নির্দেশে আর পথ চলিতে যাইব না, গর্তে পড়িয়া হাতপা ভাঙ্গিব না। হে ভগবান, এখন হইতে তোমার নির্দেশে পথ চলিব। তোমার সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করিব। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু' ইহাই হইবে এখন হইতে আমার জীবনসঙ্গীত।

কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডে দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইবার আখ্যানটি বডই শিক্ষাপ্রদ। ব্রহ্মের শক্তিতে দেবতারা বিজয লাভ করিয়াছেন কিন্তু বিজয়োৎসবের উন্মাদনায় তাহা ভুলিযা গিয়া নিজেদেরই অহমিকার ডঙ্কা পিটিতেছেন। ব্রহ্ম ছদ্মবেশে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত। দেবতারা অগ্নিকে পাঠাইলেন আগন্তুকের তথ্যানুসন্ধানের জন্য। অগ্নিকে দেখিয়া ছদ্মবেশী ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? অগ্নি অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, আমার পরিচয় ত্রিভুবনে সকলেই জানে। নূতন করিয়া আবার কি পরিচয় দিব? আমি সর্বদাহক জাতবেদা অগ্নি। ছদ্মবেশী হাসিয়া বলিলেন, বটে? তা বেশ, এই তৃণগাছিটি দগ্ধ করুন তো।

অগ্নি সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা পোড়াইতে পারিলেন না। লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দেবসংসদে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। ছদ্মবেশীর অনুরূপ প্রশ্নে বায়ু বুক ফুলাইয়া

বলিলেন, আমি সর্বশোষক মাতরিশ্বা বায়ু। ব্রহ্ম পূর্বোক্ত তৃণগাছাটি বায়ুর সম্মুখে স্থাপন করিয়া বায়ুকে বলিলেন, এইটি নড়ান দেখি।

বায়ু ভয়াবহ প্রভঞ্জনরূপে বহিতে লাগিলেন কিন্তু তৃণগাছটি নড়িল না। বায়ু সরমে মরিয়া গিযা পলাইলেন। তখন আসিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। ছদ্মবেশী তৎপূর্বেই তিরোহিত হইয়াছেন। ইন্দ্রের অহঙ্কার বিষম আহত হইল। আকাশে সর্বাভরণভূষিতা জগজ্জননী উমা আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, বৎস, যাহা জানিতে চাও তাহা বলি শোন। ছদ্মবেশে যিনি আসিয়াছিলেন তিনি সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্ম। তাঁহারই শক্তিতে তোমরা জয়লাভ করিয়াছিলে, কিন্তু উহা ভুলিয়া গিয়া নিজদেরই মাহাত্ম্য প্রচারে রত হইয়াছিলে। ইহা সর্বনাশকর বিভ্রান্তি। ঐ বিভ্রান্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে আসিয়া তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন। এখন হইতে আর আমি আমি করিও না। সকল কর্ম, সকল সার্থকতা, সকল উল্লাসের পশ্চাতে সর্বকারণ ভগবানকে ধরিতে শেখ। এই সংসার তাঁহারই অঙ্গুলি-হেলনে চলিতেছে। ঈশ্বরই যন্ত্রী, জীব যন্ত্র মাত্র। যত কিছু কাজ তাহা তাঁহারই কাজ। যত কিছু বৈভব উহা তাঁহারই ঐশ্বর্য। যত কিছু গৌরব তাহা তাঁহারই মহিমা।

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যা, পথ কি তাহা আবিষ্কার করা নয়, যে পথ পাইয়াছি সেই পথে চলিবার দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাব। আমাদের কাঁচা আমি আমাদিগকে শ্রেয়ের অনুসন্ধান হইতে টানিয়া রাখে, বিপথে চলিতে প্ররোচিত করে। কবি কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ঘুচাও চোখের জলে।

ভগবানের চরণে আমাদের মাথা নত না হইলে, আঘাতের পর আঘাত খাইয়া চোখের জলে আমাদের ঝুটা পলকা অহঙ্কার ধৌত না হইলে সত্যের অভিযান ও উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। কে বলিতে পারে 'করিষ্যে বচনং তব'? যাহার মাথা নত হইয়াছে, যাহার আত্মম্ভরিতা ঘুচিয়াছে। অর্জুন প্রথমে মাথা আকাশে তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের ভুল শুধরাইতে চাহিয়াছিলেন। অনেক ধমক খাইয়া, অনেক উপদেশ শুনিয়া এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেই মাথা নীচু হইল। তখন বলিলেন, করিষ্যে বচনং তব। তোমার কথা পালন করিব। নিজের অহমিকাকে দাবাইয়া রাখিয়া, নিজের সুখ দুঃখ লাভ লোকসানের হিসাব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যিনি ভগবদিচ্ছাকে অনুসরণ করিতে পারেন তিনি ধন্য। তিনি ভগবানের যথার্থ প্রিয় সন্তান। পরমশ্রেয়োলাভ তাঁহার পক্ষে সুনিশ্চিত।

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন—Thy will be done—হে প্রভু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। শিষ্যেরা ইহার মর্ম খ্রীষ্টের জীবৎকালে সামান্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর অন্তর্ধানের পর নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অনেক দ্বন্দ্ব লাঞ্ছনা অত্যাচার সহিয়া ধীরে ধীরে তাঁহারা এই মহামন্ত্র সুস্থিরভাবে অবলম্বন করিতে পারিয়াছিলেন। আমি নই তুমি, আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা। তোমারই চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমারই মঙ্গলহস্তের ক্রীড়নক

হইলাম। যেভাবে চালাইবে সেই ভাবে চলিব, যেভাবে নাচাইবে সেই ভাবে নাচিব। খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পরবর্তী জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই এই মন্ত্র কী আশ্চর্যভাবে তাঁহাদের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—করিষ্যে বচনং তব। এই সঙ্গীত সাধিয়া কী শক্তি, কী উৎসাহ, কী পবিত্রতা, কী ভালবাসা তাঁহাদের চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল। দেশ দেশান্তরে সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের জীবন খ্রীষ্টের জীবনালোকে প্রদীপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মতো, বুদ্ধের মতো, খ্রীষ্টের মতো, শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ভাগবত পুরুষরা যখন মানুষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান এবং বলেন তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্—তোমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-চেষ্টা-ক্রিয়া আমাকে সঁপিয়া দাও, Follow me—আমাকে অনুসরণ কর, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে টিটকারী দি, কেহ কেহ কৌতূহলবশে তাঁহাদের আশে পাশে ঘুরি, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভালবাসিয়া ফেলি, তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করি এবং একদিন তাঁহাদের নিশান আমাদের কাঁধে তুলিয়া লই, বলি,—করিষ্যে বচনং তব। তখন হইতে শুরু হয় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের যথার্থ সার্থকতা। তখন হইতে আমাদের চোখের সম্মুখ হইতে পর্দার পর পর্দা সরিয়া যায়। আমাদের হৃদয়ের নিষ্ফল শতধা-প্রসারিত বিক্ষেপসমূহ গুটাইয়া আসিতে থাকে, সদা-চঞ্চল ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি শান্ত হইয়া আসে, বুদ্ধি নিয়ত-পরিবর্তনশীলের পশ্চাতে চির-অপরি-বর্তনীয়কে ধরিতে পারিয়া ধন্য হয়।

জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া আমরা কত না ছুটিয়াছি, কত হাতপা ছুঁড়িয়াছি, কত কৃতিত্ব অর্জনে ব্যস্ত হইয়াছি, কত দিকে কত ভালবাসা কুড়াইতে গিয়াছি কিন্তু শান্ত হইতে পারিয়াছি কি? না, পারি নাই। পরিশ্রমই সার হইয়াছে, একবার হাসিয়া দশবার কাঁদিয়াছি, একটু হাঁটিয়া উপর্যুপরি হোঁচট খাইয়াছি, এক পয়সা জিতিয়া দশ পয়সা হারিয়াছি। এবার যদি ডাক আসিয়া থাকে তো সর্বপ্রযত্নে উহা যেন শুনিতে পারি, শুনিয়া যেন বলিতে পারি, করিষ্যে বচনং তব। পুরাতন মানুষের মৃত্যু হউক—যে মানুষ চিরকাল কেবল নিজের মূঢ় অহঙ্কারের ক্রীতদাসত্ব করিয়াছে। নূতন মানুষ জন্ম গ্রহণ করুক—যে শ্রীভগবানকে সকল কর্তৃত্ব দিয়া তাহার বাণীকে জীবনে মূর্ত করিয়া তুলিবে। যাহা কিছু সে করিবে ভগবানের উপাসনা বলিয়া করিবে, ভগবানের প্রীতির জন্য করিবে। তাহার সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে ভগবৎ-চেতনা বিচ্ছুরিত হইবে, তাহার প্রতিটি চিন্তা শ্রীভগবানের সত্যে বিধৃত থাকিবে। এই পৃথিবীতে তাহার জন্য স্বর্গ নামিয়া আসিবে। মনুষ্যশরীরে দেবত্ব লাভ করিয়া সে ত্রিলোকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

রামচরিতমানসে কাক-গরুড়-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

এতক্ষণ নানাভাবে মায়ার প্রভাব বর্ণনা করার পরে, এবারে কেন এবং কিভাবে ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হন কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব তাঁকে চিনে উঠতে পারে না, ভূষণ্ডী সখেদে গরুড়কে সে কথা নানা উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগল—

ভগতহেতু ভগবান প্রভুরাম ধরেযু তনুভূপ।
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ॥

[দেখ] ভক্তের জন্য ভগবান, প্রভু রাম নৃপতি-দেহ ধারণ ক'রে সাধারণ মানুষের মতই আচরণ ক'রে কেমন পরম-পাবন চরিত্র স্থাপন করলেন।

জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবঈ আপুন হোই ন সোই॥
অসি রঘুপতি লীলা উরগারী।[৬]
দনুজবিমোহনি জনসুখকারী॥

যেমন কোন নট যখন নানা বেশ ধ'রে নৃত্য করে তখন অবিকল সেই সেই ভাবই দেখায়, যদিও ওর কোনটাই তার আপন ভাব নয়।

[নটের ন্যায়] হে উরগারি, রঘুপতির এই লীলা আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে মোহজনক, কিন্তু ভক্তজনের নিকট সুখদায়ক।

নয়ন দোষ জা কহঁ জব হোঈ।
পীতবরন সসি কহুঁ কহ সোঈ॥
জব জেহি দিশিভ্রম হোই খগেসা।
সো কহ পচ্ছিম উয়উ দিনেসা॥

হে খগপতি, যার যখন চোখের দোষ হয় [অর্থাৎ কামলা রোগ হয়] সে তখন বলতে থাকে চাঁদ হলদে রং-এর। কারও যখন দিকভ্রম হয়, সে তখন বলে, সূর্য পশ্চিমে ওঠে।

নৌকারূঢ় চলত জগ দেখা।
অচল মোহবস আপুহি লেখা॥
বালক ভ্রমহিঁ ন ভ্রমহিঁ গৃহাদী।
কহহিঁ পরসপর মিথ্যাবাদী॥

যে নৌকায় চড়ে চলেছে, সে দেখে যেন পৃথিবীটাই চলছে, আর মোহবশে নিজেকে স্থির মনে করে। বালকেরা যখন ঘূর্ণীপাক খায়, তখন বস্তুতঃ তারাই ঘুরতে থাকে, ঘরবাড়ী ঘোরে না। কিন্তু [এ না বুঝে] তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলতে থাকে।

এবার "উপ-মা" ছেড়ে মা-এর কথা বলা হচ্ছে—

হরিবিষৈক অস মোহ বিহঙ্গা।
সপনেহুঁ নহিঁ অজ্ঞান প্রসঙ্গা॥
মায়াবস মতিমন্দ অভাগী।
হৃদয় জবনিকা বহুবিধি লাগি॥
তে সঠ হঠবস সংসয় করহীঁ।
নিজ অজ্ঞান রামপর ধরহীঁ॥

হে গরুড়, হরিবিষয়ে মোহও এইরূপই। তাঁর মধ্যে স্বপ্নেও মায়ামোহের লেশমাত্র নেই। মায়ার বশ মন্দমতি হতভাগ্য লোকেরা—যাদের অন্তরে মায়ার নানা পরদা পড়ে আছে—সেই

---

(৬) এখানে "উরগারী" কথাটি লক্ষণীয়। রামচন্দ্রকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে গরুড়ের সংশয়-সন্দেহ সম্বন্ধে এমন কথার অবতারণা হ'তে চলেছে বলেই তাকে "খগপতি," "খগরাজ" না ব'লে, "উরগারী" ব'লে সম্বোধন করা হচ্ছে মনে হয়।

সব দুষ্টমতিরাই জেদের বশবর্তী হয়ে সংশয়-সন্দেহ ক'রে থাকে, আর নিজ নিজ অজ্ঞানতাই রামের উপর আরোপ করে মাত্র [অর্থাৎ আপন আপন ভাবানুযায়ী তাঁকে মোহিত, শোকগ্রস্ত, বদ্ধ প্রভৃতি ভাবে দেখে থাকে]।

এমনি ক রে, বদ্ধজীব মাত্রকেই এবং সেই সঙ্গে গরুড়কেও, সংশয়-সন্দেহের দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্রে দোষদর্শন করতে দেখে ক্রুদ্ধস্বরে ভুষণ্ডী বলতে লাগল—

কাম ক্রোধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত দুখরূপ।
তে কিমি জানহিঁ রঘুপতিহিঁ মূঢ় পরে তমকূপ ॥

কাম ক্রোধ অহংকার ও লোভে মত্ত, দুঃখময় সংসারে আসক্ত হ'য়ে যারা অন্ধকূপে পড়ে রয়েছে, কেমন ক'রে তারা রঘুপতিকে জানবে ?

বলতে বলতে কিন্তু কথার সুর বদলে গেছে, ভর্ৎসনার স্থলে এবারে গভীর সমবেদনা দেখা দিয়েছে—

নির্গুনরূপ সুলভ অতি সগুন ন জানহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মুনি ভ্রম হোই ॥

প্রভুর নির্গুণরূপ বরং সুলভ (সহজগম্য), কিন্তু সগুণরূপ কেউই জানে না [অর্থাৎ ঠিক ঠিক জানতে বা বুঝতে পারে না], কেননা এতে সুগম্য অগম্য নানা চরিত্রের [অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ভাবসকলের] সমাবেশ, যা দেখে শুনে [সাধারণ লোকের কথা কি ?] মুনিগণেরও মতিভ্রম হ'য়ে যায়।

জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী।
সো সব কথা সুনাবউঁ তোহী ॥

[দেখ, এই মায়া মোহের প্রভাবে আমাকেও কম ভুগতে হয়নি] যেমন ক'রে মায়া এক সময়ে আমাকেও মোহিত করেছিল, হে প্রভু, সে-সব কথাও তোমাকে আমি শোনাব।

"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

আমরা পূর্বে শিবকে বলতে শুনেছি—শ্রোতা যদি বুদ্ধিমান, সুশীল, ভক্তিমান এবং ঈশ্বরীয় কথার মর্মগ্রহণে সমর্থ হয়, তাহলে সাধুরা তার কাছে পরম গুহ্যকথাও প্রকাশ ক'রে থাকেন।

তাই এখন পূর্বকৃত দোষের জন্য অনুতপ্ত, রামকথায় শ্রদ্ধাবান গরুড়কে আদর ক'রে ভুষণ্ডীকে বলতে শোনা যায়—

রামকৃপাভাজন তুম্হ তাতা।
হরিগুণপ্রীতি মোহি সুখদাতা ॥
তাতেঁ নহিঁ কছু তুম্হহি দুরাবউঁ।
পরম রহস্য মনোহর গাবউঁ ॥

হে প্রিয, তুমি রামের কৃপাভাজন। যে-হরিগুনগান আমাকে সুখ দেয়, তাতে তোমারও প্রীতি আছে। তাই, তোমার কাছে কিছু গোপন করব না, সেই মনোহর পরম-রহস্যকথা তোমার নিকট গান করব।

সুনহু রামকর সহজ সুভাউ।
জন অভিমান রাখহিঁ কাউ ॥
সংসৃতমূল সুলপ্রদ নানা।
সকল সোক দায়ক অভিমানা।

রামচন্দ্রের সহজ স্বভাবের কথা শোন। ভক্তজনের কোন অভিমানই তিনি থাকতে দেন না। এই অহঙ্কার-অভিমানই পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতির কারণ—নানা দুঃখপ্রদ। আর, সকল শোকের কারণই হচ্ছে এই অহঙ্কার-অভিমান।

পরম-রহস্যকথাই বটে। যাঁর পেটে কোন কথা থাকেনা, এমন যে নারদ, তিনি সে কথাটি গোপন ক'রে গেলেন, সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যা খুলে বললেন না, এমন কি স্বয়ং শিবও নিজে সোজাসুজি কিছু না ব'লে যেজন্য

পক্ষীরাজ গরুড়কে কাকভূষণ্ডীর কাছে পাঠিয়েছিলেন, কালপূর্ণ এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত দেখে ভূষণ্ডী এখন সেই পরম-রহস্যকথা গরুড়কে শোনাচ্ছে। রকম দেখে মনে হয়, তুলসী যেন প্রকারান্তরে এই কথাই বলতে চাইছেন—অহঙ্কার-অভিমানের লেশ থাকতেও বুঝি বা বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক এমন কি শিবলোক পর্যন্তও যাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ অহঙ্কার-অভিমান-শূন্য না হ'লে শিবত্ব-লাভ হয় না, —পরমজ্ঞান—পরাভক্তি—পরাশান্তির অধিকারী হওয়া যায় না।

যা হোক ভূষণ্ডী ব'লে চলেছে—

তাতেঁ করহিঁ কৃপানিধি দূরী।
সেবকপর মমতা অতি ভূরী॥
জিমি সিসুতন ব্রন হোই গুসাঈঁ।
মাতু চিরাব কঠিন কী নাঈঁ॥
জদপি প্রথম দুঃখ পাবই রোবই বাল অধীর।
ব্যাধিনাসহিত জননী গণত ন সো সিসুপীর॥

সেইজন্যই ত কৃপানিধি এই অহঙ্কার-অভিমান সমূলে দূর ক'রে দেন। সেবকের প্রতি যে তাঁর অসীম মমতা। হে গোসাঁই, শিশুর শরীরে ফোড়া হলে মা কেমন কঠিন হ'য়ে তাকে চিরে দেন। যদিও প্রথমে ব্যথা পেয়ে শিশু অধীর হ'য়ে কেঁদে ওঠে, তবুও কিন্তু মা রোগমুক্তির জন্য তার ঐ ব্যথা গ্রাহ্যই করেন না।

তিমি রঘুপতি নিজদাস কর হরহিঁ
　　মান হিত লাগি।
তুলসিদাস ঐ সে প্রভুহিঁ কস ন
　　ভজসি ভ্রম ত্যাগি॥

তেমনি করেই [অর্থাৎ বেদনা দিয়েও] রঘুপতি নিজদাসের মান-অভিমান হরণ করেন—তার হিতের জন্যই।

এখানে এসে মনশ্চক্ষে দেখা যায়, বুঝি বা অন্তরের কানে শোনাও যায়—ভূষণ্ডীকাকের মুখোস প'রে এতক্ষণ রামকৃপাকথা বলতে বলতে ভাবাবেগে অভিভূত তুলসী যেন আর আত্ম-সংবরণ ক'রে উঠতে পাচ্ছেন না। ভাবের আতিশয্যে স্থান-কাল-পাত্রের বোধ হারিয়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠে বলছেন—"তুলসিদাস ঐ সে প্রভুহিঁ কস ন ভজসি ভ্রম ত্যাগি।" ওরে মূঢ় তুলসী! এমন করুণাময় প্রভুকে একটুখানি মায়ার ঘোর, একটুখানি ভ্রান্তি ছেড়ে কেন তুই এখনও ভজনা করতে পাচ্ছিস নে?

কাকভূষণ্ডীর আত্মকথা

সে যা হোক, এরপর দেখা যায়, মনের খেদেই হোক আর মনের আনন্দেই হোক, ভূষণ্ডী নিজের অজ্ঞতা ও সেই সাথে কখন কিভাবে রামচন্দ্রের কৃপার পরশ পেয়েছিল সেই সব নিজ অপরোক্ষানুভূতির কথা বলতে আরম্ভ করেছে। কেমন ক'রে সে রামচন্দ্রের জন্মোৎসব দেখতে অযোধ্যায় গিয়ে সেখানে পাঁচ বছর ধ'রে বালক রামচন্দ্রের সঙ্গ করেছিল, তাঁর অলৌকিক রূপ-মাধুরী দেখে নয়ন-মন সার্থক করেছিল, একে একে সে-সব কথা সে গরুড়কে শোনাল। তারপর রামের শিশুসুলভ ভাব দেখতে দেখতে এক সময়ে সে রামকে সামান্য মানবশিশু মনে ক'রে কেমন ক'রে মায়ার কবলে পড়েছিল, আবার রামের কৃপাতেই এই ব্যাপার অবলম্বনেই ত্রিভুবনে সর্বত্রই রামের মঙ্গল হস্ত দেখতে পেয়েছিল সে-সব কথা ব'লে, পরে ভাবাবেশে রামচন্দ্রের উদরমধ্যে প্রবেশ ও ব্রহ্মাণ্ডদর্শনের কথাও সবিস্তারে বর্ণনা ক'রল।

আমরা দেখেছি, গরুড়ের আগমনের পরেই ভূষণ্ডী একবার তাকে আদ্যোপান্ত রামচরিতকথা শুনিয়েছিল। দেখা যায়, তখনকার সে কথা ছিল যেন অসাধারণ হয়েও সাধারণ। কিন্তু

গরুড়ের সাথে অন্তরঙ্গতা হবার পরে, তাকে উপযুক্ত অধিকারী জেনে আজ যে পরম-রহস্যময় রামকথা তাকে শোনান হচ্ছে—সে কথা কাকের প্রাণের কথা— নিজ অনুভূতির কথা।

একে একে ভূষণ্ডী ব'লে যেতে লাগল— বালক রামচন্দ্রের বিভূতি দর্শনে কেমন ক'রে সে মাটিতে প'ড়ে ত্রাহি ত্রাহি ব'লে চিৎকার ক'রে উঠেছিল, আর তা দেখে রামচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। তারপর, সে যখন অণিমা-লঘিমাদি সিদ্ধাই, এমন কি জ্ঞান-বৈরাগেরও প্রার্থনা না ক'রে, শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনা জানাল—

ভগত কলপতরু প্রণতহিত কৃপাসিন্ধু সুখধাম।
সোই নিজ ভগতি মোহি প্রভু
দেহু দয়া করি রাম॥

হে ভক্তকল্পতরু, সেবকের হিতকারী সকল সুখের আলয়, কৃপাসিন্ধু রাম, হে প্রভু দয়া ক'রে তোমার পাদপদ্মে আমার ভক্তি দাও, তখন রামচন্দ্র পরম আনন্দিত হ'য়ে তাকে ভক্তিধনের অধিকারী ত করলেনই, অধিকন্তু তাকে জ্ঞান-বৈরাগ্য এমন কি যোগমাগের রহস্য উপলব্ধির ক্ষমতাও দান করলেন এবং সেই সঙ্গে মায়াজনিত সকল ভ্রম হতেও মুক্তিদান করলেন।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ হয় স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি—"পূর্ণভক্তির উদয়ে পূর্ণজ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে।"

এর পরে, শাস্ত্রসম্মত ঈশ্বরবিষয়ক যে-সকল সিদ্ধান্তের কথা রামচন্দ্র তাকে বলেছিলেন, ভূষণ্ডী সে-সবও গরুড়কে শুনিয়ে অবশেষে ব'লল—

নিজ অনুভব অব কহউঁ খগেসা।
বিনু হরিভজন ন জাহি কলেসা॥
রামকৃপা বিনু সুনু খগরাঈ।
জানি ন জাই রাম প্রভুতাঈ॥

হে খগপতি, আমার নিজের অনুভব থেকেই তোমাকে বলছি—হরিভজন ছাড়া দুঃখ নিবারণের অন্য পথ নেই। আর, হে খগেশ! শোন, এ কথাও তোমায় বলে রাখছি রামকৃপাবিনা রামের মহিমা জানা যায় না।

আরও দেখ,

জানে বিনু ন হোই পরতীতী।
বিনু পরতীতী হোই নহিঁ প্রীতি॥
প্রীতি বিনা নহি ভগতি দৃঢ়াঈ।
জিমি খগপতি জলকৈ চিকনাঈ॥

না জানলে বিশ্বাস হয় না। আবার বিশ্বাস না হ'লে প্রীতি হয় না। প্রীতি না জন্মিলে ভক্তি দৃঢ় হয় না। [ভাসা-ভাসা ভক্তি কেমন জান?] যেমন জলের চেকনাই! (অর্থাৎ হাওয়া লেগে একটুখানি রদ্দুরের তাপে অল্পজল শুকিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার চাকচিক্যও লোপ পেয়ে যায়, তেমনি)।

এইরূপে ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্বকথা, রামচন্দ্রের অসীম মহিমার কথা কীর্তন ক'রে, অবশেষে ভূষণ্ডী গরুড়কে ব'লল—

রাম অমিত গুনসাগর থাহ কি পাবই কোই।
সন্তন্হ সন জস কছু সুনেউঁ তুম্হহিঁ সুনায়উ
সোই॥

রামচন্দ্র অসীম গুণসাগর, কে তার ইয়ত্তা করবে? সাধুদের কাছে যা একটু কিছু শুনেছিলাম, তোমাকে তাই-ই শোনালাম।

ভাববস্য ভগবান সুখনিধান করুনাভবন।
তজি মমতামদমান ভজিয় সদা সীতাপতিহি॥

ভগবান ভাবের বশ। তিনি সুখনিধান, করুণার বরুণালয়। মায়া-মমতা, মান-অভিমান ছেড়ে নিরন্তর সীতাপতির ভজনা কর।

শিব এরপর পার্বতীকে বলছেন—

সুনি ভুসুণ্ডিকে বচন সুহায়ে।
হরষিত খগপতি পঙ্খ ফুলায়ে॥

নয়ননীর মন অতি হরষানা।
শ্রীরঘুবর প্রতাপ উর আনা॥

ভুষণ্ডীর মনোহর কথা শুনে গরুড় আনন্দে পক্ষবিস্তার ক'রল। তার চোখ জলে ভরে গেল, মনে বড় আনন্দ হ'ল, অন্তরে রঘুবীরের মহিমা স্ফুরিত হ'ল।

পছিল মোহ সমুঝি পছিতানা।
ব্রহ্ম অনাদি মনুজ করি মানা॥
পুনি পুনি কাগচরণ সির নাবা।
জানি রামসম প্রেম বঢাবা।

পূর্বে তার যে মোহ উপস্থিত হয়েছিল আর তার ফলে অনাদি ব্রহ্ম রামচন্দ্রকে সামান্য মানুষ ভেবে যে মহাভ্রমে পড়েছিল, সে কথা বুঝতে পেরে সে অনুতপ্ত হ'ল। ভুষণ্ডীকাককে সে এখন রামেরই সমান জ্ঞান ক'রে তার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হ'ল ও পুনঃ পুনঃ তার চরণে প্রণাম করতে লাগল।

সাধনপথে গুরুর একান্ত প্রয়োজনঃ গরুড়ের অভিমান-নাশ ও গুরু-ইষ্ট অভেদ দর্শন

তারপর, ভুষণ্ডীকে উদ্দেশ্য ক'রে গরুড় বলতে লাগল—

গুরুবিনু ভবনিধি তরই ন কোঈ।
জোঁ বিরঞ্চি শঙ্কর সম হোঈ॥
সংসয় সর্প গ্রাসেউ মোহি তাতা।
দুখদ লহরি কুতর্ক বহু ব্রাতা॥
তব সরূপ গারুড়ি রঘুনায়ক।
মোহি জিআয়েউ জন সুখদায়ক॥
তব প্রসাদ মম মোহ নসানা।
রামরহস্য অনূপম জানা॥

যদি কেউ ব্রহ্মা অথবা শঙ্করের সমানও হয় তবু সে গুরু বিনা সংসারসাগর পার হ'তে সমর্থ হয় না। হে তাত, সংশয়রূপ সর্প যখন আমাকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল, কুতর্করূপ দুঃখতরঙ্গের অভিঘাতে যখন আমি বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, তখন তুমিই, যাঁকে আমি স্বরূপতঃ ভক্তজনের আনন্দদানকারী, সংশয়-সন্দেহ-রূপ সর্পের নাশ-কারী স্বয়ং রঘুপতি বলেই মনে করি, আমাকে এই মোহের গ্রাস থেকে রক্ষা করলে।[৭] হে প্রভু! তোমার প্রসাদেই আমার সকল মোহের নাশ হ'ল। আমি অনুপম রামরহস্য অবগত হ'তে পারলাম।

ভুষণ্ডী কর্তৃক কাকদেহ প্রাপ্তির ইতিহাস-বর্ণন ও কাক-গরুড়-কথার সমাপ্তি

দেখা যায়, রামরহস্যবিদ তুলসীজী এতক্ষণে যেন তাঁর মূল বক্তব্য শেষ ক'রে ফেলেছেন। কাজেই এর পরের যে সব কথোপকথন, কাকের পূর্বজীবনের ঘটনাবলীর বিবরণ ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা না ক'রে, মাত্র আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই বর্তমান প্রবন্ধটি শেষ ক'রে ফেলা যাক।

আমরা পূর্বে দেখেছি, সকল তত্ত্বকথা শোনার পরে পার্বতী কৌতূহলবশতঃ শিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এমন যে হরিভক্ত তার কিনা কাকের দেহ! এ কেমন কথা? ভুষণ্ডীর কাছে গরুড়েরও সেই একই প্রশ্ন—

তুম্হ সর্বজ্ঞ তজ্ঞ তমপারা।
সুমতি সুসীল সরল আচারা॥
জ্ঞান বিরত বিজ্ঞান নিবাসা।
রঘুনায়ক কে তুম্হ প্রিয় দাসা॥
কারণ কবন দেহ যহ পাঈ।
তাত সকল মোহি কহউ বুঝাঈ॥

---

৭ এখানে শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত মহাশয়ের অনুবাদ অনুযায়ী "ভক্তের সুখদায়ক রঘুনাথ তোমার মত গারুড়ি অর্থাৎ সাপের ওঝা দিয়া আমাকে বাঁচালেন" এরূপ না ব'লে গরুড়ের তৎকালীন মনোভাব ও পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে এরূপ অর্থ করা হ'ল।

তুমি সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ অজ্ঞানশূন্য সুমতি সুশীল, তোমার আচার-ব্যবহার সরল, তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যের আবাসস্থল, রঘুনাথের প্রিয় দাস। হে তাত, আমাকে সকল কথা বুঝিয়ে বল, এমন হয়েও তুমি কি কারণে—এরূপ [কুৎসিত] দেহ পেয়েছ ?

গরুড়ের প্রশ্নের উত্তরে জাতিস্মর ভূষণ্ডী নিজের পূর্ব পূর্ব জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে করতে কেমন ক'রে সে দুর্বুদ্ধিবশতঃ পরমজ্ঞানী লোমশমুনির অভিশাপে কাকদেহ প্রাপ্ত হয়েছিল সেই কথাপ্রসঙ্গে অতঃপর ব'লল—

মুনি ক্রোধভরে বললেন—

সঠ স্বপচ্ছ তব হৃদয় বিসালা।
সপদি হোহু পচ্ছী চণ্ডালা॥

দুষ্ট, তোমার হৃদয় বিশাল, কিন্তু তুমি স্বপক্ষপাতী। অতএব তুমি পক্ষিকুলে কাক হয়ে জন্মাও।

লীনহ পাপ মৈঁ সীস চড়াঈ।
নহিঁ কছু ভয় ন দীনতা আঈ॥

আমি মুনির অভিশাপ মাথা পেতে নিলাম, আমার মনে কোন ভয় বা দীনতা এল না।

কিন্তু, মন ক্রম বচন মোহি জন জানা।
মুনিমতি পুনি ফেরী ভগবানা॥
রিষি মম সহনসীলতা দেখী।
রামচরণ বিশ্বাস বিসেখী॥
অতি বিসময় পুনি পুনি পছিতাঈ।
সাদর মুনি মোহি লীন্হ বোলাঈ॥
মম পরিতোষ বিবিধবিধি কীন্হা।
হরষিত রামমন্ত্র তব দীনহা॥

ভগবান আমাকে মন কার্য ও বাক্যে নিজের জন জেনে মুনির মতি ফিরিয়ে দিলেন। ঋষি আমার সহনশীলতা, বিশেষ ক'রে রামচরণে বিশ্বাস দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হ'য়ে বার বার অনুতাপ করতে করতে আদর ক'রে আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। নানাপ্রকারে তিনি আমাকে খুশী করতে চেষ্টিত হলেন ও অবশেষে আনন্দের সাথে রামমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

ভগতীপচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি মহারিষি সাপ।
মুনি দুর্লভবর পায়উঁ দেখহু ভজনপ্রতাপ॥

কেবল জেদ করেই আমি ভক্তিপথ সমর্থন করেছিলাম, তাই মহর্ষি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। আবার সেই তাঁর কাছ থেকেই দুর্লভ বর [রামমন্ত্রে দীক্ষা] লাভ হ'ল। দেখ, ভজনের কি প্রতাপ।[৮]

শ্রীমৎ তুলসীদাসের মত সুমহান সাধক অথবা ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে ভক্তিপথের সকল প্রকার গোঁড়ামি অথবা সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে এরূপ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিশেষভাবেই লক্ষণীয়।

সে যা হোক, অভিশাপের সাথে সাথে ভূষণ্ডী লোমশমুনির এরূপ আশীর্বাদও পেয়েছিল যে, ইচ্ছামাত্রেই সে কাকশরীর ত্যাগ ক'রে অন্য যে-কোন শরীর ধরতে পারবে। এমন অমোঘ আশীর্বাদ পেয়েও কেন সে এতদিন তুচ্ছ কাকদেহ পরিত্যাগ করেনি, সে প্রশ্নের উত্তরে আবেগভরে ভূষণ্ডীকে বলতে শোনা যায়—

তা তেঁ যহ তন মোহি প্রিয় ভয়উ রামপদ নেহ।
নিজ প্রভু দরসন পায়উঁ গয়উ সকল সন্দেহ॥

[কেমন করে এ দেহ ছাড়ি বল!] এ দেহ যে আমায় অতি প্রিয়। এই দেহতেই যে আমি রামপদে ভক্তিলাভ করেছি—এই দেহতেই যে আমার প্রভুর দর্শন পেয়েছি—আমার সকল সংশয়-সন্দেহের অবসান ঘটেছে!

জয় ভাগবত-ভক্ত-ভগবান!

---

৮ মনে হয় এখানে এরূপ অর্থও করা চলে—কিন্তু দেখ রাম-ভজনের কি প্রভাব, যার ফলে এরূপ অভিশাপ সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত আমার মুনিগণের পক্ষেও দুর্লভবর [অর্থাৎ রামমন্ত্রে দীক্ষা] লাভ হ'ল।

সনাতন ধর্ম*

স্বামী অভেদানন্দ

[স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জানুআরি মাসে আমন্ত্রিত হইয়া জামসেদপুরে পদার্পণ করেন। সেই সময় তাঁহাকে 'মিলনী' মণ্ডপে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় শহরের জনসাধারণ উপযুক্ত মর্যাদা ও উৎসাহে বিপুলভাবে সংবর্ধনা করেন। সভায় টাটা ইস্পাত কারখানা ও চতুস্পার্শস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য দেশীয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সংবর্ধনার উত্তর প্রদানকালে তিনি যে ভাষণ দেন তাহাই ১৯২৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে 'Sanatana Dharma' নামে মুদ্রিত হয়।]

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ, টাটানগরবাসী বন্ধুগণ, অদ্য সন্ধ্যায় আপনারা আমার প্রতি যে সকল প্রীতিপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং শহরে উপনীত হওয়ামাত্র যেরূপ সমারোহে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন তজ্জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। বিগত ২৫ বৎসর আমি আমেরিকায় কাজ করেছি। আমার জগৎবরেণ্য গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ আমার পূর্বে এই কাজ আরম্ভ করেছিলেন, আপনারা তা জানেন। তিনিই প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি সাগর পার হয়ে নূতন পৃথিবীতে পদার্পণ করেন এবং চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩ খৃঃ) সনাতন ধর্মের (বৈদিক ধর্ম ও বেদান্ত দর্শনের) প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই বিরাট সম্মিলনে পৃথিবীর সকল অংশ থেকে ধর্মের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক, ধর্মতত্ত্বে উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি এবং খ্যাতিমান প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিরাও তথায় উপস্থিত হয়ে স্বকীয় ভাবধারা ও ধর্মনীতি জগৎ সমক্ষে প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই সকল স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ তো ছেলেমানুষ। তিনি যদিও পূর্বে কখনও সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন নাই তথাপি সভাপতির নির্দেশে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে সহজ সরল ভাষায় স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত সামান্য কয়েকটি কথাতে কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তাঁর কথা লোকের প্রাণে উৎসাহ, প্রীতি ও সহানুভূতি জাগরিত করল; ইহা বৈদিক ধর্মের সেই মহান প্রতিনিধিরও হৃদয় স্পর্শ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন। আপনারা সকলেই জানেন, সনাতন ধর্মের অর্থ চিরন্তন ধর্ম। এই ধর্মের কোনও প্রতিষ্ঠাতা নাই। ইহাকে কেন চিরন্তন ধর্ম বলা হয়? ধর্ম দ্বারা আমরা কতকগুলি গ্রহণীয় বা বিশ্বাস্য তত্ত্ব বা মতবাদ বুঝি না, বুঝি আত্মবিজ্ঞান; যা দ্বারা আমাদের যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যথা—আমরা এই জগতে কেন এসেছি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুর পরে কোথায় যাব? আমাদের মন যে সকল প্রশ্নে বিচলিত হয় তার সমাধান করা ধর্মের অবশ্যকর্তব্য।

* মূল ইংরেজী ভাষণ হইতে অনূদিত। অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও গ্রন্থে কতকগুলি কথা লিখিত হবে, আর তদ্দ্বারা আমাদের মনের প্রশ্নগুলির উত্তর পাই বা না পাই সেগুলিকে ধ্রুব সত্যরূপে গ্রহণ করতে হবে, ধর্মের অর্থ ইহা নয়, কথাগুলি আপ্তবাক্য হতে পারে, নাও হতে পারে। ধর্মদ্বারা জন্ম-মৃত্যু-সমস্যার সমাধান বোঝায়। বেদ ব্যতীত অন্য কোথাও আমরা উক্ত সমাধান খুঁজে পাই না। আমাদের ঋষি ও সত্যদ্রষ্টা পূর্বপুরুষগণ সর্বপ্রথম জগৎকে ঐ সমাধান দান করেন। উক্ত সত্যদ্রষ্টাগণ খৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা সে সময় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বর্তমানকালের সভ্যতার নেতৃস্থানীয় জাতিদিগের পূর্বপুরুষগণ সে সময় তাদের দেহে উল্কি অঙ্কিত করত ও গুহায় ও জঙ্গলে বাস করত। সেই সুদূর অতীতেই আমাদের পূর্বপুরুষ বৈদিক ভারতের মহান ঋষিরা সনাতন সত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বকালে সকল মানবের মন যে-সব সমস্যা দ্বারা বিচলিত হয় তার সর্বপ্রথম সমাধান আবিষ্কার করেন। ইহা ঈশ্বরের নিকট থেকে অনুপ্রেরণারূপে আসে, তাঁদের অন্তরে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে ও আমাদের জীবাত্মা যেসকল নিয়মের অধীন তা প্রকাশ করে। যে ধর্মকে আমি আত্মবিজ্ঞান আখ্যা দিয়েছি তা কোনও ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই প্রতিষ্ঠাতা আছে। খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশু-খৃষ্টের জীবন ও বাণী উক্ত ধর্মের ভিত্তি। বর্তমানে সভ্যজগতে বৌদ্ধধর্মের অনুগামীরা সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উক্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা রাজ-পুত্র সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জীবন, চরিত্র ও বাণী রউপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত। খৃষ্ট- ও বৌদ্ধ-ধর্ম-বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মেরও প্রতিষ্ঠাতা আছে। মহম্মদ মুসলমান ধর্ম, জরথুষ্ট্র জরথুষ্ট্র-ধর্ম প্রবর্তন করেন। আপনারা দেখেছেন সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই প্রতিষ্ঠাতা আছে, কিন্তু সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নাই। সকল মানবাত্মার নিয়ন্তা শাশ্বত আধ্যাত্মিক নিয়মই ইহার ভিত্তি। এই সকল আধ্যাত্মিক নিয়ম মানুষের সৃষ্টি নয়। অন্য যে সব নিয়ম আমাদের বাহ্য অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে তাহা হয়ত মানুষের তৈয়ারী হতে পারে, কিন্তু যে সকল আধ্যাত্মিক নিয়ম আমাদের জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা নিত্য। এই নিয়মগুলিই সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব। সুতরাং আমাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলি। আমাদের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আমেরিকায় চিকাগোতে বিশ্বমেলায় ইহা ব্যাখ্যা করেন।

২৫ বৎসর পূর্বে খৃষ্ট ধর্ম যেরূপ ছিল আজ সেরূপ নাই। বৈদিক দর্শন যে সনাতন সত্যের মৌলিক তত্ত্ব শিক্ষা দেয় তাহাই আজ উহার ভিত্তি, বেদে যেরূপ আছে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ভগবান এক, পণ্ডিতগণ তাঁকে বহু নামে ডাকেন। অতএব এই সকল আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের খৃষ্টান সায়েন্টিষ্ট, 'নিউ থটিষ্ট' (নব চিন্তাবিদ) ও প্রেততত্ত্ববিদগণ গ্রহণ করেছে। তাদের মন বেদান্তের নূতন আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। এগুলি আমরাই তাদের মধ্যে প্রচলন করেছি। এবং ইউরোপীয়রাও ধীরে ধীরে একই আদর্শ প্রাপ্ত হচ্ছে। অধুনা ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক খৃষ্টান সায়েন্সগীর্জা ও নিউ থট মন্দির দেখা যাবে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ও স্যার ওলিভার লজ প্রভৃতির ন্যায় প্রেততত্ত্ববিদেরা আমাদের বেদান্তের উপদিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা দেয় যে, আত্মা

অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরে আমরা অনন্ত দুঃখে নিপতিত হই না। স্যার ওলিভার লজের কথাই ধরা যাক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁর লেখা বই 'রেমণ্ড' পাঠ করলে দেখতে পাবেন তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের যে বন্ধুরা মৃত ও পরলোকগত তাদের সাথে আমরা খবরাখবর করতে পারি। এবং এইরূপ উক্তির জন্য তিনি গর্ববোধ করেন। ক্যালিফর্নিয়া স্যানফ্রান্সিস্কোতে গত বৎসর তিনি যে ভাষণ দেন তা আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিশপ কর্তৃক আনীত এই মহাপ্রাণ প্রবীণ ভদ্রলোক খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে, বন্ধুগণ, মৃত্যুর পর আমরা নরকে যাই না পরন্তু সুখ ভোগ করতে থাকি এবং আমাদের শক্তি আছে যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের মৃত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। বন্ধুগণ, ইহা গোঁড়া খৃষ্টধর্ম-বহির্ভূত এক পদক্ষেপ। গোঁড়া খৃষ্টান কখনও এই চিন্তা করতে দেবে না যে আপনি মৃত বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। বরং তাদের মতে তারা সবাই এখন নিদ্রিত এবং শেষ-বিচারের দিন একজন দেবদূতের ভেরীনিনাদে জাগ্রত হবে ও তাদের পাঞ্চভৌতিক দেহসহ উত্থিত হয়ে স্বর্গে যাবে। বহু শতাব্দীব্যাপী এই মতবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায়তনে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয় এজন্য কৃতিত্ব তাঁরই বেশী। কিন্তু ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়বাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিচ্ছে এবং জড়বাদ মানবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। উহা জড়ের উৎস খুঁজে পায় না অথচ জড়বহির্ভূত কোন কিছুকে অস্বীকার করে।

খৃষ্টান সায়েন্টিস্টরা কিন্তু উলটো—জড়ের অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং বেদান্ত যেমন বলে, জড় বা জড়জগৎ হ'ল মায়া বা প্রপঞ্চ, খৃষ্টান সায়েন্টিস্টরাও সেইরূপ একে অলীক বলে। তাদের মতে আপনাদের ভৌতিক দেহও অলীক ও দেহের ব্যাধিরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। কারণ আপনারা ব্যাধি রোগ দুঃখ ও ক্লেশ থেকে মুক্তস্বভাব। এখানে বলে রাখি, বেদ এই ধারণা শিক্ষা দেয় এবং বেদান্তদর্শন দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে যে, 'আত্মা দুঃখ, ক্লেশ, ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে মুক্ত।'

আত্মাই আমাদের সত্য পরিচয়। ইহাই সনাতন সত্য, কেহ বলে ব্রহ্ম, কেহ বলে পরমাত্মা। ইহাই শক্তি, শাক্তদিগের মা ভগবতী, শৈবের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু। খৃষ্টানরা এই সত্যকেই স্বর্গস্থ পিতা বলে। নানকের শিষ্যগণ ইহাকে সনাতন সত্য বলে। বৌদ্ধরা ইহাকে বুদ্ধ ব'লে থাকে এবং মুসলমানেরা একই সত্যকে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লা বলে। সুতরাং বন্ধুগণ, মৌলিক সত্যে কোনও প্রভেদ নাই—কারণ সত্য এক। খৃষ্টান মুসলমান বা হিন্দু সকলে একই সত্যের আরাধনা করে, যা অদ্বয়। সত্য এক, একথা যখন লোকে ভুলে যায়, তখনই ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করে এবং পৌত্তলিকের ঈশ্বর, খৃষ্টানের ঈশ্বর, মুসলমানের ঈশ্বর, বৈষ্ণবের ঈশ্বর ও শৈবের ঈশ্বর ইত্যাদি বলা সুরু করে। ইহারা সকলেই ঈশ্বর—কিন্তু কে ইহারা? ধর্ম কি এই শিক্ষা দেয় যে এতগুলি ঈশ্বর আছেন? একজন গোঁড়া খৃষ্টান বলতে পারে, কেন পৌত্তলিকের ঈশ্বর উপাসনা করবে? খৃষ্টানের ঈশ্বরই উপাসনা করা উচিত, খৃষ্টানের ঈশ্বর শ্বেতাঙ্গ ও পৌত্তলিকের ঈশ্বর কৃষ্ণাঙ্গ। বন্ধুগণ, খৃষ্টানের ঈশ্বর, হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের ঈশ্বর ব'লে কিছু নাই। কারণ ঈশ্বর এক এবং তাঁকেই সকল জাতি পূজা করে। তিনি উপাধিশূন্য। যাঁকে

মুসলমানেরা আল্লা ব'লে উপাসনা করে সেই একই ঈশ্বরকে পার্শীরা আহুরমাজদা নামে ডাকে। সেই একই সত্য বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি বা আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। সকল ধর্মমতের বিভেদের সামঞ্জস্য একমাত্র ঈশ্বরের একত্বরূপ মৌলিকত্বের উপর নির্ভরশীল। আমাদের সনাতন ধর্ম এই মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং সনাতন ধর্ম জগৎময় প্রচার করা কর্তব্য।

জড়বাদ কখনও প্রাণে শান্তি দিতে পারে না। ব্যবসাদারী পৃথিবীতে দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা আনবে—বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে যেমন দেখা গেছে। জড়বাদ ও ব্যবসাদারীর ফল ঐ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরে এখন নবযুগ সুরু হয়েছে. ব্যবসাদারী আর থাকবে না। আমরা জগৎকে দেখিয়েছি যে সাংসারিক অভ্যুদয়ের জন্য আমরা জীবন ধারণ করি না, উদ্দেশ্য অন্য বস্তু লাভ। আমাদের জীবনোদ্দেশ্য সর্বব্যাপী অদ্বয় শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করা। প্রশ্ন হতে পারে কিরূপে ইহা লাভ সম্ভব? প্রথমতঃ শিক্ষা করতে হবে যে প্রাণ একটিই। মানুষ, প্রাণী, গাছগাছড়া যতসব দেখছি—প্রত্যেক ব্যষ্টিপ্রকাশে কি স্বতন্ত্র প্রাণ আছে? না; বহুবিধ বৈদ্যুতিক আলোর মত একই প্রাণশক্তির প্রবাহ সর্বত্র বিদ্যমান। একথা কি বলা চলে যে একটি আলো এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির আলো, অপরটি ভিন্ন এবং তৃতীয়টি আবার বিভিন্ন রকমের শক্তির? একই বিদ্যুৎ এতগুলি বাতিতে আলো দিচ্ছে আর একই বিদ্যুৎ শুধু আলো উৎপন্ন করে না, উত্তাপ ও গতিও উৎপন্ন করে। দেখুন, রাস্তায় গাড়ি বিদ্যুতে চলে, বৈদ্যুতিক চুল্লীতে আহার্য প্রস্তুত হয় এবং বৈদ্যুতিক আলোতে পুস্তক পাঠ করা যায়। এই সব বিভিন্ন প্রকাশ একই বিদ্যুৎশক্তির। সুতরাং বন্ধুগণ, সকল মনুষ্যদেহে এই প্রাণশক্তির প্রকাশ, এমন কি সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেও। উক্ত প্রাণশক্তি এক, আমার বা আপনার কারও নয়; এই প্রাণ অবিনশ্বর। প্রাণহীন পদার্থ কিছুই নাই। সবই প্রাণবস্তু এবং প্রাণ বা জীবনীশক্তি সর্বব্যাপী। ইহাই আণবিক কার্যকারিতার হেতু, ইলেকট্রনের গতির কারণ। ইহা থেকেই ইলেকট্রন, আয়ন, অণু ও পরমাণুর উৎপত্তি। একই প্রাণশক্তি তথাকথিত জড়জগতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং উহারা প্রাণীজগতে মন ও ইন্দ্রিয়শক্তি রূপে, চিন্তা ও বিচারশক্তি রূপে প্রকাশিত। বেদান্তে আমরা বহুত্বে একত্বের ভাব দেখি—সব কিছু সেই এক অনন্ত উৎস থেকে উদ্ভূত; প্রাণশক্তির উৎপত্তি উহা থেকেই এবং একই উৎস থেকে মন, বুদ্ধি, বাক্‌শক্তি আস্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতি উদ্ভূত এবং যা কিছু ইথার-জাতীয়, বায়বীয়, তরল ও কঠিন সেই সকলও।

পদার্থ ও মন সেই একই উৎস থেকে এসেছে যাকে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে থাকি। সুতরাং বন্ধুগণ, কিরূপে বহু ঈশ্বর থাকা সম্ভব—মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্শীদের ঈশ্বর থেকে কি হিন্দুর এক ভিন্ন ঈশ্বর? কেন বিবাদ, কেন একে অপরকে ঘৃণা করা? বিবিধ নামে ও বিভিন্ন মূর্তিতে ঈশ্বর একই, এই উপলব্ধি সহায়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একে অন্যকে ভালবাসা উচিত। মানুষ হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান হোক সে ঈশ্বরেরই সন্তান, ইহাই সনাতন সত্য এবং আমাদের একে অন্যকে অবশ্য আলিঙ্গন করা এবং খৃষ্টান, মুসলমান বা পার্শীকে নিজের ঠিক ভাই মনে করা কর্তব্য। যীশুখৃষ্টেরও আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে পুরুষ-পরম্পরা এই শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। এই বাণী সর্বপ্রথম

ভারতেই ঘোষিত হয় এবং ইহাই ভবিষ্যতে ইউরোপীয় জাতিগুলিকে পরিচালিত করবে। আজ তারা এই সত্য গ্রহণেচ্ছু হয়ে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করছে। এবং আজ খৃষ্টানধর্ম, অর্থাৎ গোঁড়া খৃষ্টধর্মের কথা বলছি, পশ্চাতে স্থান নিতে বাধ্য। যেখানে বিজ্ঞানের জয়, সেখানে বেদান্তের সনাতন ধর্মেরও বিজয়।

... ...

সুতরাং বন্ধুগণ, পৃথিবীময় সনাতন ধর্মের পতাকা বহন করে নিয়ে গিয়ে ইহার সত্য প্রচার করুন। হিন্দু ব্যতীত অন্য কোনও জাতি উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা প্রাপ্ত হয় নাই এবং হিন্দুরাই সমগ্র পৃথিবীর ধর্মাচার্যদিগের পথ-প্রদর্শক। স্বামী বিবেকানন্দ পথ প্রস্তুত করেন, আমি তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করেছি এবং আপনারা আমাদের অনুগামী হউন। এগিয়ে আসুন এবং সকল জাতিকে দেখান যে, প্রাচীনকালের ঋষি ও মহাপুরুষদের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আপনারা এই সত্যের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এবং এই যুগেও আপনারাও ঐরূপ জীবনে উন্নীত হতে সক্ষম। পাশ্চাত্যের লোকদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা প্রায় নাই বলা চলে। তাদের উপাসনার সময়াভাব। তারা সপ্তাহে একবার ভজনালয়ে যায়, নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মসভায় যায়। কিন্তু বন্ধুগণ, মানবজাতির মধ্যে একমাত্র আমাদেরই খাওয়াদাওয়া নিদ্রা প্রভৃতির ভিতর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ধর্ম ওতপ্রোত। আমরা ধর্মকে ভালবাসি। এই আদর্শ সমগ্র পৃথিবী জয় করবে। ইউরোপীয় জাতি জাগতিক বিষয়ে আপনাদের অধীশ্বর হতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আপনারা তাদের প্রভু। [illegible] মানবজাতির সমক্ষে প্রমাণ করুন, [illegible] শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তি বড়। আজ হয়ত আপনারা একথা পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু কাল যদি আত্মিক শক্তি প্রকাশ করতে পারেন, যদি এই উপলব্ধি হয় যে আপনারা অমৃতের পুত্র, ঈশ্বরের প্রেম আপনাদের মধ্যে প্রকটিত হচ্ছে তবে আপনারা জগতের কর্তৃত্বলাভে সমর্থ হবেন। এইখানেই আমাদের শক্তি এবং কেহ ইহা আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আত্মার শক্তি তরবারির শক্তি অপেক্ষা অধিক। অন্য জাতিকে জয় করা চলে, তাদের দেশ দখল করা যায়, তরবারির আঘাতে প্রতিবেশীকে হত্যা করে তার যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করা সম্ভব, কিন্তু হে বন্ধু, তাতে সুখশান্তি আসবে না। কিন্তু যদি স্বীয় মন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জয় করা যায় তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট অপেক্ষাও বড় হওয়া সম্ভব।

মহান আলেকজাণ্ডার একজন দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তিনি একটি বৃক্ষতলে এক উলঙ্গ দরিদ্র সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁর সাথে তিনি পরিচিত হতে ইচ্ছা করেন। সন্ন্যাসীকে তাঁর নিকটে আনার জন্য তিনি অনুচরদের পাঠান। যোগী সন্ন্যাসী কিন্তু স্থান ত্যাগ করলেন না। অনুচরগণ যখন আলেকজাণ্ডারকে জানাল যে যোগী আসতে অসম্মত, আলেকজাণ্ডার হুকুম করলেন, 'না এলে, তাকে হত্যা কর।' এই সংবাদ যোগীটিকে জানান হলে তিনি বলেন, "আলেকজাণ্ডার মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস। সে পৃথিবী-বিজেতা নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লিপ্সার ক্রীতদাস, আর মিথ্যাবাদী ; কারণ সে আমাকে হত্যা করতে পারে না। 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।' অস্ত্র আমাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দাহ করতে পারে না, জল আমাকে আর্দ্র করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। আমি অমর,

অক্ষয়, জন্মমৃত্যুরহিত। সুতরাং কেহ যদি বলে আমাকে বধ করবে, তবে সে মিথ্যাবাদী।” মহান আলেকজাণ্ডার অনুচর-প্রমুখাৎ এই কথাগুলি শ্রবণান্তর এই মহাপুরুষের নিকট শির অবনত করেন ও বলে ওঠেন, ‘এই সাধু বিশ্বের প্রকৃত কর্তা ও প্রভু।’

আপনারা প্রত্যেকেই উক্ত মহাপুরুষের ন্যায় হতে পারেন—যথার্থ প্রভু—যদি উপলব্ধি হয় যে আপনাদের অন্তরে ঈশ্বর বাস করেন, আপনারা সর্বশক্তিমানের জীবন্ত বিগ্রহ। এখন আপনারা মনে করেন যে ঈশ্বর মেঘলোকের উর্ধ্বে কোনও দূর স্বর্গে বাস করেন, আপনাদের অন্তরে নয়। এটি কেমন ধর্ম? ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আত্মার অস্তিত্ব সর্বত্র। তিনি আপনাদের অন্তরে বাস করেন। ঈশ্বরকে আত্মারূপে অনুভব করতে প্রয়াসী হন এবং জীবনের প্রতিটি দৈনন্দিন কার্যে দেবত্ব প্রকাশিত করুন। তিনিই চিরন্তন সত্য, তাঁহার অস্তিত্ব জগতের সর্বত্র। সৌরজগতে, নক্ষত্রলোকে ও যুগপৎ সকল প্রাণীর অন্তরে তিনিই বাস করেন। যে এই শাশ্বত সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে, সে অসীম শান্তি ও অনন্ত সুখলাভ করে। বেদান্তের শিক্ষা ইহাই। অবশ্য আমরা পৃথিবীর সর্বত্র এ শিক্ষা দান করব। অধিকন্তু ইহাও আমাদিগকে উপলব্ধি করতে হবে যে সকল মানুষই সেই দিব্য সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। মানুষই ঈশ্বর, কোনও মানুষ-ভ্রাতার সহিত যদি দুর্ব্যবহার করা হয়, সে ঝাড়ুদার, মেথর বা পারিয়া যাই হোক না কেন, তবে তা ঈশ্বরের সঙ্গে দুর্ব্যবহারেরই সমতুল্য।

এদের কারও অপেক্ষা আমাদের নিজদিগকে বড় মনে করার অধিকার নাই। সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর বাস করছেন। আমাদের শাস্ত্র, বেদ, দর্শন ও বেদান্তের শিক্ষা হল, যে একই দেবত্ব সকলের মধ্যে দর্শন করে সেই-ই সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ভগবদ্গীতায় আছে:—যে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ, হাতী, গরু, কুকুর ও পারিয়ার মধ্যে একই ব্রহ্মদর্শন করে সেই জ্ঞানী। সুতরাং বন্ধুগণ, আপনাদের ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করুন। এবং স্মরণ রাখুন এই সকল পারিয়া ও নীচ জাতির মানুষ ব্রাহ্মণেরই সমতুল্য, কারণ ঈশ্বর তাদের মধ্যেও আছেন। আমরা যদি সকলের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন না করতে পারি তবে দোষ কার?

যে ব্রাহ্মণ এই সনাতন সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ সে ব্রাহ্মণই নয়, অপর পক্ষে যে ব্যক্তি এই সত্য উপলব্ধি করে সে নীচজাতিসম্ভূত হলেও, যে ব্রাহ্মণ সনাতন ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে না তার চেয়ে বড়। সুতরাং বন্ধুগণ, আমাদের ধর্ম মহৎ ও উদার এবং উহাতে এই সব জাতিভেদ এবং মতবাদ বা বর্ণবৈষম্যের স্থান নাই। একত্বই মৌলিক নীতি। সকল জাতিই এই সত্য গ্রহণ করবে এবং এই মহান উপদেশাবলী কার্যে পরিণত দেখলে শ্রদ্ধাবনত হবে সেখানে। এখন যুক্তরাষ্ট্রে এমন বহু লোক আছে যারা যে কোনও সত্যের প্রচারককে গ্রহণ করবে এবং তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নেতাদের একজন ভেবে বরণ করবে। বেদান্তদর্শন তার কাজ করেছে, কিন্তু এখনও তা শেষ হয় নাই। আমরা মাত্র আরম্ভ করেছি। আমেরিকায় বর্তমানে অন্য স্বামীজীরা আছেন। তাঁরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠিত মিশনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা অভিনন্দনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি আমার গুরুদেব। আমি তাঁর দর্শনলাভের গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তাঁর উপদেশ শুনেছি এবং দুই বৎসর তাঁর সেবাধিকার পেয়েছি। আমাদের সংঘের

বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য স্বামীজীদের ন্যায় আমিও তাঁর শ্রীচরণতলে আশ্রয় পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্তবিগ্রহ। আপনাদের সম্মুখে যে সকল আদর্শের বর্ণনা দিচ্ছিলাম সেই সকলই আমরা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। খৃষ্টানরা এসে যখন তাঁর ঐরূপ ঈশ্বরানুভূতি প্রত্যক্ষ করত তারা তখন তাদের প্রভু যীশুখৃষ্টের সম্মুখে যেরূপ প্রণত হয় তাঁকেও সেইরূপ প্রণতি জানাত এবং ঈশ্বরের নিকটে যেরূপ প্রার্থনা করে তাঁর নিকটও তেমনই প্রার্থনা করত। মুসলমানেরা আসত এবং তাঁকে তাদের শ্রেষ্ঠ সাধু ও ইসলামের অনুপ্রাণিত আচার্য মনে করত। বৌদ্ধরা তাঁর মধ্যে তাদের বুদ্ধের আদর্শ দেখত এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবেরাও তাঁর ভিতরে তাদের উচ্চতম আদর্শের পরিচয় পেত। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন করতেন এবং তাঁর শিক্ষা ছিল অতি উদার যা খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা বৌদ্ধ সকলেই অনুসরণে সক্ষম।

সুতরাং বন্ধুগণ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার। আমাদের যখন এমন একজন আচার্যের প্রয়োজন উপস্থিত হল, নিজ জীবনে যিনি জ্ঞান ও ধর্মসমূহের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, তখন তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। তিনি নিজ জীবনে তা দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ধর্মসমন্বয়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যখন তাঁর নিকট আসি, খৃষ্ট বা বুদ্ধের ন্যায় কোনও আচার্যকেই আমরা বিশ্বাস করতাম না। আমরা ছিলাম অজ্ঞেয়বাদী ও বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু যখন তাঁকে দেখলাম এবং তাঁর জীবন দিনে রাতে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন তার মধ্যে আমরা কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও অন্যান্য অবতারের প্রকাশ দেখতে পেলাম। তিনি প্রায় সবক্ষণই ঈশ্বরানুভূতিতে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাঁর জীবনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সংসারী লোকের ন্যায় বস্তুতান্ত্রিক বা ব্যবসায়ী আদর্শ অনুসরণ করতেন না, বরং ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ইহাই ছিল তাঁর আদর্শ। আপনারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক ও অতুল সম্পদের অধিকারী অথবা বহু সন্তানের জনক হউন না কেন, কিন্তু যদি ঈশ্বরোপলব্ধি বা বিশ্বজনীন আত্মার সহিত আপনাদের সম্বন্ধ উপলব্ধি না হয়ে থাকে তবে আপনাদের জীবন বৃথা। এই বিষয় তাঁর স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অতীব প্রযুক্তিকুশলী স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। এইরূপ গুরুর শিষ্যগণ প্রয়োগকুশল নিশ্চয়ই হবে, স্বপ্নবিলাসী হবে না। তারা মহান কর্মী। তারা আদর্শের জন্য কর্ম করে। তাদের আদর্শ কর্মযোগ। কর্মযোগ নিঃস্বার্থ কর্মের পথ। তাদের জীবন জগতের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা মুক্তির পথপ্রদর্শক। কর্মযোগ অন্তর পবিত্র করার উপায় শিক্ষা দেয়, সংস্কৃতে তাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পূর্বে প্রথম সোপান চিত্তশুদ্ধি। যীশুখৃষ্ট এই কথাই কি কম্বুকণ্ঠে বলেন নাই, "যাদের অন্তর পবিত্র তারাই ভাগ্যবান, কারণ তারা ঈশ্বর দর্শন করবে।" ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শন উভয়ের জন্য অন্তরের পবিত্রতা প্রয়োজন। অতএব বন্ধুগণ, সকলের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা আপনারা চিত্তশুদ্ধি করতে পারেন, ইহা উপলব্ধি করুন, জীবনে যে সব কর্ম করছেন তা পরমেশ্বরেরই উপাসনা।

ভগবদ্গীতা বলে: "যে কোন কর্ম কর, যে কোন ত্যাগ কর, সব বিনাসর্তে ঈশ্বরে সমর্পণ কর।" এই প্রণালীতে অন্তর শুদ্ধ হবে এবং অন্তর শুদ্ধ হলে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শনের

অধিকার আসবে। তখন সনাতন ধর্মাদর্শে পৌছিবেন। অতএব সকল কর্ম, শারীরিক, মানসিক বা লোকহিতকরই হোক, নিজের জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা না করে সম্পাদন করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে। আমাদের সনাতন ধর্ম অন্য একটি বিষয় শিক্ষা দেয়, আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, সকল মানুষই একটি যন্ত্র যার ভিতব দিয়ে ঈশ্বর কাজ করছেন।

ঋগ্বেদে আছে—ঈশ্বরের অসংখ্য চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও মস্তক আছে। যখন এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয় তাঁর অন্তরের ভগবানকে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য, মরণশীল সত্তাকে আপনার অভিবাদন না দিয়ে অমৃতকে দিন, তিনিই প্রকৃত মানুষ। আমাদের প্রথা বন্ধুদেব সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের প্রণাম কবা। ইহার অর্থ আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যে ঈশ্বর বাস করেন তাকেই প্রণাম জানাই, অধিকন্তু আপনাদেব উপলব্ধি করা কর্তব্য, যে কোন কাজ আপনার ভ্রাতা, প্রতিবেশী বা দেশেব জন্য করেন তা উপাসনাই এবং এই আদর্শ মনে বেখে নিজেদের কাজ করে চলা ও পৃথিবীতে বাস কবা উচিত। যদি ভগবৎপ্রেমে ও মানবপ্রীতিতে কাজ করেন তবে এই জীবনেই ঈশ্বরলাভের অধিকারী হবেন এবং মৃত্যুর পরে, সেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবেন যা পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থেই বর্ণিত আছে। তখন জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য লাভ হবে। এবং তখন উপলব্ধি হবে যে আপনি মরণশীল নন, মৃত্যুহীন প্রাণ, পরমাত্মাব সাথে একত্ব উপলব্ধি হবে। মুক্তিতেই আপনার জন্মগত অধিকার, এতদিন আপনার শক্তির অপচয় করেছেন পার্থিব বিষয়ে আপনার মনকে আবদ্ধ রেখে এবং নিজকে অন্য মরণশীল প্রাণীর দাস মনে ক'রে, এই বোধ তখন আসবে। আমবা সকলে মুক্তিলাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেছি। মুক্তিই সকলের লক্ষ্য এবং মোক্ষ আমাদের ধর্মেব উচ্চতম আদর্শ। মোক্ষ অর্থ মুক্তি। মুক্তি শুধু জাগতিক কার্যে স্বাধীনতা বুঝায় না, সকল বন্ধন, সকল দৈহিক ও মানসিক অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি বুঝায়। পুরাকালে মহান ঋষিগণ এই আদর্শ রেখে গেছেন এবং একই আদর্শ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংঘে কর্মরত তাঁর শিষ্যগণও দৃঢভাবে ঘোষণা করেছেন……।

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীভবতারিণীর চরণে প্রার্থনা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিত্য নিত্য দ্রব্যমূল্য
এমনি করে বাড়বে যদি,
কোথায় বল থামবে জাতির
দুর্গতির হায় এই পরিধি?
সে শৃঙ্খলা, শান্তি কোথা?
নিরাপত্তা কথার কথা।
উদ্বেগ, অভাব, উৎকণ্ঠা যে
লেগেই আছে নিরবধি।

২

লুটপাট আর ডাকাতি খুন
নাই প্রতিকার, ঘটছে নিতি,
লোক যে হল উদ্বেজিত
দিনে দিনে বাড়ছে ভীতি।
এ যন্ত্রণা ঘুচাও মাগো!
রক্ষা কর, তুমি জাগো,
দাও মা অভয়, দাও মা আশা,
দাও ভরসা এই মিনতি।

৩

এ দুর্দশার দায়িত্ব কার?
আমরা জানি তুমিই দায়ী,
তুমি বিপদ-তারিণী মা—
তোমার কাছেই বিচার চাহি।
'ভাগের মা যে পায়না গঙ্গা'
তাইতো মনে দারুণ শঙ্কা,
নূতন শক্তি লভুক জাতি
তোমার কৃপায় অবগাহি।

কৃপাভিক্ষা

শ্রীকালিদাস রায়

দিগন্ত পানে চেয়ে থাকি তব
হেরিতে অভয় পাণি,
কান খাড়া করে থাকি প্রভু, তব
শুনিতে আশার বাণী।
ভুল করেছিনু, তাহার দণ্ড
হবে কেন প্রভু এত প্রচণ্ড?
মার্জনা করি অনুতপ্তেরে
কাছে লও প্রভু টানি!
অপরাধ কত করেছি চরণে প্রভু—
শাসন করেছ, তাড়ন করেছ,
ক্ষমা তো করেছ তবু!
আজি কেন হলে কৃপায় কৃপণ।
আমি অসহায়, আমি অশরণ,
রুদ্রমূর্তি সম্বরি ধর
স্নেহময় রূপখানি।

সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শন

অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখা যায় যে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে দুইটি মত সারা ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই দুটি মত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) ও যুক্তিবাদ (rationalism)। প্রত্যক্ষবাদ অনুসারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একমাত্র জ্ঞানার্জনের উপায়। যাহা প্রত্যক্ষ করা একেবারে সম্ভব না তাহা আমাদের জ্ঞানগোচর হতে পারে না। যেমন ঈশ্বর, আত্মা, পরজন্ম ইত্যাদি। যুক্তিবাদীরা বলেন যে প্রত্যক্ষের বিষয় জ্ঞানের আধার হতে পারে না, কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান অনেকক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক ও সকলের প্রত্যক্ষ সমান নয়। প্রত্যক্ষের দ্বারা সার্বভৌম জ্ঞান হতে পারে না। বুদ্ধিবিবেচনার সাহায্যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। এই দুই মতের সমন্বয় করবার চেষ্টা মহামতি কাণ্ট করেছিলেন। তাঁর মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সামগ্রী যোগায় কিন্তু ঐ সামগ্রী বা মালমশলা দিয়ে জ্ঞানের কাঠাম প্রস্তুত করা সম্ভব হয় বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে। বুদ্ধিবৃত্তি ঐ সামগ্রী স্বীয় বৃত্তির আধারে শ্রেণীগত ক'রে জ্ঞান জন্মায়, অতএব দৃশ্যমান জগৎ বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্ট বস্তু। প্রত্যক্ষের বহির্ভূত বস্তু, যেমন ঈশ্বর বা আত্মা একটা ধারণামাত্র, জ্ঞানের বিষয় নয়।

জগতের সত্তা সম্বন্ধেও দুইটি মত প্রকট দেখা যায়। এই দুই মত বিজ্ঞানবাদ (idealism) ও বস্তুতন্ত্রবাদ (realism)। বিজ্ঞানবাদ অনুসারে জগৎ বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞান বহির্ভূত বা অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। বাহিরে যে সব বস্তু দেখিতে পাই সে সবই বিজ্ঞানের প্রকাশ। বিজ্ঞানের বাহিরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

বস্তুতন্ত্রবাদী বলেন যে বস্তুর অস্তিত্ব কোন মানসিক ক্রিয়া বা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। এই জগৎ জ্ঞাতার আবির্ভাবের পূর্বে ছিল এবং আপন নিয়ম অনুসারে চলে। মানুষ নিজেই জগতের অংশ, তার মন প্রকৃতির পরিণাম, অতএব জগৎ মনের উপর নির্ভরশীল নয়। বস্তু বিজ্ঞানপ্রসূত বা তাহার প্রকাশ—এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত।

হেগেল বলেন, এক অখণ্ড চৈতন্য প্রকৃতি ও আত্মার আধার। ঐ অখণ্ড চৈতন্যের দুইভাবে প্রকাশ—একদিকে প্রাকৃতিক ঘটনা ও অপর-দিকে প্রত্যক্ চৈতন্যের ক্রমবিকাশ। এই জন্য সব ক্ষেত্রেই দুটি বিপরীত ভাবের উদয় দেখা যায়, কিন্তু ঐ দুই ভাব (thesis & antithesis) উচ্চতর সমন্বয়ে মিলিত হয় (synthesis)। অখণ্ড চৈতন্য প্রকৃতি ও আত্মার সমন্বয়-রূপে প্রতিভাত।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য দর্শনের এইরূপ অবস্থা ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষভাগে ঐ নব দৃষ্টিসম্ভূত দার্শনিক মতবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে বার্গসোঁ এই মত ব্যক্ত করেন যে বিচারবুদ্ধি (reason) কখনও সক্রিয় সত্যের আবিষ্কার করতে পারে না। বিচারবুদ্ধি বস্তু বা বিষয়কে খণ্ড খণ্ড আকারে পরিণত করে ও যে সত্যের সন্ধান পায় তাতে প্রাণের স্পন্দন মেলে না, নিছক জড়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণশক্তির

প্রবাহ রুদ্ধ বা প্রতিহত হলে কখনও জীবনের সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বিচারবুদ্ধির সমগ্র দৃষ্টি নাই, অতএব তা ত্যাগ করে স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যে প্রাণের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

ইতালীয় দার্শনিক ক্রোসে-ও স্বজ্ঞার সার্থকতা স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর দৃষ্টিতে কলা সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার সৃজনী শক্তির প্রতি অবহিত হয়ে সত্তার বাস্তবরূপ উপলব্ধি করতে হবে। কালপ্রবাহে চিৎপদার্থের পরিবর্তনে ঐ সৃজনী শক্তির নানা রূপের উদ্ভব হয়।

ইংলণ্ডের বার্ট্রাণ্ড রাসেল যুক্তিবাদের বিরোধী নন। তিনি বস্তুতন্ত্রবাদী কিন্তু বস্তু ও মন এই দুই পৃথক সত্তার অনুমান না করে ঘটনা-প্রবাহের অন্তর্গত বিষয়গুলির বিভিন্ন সম্বন্ধে মন ও বস্তুরূপে প্রকাশ অনুমোদন করেন। তাঁর পূর্বে আবনষ্ট মাক্ ঠিক অনুরূপ তথ্যের সমর্থন করেন। তাঁর মতে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়গুলি পারস্পরিক সম্বন্ধে বস্তু বা পদার্থরূপে প্রতিভাত ও দর্শকের সম্বন্ধে মানসিক ঘটনারূপে প্রকাশিত।

রাসেল অনেকবার তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের সমন্বয় স্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর চরম কৃতিত্ব দেখা যায় তাঁর নূতন তর্কশাস্ত্রের প্রণয়নে। তিনি পুরাতন তর্ক-বিজ্ঞানের অসারতা দেখিয়ে নব তর্কশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।

আমেরিকার ডিউই (Dewey) তর্কশাস্ত্রের একটা নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আরিষ্টটলের পদ্ধতিতে ন্যায় বিচার মানুষের কর্মক্ষেত্রে নিষ্ফল। অতএব ন্যায় বিচার বা তর্কের একটা নূতন রীতি অনুসরণ করা দরকার। অর্থাৎ তর্ক পরীক্ষামূলক (experimental) হওয়া চাই। কোন সত্য মানিয়া লওয়া চলে না। যাহা আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রকট তাহার উপর নির্ভর ক'রে বিচার বিবেচনা করা দরকার। অভিজ্ঞতা (experience) মানস নয়। আমাদের কর্মধারায় অভিজ্ঞতা আসে ও পথপ্রদর্শক হয়। বিচারবুদ্ধি (reason) কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নয়। যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হয় তখনই reasoning or thinking অর্থাৎ বিচার-বিবেচনার আবশ্যক হয়। সত্য-মিথ্যা-নির্ধারণ এই বিচারের সার্থকতার উপর নির্ভর করে।

ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে বিজ্ঞানবাদের যথেষ্ট প্রসার দেখতে পাওয়া যায়। কাণ্ট ও হেগেলের পর ব্রাডলি, বোসাঙ্কে, গ্রীন প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বিচারবুদ্ধিকে জ্ঞানার্জনের ধ্রুব উপায় বলেছেন। এই জগৎ Spiritual বা বিজ্ঞানাত্মক। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন বিষয়েই আস্থা থাকে না, কারণ দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সমস্তই দ্বন্দ্বাত্মক। সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন হয় Absolute বা অক্ষর চৈতন্যে। ব্রাডলির এই মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় (immediate expericence) বিভিন্ন বস্তুর একত্র সমাবেশ-জনিত একটা অখণ্ড সত্তার আভাস পাওয়া যায়। Absolute বা অক্ষরে সমস্ত বস্তুর রূপান্তর (transformation) হয়, এই মত ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তিনটি বিভিন্ন মতের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। জার্মানীর হুজেরলের Phenomenology বা সাক্ষাৎরূপতত্ত্ব, হাইডে-গারের Existentialism বা অস্তিমানতাতত্ত্ব এবং ভিয়েনার কার্নাপের Logical Positivism বা বিধিবদ্ধ দৃষ্টতথ্যবাদ।

হুজেরলের (Husserl) সিদ্ধান্ত এই যে

অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। পূর্বতন দার্শনিকরা ঐ দুটিকে পৃথক কোঠায় রেখে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু পৃথক শ্রেণীভুক্ত নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বিষয়াত্মক। ব্রেনটানো ও মাইনং অনুরূপ মত প্রচার করেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়া বস্তুকে অবলম্বন করে চলে, অতএব বস্তুহীন মানসিক ক্রিয়া সম্ভব নয়। হুজেরল বলেছেন অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তুকে একত্রে নিতে হবে (bracketed together)। আমাদের সংজ্ঞান কেবলমাত্র চেতনাপ্রবাহ নয়। বিষয়-বস্তু-সমন্বিত অভিজ্ঞতার আধার। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে যদি ঐ অভিজ্ঞতার যথার্থ রূপ নির্ণয় করতে পারি। যখনই আমরা বাক্যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকি তখনই ভাষার প্রভাবে ঐ অভিজ্ঞতার বিকৃতরূপ পাই। এই মত আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। প্রাচীন নৈয়ায়িকরা জ্ঞান ও ভানের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। ভান একটা অখণ্ড চৈতন্য যেটা সাক্ষাৎ তথ্যরূপে প্রতীত হয়। ভাষায় যখন ঐ তথ্য সম্বন্ধে কোন উক্তি করা হয় তখন উহা খণ্ডিত হয় অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্য ও প্রমেয়চৈতন্য বা জ্ঞাত ও জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হয়। অখণ্ড চৈতন্য জ্ঞানের আধার হয়ে পড়ে। অখণ্ড অভিজ্ঞতাকে কোন তর্কের আওতায় আনা যায় না। সেটা একটা তথ্যমাত্র, যাহার আধারে জ্ঞানের উদ্ভব হয়।

হুজেরল বলেছেন অভিজ্ঞতা বিষয়াত্মক অর্থাৎ প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই বস্তুমুখী। অতএব তত্ত্বনির্ণয়কালে ঐ তথ্যের অবিকৃত রূপ দেখান একমাত্র উপায়। কাজেই তাঁর অনুসন্ধান-রীতিকে descriptive বলা হয়েছে. অর্থাৎ সাক্ষাৎ রূপের বিশ্লেষণ। এই জগৎ ভিন্ন সত্তা নয়, আমরা জগতের অংশ ও আমাদের অভিজ্ঞতা জগতের অন্তর্গত। এই কারণে হর্ষবিষাদ, ভয়ভাবনার অভিজ্ঞতা হয়।

অস্তিমানতাতত্ত্ব—আমাদের অস্তিত্ব জগতের অস্তিত্ব থেকে ভিন্ন নয়। হুজেরলের এই অভিমত তাঁর শিষ্য হাইডেগারকে (Heidegger) প্রভাবিত করে। তিনি মানুষের বিদ্যমানতার সমস্যাসমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। "আমি আছি"—এর অর্থ কি? ফরাসী দার্শনিক দেকার্ট বলেছেন যে আমি মননশীল, অতএব আমি আছি। মননশীলতাই আমার অস্তিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু তিনি ব্যক্তিবিশেষ বা আমার নিজের অস্তিত্ব জগতের সম্বন্ধযুক্ত নয়, এই মত ব্যক্ত করেন। আমি আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তাঁকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। দেকার্টের যুক্তি খণ্ডন ক'রে অস্তিমানতাতত্ত্ববাদী বলেন যে আমার অস্তিত্ব একটা সত্তায় (Being) অধিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, আমার অস্তিত্ব কোন মৌলিক উপকরণে গঠিত একথা বলা চলে না, কারণ আমি আমাকে অতিক্রম করে বর্তমান থাকি। "আমি এই" একথা বলা চলে না। কারণ আমার অস্তিত্বের বিকাশ সময় বা কালসাপেক্ষ। কালের প্রবাহে আমার অস্তিত্বের বিকাশ। আমি নানাভাবে ও নানারূপে নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধি করি। সম্ভাব্য বাস্তবিকতার পূর্বগামী (possibility precedes actuality)।

এই জগতে আমার অস্তিত্ব এমন নিবিড় ভাবে জড়িত যে আমি পৃথক সত্তায় বিধৃত বা সমাহিত এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতএব দেকার্টের নিঃসঙ্গ জীবাত্মার মত আমার অস্তিত্ব

কল্পনা করা অলীক। মানুষের অস্তিত্বকে ব্যাপিয়া এক বিরাট সত্তা (Being) আছে। মানুষের অতিবর্তন (transcendence) ঐ সত্তার পরিচায়ক।

মানুষ এক শূন্যতার সম্মুখীন হওয়ায় ভয়-ভাবনার উদয় হয়। ভয়ভাবনা (anxiety) শূন্যতার (nothing) পরিচায়ক। জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় হর্ষবিমর্ষ, দুর্ভাবনা প্রভৃতির অনুভূতি হয়।

Dasein (is there)—মানুষের অস্তিত্ব যে অতিবর্তী (transcendent) তারই স্বাক্ষর। এই অতিবর্তন সম্ভাব্যসমূহের একটা সুসম্বদ্ধ গঠনরূপে প্রকাশিত। কিন্তু হাইডেগার ব্যক্তি-বিশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নির্বাক। কির্কেগার্ড (Kierkegaard) অস্তিমানতাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করেন। তিনি প্রতি মানুষের অস্তিত্ব ও তার স্বাধীনভাবে কাজ করার ওপর জোর দেন। কিন্তু হাইডেগার মানুষের অস্তিত্বকে কাল-প্রবাহের (Time) অন্তর্গত জেনে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যের (possible) একটা ক্ষেত্ররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। "এখন দুটো বেজেছে"—এই উক্তিতে "এখন" এই শব্দের অর্থ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মিলিত রূপ।

জার্মানীতে আর একজন বিখ্যাত অস্তি-মানতাতত্ত্ববাদী কার্ল জ্যাসপার্স (Karl Jaspers) "পরা" সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে পরা সত্তার (transcendent Being) সাংকেতিক লিপি (Cypher script) এই দৃশ্যমান জগৎ (phenomenal world)। ধর্ম বা চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধীয় প্রতীকগুলি ঐ সাংকেতিক লিপির অনুরূপ। প্রতীক মাধ্যমে পরা সত্তার ও আমার অস্তিত্বের লেনদেন সম্ভব হয়। প্রতীক মানুষের যে সব ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করে তাতে পরা সত্তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

ফ্রান্সে গ্যাব্রিয়েল মার্শেল ও জঁা পল সার্টার (Gabriel Marcel & Jean Paul Sartre) অস্তিমানতাবাদী। মার্শেল বলেন যে বর্তমান কালে মানুষ নিজেকে কতকগুলি বৃত্তির (function) সমষ্টি মনে করে। বাস্তব সত্তার কোন চেতনাই তার নাই। কিন্তু কতকগুলি জৈব, সামাজিক ও মানসবৃত্তির সমষ্টি কোন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত নয় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষের জীবনকে শূন্যময় করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের সত্তা পরা সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। এই কথা স্মরণ করে আমরা মানুষের জীবন-রহস্য বুঝতে সক্ষম হব।

কিন্তু সার্টার কর্মরত মানুষের কর্মের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মই মানুষের সত্তার পরিচায়ক। সার্টার কোন পরম সত্তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে জীবনধারণ মৃত্যুবরণ করার একমাত্র নিশ্চিত উপায়, এটা আমাদের অবিদিত নয়। কর্ম করে জীবনধারণ করতেই হবে যদিও অবশেষে মৃত্যুবরণ অনিবার্য।

Transcendence বা অতিবর্তনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন বিপ্লব (revolution)। যে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে তাকে অতিক্রম ক'রে মানুষ বেঁচে থাকে। পুরাতনের আওতায় থেকে জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। বিধিব্যবস্থা মানুষের জন্য, মানুষ বিধিব্যবস্থার দাস নয়। মানুষের অস্তিত্বের বিকাশ অতিবর্তন-প্রথায় হয়ে থাকে। মানুষ জীবনের মূল্য সৃষ্টি করার স্বাধীন কর্তা।

এখন আমরা বিধিবদ্ধ দৃষ্টতথ্যবাদের আলোচনা করব। ফরাসী দার্শনিক কম্‌ৎ (Comte) দৃষ্টতথ্যবাদ (positivism) প্রচার করেছিলেন। তিনি মানুষের জীবনবিকাশের

কয়েকটি স্তর ঐতিহাসিক দৃষ্টি অনুসারে ভাগ করেছেন। প্রথমে ধর্মসম্বন্ধীয় আচারব্যবহার ও অন্ধবিশ্বাস, পরে তত্ত্ববিচার সম্বন্ধে বিভিন্ন কল্পনাবিলাস, এবং অবশেষে বিজ্ঞানচর্চা ও প্রত্যক্ষ তথ্য অনুসরণ ক'রে যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি-স্থাপন। বিজ্ঞানের জন্ম ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান দৃষ্টতথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অবস্থাতে দৃষ্টতথ্যবাদের (positivism) জন্ম হয়। বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী ছিল। তত্ত্ববিচারও কল্পনায় সীমিত ছিল। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে মানুষ প্রত্যক্ষ তথ্য অন্বেষণে আগ্রহী হয়।

কিন্তু এই অর্থে আজকাল positivism শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। দৃষ্টতথ্যবাদের অর্থ—যে প্রত্যক্ষ ঘটনার ভিত্তিতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তার বিচার করা। হিউম (Hume) প্রথমে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জ্ঞানের উপাদানকে impression (এখনকার ভাষায় sense data) বলেছেন। আমাদের জ্ঞানের দুটি বিভাগ আছে—(১) আমাদের ধারণাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধীয় জ্ঞান (২) প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রথমটিতে কেবলমাত্র সমানার্থক শব্দযোজনা (tantology) আছে, এই কথা উইতেনষ্টাইন (Wittgenstein) বলেছেন। তর্কশাস্ত্রের মীমাংসাগুলি ও গণিত-শাস্ত্রের হিসাবগুলিতে ঐরূপ শব্দযোজনা দেখা যায়। তর্কশাস্ত্রের ক = ক এবং গণিতে ৭ + ৫ = ১২ উহার উদাহরণ। এই সব ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার হয় না, বস্তুর সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু কাণ্ট বলেছেন যে জ্ঞানের প্রসার হয়, যেমন ৭ + ৫ = ১২, '১২' —'৭' বা '৫' নয়, এ দুয়ের যোগফল। কিন্তু এই মত সমর্থিত হয়নি, কারণ '৭' এর অর্থ সাতবার '১', '৫'এর অর্থ পাঁচবার '১' ও '১২'র অর্থ বারোবার '১'। অর্থাৎ একেরই পুনঃ পুনঃ গণনা।

Wittgenstein-এর মতে প্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। 'Facts' বা প্রত্যক্ষ বিষয়সমূহ বিচ্ছিন্ন, পরমাণুবৎ (atomic) এবং উহাদের সম্বন্ধ ভাষায় প্রকাশ করার কয়েকটি রীতি তিনি দেখিয়েছেন। Russell এই মত অনুসরণ ক'রে প্রত্যক্ষ বিষয়, যেমন "লাল পোচড়া," "এইত এখন," "ওখানে শব্দ," শব্দ যোজনায় ব্যক্ত করার পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Principia Mathematica-তে তিনি গণিতশাস্ত্রের নৈয়ায়িক ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছেন।

ঠিক এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মরিজ স্লিক (Maurtiz Schlick) ও রুডলফ কার্নাপ (Rudolf Carnap) বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। কার্নাপের প্রধান উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য একটা ভাষার কাঠাম প্রস্তুত করা। তিনি Russell-এর মত sense data language অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ভাষা গঠন না ক'রে বিজ্ঞান যে ভাষায় তার অনুসন্ধান করেছে তার নিয়মগুলি নির্ণয় করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ প্রকাশের ভাষা সৃষ্টিতে অনেক অসুবিধা আছে। সেইজন্য যে সব শব্দ বস্তুকে বোঝায় সেইসব শব্দকে মৌলিক শব্দরূপে প্রয়োগ ক'রে পদবিন্যাস সুসঙ্গত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কার্নাপ ভাষার বিশ্লেষণ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। একদিকে ভাষার আকৃতি (form) গঠন করার উদ্দেশ্য, অপর দিকে যে সব বস্তু শব্দের দ্বারা লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে আমাদের পদরচনা সার্থক হয়েছে

কি না তার বিচার করা। প্রথমটি Syntax বা বাক্যরচনার বিধি ও দ্বিতীয়টি Semantics বা শব্দার্থবিদ্যা। যদি বলা যায় "পরমতত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ" —এই বাক্যে (Sentence or proposition) বস্তুর কোন নির্দেশ নেই কারণ "পরমতত্ত্ব" বা "পূর্ণাঙ্গ" শব্দমাত্র, কোন প্রত্যক্ষবস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। অতএব "পরমতত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ" এই বাক্যের প্রতিপাদন (verification) সম্ভব নয়। যদি কোন বাক্য বা পদ প্রতিপন্ন করার কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সেই বাক্য অর্থশূন্য (meaningless) এবং পরিত্যাজ্য।

এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে কার্নাপ সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নগুলিকে নিরর্থক বলে বাতিল করে দিয়েছেন। দর্শন-শাস্ত্রের কোন ভিত্তি নেই। ঐ শাস্ত্রের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক বাক্যগুলির নব তর্কশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বিশ্লেষণ করা। (logical analysis of scientific propositions)।

মরিচ স্ক্লিক বস্তুতন্ত্রবাদ ও দৃষ্টতথ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। বস্তুতন্ত্রবাদ (realism) বহির্জগতের বাস্তবতা স্বীকার করে। বস্তুর বাস্তবতা মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। দৃষ্টতথ্য-বাদ (positivism) ঐ বাস্তবতার (reality) কোন অনুসন্ধান করে না। ইহার দৃষ্টিতে বিজ্ঞানই (Science) একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য, কারণ বিজ্ঞানের বিচার দৃষ্টতথ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়। যে কোন সত্য প্রতিপাদন করার একমাত্র উপায় দৃষ্টতথ্যের আধারে সত্যের পরীক্ষা করা।

ইংলণ্ডের এ, জে, আয়ার (A. J. Ayer) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *Language, Truth and Logic* লিখে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এই পুস্তকে তিনি তত্ত্বশাস্ত্র (metaphysics) বাতিল করেছেন, কারণ তত্ত্ববিষয়ক সকল প্রশ্নই নিরর্থক। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রধান ভ্রান্তি ভাষাগত। চলতি ভাষায় বলা হয় পাথর আছে, লোহা আছে। যদি এইভাবে বলা যায় আত্মা আছে, তাহলে "আছে" এই শব্দের অর্থ কি পাথর "আছে" বললে যে অর্থ হয় তার অনুরূপ? পাথর আছে অর্থাৎ দেশকালসমন্বিত এক বস্তু যা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। কিন্তু "আত্মা আছে" বললে সেই অর্থ হয় না।

আয়ার বাক্য বা পদের (proposition) বিশ্লেষণ করেছেন নূতন বিধি অনুসারে। যদি "এটা লাল", "ওটা হলদে" এই দুই মৌলিক বাক্য (basic or protocol propositions) লওয়া যায়, তাহলে 'এটা লাল অথবা ওটা হলদে" এই যুগ্ম বাক্যের অর্থ হবে—"না-লাল এবং না-হলদে" এই বাক্যের নিরসন, অর্থাৎ ঐ যুগ্ম বাক্য মিথ্যা হবে যদি "এটা লাল" এবং "ওটা হলদে" দুই বাক্যই মিথ্যা হয়। পুনরায় ঐ যুগ্ম বাক্য সত্য হবে যদি (১) "এটা লাল", "ওটা হলদে" দুটো বাক্যই সত্য হয় অথবা (২) যদি "এটা লাল" সত্য হয় এবং "ওটা হলদে" মিথ্যা হয়, অথবা (৩) যদি "এটা লাল" মিথ্যা হয় এবং "ওটা হলদে" সত্য হয়।

কোন পদ (proposition) সত্য বা মিথ্যা তা নির্ণয় করতে হলে প্রত্যক্ষ বিষয়ের আধারেই করতে হবে। আমরা সেই বাক্যকে সত্য বলি যার প্রত্যক্ষবিষয়ের সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু যদি কোন বাক্য প্রত্যক্ষতথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে সেই বাক্য বর্জন করা চলে না, যদি তার প্রতি-পাদনের (verification) কোন সম্ভাবনা থাকে। একটি পদ verified না হলেও verifiable হতে পারে, অতএব উহা পরিত্যাজ্য নয়। "মৃত্যুর পর আত্মা থাকে" এই বাক্য প্রত্যক্ষ-তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়, কিন্তু যদি ভবিষ্যতে কোন প্রত্যক্ষতথ্য পাওয়া যায় তাহলে ঐ বাক্য মিথ্যা বা অর্থহীন বলা চলে না।

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য

(স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)*

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূঃ—রজ্জুস্বরূপ শ্রবণের দ্বারা যেরূপ সর্পভ্রান্তি দূর হয়, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণের দ্বারাই যদি সেরূপ সংসারিত্ব-ভ্রান্তি দূর হইত, তবে তোমার কথা মানিতাম। পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়াও, দেখিতেছি লোকের সুখদুঃখ ও সংসারধর্ম থাকিয়াই যায়। আবার দেখ, শাস্ত্রেও এই জন্যই শ্রবণের পরে মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ করিয়াছে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মকে কর্ম বা উপাসনা বিধির শেষ ফল হিসাবেই শাস্ত্রে উপপাদন করা হইয়াছে।

উঃ—না। কর্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে বিলক্ষণ তাহা বলিয়াছি। কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ কর্ম, তাহাদেব ধর্ম বলে, তাই সূত্র হইয়াছে "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা।" হিংসাদি অধর্ম পরিহর্তব্য, এ হিসাবে অধর্মও জিজ্ঞাস্য। উক্ত অর্থ ও অনর্থ নামক ধর্মাধর্মের ফল প্রত্যক্ষ সুখ ও দুঃখ যাহা ব্রহ্মা হইতে স্থাবর সমস্ত জীব বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগে শরীর বাক ও মনের দ্বারা উপভোগ করিয়া থাকে। এরূপ শুনা যায় যে মনুষ্য হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত ব্যক্তিভেদে সুখের তারতম্য আছে। সুতরাং সুখের মূলকারণ ধর্মেরও তারতম্য আছে। ধর্মের অল্পাধিক্য হেতু বুঝা যায় যে অর্থিত্ব (কামনা) ও সামর্থ্যেরও অল্পাধিক্য আছে। সেই জন্যই শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের বিদ্যাসমাধিবিশেষ-সামর্থ্যে (চিত্তস্থৈর্যের সামর্থ্যের যোগে) উত্তরপথে যাইবার কথা (দেবযানমার্গে) আছে। আবার শুধু ইষ্টাপূর্ত ও (ধনদানাদি) দত্তকর্মকারীদের ধূমাদি-ক্রমে দক্ষিণাপথে (পিতৃযান) গমনের কথা আছে। সেখানেও সুখের অল্পাধিক্য ও সেই কারণে সুখ-প্রাপক কর্মেরও অল্পাধিক্য আছে। ইহা "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা' (যে পর্যন্ত ধর্মফল থাকে সে পযন্ত বাস করিয়া) এই বাক্য হইতে জানা যায়। মনুষ্য, নারকী জীব ও নিকৃষ্ট স্থাবর সকলেই অল্প হইলেও সুখভোগ করিয়া থাকে এবং উহা তাহার ধর্ম বা বৈধকর্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। অন্যপক্ষে, ঊর্ধ্বলোকস্থ বা অধোলোকস্থ প্রত্যেক শরীরীর ই অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখ আছে। ইহার কারণ বিধি বিরুদ্ধ কর্ম (অধর্ম) এবং কর্মীদের তারতম্য। এই প্রকারে, অবিদ্যাদি (অবিদ্যা, কাম, কর্ম, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ) দোষ-দুষ্ট শরীরীদের ধর্মাধর্মের অল্পাধিক্য হেতু সুখদুঃখ-তারতম্যপূর্ণ অনিত্য সংসারভোগ ঘটিয়া থাকে। ইহা শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। তথা শ্রুতি "সশরীর পুরুষের প্রিয় আর অপ্রিয়ের হাত হইতে নিস্তার নাই"—এই কথা বলিয়া পূর্ববর্ণিত সংসারের রূপ বলিয়াছেন। আবার "অশরীর পুরুষকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না"—এই শ্রুতিবাক্য অশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-স্পর্শ নিষেধ করিয়া জানাইতেছে যে, মোক্ষনামক অশরীর-ভাব চোদনা-লক্ষণ ধর্মের কার্য বা উৎপাদ্য নহে। ধর্মের উৎপাদ্য প্রিয় ও অপ্রিয়, পুণ্য ও পাপ। উহাদের প্রতিষেধ নহে। অশরীরত্ব ধর্মের দ্বারা উৎপাদ্য নহে,

* অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

কোন কিছুর দ্বারাই উৎপাদ্য নহে, কেননা উহা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। যথা শ্রুতি—

"অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥"

"অপ্রাণো হি অমনাঃ শুভ্রঃ," "অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ।" অতএব অশরীরত্ব রূপ মোক্ষ-ফল নিত্যসিদ্ধ, কোন অনুষ্ঠানের ফল নহে।

পূঃ—ভাল, নিত্য বলিতে বাধা কি? বিকারশীল হইলেও, অল্পাধিক্য হইলেও যদি বস্তুকে চিনিতে পারা যায়, তবে ত নিত্যই হইল। যেমন, পৃথিব্যাদিকে জগন্নিত্যতাবাদিগণ পরিণামী অথচ নিত্য বলেন, যেমন সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

উঃ—মোক্ষাখ্য অশরীরত্ব সেরূপ নহে। ইহা সর্বপ্রকার বিকাররহিত, ব্যোমবৎ সর্বব্যাপী, নিত্যকূটস্থ, পারমার্থিক, নিরবয়ব, স্বয়ংজ্যোতি, নিত্যতৃপ্ত—যাহাতে ত্রিকালে ধর্মাধর্ম ও তাহার ফল পুণ্যপাপ বা প্রিয়াপ্রিয় বা সুখদুঃখ সম্ভাবিত হয না। যথা শ্রুতি "অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্র অধর্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ" (ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে ভিন্ন, পুণ্যাপুণ্য হইতে ভিন্ন, ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন) বক্ষ্যমাণ জিজ্ঞাসা. সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে। সুতরাং যদি শাস্ত্রে কর্তব্যবিশেষ-উৎপাদ্যরূপে ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে অনুষ্ঠানসাধ্য বলিয়া মোক্ষফল নিশ্চয়ই অনিত্য হইবে। কেননা উপরি-উক্ত বর্ণনা অনুসারে কর্মফলের নানারূপ অল্পাধিক্যের মধ্যে বড়জোর মোক্ষ একটি অধিক উৎকৃষ্ট কর্মফল মাত্র। কিন্তু সমস্ত মোক্ষবাদিগণ বলেন যে মোক্ষ এরূপ নহে। ইহা নিত্য একরূপ। অতএব কর্তব্য-উৎপাদ্য হিসাবে ব্রহ্মের উপদেশ যুক্তিসঙ্গত হয় না।

তাছাড়াও দেখ শাস্ত্রে কি বলিয়াছে। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে", "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি", "অভয়ং বৈ জনক। প্রাপ্তোঽসি", "তদাত্মানমেবা-বেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ", "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"—এই সমস্ত শ্রুতির মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষ পাওয়ার কথা বলিয়াছে. মধ্যে তৃতীয় কোন কার্যান্তর নাই। তথা "বামদেব ঋষি আত্মজ্ঞানের পর বুঝিয়া-ছিলেন, আমিই মনু, আমিই সূর্য হইয়াছিলাম" ইত্যাদি, আরও শ্রুতি-বলে জানা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞান ও সর্বাত্মভাবের মধ্যে তৃতীয় কোন কার্যান্তর নাই। 'যেমন দাঁড়াইয়া গান করিতেছে' বলিলে স্থিতির ক্রিয়া ও গান করার মধ্যে তৃতীয় কার্যান্তর না-থাকা বুঝা যায়, ইহাও সেইরূপ। "তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপার দর্শন করাইতেছ। হে ভগবন্, আমি ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। হে ভগবন্, আমি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত, আপনি আমাকে শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন। ভগবান সনৎকুমার সেই মৃদিতকষায় অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে অজ্ঞানের পরপার দেখাইলেন"—এই সকল শ্রুতি মোক্ষের প্রতিবন্ধ যে অজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তিটিকেই আত্মজ্ঞানের ফল দেখাইতেছেন। একথা আচার্য গৌতমের ন্যায়োপবৃংহতি সূত্রেও আছে। যথা "দুঃখজন্ম-প্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদ-নন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (মিথ্যাজ্ঞান—রাগদ্বেষাদি দোষ-প্রবৃত্তি-জন্ম-দুঃখ এইভাবে পরপর অপায়ের মানে নাশের দ্বারা অপবর্গ হয়)। ব্রহ্মাত্মৈক্য-

বিজ্ঞান দ্বারা এই মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে।

এই ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞান সম্পৎ-উপাসনা নহে। যেমন "মন অনন্ত, বিশ্বদেব অনন্ত, সুতরাং মনকে উপাসনা করিলেই প্রসিদ্ধলোক জয় করা যায়।" ইহা অধ্যাস উপাসনাও নহে। যথা "মনই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবে" "আদিত্যই ব্রহ্ম, এইরূপ উপদেশ আছে।" ইহা বিশিষ্টক্রিয়াসাদৃশ্য-রূপ সম্বর্গ-উপাসনা নহে। যথা "বায়ু সংবরণ করেন বলিয়া সম্বর্গ। প্রাণও সংবরণ করেন বলিয়া সম্বর্গ।" জীব ও ব্রহ্মের একাত্ম-জ্ঞান এরূপ বিশিষ্টক্রিয়া-সাদৃশ্য-রূপী নহে। হবি-সংস্কার, যেমন যজ্ঞ-কার্যের অঙ্গ, জীব-ব্রহ্ম-ঐক্য-ব্যাপার সেরূপ কর্মাঙ্গ সংস্কাররূপী নহে। ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানকে উপরোক্ত সম্পৎ কি অধ্যাস কি কর্মাঙ্গসংস্কার-রূপে, যে-কোন ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে, "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই সব শাস্ত্রবাক্য যাহারা ব্রহ্ম এবং জীবের অভেদত্ব প্রতিপাদন করে, তাহাদের উপর পীড়নকরত ঐরূপ অর্থ বাহির করিতে হয়। অপিচ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"—এই বাক্যে যে অজ্ঞাননিবৃত্তি-ফলের কথা আছে তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—এই বাক্য দ্বারা যে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সম্পদাদি-পক্ষে এইরূপ অর্থের সামঞ্জস্য করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞান সম্পদাদি-রূপ নহে। আরও বুঝা যায় যে ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষতন্ত্রাধীন নহে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে ভৌতিক বস্তু, সেই বস্তুবৎ বস্তু-তন্ত্রাধীন। এবম্ভূত যে ব্রহ্ম এবং তৎজ্ঞান, সেখানে কর্মের অনুপ্রবেশ কল্পনাই করা যায় না।

পূঃ—বটে, তবে বিদিক্রিয়াটি কি ক্রিয়া নহে? উপাসনা-ক্রিয়া বা উপাস্তি-ক্রিয়া কি মানস-ক্রিয়া নহে?

উঃ—বিদিক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। যথা "ব্রহ্ম বিদিত হইতেও আলাদা, অবিদিত হইতেও আলাদা", "যেনেদং সর্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ।" উপাস্তি ক্রিয়া বা উপাসনারূপ মানসক্রিয়ার দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না। যথা "তিনি বাক্যের দ্বারা উক্ত হন না, অথচ বাক্য তাঁহার দ্বারা উদিত হয়," "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদি-দমুপাসতে" (তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, যিনি ইদন্তা-রূপে উপাসনার যোগ্য হন না)।

পূঃ—ব্রহ্মকে যদি একেবারে অবিষয় বলিয়া বর্ণনা করিতে চাও, তবে তাঁহাকে শাস্ত্রমুখে জানার বিষয় বলিবে কেন?

উঃ—শাস্ত্র ইদন্তা-রূপে ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না। শাস্ত্র শুধু অবিদ্যাকল্পিত ভেদকে নিরাস করে। শাস্ত্র প্রমাণ করে যে, প্রত্যগাত্মা অবিষয়, ব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মা অভেদ। অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের কোনই ভেদ নাই। তিনই এক। তথাচ শাস্ত্র—"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥" (যে বলে জানি না সেই জানে, যে বলে জানি সে জানে না), "ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেৎ ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ। ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" (চক্ষুর দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শোনা যায় না, জ্ঞাতার বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না)। অতএব অবিদ্যা-কল্পিত সংসারিত্বের নিবর্তন হইলেই (জ্ঞানের দ্বারা) নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইবেন। মোক্ষস্বরূপে তাই অনিত্যত্ব-দোষ পড়ে না।

যদি মোক্ষ কোনও উৎপাদ্য ব্যাপার বা বিকার্য ব্যাপার হইত, তবে বলিতে পারিতে যে

কায়িক বাচিক বা মানসিক কোন-না-কোন কার্য দ্বারা ইহা হইয়াছে। সে পক্ষে মোক্ষকে অনিত্য বলিতে নিশ্চয়ই পারিতে। উৎপাদ্য ঘটাদি বস্তু বা বিকারশীল দধ্যাদি বস্তুকে কেহ কখনও নিত্য হইতে দেখে নাই। ইহা কোন প্রাপ্তির ব্যাপার নহে যে পূর্বে ছিল না, পরে পাইলাম। স্বাত্মস্বরূপ পূর্ব হইতেই ছিল ও আছে, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তি ক্রিয়ার ফল হইবে না। যদি ধরাও যায় যে ব্রহ্ম স্বাত্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্ত, তথাপি যেহেতু ব্রহ্ম সর্বগত, সেজন্য আকাশের মত তিনি সর্ববস্তু প্রাপ্ত হইয়াই রহিয়াছেন। মোক্ষ বা ব্রহ্মকে সংস্কার্য ক্রিয়াফল হিসাবেও লইতে পার না। কেননা, সংস্কার-ক্রিয়া বল কাহাকে? না বস্তুতে যখন কোনও গুণ চড়াই বা ঘর্ষণ দ্বারা কোন দোষ দূর করি। ব্রহ্ম সর্বাধার, (আধেয় নহেন সুতরাং তৎবহির্গত কিছুই নাই) সুতরাং তৎবহির্গত গুণ পাইবে কোথায়? নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মের কোন দোষই নাই। সুতরাং ব্রহ্মকে বা মোক্ষকে সংস্কার্য ফল বলিতে পার না।

পূঃ—যদি বলি, নিত্যমুক্তত্ব বা মোক্ষ, আত্মারই ধর্ম, তবে তাহা আবৃত থাকে, সংস্কার্য ক্রিয়া দ্বারা আবরণ দূরীভূত হয়। যেমন দর্পণ ঘর্ষণের দ্বারা পুনঃ ভাস্বরত্ব লাভ করে।

উঃ—তাহা হয় না। আত্মা কখনও ক্রিয়ার আশ্রয় (অর্থাৎ কর্তা) হন না। যদি ক্রিয়ার আশ্রয় হইতেন, তবে বলিতে পারিতে যে ঘর্ষণ-ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা লাভবান হইলেন। আত্মা ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত হইলে তিনি বিকার্য হইবেন। "অবিকার্যোঽয়মুচ্যতে" ইত্যাদি বাক্য ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বাধিত হয়। তোমার নিশ্চয়ই সে অভিপ্রায় নাই। সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মা কোন ক্রিয়ার আশ্রয় (কর্তা) হইতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, অপরের কৃত ক্রিয়ার দ্বারা অপর ব্যক্তি সংস্কার্য হইতে পারেন, কিন্তু আত্মা সে ক্রিয়ার বিষয় নহে বলিয়া অপরের কৃত ক্রিয়া আত্মার সংস্কার করিবে না।

পূঃ—বাপুহে, স্নানাচমনাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীব শুদ্ধ বা সংস্কৃত হয় না?

উঃ—অবিদ্যাগৃহীত, দেহাদির দ্বারা সংহত আত্মার ওরূপ শুদ্ধি হয়, প্রত্যগাত্মার হয় না। স্নানাচমনাদি ক্রিয়ার আশ্রয় (কর্তা) দেহ, দেহের উপর তাহার ফল। সুতরাং তদ্দ্বারা দেহাত্মবাদী অবিদ্যাগ্রস্ত সংহত জীবের সংস্কার হইতে পারে। যথা, দেহাশ্রিত চিকিৎসা-ক্রিয়ার দ্বারা ধাতুবৈষম্য নিবৃত্ত হইলে দেহাভিমানী জীবেরই আরোগ্য-ফল জন্মে,—"আমি রোগশূন্য হইয়াছি" এতদ্রূপ বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ স্নানাচমনাদি ক্রিয়ার দ্বারা যে বস্তুতে বা দেহাদিতে "আমি শুদ্ধ হইয়াছি" এইরূপ বুদ্ধি জন্মে, সেই দেহাভিমানী সংহত জীবই সংস্কৃত হয়, অপর কেহ নহে। সেই সংহত ও দেহাভিমানী জীবই বা অহংকর্তাই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন করে এবং সেই সব কর্মের ফলভোগ করে। "জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটির একটি ফলভোগ করে, অন্যটি কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করেন"—এই মন্ত্র উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ। "বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত যে অহংকর্তা তাঁহাকেই মনীষিগণ ভোক্তা কহেন"; তথা "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥" (সেই এক দেবতা সমস্ত জীবের মধ্যে মায়া দ্বারা গূঢ়ভাবে থাকেন। তিনিই সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সকলের কর্মের অধ্যক্ষ (সাক্ষী), সর্বভূতের আশ্রয়। তিনিই নির্গুণ, সাক্ষী ও সকলের চেতয়িতা), "স পর্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ং অব্রণং

অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্"—এই দুই মন্ত্র ব্রহ্মের নিত্যশুদ্ধতা, সর্বব্যাপিতা ও অনাধেয়তা (আধেয় নহেন, সর্বাধার) দেখাইতেছে। ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। সুতরাং মোক্ষ সংস্কার্য নহে। সুতরাং ব্রহ্মে বা মোক্ষে ক্রিয়া-প্রবেশের অল্পমাত্রও পথ দেখাইতে পারিবে না। মোক্ষে জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়ার গন্ধমাত্রও প্রবিষ্ট করাইতে পারিবে না।

পূঃ—জ্ঞানও একপ্রকার মানসী ক্রিয়া।

উঃ—না। দেখ ক্রিয়া কাহাকে বলি। যাহা বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে নিরপেক্ষ কিন্তু পুরুষের চিত্ত ও ব্যাপারের অধীন। উদাহরণ দেখ—"যে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি গৃহীত হইবে, বষট্‌কর্তা বা হোতা সেই দেবতার ধ্যান করিবেন", "মনের দ্বারা সন্ধ্যাদেবতাকে ধ্যান করিবে।" ধ্যান, চিন্তন, ইত্যাদি মানস ক্রিয়া। ইহা পুরুষতন্ত্রাধীন, পুরুষ করিলেও করিতে পারে, না-ও করিতে পারে; অন্যথাও করিতে পারে। জ্ঞান বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, বস্তুটি যেরূপ জ্ঞানও সেইরূপ হইবে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রাধীন। এখানে পুরুষ ইচ্ছা করিলে এইরূপ জানিব – নয় জানিব না—নয় অন্যথা জানিব—এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহাকে ক্রিয়া বলিতে পার না। তারপর মানসী। জ্ঞানের মানসত্বেও তফাৎ আছে। "হে গৌতম, পুরুষ অগ্নি, স্ত্রীও অগ্নি"—এই মন্ত্রে পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রতি যে অগ্নিবুদ্ধির নির্দেশ আছে, তাহা মানসব্যাপার বটে, ক্রিয়ার্থ এরূপ উপদেশ বলিয়া ক্রিয়াও বটে আবার পুরুষতন্ত্রের অধীন, যেমন পুরুষ ইচ্ছা করিলে অগ্নিবুদ্ধি করিতেও পারে, নাও পারে আবার অন্যথা করিতেও পারে। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি, তাহার সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই, উহা পুরুষতন্ত্রাধীনও নহে। উহা প্রত্যক্ষের বিষয় যে বস্তু তাহার তন্ত্রাধীন, বস্তু যেমন, তেমন বুদ্ধি—ইহাই জ্ঞান, ইহা ক্রিয়া নহে সমস্ত প্রমাণাদির বিষয় (শুধু প্রত্যক্ষের বেলা নহে) যে বস্তু তাহার বেলায় এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব যথার্থ ব্রহ্ম বা আত্ম-বিষয়ও জ্ঞান, ক্রিয়া নহে। ব্রহ্ম বা আত্মা বস্তুর অধীন, ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিধির অধীন নহে। ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যে কুর্যাৎ শ্রুয়াৎ ইত্যাদি বিধিলিঙের প্রয়োগ থাকিলেও ঐসব বিধি বাস্তবিক প্রযোজ্য হয় না, যেমন প্রস্তরাদির উপরে ক্ষুরের তীক্ষ্ণতা ব্যর্থ হয়, সেই প্রকার অহেয় অনুপাদেয় বস্তুবিষয়ে বিধির কার্যকারিতা ব্যর্থই হইয়া থাকে।

তবে যে শাস্ত্রে বিধিচ্ছায়াবৎ বাক্য আছে, যথা "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", তাহার উদ্দেশ্য স্বাভাবিক বিষয়মুখী প্রবৃত্তিকে বিষয়বিমুখী করা। যে পুরুষ "আমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট যেন না হয়" এইরূপে প্রবৃত্তি-স্রোতে ধাবমান হয়, তাহার এতদ্দ্বারা আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ হয় না, এই আত্যন্তিক পুরুষার্থকামী পুরুষকে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগবশতঃ স্বাভাবিক যে বহির্বিষয়ক প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইতে বিমুখ করিয়া প্রত্যগাত্মস্রোতের দিকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এইরূপ বিধিচ্ছায়া-জাতীয় উপদেশ, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"। আত্মাকে অন্বেষণকারী প্রবৃত্তিকে অহেয় অনুপাদেয় আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, যথা "যাহা কিছু আছে, সবই এই আত্মা," "যখন তাহার এ সমস্তই আত্মা বলিয়া প্রতীত হইবে, তখন সে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? কাহাকে জানিবে," "বিজ্ঞাতাকে কি ভাবে জানিবে" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" যদিও আত্মজ্ঞানে কর্তব্যতা-বোধের প্রাধান্য নাই, (কেননা, হেয়কে দূরীকরণ এবং উপাদেয় অর্জন করার প্রশ্ন নাই, সেহেতু করণীয়ও কিছু নাই), তথাপি যেহেতু আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলে

কৃতকৃত্যতা-লাভের দ্বারা সমস্ত কর্তব্যতা-বোধের হানি হয়, সেজন্য এ সিদ্ধান্ত অস্মদ্‌মতের অলংকারস্বরূপ। তথাচ শ্রুতি, "আত্মানং চেৎ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ইতি" "পুরুষ যখন আপনাকে প্রত্যগাত্মা বলিয়া জানে, তখন সে আর কি ইচ্ছা করিয়া, কাহার তৃপ্তির জন্য এই শরীরের অনুগত হইয়া জ্বর ভোগ করিবে?" তথাচ স্মৃতি, "এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত"—"এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রকৃত বুদ্ধিমান হও ও কৃতকৃত্য হও"; অতএব ব্রহ্ম বা মোক্ষ, বিধির বা ক্রিয়ার বিষয় একেবারেই নহে।

পূঃ—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সম্বন্ধীয় বিধি বা ক্রিয়া-ফল হিসাবে ছাড়া, কেবল বস্তুবাদী বেদভাগ কোথায়?

উঃ—এরূপ বলা যায় না। ঔপনিষদিক পুরুষ বা প্রত্যগাত্মা অন্যশেষ বা ক্রিয়া-শেষ লভ্য ফল নহে। সেই ঔপনিষদিক পুরুষ প্রথম হইতেই বর্তমান, ক্রিয়ার যে চারিটি ফল লভ্য হয় (যথা উৎপাদ্য, বিকার্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য) তাহার প্রত্যেকটি হইতে বিলক্ষণ (পৃথক, স্বতন্ত্র), অসংসারী স্বস্বরূপস্থ হইয়া নিত্য বর্তমান। তাহাকে কেহ "নাই" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। ইহাকে আত্মা বলা হইয়াছে, আত্মাকে কেহ "নাই" বলিতে পারে না। যে "নাই" বলিবে, সে নিজেই যে আত্মা। আবার যে বলিবে, আত্মাকে যখন আমরা সকলেই "অহং" বা "আমি" বলিয়া জানি, তখন উপনিষৎ ছাড়া জানা যায় না, এ কেমন কথা? না, তাহাও বলিতে পার না, কেননা আমি যে এই "আমি"-জ্ঞানের সাক্ষী তাহা আমরা জানিনা, তাহাই উপনিষদ্‌বেদ্য, এবং তাহাই প্রত্যগাত্মা।

অহং-প্রত্যয়ের বিষয় যে কর্তা "আমি", তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তৎসাক্ষী, সর্বভূতস্থ হওয়া সত্ত্বেও এক, কূটস্থ, নিত্যবর্তমান পুরুষকে, সর্বাত্মাকে কর্মকাণ্ডস্থ বিধিজ্ঞানের দ্বারা বা তর্কযুক্তিদ্বারা কেহ জানিতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেও কেহ পারে না, আবার তাঁহাকে কৃতিসাধ্য বলিয়া স্থির করাও যায় না। এই কূটস্থ সাক্ষী আত্মাকে (মুখ্য "আমি"কে) কিছুতেই হান (নষ্ট) করা যায় না, আবার ইঁহাকে বাড়ানো-ও যায় না, সেইহেতু ইনি হেয়-উপাদেয় রহিত। এই মুখ্য-"আমি" ছাড়া সমস্ত বস্তুই বিনাশশীল ও বিকারশীল। এই মুখ্য-আমি বিনাশের কারণ না থাকায় অবিনাশী, বিকারের কারণ না থাকায় নিত্য কূটস্থ, অতএব নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব। সেই-হেতু "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" "সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি"—এইসব বেদান্তবাক্য দ্বারা এই পুরুষকে ঔপনিষদিক বিশেষণে ভূষিত করিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, এই পুরুষকে প্রাধান্যের সহিত উপনিষদেই প্রকাশ করা হইয়াছে। অতঃপর বস্তুপর বেদভাগ নাই, এরূপ ভাষণ দুঃসাহসের কর্ম।

শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ পণ্ডিতগণের বিধান "ক্রিয়া-বিষয়ক বোধ জন্মানই বেদের অর্থ",—ইহা বিধি-নিষেধ-সংক্রান্ত ধর্মজিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গের কথা।

অপিচ, যদি নিতান্তই অক্রিয়ার্থ শব্দের আনর্থক্য অঙ্গীকার কর, তবে কর্মকাণ্ডোক্ত দধি ও সোম প্রভৃতি শব্দেরও আনর্থক্য স্বীকার করিবে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ে অপ্রযোজক দধি সোম প্রভৃতি যদি বেদ ভব্যার্থে (কার্যার্থে) উপদেশ করিতে পারেন, তবে কূটস্থ নিত্য বস্তুর উপদেশ করিতে পারিবেন না কি হেতু?

ক্রিয়ার্থ উপদিশ্যমান বস্তুটি কি ক্রিয়া হইয়া যাইবে? যদি বল, দ্রব্য ক্রিয়া হইবে না কিন্তু তাহা ক্রিয়ার সাধক হইবে, এই জন্য বেদে তাহার উল্লেখ আছে। বেশ কথা। এখন আমার বক্তব্যও তাহাই। বস্তু, ক্রিয়া না হইলেও ক্রিয়ার্থ হইবে অর্থাৎ প্রয়োজন সাধন করিবে। অজ্ঞাত আত্মবস্তুর উল্লেখ বা উপদেশও প্রয়োজনসাধক হইবে। সেই আত্মাকে জানিয়া সংসারহেতু যে মিথ্যাজ্ঞান তাহার নিবৃত্তিই হইতেছে প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে কর্মকাণ্ডীয় বস্তুর ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় বস্তু সমভাবে ক্রিয়ার্থ বা প্রয়োজনসাধক হইতেছে। আর এক যুক্তি দেখ :—"ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ"—এই যে উপদেশ, ইহা না বস্তু, না ক্রিয়া (ক্রিয়ার নিষেধ), কোন ক্রিয়ার সাধকও নহে। ক্রিয়ার বা প্রয়োজনের সাধক হইল না বলিয়া, এই উপদেশকে নিরর্থক বলিয়া গণ্য করা উচিত। অবশ্য কেহই উহাকে নিরর্থক বলিয়া গণ্য করিবে না। এখানে "ন" প্রত্যয় ব্যবহার দ্বারা কোনও ক্রিয়ার সাধকত্ব বা প্রয়োজনের সাধকত্ব বুঝাইতেছে না, শুধু স্বভাব-প্রাপ্ত-হনন-অনুরাগ বিষয়ে নিবৃত্তি বা ঔদাসীন্য বুঝাইতেছে। "নঞ্" প্রত্যয়ের স্বভাব এই যে ইহা স্ব-সম্বন্ধীয়ের অভাব বোধ করায়, এইরূপ অভাব-বোধই তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্যের কারণ হয়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া নিজেই উপশমপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অভাব-বুদ্ধিও ভ্রান্তিমূলক হনন-অনুরাগ নষ্ট করিয়া অবশেষে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না"—ইত্যাদি স্থলে হননক্রিয়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ হননক্রিয়ার প্রতি ঔদাসীন্যই ন-কারের অর্থ। প্রজাপতি-ব্রত প্রভৃতি (এই ব্রতের উপদেশ—উদয়কালের আদিত্যকে দেখিবে না। এস্থলে অভাব-বুদ্ধি খাটিবে না—এই উপদেশ ক্রিয়ার সাধক)। কয়েকটি স্থল ছাড়া প্রায় সর্বত্রই ন-কারের অর্থ নিষেধ। অতএব বুঝিতে হইবে, যাহা পুরুষার্থের অনুপযুক্ত, কেবলমাত্র উপাখ্যান ও অতীত ঘটনার বর্ণনা, তাহাই অনর্থক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

পূর্বে যে বলিয়াছিলেন, "বেদান্তবাক্য-সকলকে কর্তব্যবিধির অন্তগত করিয়া লইতে হইবে। নতুবা 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী'—এইরূপ বস্তুস্বভাব জানিয়া যেমন পুরুষের লাভ বা ক্ষতিনিবারণ হয় না, সেইরূপ বেদান্তবাক্য-সকলকে ক্রিয়ার অঙ্গ বা সাধন বলিয়া লইতে হইবে।" ইহার জবাবও উপরোক্ত বিচারেই রহিয়াছে। অপিচ, তুমিও "ইহা রজ্জু—সর্প নহে" এইরূপ বস্তুমাত্র-কথনের ফল দেখিয়াছ।

পূঃ—বারংবার ব্রহ্মশ্রবণ করিয়াছে এরূপ ব্যক্তিও পূর্বের ন্যায় সংসারী রহিয়াছে। সুতরাং রজ্জু-স্বরূপ কথন তুল্য ব্রহ্মস্বরূপ-কথন হইতে পারে না।

উঃ—শরীরাদিতে অভিমানকারী পুরুষের ব্রহ্মস্বরূপ-শ্রবণের পরও দুঃখভয়াদি সংসারিত্ব দেখা যায়, কিন্তু যে বেদপ্রমাণ-জনিত ব্রহ্ম বলিয়া, নিত্যসিদ্ধকূটস্থ বলিয়া নিজেকে জানিয়াছে, তাহার ঐরূপ শরীরাদিতে অভিমান নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার আর মিথ্যাজ্ঞান-নিমিত্ত সংসারিত্ব তথা দুঃখভয়াদি থাকে না। তুমি কিছুতেই দেখাইতে পারিবে না। "এ ধন আমার" এই-রূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ধনী গৃহস্থের ধনাপহারজনিত দুঃখ হয়, কিন্তু ঐরূপ ধনাভিমানবিহীন ধনী গৃহস্থের ধনাপহার-নিমিত্ত দুঃখ হইবে না। কুণ্ডলধারী পুরুষের কুণ্ডলিত্ব-অভিমানবশতঃ সুখবোধ করিতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যখন কুণ্ডলের সহিত কুণ্ডলিত্ব-অভিমান পরিহার করে, তখন তাহার কুণ্ডল ধারণের সুখ থাকে না। তথাচ শ্রুতি "অশরীরং বাব সন্তং ন

প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—শরীর-অভিমানশূন্য ব্যক্তিকে কি প্রিয়, কি অপ্রিয় স্পর্শ করে না।

পূঃ—ও, শরীর পতিত হইলে তখন অশরীরত্ব হইবে, জীবিতকালে হইবে না, ইহাই বলিতে চাও?

উঃ—না, "আমি শরীর"—এইরূপ মিথ্যা-বুদ্ধিকেই আমি সশরীর বলিয়াছি। শরীরকে "আমি" মনে করি—ইহাই ত সশরীরের লক্ষণ। অশরীরত্ব নিত্যসিদ্ধ এবং ইহা কোন কর্মনিমিত্ত জন্মায় না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

পূঃ—বুঝিয়াছি, পুরুষের কৃত ধর্মাধর্মনিমিত্ত সশরীরত্ব জন্মায়, ইহাই বলিতেছ।

উঃ—এরূপ সিদ্ধান্তে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। যথা শরীর ব্যতীত ধর্মাধর্ম হয় না আবার ধর্মাধর্ম ব্যতীত শরীর হয় না—এই দোষ হয়। পরন্তু এই দোষ পরিহারার্থ যে অনাদিত্ব-কল্পনা তাহাও গ্রহণযোগ্য নহে। অন্ধগুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উপদেশ যেমন বস্তুনির্ণয়ে অসমর্থ, অনাদিত্ব-কল্পনাও সেইরূপ। ধর্মাধর্মের কর্তা কখনও আত্মা নহেন, সুতরাং তাঁহার বাস্তবিক কখনও সশরীরত্ব বা শরীর-সম্বন্ধ হয় না। আত্মার ক্রিয়া-সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহার কর্তৃত্বও উপপন্ন হয় না।

পূঃ—কেন রাজকর্মচারী যাহা করেন, তাহা সন্নিধানস্থ রাজারই কর্তৃত্ব বলিয়া ধরা হয়। সেইরূপ আত্মা কিছু করুন বা না করুন, সন্নিধান থাকাতেই তাঁহার কর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে।

উঃ—ভৃত্যকে বেতন দেওয়া হয় বলিয়া স্বামি-ভৃত্য-সম্বন্ধ। আত্মা বেতন দিয়া শরীরকে ভৃত্য নিয়োগ করিয়াছেন—এরূপ সম্বন্ধ নাই বা কল্পনা করা যায় না। মিথ্যা অভিমানই এক মাত্র প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধের হেতু। এতদ্দ্বারা আত্মার যজ্ঞ-কর্তৃত্বেরও নিষেধ হইল।

পূঃ—মিথ্যাজ্ঞান না বলিয়া গৌণ (গুণ-সম্বন্ধীয়) জ্ঞান বল। আত্মা দেহ-ব্যতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও দেহাদিতে আত্মার গুণ-সম্বন্ধ বোধ করিয়া দেহাদিকে "আমি" মনে করেন।

উঃ—এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না। দেখ সিংহের মতন কেশরাদি বা আকৃতি না থাকিলেও যখন আমরা পুরুষসিংহ বলি, তখন পুরুষকে সিংহ বলিয়া ভ্রম করি না। তখন শৌর্য ক্রৌর্য ইত্যাদি সিংহগুণ তাহাতে আছে বলিয়া পুরুষ-সিংহ বলি। অর্থাৎ দুইটি জানা প্রসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে মুখ্য বস্তুর কতকগুলি গুণ অপর বস্তুতে দেখিলে তাহাকে পূর্ব বস্তুর নামে অভিহিত করি। এরূপ না হইয়া যদি মন্দ অন্ধকারবশতঃ কোন স্থাণুকে পুরুষ বলি, তবে তাহা ভ্রান্তি হইবে। যদি শুক্তিকাকে দৃষ্টির দোষবশতঃ বা আলোর অল্পতাবশতঃ রজত বলি, তাহা ভ্রান্তি হইবে। কেননা একটা বস্তু জানি, অপর বস্তু জানি না। সেইহেতু স্থাণুকে পুরুষ ও শুক্তিকে রজত বলিয়াছি। যদি নিঃসংশয়ে জানিতাম, তবে স্থাণু ও শুক্তিই বলিতাম। সেই-রূপ যখন আত্মা ও অনাত্মার নিঃসংশয় বিবেক থাকে না, তখন সাদৃশ্যাদি-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে যখন আমরা দেহাদি-সংঘাতকে "আমি" বলি, তখন তাহা গুণসম্বন্ধীয় বা গৌণ হইতেই পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তিগণও যাঁহারা আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞ, তাঁহাদেরও অজ্ঞ রাখালের মত দেহাদিতে "আমি" শব্দপ্রয়োগ দেখা যায়, কেননা, তখন তাঁহারা "আমি" ও দেহাদি-সংঘাত যে বিবিক্ত তাহা বোধ করেন না, অবিবিক্ত-ভাবে দেহাদিকে "আমি" বলিয়া থাকেন। অতএব, যাঁহারা বলেন, দেহাদিও আছে আর দেহবিবিক্ত আত্মাও আছেন, তাঁহারা যখন দেহাদিতে "আমি" প্রত্যয় ব্যবহার করেন তখন গৌণ সম্বন্ধবশতঃ করেন না।

কেননা তখন তাঁহাদের দুইটি পৃথক বস্তুর প্রত্যয় থাকে না। সুতরাং দেহাদিতে অহংবুদ্ধি মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান-নিমিত্ত সশরীরত্ব, সুতরাং ইহাও সিদ্ধ হইল যে তত্ত্বজ্ঞানীর জীবিতকালেও অশরীরত্ব হইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্-বিষয়ে শ্রুতিবাক্য যথা—"যেমন পরিত্যক্ত সর্পত্বক বল্মীক-স্তূপে শয়ান থাকে, অশরীর অমৃত ব্যক্তির শরীরও তদ্রূপ থাকে।" "তখন তিনি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষু, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণ, বাগিন্দ্রিয় থাকিতেও অ-বাক্, মন থাকিতেও অমনা, প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণই হন।" স্মৃতিও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি-সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয় বলিয়াছেন। অতএব জ্ঞাতব্রহ্ম পুরুষের কখনই যথাপূর্ব সংসারিত্ব থাকে না। যাঁর থাকে, তিনি নিশ্চিত ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হন নাই।

পূঃ—আচ্ছা, শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধি দ্বারা ইহাই কি বুঝায় না যে ব্রহ্ম বিধির অঙ্গ? সুতরাং শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ধারণ করিয়াই বেদান্তের তাৎপর্য পর্যবসিত হয় না।

উঃ—এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। ব্রহ্মের স্বরূপ-অবগতির জন্যই যেমন শ্রবণ, মনন-নিদিধ্যাসনও সেই একই উদ্দেশ্যে। ব্রহ্ম-অবগতির দ্বারা যদি অন্য কোন প্রয়োজন সাধিত হইত তবে ইহাকে বিধি-শেষ বা ক্রিয়াঙ্গ বলা যাইত। এস্থলে তদ্রূপ নহে। শ্রবণের উদ্দেশ্য যেমন অবগতি, মনন-নিদিধ্যাসনেরও উদ্দেশ্য অবগতি। অতএব শাস্ত্রমাধ্যমে বা শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা যে ব্রহ্ম-অবগতি তাহা বিধিশেষ বা ক্রিয়াঙ্গ হিসাবে নহে। অতএব বেদান্তবাক্য-সমন্বয় দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, শাস্ত্র ব্রহ্মকে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়াই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্রারম্ভও উপপন্ন হইল। বিধিপরত্ব বা বিধিশেষত্ব হিসাবে ব্রহ্ম যদি বেদে উপস্থাপিত হইতেন, তবে "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে যে-শাস্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহার পরে দ্বিতীয় পৃথক শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিত না। যদি একান্তই মানস-ধর্মের বিচার প্রসঙ্গ সূত্রে ব্যাসদেব লিখিতেন, তবে "অথাতঃ পরিশিষ্টধর্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া লিখিতেন। যেমন জৈমিনী "অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা"র পরও লিখিয়াছেন "অথাতঃ ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থয়োঃ জিজ্ঞাসা" জৈমিনীর ব্রহ্মাত্মৈকত্ব প্রতিজ্ঞাত ছিল না বলিয়া, যুক্তিযুক্তভাবেই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া ব্যাসদেব পৃথক শাস্ত্রারম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত বিধি, সমস্ত প্রমাণ বলবৎ থাকে, যতক্ষণ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান প্রকাশ না পায়। অহেয়-অনুপাদেয়-অদ্বৈত-প্রত্যগাত্মা-অবগতির পর সমস্ত প্রমাণ, প্রমাতা লোপ পায় এবং তদ্বিষয়ও লোপ পায়। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়াছেন, "আমি সৎ ব্রহ্ম কূটস্থ আত্মা এই বোধ হইলে পর, পুত্রকলত্রাদির বাধ হয়, অর্থাৎ গৌণাত্মার (পুত্র ক্লিষ্ট হইলে আমি ক্লিষ্ট হই এবংবিধ অহং-প্রত্যয়কে গৌণাত্মা বলে) বাধ হয়—এবং আমি কর্তা, দেহাদি-সংহত বস্তু এইরূপ মিথ্যাত্মারও বাধ হয়। সুতরাং তখন আর কোন প্রকার ব্যবহারই থাকিতে পারে না। আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত প্রমাতা আত্মাকে প্রমাণের দ্বারা অন্বেষণের কথা উঠে, কিন্তু বিজ্ঞাত হইলে সেই প্রমাতাই পাপদোষাদি-রহিত পরমাত্মা হন। দেহে অহংবুদ্ধি ভ্রম হইলেও যেমন জ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য, লৌকিক ব্যবহারও তেমন আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য।"

নিবেদিতা-সাহিত্যে হুইট্‌ম্যানের প্রভাব

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নিবেদিতার একখানি ছোট পুস্তিকা সে-কালে উপহার পেয়েছিলাম। কতকগুলি ছোট ছোট প্রবন্ধের গুচ্ছ। ভক্ত রামপ্রসাদের ও রামকৃষ্ণের উপরে দুটী প্রবন্ধ গোড়াতেই আছে। একটী প্রবন্ধের নাম An Intercession. গোড়াতেই উদ্ধৃত রয়েছে মার্কিন কবি ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্‌ম্যানের বিখ্যাত Song Of The Open Road কবিতার কয়েকটী লাইন, যার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে বৈরাগীর একতারার ঝঙ্কার। আরও দু'একটী প্রবন্ধ সুরু হয়েছে হুইট্‌ম্যানের কবিতা দিয়ে। নিবেদিতার চিন্তাধারার উপরে ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্‌ম্যানের এই প্রভাব লক্ষ্য করবার বিষয়।

নিবেদিতার জন্ম খ্রীষ্টান পরিবারে, খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের দেশে। খ্রীষ্টের ভাব-ধারায় অনুস্যূত আবহাওয়ার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে এখানে ওখানে মণি-মুক্তার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে খ্রীষ্টের বাণী। বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

খ্রীষ্টের অনুরাগিণী নিবেদিতা কবি হুইট্‌-ম্যানেরও অনুরাগিণী ছিলেন—এই আবিষ্কারও আমাদিগকে বিস্মিত করে না। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক লুই ষ্টিভেন্‌সন্‌ (Robert Louis Stevenson) হুইট্‌ম্যানের কাব্যের উপরে নূতন আলোকপাত করেছেন। কবির Leaves of Grass-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে একজায়গায় ষ্টিভেন্‌সন্‌ লিখেছেন: There is much that is startingly Christian in Leaves of Grass. 'লিভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রাস্‌'এ এমন অনেক-কিছু আছে যাদের মধ্যে খ্রীষ্টের বাণীর চমকপ্রদ প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই নিঃসংশয়ে। যারা ষোলআনা মন দিয়ে ঈশ্বর চাইবে, তাদের জন্য খ্রীষ্ট যে-পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন সে-পথে আরাম নেই, সুখ নেই, আত্মীয়স্বজনের মধুর সান্ত্বনার বাণী নেই। সে-পথ হচ্ছে ত্যাগের কঠিন পথ, সে পথে যারা চলবে না, অনন্ত জীবনের পথে তাদের বিড়ম্বনা, সে-পথে মৃত্যু। খ্রীষ্ট বললেন, To save one's life one must lose it. জীবন যদি রক্ষা করতে হয় তবে জীবনকে হারাতেই হবে। কারণ মৃত্যু থেকেই আসে জীবনের প্লাবন। Verily, verily I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die it abideth alone, but if it die it bringeth forth much fruit. "আমি তোমাদের নিশ্চয়, নিশ্চয় ক'রে বলছি, গমের দানা মাটিতে প'ড়ে মরে না গেলে সে একাই থেকে যায়। কিন্তু মাটির মধ্যে মরলে অনেক ফসল ফলায়।" এই creative renunciation-এর বাণীই খ্রীষ্টের বাণী। হুইট্‌ম্যানও এই মহান মৃত্যুর সুরে সুর মিলিয়ে গাইলেন,

"Know that the young man who composedly perill'd his life and lost it has done exceedingly well for himself without doubt,"

"একথা জেনে রাখো, যে যুবক প্রশান্তচিত্তে জীবনকে বিপন্ন ক'রে প্রাণবলি দিলো সে নিঃসংশয়ে নিজের কল্যাণ ক'রে গেল।"

এই ত্যাগেরই স্তবগান ভারতবর্ষের কবির কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে। অমৃতের পথকে তিনি দুঃখের পথ বলেই বর্ণনা করেছেন।

"চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।"—বলাকা

ফ্রান্সের চিন্তাশীল ক্যাথলিক লেখক ফ্রাঁসোয়া মোরে (Francois Mauriace) God and Mammon বইতে একই কথা লিখলেন: In reality the people who look for comfort and consolation and ease in their religion clutter up the threshhold without entering the building. For those who understand it and love it, the spiritual life may be said to be a terrific and terrifying adventure. There may be no playing with the Cross. ক্রস্ নিয়ে কিছুতেই ছেলেখেলা চলবে না। আধ্যাত্মিক জীবন একটা অভিযান, যা নিঃসন্দেহে বিপদসঙ্কুল এবং বিঘ্নবহুল। ধর্মের রাস্তায় যারা আরাম খোঁজে, সুখের কামনা করে, তারা তো সেই পরম উপলব্ধির মন্দিরে ঢুকবার আগেই দরজা বন্ধ করে দেয়।

নিবেদিতার গুরুর কণ্ঠেও বৈরাগ্যের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। কতকাল পরেও স্বামীজীর সেই কম্বুকণ্ঠের বাণী আমাদিগকে চমকে দেয়: What then can satisfy man? Not gold. Not joy. Not beauty. One Infinite alone can satisfy him… সেই উপনিষদের চিরন্তন বাণী: ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।

হুইট্‌ম্যানের মৃত্যুর এক বৎসর পরে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতা করেন। হুইট্‌ম্যানের মৃত্যুতিথি ২৬শে মার্চ, ১৮৯২। স্বামীজী চিকাগোতে প্রথম বক্তৃতা করলেন ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। বিবেকানন্দ মার্কিন কবির গুণগ্রাহী ছিলেন। কবিকে বলতেন মার্কিন সন্ন্যাসী। হুইট্‌ম্যানের চিন্তাধারার প্রভাবে আমেরিকার চিত্তভূমি আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল। সেই চিন্তাধারার মধ্যে বেদান্তের প্রতিধ্বনি স্পষ্টই শুনতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আমেরিকা যে এমন সহজে স্বামীজীকে গ্রহণ করেছিল, তার জন্য হুইট্‌ম্যানের ভাবসম্পদ নিঃসংশয়ে বহুল পরিমাণে দায়ী।

নিবেদিতা স্বামীজীর প্রভাবে বৈরাগ্যের দুর্গম পথকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু যাদের পিছনে আমরা ফেলে আসি তাদের মন থেকে সরানো সহজ নয়। তারা অজ্ঞাতসারে আমাদের মনকে টানে, তাদের মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, আমাদের হৃদয়ে বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে আসে। নিবেদিতা জীবনের এমনি এক একটা মুহূর্তে হুইট্‌ম্যানের কবিতা পড়ে বৈরাগ্যের পাষাণ-কঠিন পথে চলবার প্রেরণা পেতেন, এই কথাই তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়বার সময়ে আমার মনে হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের মাত্রা

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সামাজিক জীবনে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনার্য-সংস্কৃতির প্রভাব আর্যেরা কোনদিনই উপেক্ষা করতে পারেননি। আর্যদের কাছে পরাজিত হলেও অনার্য-সংস্কৃতি আর্যদের ভাবজীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। পুরাণেও তাই তার ছায়া দেখা যায়।

এই সব পুরাণ কালক্রমে হিন্দুদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে এমনই একাত্ম হয়ে যায় যে, তারপর থেকে যে ভাষাতেই সাহিত্যচর্চা শুরু হয় তাতেই এই পুরাণগুলির প্রভাব পড়তে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই পুরাণের প্রভাব তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে দেখি আমাদের বাংলা ভাষার মঙ্গলসাহিত্যের সীমানাকে জুড়ে।

মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীকে সংস্কার করে পুরাণের চরিত্র করে তোলার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সংস্কৃত পুরাণে আমরা যে সমস্ত দেবদেবীর পরিচয় পাই, তাঁরা সকলেই বৈদিক দেবদেবী নন। কিন্তু বৈদিক দেবতার সম্মান ও চরিত্রসম্পদ তাঁরা সকলেই পেয়েছেন—মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেবতার অখণ্ড মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। সংস্কৃত পুরাণে দেখি ভক্তজনের ব্যাকুল প্রার্থনা শুনছেন দেবদেবীগণ আবির্ভূত হয়ে। বৈদিক দেবতাদের এই কল্যাণময়ী শক্তি দেখা যায় পুরাণে। অবশ্য দেবীর প্রাধান্য তেমন বেশী দেখা যায় না।

পুরাণে দেখি ভীত আর্ত মানুষ দেবতার কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

পুরাণের এই আদর্শ মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক, উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতিতে সচেতনভাবে অনুসৃত হয়েছে। একই পরিবেশ ও উদ্দেশ্য হওয়ায় উভয়ের রীতিও প্রায় সমধর্মিতা লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্যকারগণ পুরাণকে সচেতন-ভাবে অনুসরণ করেছেন দেববন্দনার ক্ষেত্রে—একের থেকে বহু দেবতাকে বন্দনা করা হয় মঙ্গলকাব্যের ভূমিকায়। মঙ্গলকাব্যের এই দেবখণ্ডের বন্দনা-অংশে দেবতা-রূপে শ্রীচৈতন্যদেবও স্থান পেয়েছেন। কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে পুরাণের ভাষা পর্যন্ত অনূদিত হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনাতে মূল কাঠামোটি অনুসৃত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের দুটি অংশ—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডের অবতারণা দ্বারাই এখানে বাস্তবকে ছাড়িয়ে অবাস্তব এবং সম্পূর্ণ দৈবী আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। একমাত্র নরখণ্ডেই দেব-নিরপেক্ষ মনুষ্যশক্তি ও সৃষ্টির পরিচয় আছে।

সংস্কৃত পুরাণে দেবতার অলৌকিক লীলা দেবসমাজে ও ভক্তসমাজে তাঁদের মহিমার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। মঙ্গলকাব্যেও দেবতার পূজা-প্রচারই লক্ষ্য, এমনকি এই আদর্শে মঙ্গল-কাব্যের নামকরণের মধ্যেও পুরাণের অবি-সংবাদিত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ মেলে। যেমন পদ্ম-পুরাণ। পদ্মপুরাণের সংস্কৃতরূপে আমরা মনসার যে সাক্ষাৎ পাই, মনসামঙ্গলেও অনেক-স্থানে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের যে শাখাগুলিকে পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের শাখা বলা হয় তাদের নামকরণেই

প্রমাণিত হচ্ছে, এরা কতদূর পুরাণ-প্রভাবিত। পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পড়ে গৌরী-মঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি।

নারায়ণদেব তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের নাম-করণে বলেছেন, —

"পদ্মপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে
নারায়ণদেব পাঁচালী রচিছে।"

সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণীয় প্রভাব মঙ্গলকাব্যেই নয়, অন্যকাব্যেও আছে। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম যে বিশিষ্ট রূপাঙ্গিক লাভ করেছে—শ্রীকৃষ্ণের যে মধুরলীলা বৈষ্ণব-সাধারণের উপজীব্য, তা মুখ্যতঃ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং শ্রীমদ্ভাগবত থেকে গৃহীত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব-সাধক এবং রসজ্ঞদের কাছে বিশেষ সমাদৃত। গীতগোবিন্দের উপর ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে গীতগোবিন্দের রাসলীলার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় এবং গীতগোবিন্দের রাধার উল্লেখ ভাগবতে নেই। কিন্তু একজন প্রধানা-গোপিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথম শ্লোকের সাথে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ১৫শ অধ্যায়ের প্রথম ৮টি শ্লোকের প্রায় হুবহু মিল আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। বাংলার বৈষ্ণবরসবেত্তারা মহা-ভারতের শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করেননি। করেছেন মধুরস্বভাব প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপকে। এই কৃষ্ণই পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যের নায়ক এবং দেবতা। দেব-চরিত্র বর্ণনার সাধনায় বৈষ্ণবকাব্যসাহিত্য পুরাণের কাছে ঋণী। ভাগবতের ব্রজলীলা বৈষ্ণবসাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য। কেবল তাই নয়, মধ্যযুগের প্রারম্ভে মালাধর বসু-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের সার্থক অনুবাদ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এর কিছু পূর্বে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'ও ভাগবত-প্রভাব স্বীকৃত হয়ে থাকে। তবে এর কাব্যমূল্য যাই হোক না কেন, বৈষ্ণব-সমাজে ভক্তিকাব্য বলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' ভাগবতাশ্রয়ী ভক্তিপূর্ণ কৃষ্ণকথা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অবশ্য এই ভক্তিবাদের সূচনায় 'গীত-গোবিন্দ' এবং সার্থকলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণবিজয়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এটিই ভক্তের রচিত প্রথম কাব্য। এ-কাব্য ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের তিনটি শাখা—(১) অনুবাদসাহিত্যের শাখা, (২) বৈষ্ণব-কাব্যের শাখা ও (৩) মঙ্গলকাব্যের শাখা। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুটি শাখার উপরে পুরাণের প্রভাব অনস্বীকার্য। সুতরাং বাংলার জাতীয় জীবনের উপরেই সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সর্বজাতির সাহিত্যের আদিযুগেই ধর্মের একাধিপত্য স্বীকৃত। বাংলা-সাহিত্যের প্রথমযুগেও পুরাণপ্রভাব স্বাভাবিক কারণে এসে পড়েছে। স্বকীয় চিন্তাধারা যতদিন না মৌলিকত্ব অর্জন করেছে ততদিন প্রাচীন প্রভাবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাংলাসাহিত্যের অনুবাদশাখাটি প্রত্যক্ষ-ভাবে পৌরাণিক শাখার অনুবাদ। ভারতবর্ষের দুটি বিখ্যাত মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত সে যুগের জীবনচেতনারই প্রকাশ। এই রামায়ণ-মহাভারতকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ অনুবাদশাখা বিবর্তিত। সুতরাং পুরাণ শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনেও তার ছায়া বিস্তার করেছে। দেবীমাহাত্ম্যমূলক মঙ্গলকাব্যে দেবী-ভাগবতের প্রভাব আছে।

ষোড়শ শতকের জীবনীসাহিত্যও শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুকরণে। বৃন্দাবনদাস স্পষ্টই বলেছেন—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥"

বাংলাসাহিত্যের অন্যতম জীবনীগ্রন্থ হিসেবে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটির সম্মান স্বীকৃত। চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে অনুরূপ একটি পুরাণ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন বৃন্দাবনদাস।

পুরাণ ও মহাকাব্য জাতির ভাবজীবনে একটি স্থায়ী দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করে। তাই আমাদের জাতীয় প্রবণতা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মূলেও সবচেয়ে কার্যকরী উপাদান হলো পৌরাণিক কাব্য ও পুরাণ। সুতরাং বাংলাসাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করলেও বাঙালীর ভাবজীবনে তার জীবনাদর্শের মধ্যে, ন্যায়-নীতি-ধর্মবোধের মধ্যে পুরাণের পরোক্ষ প্রভাব আছে।

এখন ঐ প্রভাব কিছু কমেছে। তবে একেবারে দূরবর্তী হয়েছে এ-কথা বলা যায় না। কারণ প্রত্যেক যুগেই মানুষ পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই আধুনিক প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিকদের মজ্জায় মজ্জায় পুরাণের আদর্শনিষ্ঠা বর্তমান। তাই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যেও তার প্রতিফলনই চরমভাবে। কাহিনীর বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, চরিত্রসৃষ্টিতে সর্বত্রই এই আদর্শনিষ্ঠা, মহিমাবোধ অপ্রত্যক্ষভাবে গভীর প্রভাব রেখে গেছে। হয়তো রাখবেও আরো অনেক অনেক দিন।

নাও মা তুমিই টেনে

(গান)

শ্রীরণজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ভক্ত-জীবন দাও মা আমায়, দিন গেল মোর হেলায় খেলায়
হল না তোর ভজন,
অহংকারে রইনু মেতে, বৃথাই এ জীবন॥
হৃদয় মাঝে আছ তুমি জানবো কোথা থেকে
অহংকার যে আঁধার হয়ে আছে তোমায় ঢেকে।
বাহিরে তাই ঘুরে মরি, মন বোঝে না তীর্থ করি,
ঘুচিয়ে দাও মনের আঁধার মাগো আমার জগৎ জীবন॥
(মাগো) কেঁদে কেঁদে ডাকব যত, মনের আঁধার কাটবে তত,
(ওমা) মন দিয়েছ 'মত্ত হাতী', হাওয়ার সাথে করে গমন।
(এখন) নাও মা তুমিই টেনে তারে বেঁধে তোমার কৃপার ডোরে
(সে মন) ডাকুক শুধু মা মা বলে, ভাবুক তোমার অভয় চরণ॥

সমালোচনা

শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন—ডক্টর শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক: ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণলাল দাম, খড়্গপুর (খারিদা)। পৃষ্ঠা ৫৫০+১৩; মূল্য ১২'৫০।

অধ্যাত্ম-সাধনা ও চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্মে অশেষ স্বাধীনতা বিদ্যমান, সেইজন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাধক ও মহাপুরুষগণের নব নব চিন্তার বিকাশ ঘটিয়াছে, ফলে বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র এবং সাধনমার্গে বিভিন্ন মত ও পথের উৎপত্তি হইয়াছে। অগণিত মুমুক্ষু ও আধ্যাত্মিক রসপিপাসু মানব এই সব দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করিয়া এবং সাধনপথে সাধন করিয়া জীবনে কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার ভগবান শ্রীনিম্বার্কাচার্য ছিলেন স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী। শ্রীনিম্বার্ক-প্রবর্তিত মতবাদ 'নিম্বার্কদর্শন' বা 'নিম্বার্ক-বেদান্ত' নামে সুপ্রসিদ্ধ। নিম্বার্কানুবর্তী সকল আচার্যই 'নিম্বার্কবেদান্ত' মত অবলম্বন করিয়া থাকেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত কিছুই আলোচ্য গ্রন্থে সবিস্তার সন্নিবেশিত। সুধী গ্রন্থকার শ্রীনিম্বার্কের আভির্ভাব-কাল সম্বন্ধে যে গবেষণা করিযাছেন তজ্জন্য তিনি সাধুবাদের যোগ্য। গ্রন্থ-প্রণয়নে যে মনীষা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা চিত্তাকর্ষক।

গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়-পরিচিতি, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জীবন, আবির্ভাব-কাল ও তাঁহার রচিত গ্রন্থের বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্বার্কদর্শন-পরিচয়, প্রমাণ সমীক্ষা, নিম্বার্কদর্শনে জীব জগৎ ব্রহ্ম ও মোক্ষ এবং তৃতীয় খণ্ডে নিম্বার্কদর্শনে সাধন ও উপাসনা-প্রণালী, দার্শনিক জগতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের স্থান প্রভৃতির বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। পরিশিষ্টে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সহায়কারী ১৫৪ খানি পুস্তকের নাম দেওয়া হইয়াছে।

এই গবেষণা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ছাপা এবং বাঁধাই ভাল।

বৈরাগ্যশতকম্—অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ। প্রকাশক: স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠা ১৫৪+৮; মূল্য দেড় টাকা।

মহাকবি ভর্তৃহরি-বিরচিত 'শতক' গ্রন্থত্রয়ের অন্যতম 'বৈরাগ্যশতকম্' ভারতীয় মনীষার অত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য, ইহার সাহিত্যিক, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আবেদন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পাঠকদিগের চিত্তে পূর্ববৎ দেদীপ্যমান! কিন্তু বৈরাগ্যোদ্দীপক এই শতক গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এতকাল দুর্বোধ্য ও আস্বাদনের অযোগ্য বিবেচিত হইত। স্বামী ধীরেশানন্দজী উক্ত গ্রন্থের সটীক বঙ্গানুবাদ করিয়া তাঁহাদের নিকট উহা বোধগম্য করাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অনূদিত গ্রন্থের পরিচিতি-অংশে যোগিরাজ ভর্তৃহরির আবির্ভাব-কাল ও সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস বর্ণিত। মূল গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বৈরাগ্য

একশতটি শ্লোকে তৃষ্ণাদূষণ, বিষয়-পরিত্যাগ-বিড়ম্বনা, যাজ্ঞা-দৈন্যদূষণ, ভোগাস্থৈর্য-বর্ণন প্রভৃতি ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য উক্ত গ্রন্থের বহু প্রকার শ্লোকক্রম, শ্লোকসংখ্যা ও পাঠভেদ পরিদৃষ্ট হয়। অনুবাদক তাঁহার অনুবাদে টীকাকার পণ্ডিত রামচন্দ্র বুধেন্দ্র-স্বীকৃত সংখ্যা ও ক্রমাদিই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যান-ভেদস্থলে কখন কখন কৃষ্ণশাস্ত্রিকৃত টীকারও অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও সঙ্গতি-বোধই পরিস্ফুট! অনূদিত গ্রন্থের প্রায় শেষাংশে অকারাদি বর্ণক্রমে মূল শ্লোকগুলির একটি সূচী প্রদত্ত হওয়ায় পাঠক-দিগের খুবই সুবিধা হইবে। পরিশেষে মনস্বী অনুবাদক 'বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস' শীর্ষক শাস্ত্রীয়-বিচার সম্বলিত স্বরচিত একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ সংযোজন করায় উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থখানির মর্যাদা ও উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থে অধিকাংশ মূল সংস্কৃত শ্লোকে পাদান্ত কমা-চিহ্ন (,) ও বিসন্ধি-প্রয়োগ প্রদর্শন সংস্কৃত রুচি ও রীতি-সম্মত নহে। অন্বয় ও অন্বয়ার্থ প্রায়শঃ অনুবাদ-মুখী হইলেও কোন কোন স্থলে অন্বয়ের পদক্রমে ইতরবিশেষ হইয়াছে এবং তজ্জন্য অর্থভেদও ঘটিয়াছে। সান্ধভঙ্গের দ্বারা সরলী-করণের ও অন্বয়ার্থ-প্রদর্শনের পূর্বে প্রতি-শ্লোকের কেবলমাত্র যথাযথ অন্বয় প্রদর্শন করিলে পদ্যের গদ্যে পরিণমনটি সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্য করা যাইত এবং মূলের বোধে আরও সৌকর্য সাধিত হইত।

আবশ্যকস্থলে শব্দবিশেষের মর্মার্থ ও শ্লোকের আশয় প্রদর্শন এবং পাদটীকা-সংযোজনের দ্বারা আলোচ্য অনুবাদগ্রন্থের মান উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। মূলের শৃঙ্গারবোধক বাক্যগুলির বিস্পষ্ট অনুবাদের পরিবর্তে কেবলমাত্র তাৎপর্যপ্রদর্শন সমীচীন হইয়াছে। অন্যথা বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্মাইয়া অনেকেরই আলোচ্য গ্রন্থপাঠ নিষ্ফল হইত, সন্দেহ নাই।

—শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীম-কথা—স্বামী জগন্নাথানন্দ। মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৪৭০+১২; মূল্য দশ টাকা।

শ্রদ্ধেয় স্বামী জগন্নাথানন্দ প্রণীত "শ্রীম-কথা" একখানি সুবৃহৎ জীবনী-গ্রন্থ, কিন্তু প্রচলিত অর্থে জীবনী-গ্রন্থ বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহার ব্যতিক্রম। গ্রন্থের প্রথমাংশে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত,—যিনি মাষ্টার মহাশয় বা আরও সংক্ষেপে শ্রীম নামে খ্যাত,—তাঁহার জীবন-কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্প পরিসরে শ্রীম'র এই জীবনকাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের একটা বহুদিনের অনুভূত অভাব পূরণ করিল। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গের অন্যতম। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের" সঙ্কলয়িতা ও পরিবেশক শ্রীম'র নাম লক্ষ লক্ষ নরনারীর শ্রদ্ধার বস্তু। কিন্তু শ্রীম'র নিষ্ঠা ও তপস্যাপূত জীবন-কথার প্রচার একরকম হয় নাই বলিলেও চলে। তাই স্বামী জগন্নাথানন্দের এই গ্রন্থখানি সর্বতোভাবেই অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীম-কথা এক নূতন আঙ্গিকে লিখিত তথ্য-নিষ্ঠ ও সুখপাঠ্য জীবনালেখ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরকে মাষ্টার মহাশয় যেমনটি দেখিয়াছিলেন, যেমনটি তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনিয়াছিলেন, হুবহু তেমনটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার অমর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" গ্রন্থে। যে ধৈর্য ও অনুরাগ লইয়া শ্রী-ম এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন

করিয়াছেন, তাহার মূল্য কঠোর তপশ্চর্যারই অনুরূপ। স্বামী জগন্নাথানন্দজীও সেই একই আঙ্গিকে শ্রীম-কথা রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের সার্থক ফলশ্রুতি। মাষ্টার মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সমকালীন এবং উত্তরকালের অসংখ্য ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য বহু জ্ঞানী-গুণী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ-নিবেদিত-প্রাণ শ্রীম জ্ঞানকল্পতরু শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী অবলম্বন করিয়াই অবিশ্বাসীর সংশয় ও সন্দেহের নিরসন এবং প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিযাছেন। নিজের মতামত ব্যক্ত করিযাছেন খুব কমই। "কথামৃতের" মতই শ্রীম-কথা সহজ রসের আধার। ভাবে ও ভাষায় বইখানি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বইখানির বহুল প্রচার সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইবে।

—নিখিলরঞ্জন রায়

গীতা-গুঞ্জন: অধ্যাপক সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম.এ. ডি. লিট্, দর্শনাচার্য, ভাগবত-রত্ন। প্রকাশক—শ্রীরাধেশ্যাম আগরওয়ালা, বোলপুর। পৃষ্ঠা—৫৬, মূল্য—২.২৫ টাকা।

গীতা সর্বোপনিষদের সার। বহুবার আমাদের জীবনে কর্তব্য লইয়া সমস্যা দেখা দেয়, ধর্ম ও কর্মের মধ্যে বিরোধ বাধিতে চায়। এমনি একটি সমস্যার পটভূমিতে গীতা উক্ত হইয়াছে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে সমস্যার নিঃসংশয় সমাধান দিয়াছেন—'মামনুস্মর যুধ্য চ' —ভগবানলাভকে জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া জ্ঞান, ভক্তি বা যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কর্তব্য করিয়া যাও। গীতার যে কোনরূপ আলোচনা তাই আমাদের পক্ষে পরম কল্যাণকর। 'গীতা-গুঞ্জনে' গ্রন্থকার গীতা হইতে মাঝে মাঝে মূল শ্লোক লইয়া সেগুলির এবং তৎসহ সংযোজিত কথা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সমগ্র গীতার মূল ভাবটি পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সমবায়: লেখক জেরী ভুরীস এবং অ্যালী সি. ফেলডার (জুনিয়ার)। প্রকাশক: ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-৬৪।

বহুচিত্র-শোভিত সুমুদ্রিত 'সমবায়' পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমেরিকা ও ভারতের জনসাধারণ নিজেদের কল্যাণসাধনে কিরূপে সমবেতভাবে প্রচেষ্টা করে, নিপুণবিবৃতির মাধ্যমে এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাপক ডি আর. গ্যাডসিল কর্তৃক লিখিত ভূমিকাটি সুচিন্তিত নিবন্ধ। ভূমিকা ছাডা পুস্তিকাটিতে এগারোটি পরিচ্ছেদ আছে। আমেরিকার গণতন্ত্রে সমবায়ের সূচনা ও সম্প্রসারণ-সম্বন্ধে সহজবোধ্য ভাষায় বিস্তৃত চিত্তাকর্ষক আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে সমবায়ের অবস্থাও আলোচনা করা হইয়াছে। আমেরিকায় সমবায়-ব্যবস্থার ধীর ক্রমিক উন্নতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়, কিন্তু ভারতবাসী এখনও সমবায়ের ব্যাপারে পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে। গত ২৫.৭.৬৭ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রদেশপাল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার জেলায় মিশন-পরিচালিত হাট-আস্কুরিয়া সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

গত জুন মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়:

(১) **বিহারে** (ক) হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরী ও *চম্পারণ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে* ৯০,৭৩৫ কেজি গম, ২৪,১৭৭ কেজি জোয়ার, ৮৪৬ কেজি চাল, ১৩,৪২০ গ্রাম বিস্কুট, ৮ পাউণ্ড হরলিকস, ৩৩ খানি পরিধেয় বস্ত্রাদি, ১৬,০০০ ভিটামিন ট্যাবলেট বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৮,১৫১।

চিকিৎসা: ১১,৯৩১ জনকে কলেরা ইঞ্জেকশন এবং ৪৮৫ জনকে বসন্তের টিকা দেওয়া হইয়াছে।

প্রতাপপুরে একটি নূতন সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

(খ) সাঁওতাল পরগণা জেলায় রিখিয়া সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৯,৫৪৭ কেজি গম, ৭৫০ কেজি জোয়ার, ৬৩ কেজি ভুট্টাদানা, ৫৪৪ খানি চাদর ও শাড়ী, ৬৬৮ খানি কম্বল, ১,৭১৪ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১১,৬৪৭।

(২) **উত্তরপ্রদেশ** মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৬,৮৬৬ কেজি গম, ৭৪৭ কেজি গুঁড়া দুধ, ২০৬ কেজি বিস্কুট, ৬৮০ বোতল শিশুখাদ্য, ৭,৭০০ ভিটামিন ট্যাবলেট এবং অন্যান্য ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫,৮৪২।

(৩) **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) পুরুলিয়া জেলায় পরা, ঝাপড়া, হুড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালিতোড়া এবং নাডীহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭,০১৮·৫ কেজি চাল, ৭,৭৭১ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১,৯৭২।

(খ) বাঁকুড়া জেলায় হাট-আস্কুরিয়া, দধিমুখা এবং খাণ্ডারী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৩,৮৯৩·৭৫ কেজি গম বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৪,৩২৫।

বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী ও রামহরিপুরে সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। রামহরিপুর হইতে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে সাহায্য দেওয়া হইতেছে:

কাপিষ্টা, পিব্‌রাবনী এবং সহরজোড়া।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মালদহ জেলাতেও দুর্ভিক্ষত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিদর্শনের পর নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে জুন মাসেই সেবার কাজ শুরু করা হইয়াছে:

মঙ্গলবাড়ী, ভাবুক, বৈরগাচি, পাকুয়াহাট।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের তিনজন ছাত্র মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই বৎসর এম. এ. (সংস্কৃত), এম এস-সি. ও বি. এস সি পরীক্ষায় (গণিত) প্রথম স্থান এবং চারজন ছাত্র বি. কম. পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বৎসর সাহিত্যশাখায় (Humanities Group) প্রথম স্থান এবং পাঁচজন বিভিন্ন শাখায় প্রথম দশজনের মধ্যে পাচটি স্থান অধিকার করিয়াছে।

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কনবিদ্যা (Fine Arts Group) শাখায় প্রথম স্থান এবং দুইজন যথাক্রমে বিজ্ঞানশাখায় চতুর্থ এবং শিল্পশাখায় (Technical Group) সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের বিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৫—মার্চ, ১৯৬৬) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মথুরা রোডের উপর নূতন প্রশস্ত ভবন-সমূহে ইহা স্থানান্তরিত হয়। সেবাশ্রম একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল, এখানে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, রেডিওলজি, প্যাথলজি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে চক্ষুরোগীসহ ২,৫২৭ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,৮৬৬ জন আরোগ্য লাভ করে। চক্ষু-অস্ত্রোপচার সহ মোট ৯২৯টি অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের ১০৩টি শয্যার মধ্যে গড়ে দৈনিক ৭১টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল।

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ২,১৭,৭৮৯ জন রোগী (পুরাতন ১,৭৮,৯৫২) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগীসহ মোট ১,২২২ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৩৫।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫,১৯৮ ও ১৫,৬৩৬। এক্স-রে বিভাগে ১,২৩৪টি এক্স-রে করা হয় এবং ল্যাবরেটরিতে ৮,০০১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ফিজিও-থেরাপি বিভাগে ৭৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

উল্লেখযোগ্য যে, বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগটি হইল চক্ষু বিভাগ, চক্ষুরোগে আক্রান্ত সহস্র সহস্র রোগী এখানে চিকিৎসালাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে।

মালদহ : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইযাছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মালদহে মঠ-শাখা একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থাপিত হয়, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইহা বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জনহিতকর কার্যের জন্য মিশন-শাখাটি খোলা হয়।

মঠ বিভাগে নিত্য পূজার্চনা ও ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা এবং উৎসবাদি সুষ্ঠু-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মিশন-বিভাগে বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের কাজই প্রধান। মিশন-শাখা কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি পরিচালিত হইতেছে :

(১) ১০০টি শিশু ছাত্র-ছাত্রীকে লইয়া দুইটি নার্সারি বিদ্যালয়, (২) ২২৫টি ছাত্র-ছাত্রী-সমন্বিত একটি প্রাথমিক বুনিয়াদী স্কুল, (৩) ৬২৮টি ছাত্র-সমন্বিত একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, (৪) মিশন-প্রতিষ্ঠিত বাস্তুহারা কলোনীতে ১৪২টি ছাত্র-ছাত্রীযুক্ত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৫) গ্রামে আদিবাসী সাঁওতাল ও অন্যান্য অনুন্নত বালক-বালিকাদের

জন্ত গাজোল থানার—চিংকোলে, মালদহ থানার—নারায়ণপুরে, ইংরেজবাজারের—অমৃতি মোহনপাড়ায় এবং বামনগোলা থানার —চেংনাডাঙ্গায় ২৫৬টি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আর বয়স্কদের জন্ত ৪টি সামাজিক ও বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র, (৬) মহিলাদের জন্ত কুটিরশিল্প—সেলাই, রেশমের ঝুটকাটা, ছবি বাঁধানো, খেলনা তৈয়ারি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্ত 'সারদা শিল্প-নিকেতন' নামে শহরে দুইটি স্কুল, (৭) 'বিবেকানন্দ শিশুসঙ্ঘ' নামে ছোট ছেলেমেয়েদের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও সর্ববিধ উন্নতির জন্ত একটি ক্লাব এবং মফস্বলে ইহার দুইটি শাখা (মেম্বার-সংখ্যা —৩১০), (৮) কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জন্ত একটি ছাত্রাবাস।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ২২টি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে কলেজের একটি ছাত্র কৃতিত্বের সহিত অনার্স-সহ বি. এ পাস করিয়াছে। কতিপয় মেধাবী দরিদ্র ছাত্র এবং সাঁওতাল ও আদিবাসী ছাত্র বিনা-ব্যয়ে এখানে আহার ও বাসস্থানের সুযোগ পাইয়া শিক্ষালাভ করিতেছে।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি এবং নারায়ণপুর ও চিংকোলে দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিতরণ কেন্দ্র আছে। আলোচ্য বর্ষে ৪৬,১৯৯ জনকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪,৭৫১ জন নূতন রোগী।

আশ্রমে ২,০৮৬ খানি পুস্তক-সমন্বিত একটি গ্রন্থাগার আছে। আলোচ্য বর্ষে পাঠকগণ ২,৮০৩ খানি বই বাড়ীতে লইয়া পড়িয়াছেন। পাঠাগারে পাঠকসংখ্যা প্রত্যহ গড়ে ৩৫।

বহু দরিদ্র নরনারীকে সাময়িক অর্থ ও বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করা হয়। অমৃতির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা গত অক্টোবর মাস হইতে চালু করা হইয়াছে।

মিশন-কেন্দ্র কর্তৃক ১০৬টি মধ্যবিত্ত পরিবার-সমন্বিত একটি উদ্বাস্তু-কলোনী শহরের এক সুদৃশ্য অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা বর্তমানে স্বাবলম্বী হইয়া স্বাধীন নাগরিকরূপে বসবাস করিতেছেন।

বাঁকুড়া : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠ-বিভাগের কার্যধারা :

(১) মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এখানে নিত্য পূজার্চনা, উপাসনা, প্রার্থনা ও ভজনাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(২) স্থানীয় জনসাধারণের আধ্যাত্মিকতা লাভের সহায়তায় ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ৫৫০টি ধর্ম-ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা—৩,৪৮৫। পাঠাগারে ৩৭টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়।

(৪) জগতের মহাপুরুষগণের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মিশন-শাখার কার্যাবলী :

( ) মিশন কর্তৃক তিনটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিতরণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। ইহাদের একটি গ্রামে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৫৪,০৬৯ জন চিকিৎসিত হইয়াছে।

(২) অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্ত একটি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই বিদ্যালয়ে ১৩৩ জন বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে।

(৩) কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। প্রতিদিন ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থীদের জন্য ধর্ম-ক্লাস করা হইয়া থাকে।

(৪) কয়েকজন দরিদ্র ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত কেন্দ্র - অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল :

অক্টোবর, ১৯৬৬ : শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিশ্বজনীন বাণী, রাজযোগ-সহায়ে একাগ্রতা ; জ্ঞানযোগের বিচার-সহায়ে একাগ্রতা, মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা, মানুষের স্বরূপ কি ?

নভেম্বর,'৬৬ : বিশ্বাস, মৃত্যুর পারে জীবন, যোগের মাধ্যমে শান্তি, আধ্যাত্মিক সেতুর তিনটি খিলান।

এপ্রিল, '৬৭ : শ্রীরামকৃষ্ণ—বর্তমান জগতের আলোক। শ্রীরামকৃষ্ণ—জগজ্জননীর বাণীরূপ, আধ্যাত্মিক জীবন ও সামাজিক দায়িত্ব, যোগ ও আন্তর জীবনের নীতি, মৌনতার আরোগ্য-কারিণী ও সৃজনী শক্তি।

মে, '৬৭ : ঈশ্বর, আত্মা ও বিশ্ব, সাকার হইতে নিরাকারে, ধর্মীয় জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন, বুদ্ধের শান্তি ও জ্ঞানের বাণী।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে কঠোপনিষৎ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে ক্লাস করা হইয়াছিল।

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া ঃ স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি ঃ অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল :

ডিসেম্বর, ১৯৬৬ : পরমপুরুষরূপে সত্তা, যে স্বর্গ আমরা স্পর্শ করিতে পারি, মনের সীমান্ত প্রদেশ, সার্থক জীবনযাপন, জ্ঞান ও প্রেমের মূর্তি স্বামী প্রেমানন্দ, শান্তি কোথায় ? ঈশ্বরাবতার যীশুখৃষ্ট।

জানুআরি, ১৯৬৭ : বর্তমান ভারতের মহীয়সী সাধিকা ; প্রথমের কাজ প্রথমে, সাকারের মাধ্যমে নিরাকারে, মৃত্যুর পূর্বে যাহা আমরা অবশ্যই করিব, মনের সহিত যুদ্ধ, উন্নতির সোপানে আত্মার আরোহণ, আলোক-প্রদ জীবন, বিশ্ব—আত্মার অভিক্ষেপ।

ফেব্রুআরি, '৬৭ : স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয় ও মন, স্বর্গীয় ভাবে জগৎ পূর্ণ, সত্তানুভূতির অভ্যাস, কিরূপে যোগী হওয়া যায় ? কর্মবিধান ও ঈশ্বরমহিমা, স্পর্শাতীতকে স্পর্শ করা ; ধারাবাহিক ধ্যান।

মার্চ, '৬৭ : ধর্মের নব দিগন্ত, জাগ্রত মনের গুরুত্ব ; ধ্যানযোগ, বাহিরে কিছুই নাই, সবই অন্তরে, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে আধ্যাত্মিক জীবন, মানবজাতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দান ; বেদান্ত ও রহস্যবিদ্যা, পুনর্জন্ম ও দ্বিতীয় জন্ম, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভবিষ্যৎ ভারত।

এপ্রিল, '৬৭ : দৈনন্দিন জীবনকে কিরূপে আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ করা যায়, ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করুন, দেখ, আমি তোমাদিগকে সুসমাচার দিতেছি, আমাদের জীবনকে উপাসনায় পূর্ণ করা, শক্তির উৎস, আধ্যাত্মিক জীবনে পরিবেশের প্রভাব ; আমাদের 'আমি'র প্রকৃত স্বরূপ, কিভাবে আমরা 'আত্মা'কে হারাইব না, ঈশ্বরানুভূতি কাহাকে বলে।

মে, '৬৭ : শব্দ হইতে শব্দাতীত, আত্ম-জ্ঞানের ভিত্তি, জীবনের কেন্দ্রে উপস্থিত

হওয়া ; আত্মার আত্মাকে উপাসনা ; আন্তর সমন্বয় ; আমরা কেন আছি এবং আমাদের স্বরূপ কি ? বুদ্ধ ও বেদান্ত, কাল অনন্ত ; স্বামী বিবেকানন্দের ভাব কি বিশ্ব গ্রহণ করিবে ?

পুরাতন মন্দিরে 'অবধূত গীতা' আলোচিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রভাত-ফেরী, পূজা-পাঠাদি, শোভাযাত্রা ও আশ্রম-প্রাঙ্গণে ২২শে এবং ২৩শে মে ধর্মসভা হয়। ২২ তারিখে আশ্রম বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী। সভার পূর্বে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ড্রিল, বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌশল, ব্রতচারী নৃত্যাদি দেখানো হয়। ২৩ তারিখের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী। সভান্তে প্রায় দেড় হাজার ভক্তকে হাতে হাতে বোঁদে প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৪শে মে হরিণবাড়ী যুধিষ্ঠির বিদ্যানিকেতনে এবং ২৫শে মে নটেন্দ্রপুর নটেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে ধর্মালোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহেন্দ্রানন্দজী, স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী এবং স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী। সভার পূর্বে 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী। স্থানীয় নেতা শ্রীহরিপদ বাগুলি এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাসও বক্তৃতাদি দেন। সভান্তে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সমাজ-শিক্ষা বিজ্ঞান কর্তৃক পরিচালিত ছায়াচিত্র-প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রহ্লাদচরিত্র, মহাভারত ও ঠাকুর-স্বামীজীর জীবন-আলেখ্য আলোচিত হয়।

২৬শে মে মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'রানা প্রতাপ' নাটক অভিনীত হয়।

প্রচারকার্য

গত জানুআরি মাস হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ সারদা সঙ্ঘ—ডিগবয়, রামকৃষ্ণ আশ্রম— ডিগবয়, বিবেকানন্দ বিদ্যালয় - ডিগবয়, রামকৃষ্ণ আশ্রম—তিনসুকিয়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম—যোরহাট, বেঙ্গলীক্লাব—যোরহাট, গোলাঘাট, ফারকাটিং, ডিমাপুর রামকৃষ্ণ সোসাইটি—নাগাল্যাণ্ড, রেলওয়ে হাইস্কুল—ডিমাপুর, পুরানাবাজার কাছারী বস্তি, ডিমাপুর দুর্গাবাড়ী, দেশবন্ধু হাইস্কুল—হোজাই, রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি—গৌহাটী, বেঙ্গলী হাইস্কুল—গৌহাটী, রেলওয়ে হাইস্কুল—গৌহাটী, হিন্দী হাইস্কুল—গৌহাটী, বিশ্বহিন্দু পরিষদ—গৌহাটী, বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ইনিস্টিটিউট, নিউবঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ইনিস্টিটিউট, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র—পাণ্ডু, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা', 'ভারতের নারী ও মাতা সারদাদেবী', 'জাতীয় উন্নতিতে ধর্মের স্থান' ও 'আচার্য বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে মোট ৩০টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৪টি আলোকচিত্র সহযোগে দেওয়া হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদা মন্দিরের (বাগবাজার, কলিকাতা-৩) ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ—১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের সুমুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপূজার পুণ্যদিবসে জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী কর্তৃক এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়। সেই শুভ অনুষ্ঠানে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ অবস্থা হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহা ঠিক ঠিক একটি বিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতে নারীজাতির মধ্যে আদর্শ শিক্ষা-বিস্তারে কিভাবে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয় তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-কেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে এবং দীর্ঘকাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট ইহার পরিচালনাভার রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের উপর অর্পিত হয়। হস্তান্তরিত হইবার পর হইতে ইহা রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিচালিত হইতেছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক বিভাগে প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রাথমিক বিভাগটি স্বতন্ত্র ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ে বিষয়-নির্বাচনের জন্য তিনটি ধারা আছে: সাহিত্য, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান (Home Science)। এখানে দরিদ্র ছাত্রীরা বিনা-বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করে।

নিবেদিতা ছাত্রীসঙ্ঘ কর্তৃক সভাসমিতি, উৎসব, বিতর্ক, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি পরিচালিত হয়।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ৭,৭৫৯, ১৪টি সাময়িক পত্রিকা ও ৩ খানি সংবাদপত্র রাখা হয়।

শিল্পবিভাগ: ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'পুরস্ত্রী বিভাগ' নাম দিয়া দরিদ্র মহিলাগণকে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং এই বিভাগটি খুলিয়াছিলেন। বর্তমানে এখানে সূচীশিল্প, দরজীর কাজ, মোজাবোনা, খেলনা তৈরী, তাঁত-বোনা, চামড়ার কাজ প্রভৃতি শিখাইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

যে সব বালিকা আবাসিক ছাত্রী-হিসাবে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে চায়, তাহারা সারদামন্দিরে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। বর্তমানে ৪৭ জন ছাত্রীর মধ্যে ৪ জন বিনা-ব্যয়ে থাকে এবং ৪ জন আংশিক খরচ বহন করে।

জন্মাষ্টমী, রামনবমী, দোলযাত্রা, বুদ্ধপূর্ণিমা, শংকরাচার্যের জন্মতিথি, খৃষ্টজন্মদিন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

গয়া: রামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যবিবরণী (১৯৬২-৬৫) আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

পুণ্যতীর্থ গয়াধামে এই আশ্রমটিতে নিত্য পূজা ও ভজনাদি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই

চলিয়া আসিতেছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদাসহকারে উদ্‌যাপন করা করা হয়। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সময় দরিদ্রনারায়ণসেবা করা হইয়া থাকে। একটি নৈশ বিদ্যালয়, একটি গ্রন্থাগার এবং একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ২১,৭০৫ জনকে ঔষধ দেওয়া হয়।

উৎসব-সংবাদ

পাঁচগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম নামে একটি আশ্রম স্বামীজীর জন্মতিথিতে (১লা ফেব্রুআরি) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে দুইদিন ধর্মসভা ও প্রায় বারশত ভক্তের মধ্যে প্রসাদবিতরণ হয়।

২৩ ও ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সুখদানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেন।

আশ্রমে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় এবং একটি অবৈতনিক পুস্তকাগার পরিচালিত হইতেছে।

কালীঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ১২ই হইতে ১৫ই মে তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, কীর্তন ও রামায়ণগান প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রথম দিন সন্ধ্যায় ধর্ম-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী জীবানন্দজী মহারাজ, বক্তৃতা করেন অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। পাঠ ও সংগীতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন বাউল সম্রাট শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, রামায়ণভারতী শ্রীমতী সুমতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। উৎসবান্তে কয়েক শত ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হুগলী : গত বুদ্ধ-পূর্ণিমাতিথিতে হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক হুগলী 'বিবেকানন্দ ভবনে' অনুষ্ঠিত সভায় বুদ্ধের জন্ম-তিথি পালিত হয়। সভায় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর উপর আলোকপাত করেন শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বড়ুযা, শ্রীসুভূতিরঞ্জন বড়ুযা, শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন। সভান্তে সঙ্ঘের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক "জগজ্জ্যোতি" গীতি-আলেখ্য পরিচালিত হয়।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালনায় গত বুদ্ধপূর্ণিমার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী ভবনে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থা-গারের শুভ উদ্বোধন করেন। ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। সাধারণ বিভাগ, মহিলাবিভাগ, শিশুবিভাগ, গবেষণাবিভাগ ও পাঠ্যপুস্তক-বিভাগ-সমন্বিত এই গ্রন্থাগারটির উপযোগিতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রধান অতিথি শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিলাসমিতি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

চাকুলিয়া : স্থানীয় ভক্তগণের সহ-যোগিতায় গত ১৯. ৬. ৬৭ তারিখে সিংভূম জেলার চাকুলিয়ায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা অর্চনা এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, স্বামী অপ্রমেয়ানন্দ, স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য এবং শ্রীযতীন্দ্র নাথ কর এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, জননী সারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারা

সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচশতাধিক লোককে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

খড়িবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪শে হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই কয় দিন নিত্যপূজা, পাঠ, রামায়ণ ও কীর্তনগান, চলচ্চিত্রপ্রদর্শন ও বাউলসঙ্গীত উৎসবের অঙ্গ ছিল। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বৈকাল ৬ টায় স্বামী অমৃতত্বানন্দের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ ধর্ম-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া ঐদিন দ্বিপ্রহরে সহস্রাধিক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শিবতোষ দাশগুপ্তের দেহত্যাগ

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শিবতোষ দাশগুপ্ত গত ২৫শে জুন, ১৯৬৭ দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। টাটা কোম্পানীর কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দাস্তুর কোম্পানীর কলিকাতায় উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার-রূপে তিনি কাজ করিতেছিলেন। প্রথম প্রেসিডেন্ট সন্তোষ গুপ্ত মহাশয়ের দেহত্যাগের পর হইতেই তিনি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।। ওঁ শান্তিঃ।।।

মাতঙ্গিনী দেবীর দেহত্যাগ

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্যা মাতঙ্গিনী দেবী ৭৬ বৎসর বয়সে গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৬ ৪০ মিনিটে তাঁহার কসবা-স্থিত নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

গত দুই বৎসর যাবৎ পক্ষাঘাতে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।। ওঁ শান্তিঃ।।।



" নমো দেবি ! মহাবিদ্যে ! নমামি চরণৌ তব ।
সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্বার্থদে ! শিবে ॥"

শিল্পী—নিতাই চন্দ্র পাল

উদ্বোধন

দিব্যবাণী

(বিষ্ণুর স্তব)

নমো দেব্যৈ প্রকৃত্যৈ চ বিধাত্র্যৈ সততং নমঃ।
কল্যাণ্যৈ কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৭

সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণয়ে নমঃ।
পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ তে ভুবনেশ্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৮

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ।
অর্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হৃল্লেখায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৯

নমো দেবি! মহাবিদ্যে! নমামি চরণৌ তব।
সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্বার্থদে-শিবে ॥ ৪৯

—দেবীভাগবত—৩।৪

নমি মা প্রকৃতি, দেবি, ত্রিভুবন-বিধায়িনি, জননি তোমায়!
নমি নিত্যা, সিদ্ধিপ্রদা, সর্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী, কল্যাণী মাতায় ॥
সচ্চিদানন্দ-রূপিণী বিশ্বপ্রসবিনী মায়ে করি নমস্কার,
সৃষ্টি-আদি-বিধায়িনী ভুবন-ঈশ্বরী পদে নমি বারংবার ॥
মায়াময় জগতের অধিষ্ঠান তুমি মা গো, ব্রহ্মস্বরূপিণি!
চৈতন্যরূপিণী তুমি, হৃদয়-বাসিনী তুমি, প্রণমি জননি ॥
নমি দেবি, মহাবিদ্যে! তোমার শ্রীপদ-যুগে নমি বার বার!
সর্বার্থদায়িনি, শিবে! চির-মুক্ত করি দাও জ্ঞানের দুয়ার ॥

কথাপ্রসঙ্গে

শক্তি ও তাঁহার পূজা

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা সবই শক্তিরই—জগজ্জননীরই রূপ; আর যে সত্তাকে অবলম্বন করিয়া এই রূপ ফুটিয়া উঠে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মূল সত্তা যাহা তাহাই ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চেতনা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, একটি বৃক্ষ দেখিতেছি—উহার বৃক্ষত্ব যেটুকু, সেটুকু মায়া আর উহার ভিতর সত্তা যাহা তাহাই চৈতন্য। এই মায়াই শক্তি। তন্ত্রের ভাষায় শিব ও শিবার সংযুক্ত রূপই হইতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু; শিব চৈতন্যের প্রতীক, শিবা শক্তির।

ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি কিন্তু দুটি আলাদা সত্তা নয়, একই। নির্গুণ সত্তারূপে যাঁহাকে বিশ্বের চরম সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, তিনিই নিজেকে নিজ শক্তিবলে সগুণরূপে প্রকাশিত করিয়া জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন। তিনি সগুণ নির্গুণ, সাকার নিরাকার দুই-ই, অথবা সগুণা নির্গুণা, সাকারা নিরাকারা দুই-ই। বেদান্তের ব্রহ্ম ও তন্ত্রের মহাশক্তি অভিন্ন। মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে, শক্তি "সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী" (৩।৩৪)। দেবীভাগবতে আছে, মহাশক্তি বলিতেছেন, "সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্" (১।১৫।৫২), ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তিকে পৃথক দুটি সত্তারূপে ভাবাই যায় না—"সা চ ব্রহ্ম-স্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী। যথাত্মা চ তথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা" (৯।১।১০)। এই সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি, আর যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন তখন তাঁহাকেই শক্তি বলিয়া থাকি; অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি যেমন অভেদ, একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে ভাবা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, তন্ত্রে যাঁহাকে কালী বলিয়াছে, বেদান্তে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছে।

ব্রহ্ম ও শক্তি যে অভেদ তাহা বুঝাইবার জন্য দেবীভাগবতে বলা হইয়াছে: নির্গুণ সত্তা যেন প্রথমে একই দেহে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই হইলেন—"যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধা-রূপো বভূব সঃ। পুমাংশ্চ দক্ষিণার্ধাঙ্গো বামার্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা" (৯।১।৯)—দক্ষিণার্ধ চৈতন্যস্বরূপ, বামার্ধ শক্তিরূপিণী। মন-বুদ্ধিতে ধারণা করিবার মত সীমায় উপনিষদের এই সত্যটিই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এখানে—"স ঐক্ষত একোঽহং বহু স্যাম্"—স্বরূপে নিষ্ক্রিয় নির্গুণ সত্তার সহিত একীভূত শক্তি যেখানে ইচ্ছারূপে প্রথম বিকশিত হইতেছেন।

শিব-শক্ত্যাত্মক জগৎ

এই অর্ধ-নারীশ্বর রূপটিই সৃষ্টির অন্তর্গত স্থূলসূক্ষ্ম যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ। একটি সত্তাই নিজে চৈতন্য ও শক্তি দুটি রূপে বিকশিত হইবার পর শক্তি যেন 'বাজীকরের বাজী' দেখাইতে সুরু করিলেন এই চৈতন্যসত্তার সহিত সদা-সংযুক্ত থাকিয়াই—বিশ্বের স্থূলসূক্ষ্ম অসংখ্য বস্তুর সৃষ্টি সুরু হইল; তাঁহার নিজের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী ত্রিগুণময়ী রূপ হইতে সুরু করিয়া স্থূলতম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু পর্যন্ত সবই।

কিন্তু এই সবকিছুই অনিত্য, ইহাদের যেমন সৃষ্টি-স্থিতি আছে তেমনি বিনাশও আছে; সৃষ্টির সব কিছুরই মূল সত্তা ছাড়া, "তুরীয়া নির্গুণা মা" বা ব্রহ্ম ছাড়া, যত সূক্ষ্ম যত শুদ্ধই হউক না কেন নাম-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট কোন কিছুরই নিত্য অস্তিত্ব নাই—"নান্যদস্তি সনাতনম্"।

শক্তি ও চেতনা ছাড়া সৃষ্টির অন্তর্গত কোন কিছুরই মধ্যে যে আর কিছুই নাই, এ সত্যটি অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার প্রত্যক্ষ অনুভূতিসিদ্ধ। আমাদেরই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'মন্দিরের মেজে দেয়াল চৌকাঠ কোশাকুশি' প্রভৃতি জড়পদার্থের ভিতরও চৈতন্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'মা'-কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সর্বত্র—'মা-ই সব হয়ে রয়েছেন।'

জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি

যেমন বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্বগুলি আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও কেবলমাত্র যাঁহারা শিক্ষা দ্বারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জিত করেন তাঁহারাই সেগুলি প্রত্যক্ষ বা ধারণা করিতে সমর্থ হন, তেমনি কেবলমাত্র যাঁহারা সংযম ও একাগ্রতাদি সহায়ে মন-বুদ্ধিকে শুদ্ধ, সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করার উপযোগী করিয়া তোলেন তাঁহারাই সৃষ্টির সবকিছুর ভিতর চৈতন্য ও শক্তিকে দেখিতে পান। সাধারণ অবস্থায় না পারিলেও যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করার দ্বার সকলেরই নিকট সমভাবে উন্মুক্ত। তবে সাধারণ অবস্থাতেও, আধুনিক বিজ্ঞানের সত্যাবিষ্কারের ফলে এই সত্যের আংশিক আভাস আমরা পাইতেছি আজ সকলেই। সৃষ্টির মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তু আছে তাহার মধ্যে সত্তা বলিতে শক্তি ছাড়া যে আর কিছুই নাই, এ সত্য জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। এই শক্তিই বিভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, যাবতীয় জড়বস্তুরূপে নিজেকে প্রকাশিত করিতেছে, উহাকে ধরিয়া রাখিতেছে, আবার ভাঙিতেছেও—এই শক্তিই জড়জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ ঘটাইতেছে, এই শক্তি ছাড়া জড়জগতে আর কোন কিছুরই নিত্য সত্তা নাই, সবই সাময়িক প্রকাশ মাত্র—ইহাও আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য।

তবে বিজ্ঞানের এ আবিষ্কার অচেতন স্থূল প্রকাশের সীমা এখনো ছাড়াইতে পারে নাই। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জড়বস্তুর রূপ লইলেও, উহার সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করিলেও নিজের ইচ্ছায় সে কিছুই করিতে পারে না; বিভিন্ন পরিবেশে সে বিভিন্ন রূপ নিতে, বিভিন্ন ঘটনা ঘটাইতে বাধ্য হয়। দেখা গিয়াছে একই পরিবেশে সর্বদা একই ঘটনা ঘটে। পর্যবেক্ষণ সহায়ে সেগুলি জানিয়া তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'প্রকৃতির নিয়ম।' প্রকৃতি একটি শব্দমাত্র বা অজ্ঞাত কোন চেতন সত্তা কি না, প্রাকৃতিক নিয়ম তাহার ইচ্ছা কি না, বিজ্ঞান এ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারে না।

সৃষ্টির অন্তর্গত আর একটি শক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত যাহা কিন্তু নিজে এই পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শক্তিকে নিজের প্রয়োজনমত কাজে লাগাইতে পারে, অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই, উহা প্রাণীর মধ্যে বিকশিত ইচ্ছাশক্তি। একটি চিনির দানা এক জায়গায় পড়িয়া আছে; নিজের ইচ্ছায় সে নড়িবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু একটি পিপীলিকা তাহা করিতে পারে। মাটি নিজের ইচ্ছায় ইটের আকার লইয়া আগুনে প্রবেশ করিয়া রূপান্তরিত হইতে পারে না, কিন্তু

মানুষের ইচ্ছাশক্তি উহাকে ইটের আকার দিয়া, পুড়াইয়া তাহা সাজাইয়া বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারে। এই ইচ্ছাশক্তি যে চৈতন্যের সহিত সদা-সংযুক্ত, তাহাও আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ —চৈতন্য যেখানে বিকশিত নয়, ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সেখানে দেখি না আমরা।

আরো একটি শক্তির সহিত আমবা পরিচিত —প্রাণশক্তি ; এই শক্তি উদ্ভিদের একটি বীজের বা প্রাণীর অতিক্ষুদ্র একটি জীবকোষের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনারূপে প্রচ্ছন্ন থাকিযা উহাকে উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহে পরিণত কবে উহাদেব প্রতিটি বিভিন্ন খুঁটিনাটি সহ। সাধাবণ অবস্থাতেই এই শক্তির সহিতও আমরা চৈতন্যকে সদা-সংযুক্ত দেখিতে পাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

স্থূল বস্তুতেও শক্তি ও চৈতন্য সদা-সংযুক্ত

প্রাণীর মধ্যে আমবা এই মানস- বা ইচ্ছা-শক্তির এবং প্রাণশক্তির বিকাশের সহিত সদা-সংযুক্ত চৈতন্যেরও বিকাশ দেখিতে পাই, কিন্তু অচেতন পদার্থে এসবের কোনটিকেই দেখি না। কিন্তু দেখি না বলিযাই আজ বলিতে পাবা যায না যে সেখানে উহা নাই—যদি না থাকিত, তবে অচেতন পদার্থ হইতে উহারা বিকশিত হয় কি করিয়া? স্থূল পদার্থ (ম্যাটার) অচেতন শক্তি (এনাবজি) ছাড়া আর কিছুই নয় বলিয়া, উহা এনারজির ই একটি অবস্থা বলিয়া উহার মধ্য হইতে অচেতন শক্তির বিকাশ সম্ভব। অচেতন শক্তি যদি প্রাণশক্তির বা ইচ্ছাশক্তিব বা চৈতন্যেব একটি (অপেক্ষাকৃত স্থূল) অবস্থা না হইত, তাহা হইলে উহার ভিতর হইতে এগুলির বিকাশ ঘটে কিরূপে? জড়বিজ্ঞানের আজ-পর্যন্ত-আবিষ্কৃত জ্ঞানের সীমানার মধ্যে এরূপ একটি ঘটনা কোথাও ঘটিতে দেখা যায নাই যে, শূন্য হইতে কোন কিছু সৃষ্ট হইল বা উহার বিনাশের পর শূন্য হইয়া গেল, বস্তুর বিকাশ বা পরিবর্তন যেভাবেই যাহাই হউক না কেন, দেখা যায় একটি সত্তা সেখানে সর্বাবস্থায় থাকিয়াই যাইতেছে। কাজেই এখনো বিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমার মধ্যে না আসিলেও সৃষ্টির মধ্যে একটি শক্তিই যে ইচ্ছাশক্তি রূপে, প্রাণশক্তি রূপে এবং বিভিন্ন এনারজি রূপে রূপায়িত হইতেছে, এবং চৈতন্যের সঙ্গেও সর্বাবস্থায় উহা সংযুক্ত থাকে সত্যদ্রষ্টাদেব প্রত্যক্ষ করা এই সত্যকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও 'যুক্তিবিরুদ্ধ' বলা চলে না। চৈতন্য ও তৎসংযুক্ত শক্তি কোথাও প্রকাশিত, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকে এই মাত্র প্রভেদ। যেমন জডবস্তুর মধ্যে আমরা এনারজিকেই বিভিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাই—শুদ্ধ এনারজি রূপে, ম্যাটার-আশ্রিত এনারজি রূপে এবং প্রচ্ছন্ন-শক্তি ম্যাটার রূপে, ম্যাটার রূপেও সে তাহার মূল কাবণ এনারজির সহিত সদা-সংযুক্ত। কাজেই সূক্ষ্মতম সত্তা চৈতন্য যদি শক্তিরও মূল সত্তা হয়, তাহা হইলে শক্তির সহিত উহা সদা-সংযুক্ত থাকাই স্বাভাবিক।

শক্তির পূজা

অনুমান নয়, যুক্তি নয়, শুধু বুদ্ধির ধারণাতেও নয়, সত্যদ্রষ্টাগণ সৃষ্টবস্তুর সব কিছুরই ভিতরে চৈতন্যের সহিত সদা-সংযুক্ত মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সৃষ্টির অতীত প্রদেশে চৈতন্য ও তাব শক্তি অভেদ, অদ্বয় রূপে বিদ্যমান, কিন্তু 'সৃষ্টি' যেখানে, সেখানে সর্বত্রই সত্তা ও শক্তি, শিব ও শিবা দুটি রূপেই সদা-সংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান।

মা যখন "মহাযোগীশ-হৃৎপুরে"—চৈতন্যের প্রতীক মহেশের হৃদয়ের গহন প্রদেশে অবস্থান করেন, তখন দুই বলিয়া কিছুই থাকে না; আর

যখন বাহিরে আসেন তখনই হন অর্ধনারীশ্বর; সৃষ্টির সব কিছুই এই অর্ধনারীশ্বরেরই বিভিন্ন অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলত্বের দিকে তাঁহার বিকাশ যতই যাইতে থাকে, ততই বৈচিত্র্য হয় অধিকতর, ভঙ্গুরতা, মৃত্যুভয়, দুঃখ ততই বাড়ে এবং একেবারে জড়রূপে প্রকাশ যেখানে সেখানে কোন অনুভূতিরও প্রকাশ থাকে না।

এই জড়ত্ব হইতে আমাদের স্বরূপের দিকে যে কোন অগ্রগমনই তাঁহার পূজা—মায়ের পূজা। যাহা কিছু আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে, স্বরূপকে অধিকতরভাবে প্রকাশিত করিতে সহায়ক তাহাই মাতৃপূজার, শক্তিপূজার উপকরণ। যে উদ্দেশ্যে যে পূজা, যথাযথভাবে তাহা সাধিত হইলে মা প্রসন্না হইবেনই, তাহা ফলপ্রসূ হইবেই।

জড়শক্তিরূপিণী, প্রাণরূপিণী, ইচ্ছারূপিণী, কারণানন্দবিগ্রহা প্রভৃতি মায়ের বিভিন্নরূপের পূজার বিধি বিভিন্ন। কিন্তু সবই তাঁহারই পূজা। 'রাজযোগ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণকে যেমন প্রাণায়াম বলে, রসায়ন পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে জ্ঞানলাভকেও সেইরূপ প্রাণায়াম বলা যায়—উহা জড়-নিয়ামিকা শক্তির নিয়ন্ত্রণ। এ সবই শক্তির পূজা। মানস শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করাও তাহাই। শক্তির সর্ববিধ পূজাতেই কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে হইলে, মায়ের প্রসন্নতা অর্জন করিতে হইলে একাগ্রতা চাই-ই। আর, 'ভারতের শক্তিপূজা'য় স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন: চাই বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ, অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া শক্তির অবতরণের পথ প্রশস্ত রাখা এবং স্বার্থত্যাগ বা আত্মবলিদান। তাহা হইলেই মা প্রসন্না হইয়া শক্তির যে-রূপের উপাসনা আমরা করিতেছি, তাহার সীমায় জ্ঞানের দুয়ার পূর্ণ অবারিত করিয়া দিবেন। আর, যে কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইলেই ঐ বিষয়টির উপর পূর্ণ আধিপত্যও সঙ্গে সঙ্গে আসে আমাদের—যেমন প্রকৃতির নিয়মগুলি জানিতে পারিলেই আমাদের জড়শক্তির উপর আধিপত্য আসে।

এভাবে শক্তির উন্নত হইতে উন্নততর বিকাশের পূজার ফলের মধ্যেও ব্যবধান বিস্তর। তাঁহার সর্বোচ্চ বিকাশকে—'কারণানন্দবিগ্রহা' 'পরমানন্দময়ী' 'ব্রহ্মময়ী' মাকে পূর্ণ সংযত ও পূর্ণ একাগ্র হইয়া পূজায় তুষ্ট করিতে পারিলে সৃষ্টির সবকিছুরই জ্ঞান করায়ত্ত হয়, সবকিছুরই উপর আধিপত্য আসে আমাদের। কিন্তু পূজক "সৌম্যাসৌম্যতরা-শেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী" মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন একবার পাইলে আর কিছুই চায় না, আর কোন পাওয়াকেই তার চেয়ে বড় বলিয়া মনে হয় না তাহার। তাহার তখন একমাত্র এই প্রার্থনাই জাগে মনে—"মা, যাহাতে তোমার এইরূপ অবাধদর্শন নিত্য লাভ করিতে পারি, তাহাই করিয়া দাও", বা ইহার পারে যেখানে তোমার স্বরূপ, সেখানে আমায় লইয়া যাও—"সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্বার্থদে শিবে!"

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণ ভরসা

The Math,
Belur P. O.
Dt. Howrah.
7th. May, 1898

My Dear Sri Mohantaji Maharaj,

আশা করি তুমি ভাল আছ, অনেক দিন তোমার নিকট হইতে কোন পত্রাদি পাই নাই। সত্বর কেমন আছ লিখিয়া সুখী করিবে। স্বামীজী ২।৩ দিন হইল Darjeeling হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। এবার Darjeeling-এ কোন উপকার হয় নাই, বরং জ্বর ইত্যাদি হইয়া রোগা হইয়া গিয়াছেন। এখানে কতদিন থাকিবেন তাহার ঠিক নাই। পরে Kashmere যাইতে পারেন। সঙ্গে বোধ হয় Mrs. Bull, Miss Noble & Miss Macleod যাইবেন।

তোমার ওখানে কিরূপ চলিতেছে সবিশেষ লিখিবে। কোনরূপ কষ্ট করিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। অর্থের আবশ্যক হইলে লিখিলে পাঠান যাইবে। কলিকাতায় Plague panic খুব হইতেছে, অনেক লোক সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

স্বামীজী তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, Alasinga-কে বলিবে যে টাকা চাহিয়াছিল Press করিবার জন্য তাহা উপস্থিত হইতে পারে না, কারণ যদ্যপি Plague Hospital করিতে হয় তজ্জন্য অনেক খরচ হইবে এবং কলিকাতায় একটা Press করিয়া Paper start করিতে হইবে, নচেৎ কলিকাতায় কার্য কিছুই হইতেছে না। আর তুমিও তো স্বামীজীকে লিখিয়াছ যে টাকা দেওয়া ঠিক নয়, তোমারই suggestion তিনি accept করিলেন।

মোহান্ত! তুমি কবে কলিকাতায় আসিবে? মঠের জন্য যাহা (জমি) খরিদ করা হইয়াছে তাহা একবার দেখিবে না?

More in my next, with love & dandabat,
Yours sincly
Brahmananda

(২)

স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লিখিত

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ

৭।৭।৯৮

প্রিয় স্বামী (অখণ্ডানন্দ),

তোমার নিকট ইহার পূর্বে পত্র দিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। আশা করি তুমি এজন্য আমাকে মাফ করিবে। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, আমি কঠিন অমাশয়রোগে খুব ভুগিয়াছি। এখনও সামান্যভাবে ভুগিতেছি। আমি আজকাল পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইয়াছি। তোমার প্রেরিত আম ৩।৪ দিন স্টেশনে থাকার পর এখানে পৌছিয়াছে। তোমার অসাবধানতা-বশতই অধিকাংশ আম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি লিখিয়াছিলে যে, তুমি রেলওয়ে রসিদ আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। আমরা রসিদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুই সময়মত আসিয়া পৌছিল না। ইতিমধ্যে জনৈক ভদ্রলোক একখানা পোস্টকার্ড লিখিয়া জানাইলেন যে, ভুলক্রমে সেই রসিদ আমের ঝুড়ির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। আমরা বালী স্টেশনে লোক পাঠাইয়া ঐ ঝুড়ি আনাইয়া খুলিয়া দেখি কতকগুলি আম বেশ ভাল আছে, আর কতকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে যেগুলি ভাল ছিল সেগুলি সত্যই খুব সুস্বাদু ছিল। তুমি বড়সাহী ও কপালভাঙ্গা আমের কলম পাঠাইতে চেষ্টা করিবে এবং আরও দুই রকমের, যাহার size বেশ বড় হয়। তুমি কখন ঐ কলম পাঠাইবে? মুর্শিদাবাদ হইতে এখন প্রতিদিন জাহাজ যাতায়াত করে। এখন উহা পাঠাইবার অনুকূল সময় নয় কি? আমি তোমার অসুবিধা সৃষ্টি করিতে চাই না। তুমি তোমার সুবিধামত উহা পাঠাইবে। অনাথাশ্রমের জন্য তুমি খুব পরিশ্রম করিতেছ জানিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি। টাকার জন্য দমিয়া যাইও না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেখানে নিঃস্বার্থভাবে কাজ হয় সেখানেই ভগবান নানাভাবে সে কাজ করিতে সাহায্য করেন। তবে মনে রাখিও— যেখানে নামযশের আকাঙ্ক্ষা থাকে সে কাজের ফল দুঃখপূর্ণই হয়।

স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীরা এখনও কাশ্মীরে আছেন। কাশ্মীরের মহারাজ শ্রীনগরে তাঁহাকে একখণ্ড জমি দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে তোমার রামকৃষ্ণ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমাদের নূতন মঠের জমিতে রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু হইয়াছে। আশা করা যায় দুই মাসের মধ্যেই উহা শেষ হইয়া যাইবে। জমিটা জাল দিয়া ঘিরিয়া ফেলার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। যখন তুমি খুব টাকার অভাব বোধ করিবে, তখন বিলম্ব না করিয়া তোমার দাস ব্রহ্মানন্দকে লিখিও, সে তোমার এই মহৎ কাজের সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, এমন কি তোমার এই কাজের জন্য জীবন বলি দিতেও প্রস্তুত। পরের পত্রে আবার লিখিব। তোমার জবরজঙ্গ ও অন্যান্য হংস, সঙ্গ প্রভৃতি কেমন আছে? ভালবাসা জানিও।

তোমার একান্ত আপনার

ব্রহ্মানন্দ

স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি

Ramakrishna Math, Belur P. O., Howrah Dist.

বুধবার। ২৪শে জুন, ১৯২৫

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী, তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ জানিয়া ও তোমরা সকলে শারীরিক ভাল আছ জানিয়া আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি; যদ্যপি সুবিধা হয় এইবার উপাধির পরীক্ষা দাও।

এখানে আমি ও সকলে ভাল আছি। ঢাকা থেকে আসিবার পূর্বে তোমাদের সহিত আর একবার দেখা করিবার ইচ্ছা খুব হইয়াছিল। সে সময় অনেক লোক, মেয়ে-পুরুষ প্রায় সমস্তদিন এমনকি সন্ধ্যার পর পর্যন্ত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছিল। সুতরাং সময় পাইলাম না, মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল।

খুকীকে আর এখন আলাদা কিছু লিখিলাম না। তাকে আমার আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানাবে।

গভীর চিন্তা, সেই গভীর ধ্যান, মন সেই দিকে রাখা। সময় সময় মন কত দিকে ছুটে যায়, সেই সময় সাবধান থাকিতে হয়। গৃহস্থ-বাড়ীতে যদি চোর আসে আর গৃহস্থ যদি জাগিয়া থাকে, চোর সেখানে কতক্ষণ থাকে? যার মায়া, সেই মহামায়া পশ্চাতে, মায়া ছুটে গেলে পর মহামায়া অন্তরে বাহিরে বিরাজমান।

মায়ী, সৎ চিন্তা ও সৎ চর্চা যার যতো থাকে, সেই লোক ততো সুখী, আর তার ও-ভুবন-ভুলান মায়াতে আবদ্ধ হতে হয় না, সকল সময় সে মনের আনন্দে থাকে।

মায়ী, সর্বভূতে তিনি রহিয়াছেন এইটুকু জানিতে হবে ও উপলব্ধি করিতে হবে, যেমন গাজীপুরে পওহাড়ীবাবার কাছে মানুষ কি জানোয়ার যে কেহ যাইত তিনি দেখিতেন নারায়ণ আসিয়াছেন। একদিন একটা গাধা আসিয়াছিল, অন্য লোক হেট্ হেট্ কোরে তাড়াচ্ছিল, পওহাড়ীবাবা জানিতে পারিয়া বলিলেন, নারায়ণ আয়া কুচ্ খানেকো দেও। একদিন একজন চামার মুচি এসেছিল, অপর লোকে তাকে বলিল চলা যাও, পওহাড়ীবাবা বলিলেন, ও-মেরে গুরু মহারাজ নারায়ণ হায়, আসন দাও। চামার মুচি হাম্ হায় (আমি)।

মায়ী, আজ আর বেশি লিখিব না। আর আমার হাতের যা লেখা বাঁকা চুরা, তোমাদের কেমন সুন্দর লেখা—যেন ছাপার অক্ষর! আমার খারাপ লেখা দেখে কিছু দোষ ধোরো না মায়ী।

মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছাদি তোমার পিতামাতা ও তোমরা সকলে জানিবে। এখানকার সব সাধুদের শুভাশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে।

মায়ী, যখন তোমার সুবিধা হবে কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

তোমাদের সুবোধানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শ
ও
ভবিষ্যৎ ভারত*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

মানুষ প্রথম অবস্থায় ছিল পাহাড়ে, পর্বতে, গুহায়, জন্তু-জানোয়ারেরই প্রায় সমপর্যায়ে, বর্বর অবস্থায়। তবে অন্যান্য জন্তুর সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল—তাকে বিচারশক্তি দিয়েছিলেন ভগবান, যা অন্য জন্তুর মধ্যে নেই। সেই বিচারশক্তি অবলম্বনে ধীরে ধীরে এগিয়ে মানুষ উন্নত হতে উন্নততর স্তরে পৌছুতে থাকে। সে ক্রমে সভ্য হয়; ঘরবাড়ী তৈরী করে, সমাজ গঠন ও রাজশাসন প্রবর্তন করে, রাজা নির্বাচন করে, আইন-কানুন মেনে সে বসবাস করতে থাকে। তখনো তার বিচারশক্তি কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়-জগতেই নিবদ্ধ। ভোগের জন্য বিরাট বিরাট বাড়ী, ভাল ভাল ফুলবাগান, সাহিত্য, কবিতা, নাচ, গান প্রভৃতি কত কি সৃষ্টি করে সে। তার যাত্রার শেষ এখানেও নয়। জগতের রহস্য সে জানতে চায়—জগৎটা কি, এর পিছনে কি রয়েছে, কে একে চালাচ্ছে? নিজের বিচারশক্তি দিয়ে সে সন্ধান করে চলে। এই সত্যের সন্ধান ক্রমে তাকে অন্তর্জগতে নিয়ে যায়, অবশেষে সে আত্মজ্ঞান লাভ করে। তখন তার যাত্রা শেষ হয়। এই হল মানুষের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস।

ইতিহাস পড়ে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক দেশের সভ্যতার পশ্চাতে একজন মহাপুরুষের জীবন,—তাঁর উপদেশ মেনে নিয়ে সেই দেশ উন্নত হয়। তারপর সেই শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে সেই সভ্যতাও নষ্ট হয়ে যায়। দু-হাজার বছর আগে ভূমধ্যসাগরের তীরে রোমান সভ্যতার খুব প্রতিপত্তি ছিল। তাদের পতনমুখে তারা গল বলে এক বর্বর জাতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। গলরা রোমান সভ্যতাকে নষ্ট করে দেয়। ঠিক সেই সময় প্যালেষ্টাইনে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়। তাঁর যে দশ বারো জন শিষ্য ছিলেন তাঁরা এবং তাঁদের শিষ্যেরা সারা ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে দেন। নতুন সভ্যতা এল। রোমান সভ্যতা নষ্ট হয়ে তার জায়গায় পাশ্চাত্য সভ্যতা সৃষ্ট হল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সারা ইউরোপ আবার শান্তিপূর্ণ হল। মানুষ শান্তিতে থাকতে, খেতে, পরতে পেয়ে নিশ্চিন্তভাবে থাকতে পারল।

যখন মানুষ ভাল অবস্থায় থাকে তখন ভগবানের কথা ভুলে যায়। ইউরোপও যে আদর্শ নিয়ে জীবনে শান্তি লাভ করেছিল, সে আদর্শও ক্রমে ভুলে যেতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার হল; আস্তে আস্তে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় সহায়ে যা আমরা দেখতে পাই না মানুষ এখন তা মানতে চাইল না। ফলে এল নাস্তিকতা। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা কোথায় এসে পৌছেছে, তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। এই সময় একজন মহাপুরুষের আসার প্রয়োজন হল, এবং যথাকালে ভগবান আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তখন আবার নতুন সভ্যতার বীজ ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীই হল সেই বীজ।

---

* মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন বাংলার এক সুদূর পল্লীতে, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার লেশমাত্র পৌঁছায়নি। পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে মায়ের পূজারী হয়ে এলেন। সেখানে ভগবান-লাভের জন্য অতন্দ্র সাধনায় মগ্ন হলেন। পরিশেষে ভগবানের দর্শনলাভ করলেন। নিজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দিয়ে তিনি জগৎকে দেখালেন যে ভগবান আছেন। এদিকে স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছেন ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। কিন্তু কোথাও তাঁর সমস্যার সমাধান পেলেন না। যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এসে তাঁকেও প্রশ্ন করলেন, তিনি বললেন, "আমি ভগবানকে দেখেছি; তোমাকে যেমন দেখছি, সেইভাবে। তোমাকেও দেখাতে পারি।" তাঁর সংস্পর্শে এসে স্বামীজীর অবিশ্বাস দূর হল। তিনি ঠাকুরের ভাব নিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হল—স্বামীজীর মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যেন মিলন ঘটল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঈশ্বরানুভূতির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শুধু যে এ যুগের বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের সন্দেহের নিরাস করলেন তা নয়, তিনি আরো দেখালেন—সকল ধর্মের ভিতর দিয়ে ভগবান লাভ করা যায়। তিনি হিন্দুধর্মের অন্তর্গত শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত সব মতের সাধনা করলেন। অন্যান্য ধর্মের, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্মের মতেও সাধনা করে দেখালেন যে সব ধর্মই মানুষকে একই জায়গায় নিয়ে যায়। তবে ভেদ কেন? ভগবান হচ্ছেন অসীম। অসীমকে সসীম ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই ভেদের প্রতীতি হয়। তিনি বললেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না। তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় আপনি কিরূপ অনুভব করেন?" তিনি বললেন, "আমি তো তা বলতে চাইরে, কিন্তু মা যে আমার মুখ চেপে ধরেন!" বোবা যেমন সন্দেশ খেয়ে সন্দেশের স্বাদ কিরূপ অপরকে তা বোঝাতে পারে না, যাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তাঁরাও তেমনি ব্রহ্মকে ভাষায় বোঝাতে পারেন না। অসীমকে সসীম ভাষায় বোঝান যায় না।

সমস্ত জগতে যে ধর্ম নিয়ে মারামারি কাটাকাটি হয়, তা এই অসীমকে সসীম-ভাষায় প্রকাশ নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, সমস্ত ধর্মই সত্য। যে কোন ধর্মপথ ধরে আমরা একই লক্ষ্যে পৌঁছাই।

সমস্ত জগতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জগতে যা কিছু আমরা দেখি তা নামরূপ মাত্র। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়। তাঁর কাছে সবই আপনার, জগতে সকলকেই—পাপী হোক, তাপী হোক, স্বদেশী হোক, বিদেশী হোক, যে কোন ব্যক্তিকেই তিনি আপনার করতে পারলেন। কেননা জগতের সকলের ভিতরেই তিনি একই আত্মাকে দেখতে পেতেন। জগতের সব কিছুর পিছনে আত্মা আছেন।

স্বামীজী তাঁর কাছে আসার পর তাঁরও জ্ঞান হল। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখার পর চিকাগো গেলেন। ভারতবর্ষ পূর্বে বহুবার জগৎকে শান্তির বাণী শুনিয়েছে। স্বামীজী এবারও সেই শান্তির বাণী শোনাতে গেলেন সারা জগৎকে। ভারতের ভাগ্য-বিধাতাই তাঁকে এ কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত আমেরিকা তিন চার বছর ধরে ঘুরে স্বামীজী দেখলেন যে, সেখানে ভোগের জিনিসের কোন অভাব নেই, তাদের

অভাব কেবল ধর্মের। আর ভারতবর্ষ ঘুরে তিনি দেখেছিলেন এদেশে ধর্মের আদর্শের অভাব নেই কিন্তু অভাব শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে। সেজন্য তিনি পাশ্চাত্যের জড়বাদের আদর্শ এবং প্রাচ্যের অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ—এই দুটিকে একত্র করে জগতের সামনে এক নতুন আদর্শ তুলে ধরলেন। এই নতুন আদর্শ তিনি এই সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যক্ত করলেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' তিনি জেনেছিলেন যে, ভারতবর্ষের আদর্শ ধর্মের আদর্শ। ধর্মকে ধরে থাকতে হবে। সেজন্য তিনি জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করতে বললেন। বললেন, যা কিছু কাজ করবে তা ভগবানের উপাসনা-জ্ঞানে করবে। এই দৃষ্টি নিয়েই লোককল্যাণকর কাজ করতে হয়। ধর্ম ছাড়া শান্তির পথ নেই। পাশ্চাত্যবাসীরা সমাজ-কল্যাণের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করেও শান্তি পাচ্ছে না, কেননা এই সেবার পিছনে কোন আধ্যাত্মিক আদর্শ নেই। সেজন্য স্বামীজী আমেরিকাবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন—ধর্ম ছাড়া কিছু হবার নয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের সামনে তিনি নতুন আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। আমরা যা কিছু কাজ করি—স্কুল, হাসপাতাল, রিলিফ—সব কিছুই করি এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। সেজন্য আমাদের যা কিছু কাজ সবই পুজোর মত—এই ছিল স্বামীজীর আদেশ। যে কোন কাজ উপাসনা হিসাবে যদি করে যেতে পার, তাহলে তোমার মুক্তি হবে। এই আদর্শ নিয়ে যদি আমরা লোকের সেবা করি তাহলে দু-দিকই রক্ষা হয়—আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও সমাজসেবা। যেমন স্টীল-ফ্যাক্টরীর উদ্দেশ্য হল স্টীল তৈরী করা, তবে এর সঙ্গে কিছু অন্য জিনিসও তৈরী হয়, যার বাজারে দাম আছে। কিন্তু সে জিনিস তৈরী করা স্টীল-ফ্যাক্টরীর উদ্দেশ্য নয়। ঠিক সেই রকম আমাদের উদ্দেশ্য হল ভগবান লাভ করা, সমাজসেবা নয়। স্বামীজী সঠিকভাবে আদর্শ দেখিয়ে গেলেন। স্টীল তৈরী করতে গেলে যে রকম 'বাই-প্রোডাক্ট' বের হয়, আমাদের ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে কাজের মাধ্যমে যা কিছু হচ্ছে সেও ঠিক তাই। যখন আমরা তা ভুলে যাই, তখনি ক্ষতি হয়। আমাদের সকলকে এ আদর্শ ধরে চলতে হবে। মুক্তিলাভই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নতুন আদর্শকে চার-দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভক্ত ও সাধু সকলের সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সহজ নয়। এ ভার আমাদের ওপর আছে একথা ভুললে চলবে না। National life-এ—সমগ্র জাতির জীবনে স্বামীজী এই ভাবটি আনতে চেয়েছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই, রাজনীতি সমাজনীতি সর্বত্রই ধর্মের প্রভাব আনতে হবে। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী, সেজন্য প্রত্যেক মানুষকেই জাগিয়ে তুলতে বলেছেন। সেই ভাব ঠিক ঠিক সকলের মধ্যে প্রচার করতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ জীবন স্বামীজী সারা বিশ্বে প্রচার করে এলেন। স্বামীজী সমগ্র জগতের সামনে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

এবার আমরা দেখব, শ্রীশ্রীমা জগতে কি দিয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। শুধু কি এই আদর্শই তিনি দেখাতে এসেছিলেন? না, তা নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরও তিনি চৌত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি

জগতে মাতৃভাব দেখাতে এসেছেন। তা ছাড়া আরো কিছু ছিল কি? আর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সংগঠন। আপনারা অবশ্যই ইহা জানেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি বুদ্ধগয়া দর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে সাধুদের মঠ দেখে তিনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর ছেলেরাও যেন এইভাবে থাকতে পারে। তার জন্য আজ বেলুড়মঠ। তিনি না থাকলে তাঁর বৈরাগ্যবান সন্তানেরা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তেন, তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব হত না। স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য জগতে গেলেন, তিনি মায়ের আদেশ নিয়েই গিয়েছিলেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা সব মাতৃগতপ্রাণ ছিলেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, সংসারের দিকে তাঁর কোন লক্ষ্য ছিল না। এদিকে সংসারী ভক্তদিগকে সংসার সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীমা না থাকলে এই সম্বন্ধে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগত। তাই তিনি মাকে রেখেছিলেন এই সকল উপদেশ জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত করতে হয় তা দেখিয়ে দেবার জন্যে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মা কামারপুকুরে কত কষ্ট করে বাস করেছিলেন। মায়ের ভাইদের সংসার সম্বন্ধেও আপনারা জানেন। তাঁরা ছিলেন ঘোর সংসারী। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: মায়ের বাড়ী জয়রামবাটীতে জলকষ্ট দেখে একজন ভক্ত কুয়া করে দিতে চাইলে মায়ের ভাইরা মাকে বললেন, "তোমার জমি কোথায়? কুয়া করার জন্য জমি নিলে ঐ জমিতে টাকা বিছিয়ে দিতে হবে।" মা এই সমস্ত সহ্য করে অনেক বছর ভাইদের সঙ্গে কাটালেন। আর সংসারে থেকে ভগবান লাভ করতে গেলে কিভাবে থাকতে হয় তা ভক্তদের দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। এইভাবে নিজ জীবন দেখিয়ে তিনি জগতে আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। কেউ মঠে এলে বাবুরাম মহারাজ বলতেন—"যা, জয়রামবাটী গিয়ে দেখে আয় বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ধান কুটছেন, ঘর নিকুচ্ছেন, ভক্তদের সেবা করছেন।"

জগতে পর পর বহু আদর্শ এসেছে। বর্তমানে স্বামীজীর ideal (আদর্শ)-টাই ঠিক করে ধরতে হবে। তাঁর Centenary (জন্ম-শতবার্ষিকী)-র সময় আমাদের রাজনীতিবিদ্, শিক্ষানীতিবিদ্, চিন্তাশীল মনীষীরাও এই কথাই চিন্তা করেছেন। তাঁরা স্বামীজীর ideal-টার উপর জোর দিয়েছেন। আপনারা শুনে সুখী হবেন যে সুদূর Finland (ফিনল্যাণ্ড) হতে তাঁদের একজন ভূতপূর্ব Minister (মন্ত্রী) এসেছিলেন। তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে দেখলাম স্বামীজীর Works (রচনাবলী) তাঁরা আমাদের মতই পড়ছেন। তিনি বললেন, "স্বামীজীর Works আমরা পড়ি ও স্বামীজীর idealগুলিকে জীবনে শক্তিপ্রদ বলে গ্রহণ করি।" মধ্যপ্রাচ্য থেকে একদল ব্যবসাজীবী (Tradesmen) আমাদের কেরলের একটি আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁরা বললেন, "আমরা স্বামীজীর বই পড়ি, আমাদের একটা Study Circle (পাঠচক্র) আছে, তাতে নিয়মিত আলোচনা করি।" ইরান দেশেও তাঁর বাণীর সমাদর হয়েছে। ইরানের একজন বিশিষ্ট সম্পদশালী ভদ্রলোক, যিনি নিজে একটি বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন, যখন বেলুড়মঠ দেখতে এসেছিলেন তখন আমাদের বললেন, "আমাদের দেশে একটা Centre (কেন্দ্র) করুন। যাবতীয় খরচ আমি বহন করব।"

এইভাবে দেখা যায় ঠাকুর যে কোথায় কি করছেন তা বোঝার উপায় নেই। স্বামীজী

তাই বলেছেন—"Ramakrishna-ideal (শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ) জগতের একমাত্র প্রাণশক্তি এবং ভারতবর্ষ রামকৃষ্ণের।" আমাদের রাজনীতি, শিক্ষানীতি সব কিছুতেই এই আদর্শকে মেনে চলতে হবে।

আজকাল আমাদের মেয়েরা লেখাপড়া শিখছেন, অফিসে, কোর্টে, রাজনীতিতে, পার্লামেণ্টে, গভর্ণমেণ্টে—সব জায়গায়ই তাঁরা কাজ করে উন্নতির চেষ্টা করছেন। এটা সত্যিই আনন্দের কথা। এতদিন তাঁরা রান্না-ঘরে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যদি তাঁরা ভারতবর্ষের মেয়েদের আদর্শ ভুলে যান, তাহলে খুব দুর্ভাগ্যের কথা। যদি আমাদের মেযেরা আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হন, তাহলে শুধু আমাদের নয়, সমগ্র জগতেরও দুর্ভাগ্য। এজন্য আমাদের ভুললে চলবে না যে, মা সারদাদেবী জীবনে যে মাতৃভাব, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তা মেনে চললে কোন দুঃখই আমাদের থাকবে না। ঠাকুর, মা, স্বামীজী তাঁদের জীবনে যে আদর্শ দেখিয়ে গেলেন তা আমাদের পালন করতে হবে। এ ছাড়া কোন উপায়েই ভারতবর্ষের উন্নতি করা যাবে না। যে যতই বলুক না কেন, আমাদের দেশে কোন রকম বাইরের আদর্শ চলবে না। ঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শ—'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ধরে আমাদের এগুতে হবে, যাতে নিজেও মোক্ষলাভ করতে পারি, জগতেরও সেবা করতে পারি। আমি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন আমাদিগকে শক্তি দেন, আমরা যেন সেইভাবে চলতে পারি।

॥ হরিঃ ওঁ তৎ সৎ ॥

আগমনী

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

একি আলো আর একি রূপ নিয়ে
　　মা তুমি ধরাতে এলে,
হংস-বলাকা নির্মল নভে
　　পাখনা দিয়েছে মেলে।

শিশিরে-বাতাসে কাশবন হাসে,
　　শেফালি-সুবাস জাগে,
অপরাজিতার নীল চুয়ে পড়ে
　　ভোরের অরুণ-রাগে।

এলে যদি মাগো চির ও-বিভায়
　　দশদিক ভরে দাও,
দুর্গতি নাশো জননী দুর্গা
　　পাপ-তাপ হরে নাও!

বিশ্বভুবনে দেখো মাগো আজো
　　দানব অট্টহাসে,
অসহায় জীব, আর্ত জীবন
　　নিত্য কাঁপিছে ত্রাসে!

তোমার খড়্গে অসুর নাশো মা
　　চণ্ডী খড়্গপাণি,
রিপুসংহার—সে তো মা তোমার
　　চির মহিমাই জানি!

মাতৃকণ্ঠ

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদ : অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

সন্তান আমার, ওঠো, জাগো, মানুষের মতো এগিয়ে যাও। বীরের মতো জীবনের সব ভার বহন করো। যা তোমার দায়িত্ব পূর্ণশক্তিতে তা পালন করো।

মা ভৈঃ।

ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার জননী, আমিই সব বিজয়ের অধীশ্বরী, পুরুষের শৌর্য ও নারীর মমতার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি।

জীবনকে দুর্বহ মনে করো না। ভাগ্য, সে তো মায়ের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। এসো, কিছুক্ষণের জন্য আমার খেলায় যোগ দাও—সব কিছুকে খেলার মতো সানন্দে বরণ করো।

উদ্দেশ্য কী—সে কথা ভেবে দ্বিধা জাগছে মনে? জগৎজননী যে কন্দুকটি নিয়ে খেলা করছেন, ভাবছো তা একেবারে নিরর্থক। একথা জানো না যে, মায়ের হাতের ওই কন্দুক আসলে সেই বজ্র যা মুহূর্তের মুদ্রাপরিবর্তনে বিশ্ববিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চেয়ো না। জ্যামুক্ত শরের কী কোনো প্রয়োজন আছে পূর্ব-পরিকল্পনার? তুমিও তাই। জীবন উদ্‌যাপিত হোক, মূল পরিকল্পনা তখন আপনি উদ্ভাসিত হবে। কালের সৃষ্টি তুমি, তার আগে কিছুই জানতে চেয়ো না।

অভ্রান্ত আমার খেলা। সারা দিনের যাত্রাপথের সেই তো নিশানা। মনে করো—এ পৃথিবীতে তোমার আবির্ভাব—সে কেবল আমারই ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা যখন পূর্ণ হবে, আমিই তোমায় টেনে নেব আমার বুকে। প্রশ্ন করো না। কোনোদিকে ফিরে চেয়ো না। কোনো পরিকল্পনা করতে যেয়ো না। শক্ষোভ মধ্যে কল্লোলিত সমুদ্রের মতো আমার ইচ্ছাই তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোক।

কিন্তু সবার আগে একথা উপলব্ধি করো। একটি পদক্ষেপও তোমার বিফল হবে না। কোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে না। তোমার স্বপ্ন তোমার কর্মের চেয়ে বড়ো নয়, ছোট হবে। সামান্য উপলক্ষ্য হয়তো তোমায় এখানে ওখানে নিয়ে যাবে, আর তারই ফলে দেখা দেবে মহৎ লক্ষ্যের পরিণাম। অনেকের সাথে তোমার দেখা হবে, কথা হবে, আর তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই একান্ত আমার আপনজনেরা হবে অঙ্গুলিমেয়। এদেরই সঙ্গে তোমার গোপন সংকেত-বিনিময় হবে, তারা তোমায় অনুসরণ করবে।

কী সেই সংকেত?

আমার সন্তানদের অন্তরের অন্তরতম গহনে মহাকালীর খড়্গ ঝলসে উঠছে। জন্ম থেকে তারা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, তাঁর খড়্গের অবতার। তারা দুঃখের, ঝড়ের, মরণের প্রেমিক—জীবনের নয়।

---

* Kali, the Mother গ্রন্থের The Voice of The Mother-এর অনুবাদ।

এমনি সব লোকেরা আসবে তোমার আগুনে তাদের মশাল জ্বালিয়ে নিতে। অসংখ্য জনতায় ঘেরা এই পৃথিবীতে মানবজাতির সেরা নায়কদের আত্মবলিদানে আহ্বান করে ঘুরে ফিরছে আমার কণ্ঠস্বর। মনে রেখো, যে আমি আহ্বান করছি, সেই আমিই সে-আহ্বানে সাড়া দেবার পথনির্দেশও করছি। জগৎজননী তাঁর সৃষ্টির রক্ষয়িত্রী, সংহারকর্ত্রী—একাধারে এ-দুইই তাঁর ভূমিকা।

ধর্মকে যে নামই দাও, আসলে তার মানে মৃত্যুকে ভালোবাসা। আজ এই দেশে বৈরাগ্যের আগুন লেলিহান শিখায় মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে এক প্রচণ্ড আবেগের আলোড়ন জাগিয়ে তুলবে। যেমন করে আর সবাই সুখের সন্ধানী হয়, তেমনি করে এদেশের মানুষ আত্মত্যাগের পথে এগিয়ে যাবে। সমস্ত সেবা, শ্রম ও যন্ত্রণা সেদিন তিক্ততার বদলে মাধুর্যের রসে ভরে উঠবে। কারণ মহান এই যুগ। আর আমি, স্বয়ং কালী বিশ্বের সমস্ত জাতির জননীস্বরূপা।

পরাজয়ের মুখোমুখি হও। হতাশাকে আলিঙ্গন করো। আমার ইচ্ছার জগতে দুঃখসুখের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। অশ্রুর জগতে প্রবেশ করে তাই আনন্দিত হও, আমার প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে থাকো। এমনি প্রলয়ের পটভূমিকায় সন্তানদের সাথে আমার দেখা হয়। পরমস্নেহে আমি তাদের হৃদয়ের গভীরে লালন করি।

আমায় ভুলিয়ে দেয় উন্মূলিত করো এমন সব বাসনা। যখন আমার আহ্বান আসে, তখন প্রণয়, বন্ধুত্ব, সুখ, গৃহকোণ—কোনকিছুর ডাক আর শুনতে পাওয়া যায় না। প্রাসাদের বিলাস ছেড়ে বেরিয়ে এসো, ভয়ংকরের সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ো, আরামের গৃহকোণ ছেড়ে প্রজ্বলন্ত নগরীর প্রহরী হয়ে ওঠো। জেনো যদি একটি অসত্য হয়ে থাকে, অন্যটিও তাই। হাসিমুখে ভাগ্যের মুখোমুখি হও।

কোনো করুণার প্রত্যাশা রেখো না। আমি তোমায় সবজীবে করুণার আধার করে তুলবো। নিজের অন্ধকারকে তুমি সাহসের সাথে বরণ করে নাও, তখনই তোমার আলো সহস্রের সমুজ্জ্বল সুখের কারণ হয়ে উঠবে। তুচ্ছতম কাজটি সযত্নে সম্পন্ন করো, মুছে ফেলো উচ্চমঞ্চের বাসনা।

প্রতিষ্ঠিত হও নির্দেশিত সাধনপন্থায়। উদ্দেশ্য ও উপায়ের সার্থক সম্মেলন হোক। এ কাজের সব দাবী তুমি পূরণ করো। তবু কোনো দায়ের বোঝা অন্তরে বহন ক'রো না। কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশাও নয়।

দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, স্থিরপ্রজ্ঞ হও। খেলা যখন শেষ হবে, দিনান্তের আলোয় তখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করবে- যে আমি পুরুষের শৌর্য ও নারীর মমতার অধিষ্ঠাত্রী কালী, সব বিজয়ের অধীশ্বরী, সেই আমিই তোমার মা- বিশ্বজননী।

ভগবানের স্বরূপ

শ্রীকালিদাস রায়

পথহারানো পথিক যারে দিন ফুরালে খুঁজে,
অনেক দেখে অনেক ঠেকে মানুষ যারে বুঝে.
জানতে যারে জ্ঞানের সাথে প্রেম নিয়ত যুঝে,
সেই ত ভগবান ॥

ভাবলে যারে আকারণে বুক ভেসে যায় জলে,
যার সাথে সব কবি তাদের প্রাণের কথা বলে,
সকল লেখার অর্থ গূঢ় যার পানে যায় চলে,
সেই ত ভগবান ॥

খুঁজতে যারে দৃষ্টি আকাশ পাতাল ভেদি যায়,
কল্পনারা খুঁজতে যারে দিগ্‌বিদিকে ধায়,
যারে কোথাও না পেয়ে হায় প্রাণ করে হায় হায়,
সেই ত ভগবান ॥

বিনা প্রয়োজনেও যারে অনেক মানুষ চায়,
শুনছে কিনা না জেনেও যার মহিম্নঃ গীত গায়,
উদ্দেশে যার অকূল পানে জীবনতরী ধায়,
সেই ত ভগবান ॥

চরম সত্যে ভক্ত ভাবে যার শ্রীমুখের বাণী
আশারে সে মনে ভাবে যার বরাভয়-পাণি,
ভরসা রাখে জীবন-সাঁঝে যে জন নেবে টানি,
সেই ত ভগবান ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানগুলি কোন না কোন তত্ত্ব প্রতিপাদন করে। ভাষার অলঙ্কার, আতিশয্য ও রূপকের আবরণ উন্মোচন করিয়া ঐ তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন সাধারণের পক্ষে কঠিন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নানা যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক নানাভাবে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, ফলে নানা টীকার মাধ্যমে উদ্ভব হয় নানা মতের। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধান ও অলৌকিকত্ব বর্জন করিলেও উপাখ্যানগুলির মধ্যে একটি সহজ সত্যের ইঙ্গিত পওয়া যায়। আবার উহাদের ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় করিতে না পারিলেও বলা যায় সুদূর অতীতের কোন না কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়াই হয়তো উহারা গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য নিরবধি কালের প্রবাহে তাহাদের রূপ ও কলেবর উভয়ই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। যেদিক দিয়াই হউক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই উপাখ্যানগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনীগুলিই ধরা যাক। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় মহামায়ার স্বরূপ-নির্ণয় —দেবী বা পরমাশক্তির মাহাত্ম্য-বর্ণনা। তন্ত্র-মতে এই মহাশক্তিই জগৎপ্রপঞ্চের সৃজন, পালন ও সংহারকারিণী। জগৎ লইয়া কারবার করিতে হইলে, জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে শক্তির আরাধনা করিতে হইবে। আবার জগদতীত অবস্থা লাভ করিবার জন্যও প্রয়োজন শক্তিসাধনা।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে, সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের জন্য তিনি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। জন্মরহিত ও অব্যয় হইলেও স্বীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে তিনি দেহধারণ করেন। চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীশক্তি সম্বন্ধেও একই কথা।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥

ঋষি বলিলেন, সেই মহামায়া নিত্যা, তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু নাই; এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্তি। কিন্তু সর্বব্যাপিনী এবং নিত্যা হইলেও তিনি বিচিত্র ও বহুরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। তাঁহার আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে দেবী নিজেই বলিয়াছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

—যখনই এই প্রকার দানবগণের প্রাদুর্ভাব ও উৎপীড়ন হইবে, তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া তোমাদের শত্রু সংহার করিব। এইভাবে স্বরূপতঃ জন্মাদি-রহিত হইলেও দেবগণের কার্যসিদ্ধি ও সৃষ্টির রক্ষণ নিমিত্ত তাঁহার আবির্ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছেন এইরূপ বলা হয়।

চণ্ডীর চরিত্রত্রয়ের দেবতা যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। অথবা বলা যায় একই শক্তির ত্রিবিধ রূপ বা প্রকাশ। মহাকালীরূপে তিনি বিষ্ণুদ্বারা মধুকৈটভ অসুরদ্বয়, মহালক্ষ্মীরূপে মহিষাসুর এবং মহাসরস্বতীরূপে শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করিয়াছেন। মধুকৈটভবধের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত। প্রলয়কালে

বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রামগ্ন তখন অসুরদ্বয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু ব্রহ্মা নিহত হইলে সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিবে, তাই ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা দেবী জনার্দনকে যোগনিদ্রামুক্ত করিলে তিনি মধুকৈটভকে সংহার করেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় দেবী ভগবতীর মহিষাসুর-মর্দিনীরূপেরই আরাধনা করা হয়। দেবগণের দেহনিঃসৃত পুঞ্জীভূত তেজোরাশি নারীমূর্তি ধারণ করে। অতঃপর দেবগণ-প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া সিংহপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক দেবী মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। স্বর্গমর্ত্য নিষ্কণ্টক ও দেবগণ পুনঃবস্থাপ্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ আমরা চণ্ডীর এই মহিষাসুরমর্দিনীরূপের সঙ্গেই পরিচিত। মহিষাসুরমর্দিনী দেবী বাংলাদেশে একাকী আসেন না। সঙ্গে আসেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। ইঁহাদের সকলকেই আমাদের প্রয়োজন। স্বয়ং শিব না থাকিলে কল্যাণ কোথায়? সুতরাং তিনিও আসেন। একই চালচিত্রের মধ্যে দেবদেবীর একত্র আরাধনা—ইহাই ছিল পুরাতন প্রথা। উদ্দেশ্য, দেবী আমাদের শত্রু সংহার করিয়া অশুভ শক্তির বিনাশপূর্বক ঐশ্বর্য, বিদ্যা, বীর্য ও সিদ্ধি প্রদান করিবেন।

মহিষাসুরবধের পর স্বর্গ ও মর্ত্যে শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বস্তুতঃ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে দেব ও দানবের দ্বন্দ্ব। নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে অন্তর্লোকে ও বহির্লোকে। কখন অশুভ বা দানবশক্তিকে পরাজিত করিয়া শুভ বা দেবশক্তি প্রাধান্য লাভ করে। কখন দেবশক্তিকে পরাজিত করিয়া অসুরশক্তি উল্লসিত। জগতের ইতিহাসই তো এই উত্থান-পতন লইয়া।

কালক্রমে পুনরায় দৈত্যদলের আবির্ভাব হইল। এবার তাহাদের অধিপতি প্রবল পরাক্রমশালী শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর-ভ্রাতৃদ্বয়। এখান হইতেই আরম্ভ চণ্ডীর তৃতীয় উপাখ্যান। চণ্ডীর অপর নাম দেবী-মাহাত্ম্য। সুতরাং শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধেও দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। কেমন করিয়া প্রচণ্ড সংগ্রামে তিনি সমগ্র অসুরকুল ধ্বংস করিলেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় পূর্ব ঘটনার বহুল পুনরুক্তি ও আতিশয্য দেখা যায়। তথাপি এই কাহিনীর মাধ্যমে দেবীর চরিত্রের একটি নূতন প্রকাশভঙ্গী আছে এবং সেজন্যই উহার মাধুর্য অধিক। মহিষাসুর-মর্দিনীর আবির্ভাবের মধ্যে এক ধরনের চমকপ্রদ ঘটনা মনকে আকৃষ্ট ও বিস্ময়ে অভিভূত করে। শুম্ভ নিশুম্ভ-কাহিনীর প্রারম্ভে শক্তি-রূপিণী দেবী লীলাচ্ছলে এক কৌতুকময়ী বালিকাতে পরিণত হইয়া সাধারণভাবে দেখা দিয়াছিলেন।

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পর দেবগণের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সঙ্গীত বাদ্য ও অপ্সরাগণের নৃত্যসহ স্বর্গে পুনরায় উৎসব আরম্ভ হইল। মর্ত্যেও পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হইল। অসুরগণের অত্যাচারে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সর্ব অশুভ নিবারণ করিয়া আবার যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। দেবগণ দেবীর উদ্দেশ্যে স্তব করিলেন:

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

—হে আশ্রিতের দুঃখহারিণি দেবি, হে নিখিল বিশ্বজননি, আপনি প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি, আপনি প্রসন্না হইয়া বিশ্ব পালন করুন। হে দেবি, আপনিই তো চরাচর জগতের অধীশ্বরী।

এইভাবেই দেবী বারে বারে শত্রু সংহার করিয়া, অশুভ শক্তি বিনাশ করিয়া দেশে শান্তি ও কল্যাণ স্থাপন করেন।

বাংলাদেশে প্রতিবৎসর শরৎকালে চণ্ডিকা দেবীর আরাধনা কতদিন ধরিয়া প্রচলিত তাহা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হইলেও অনায়াসে বলা যায় ইহা বহুবৎসরের। কথিত আছে, মহামায়ার আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় রামচন্দ্র রাবণ-বধে সমর্থ হন। বাল্মীকির রামায়ণে উহার উল্লেখ নাই। হইতে পারে রাবণও দুর্দান্ত অসুর এবং দৈবশক্তির উত্থানব্যতীত অসুরশক্তির বিনাশ নাই—এইভাবে দেবী-মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই পরবর্তীকালে ঐ তথ্য রামায়ণ-আখ্যানে সংযোজিত হয়।

চণ্ডীর গভীর তত্ত্ব নির্ণয় সহজ না হইলেও এ কথা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, শেষ পর্যন্ত দৈবী শক্তির প্রভাবেই মানব তাহার অন্তর্নিহিত অশুভ বা অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। দেবী-মাহাত্ম্যের পঠন এবং ধ্যান হৃদয়ে সেই দৈবীসত্তার উদ্বোধন ও বিকাশে সাহায্য করে। পূর্বে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গৃহস্থগণ সংযত ও ভক্তি-বিনম্র চিত্তে দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন। কেবল ধনী বা সম্পন্ন গৃহস্থ নয়, দরিদ্র ব্যক্তিও দুর্গাপূজা করিতেন। পার্থক্য থাকিত, তাঁহার পূজায় বাহিরের ঐশ্বর্য অপেক্ষা অন্তরের ঐশ্বর্য বিশেষ-ভাবে প্রকাশ পাইত। ক্রমে দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হইল। ঐ উপলক্ষ্যে নূতন বসন-ভূষণ, বিবিধ আনন্দ, দীয়তাং ভুজ্যতাম্-এর সমারোহ দেখা গেল। কিন্তু তখনও দেবী-পূজাই ছিল প্রধান। বাহিরের আড়ম্বরের সঙ্গে যথেষ্ট ঘটা করিয়া দেবীর পূজাও সম্পন্ন হইত। বর্তমানে দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব। এ উৎসবে দেবীর আরাধনা বা পূজা গৌণ, মুখ্য হইতেছে সাজসজ্জা, মণ্ডপ, আলোকোৎসব, প্রতিমার অভিনবত্ব, ইহাতে দেবী কি জাগ্রত হইবেন ও সকলের হৃদয়ে প্রকাশ পাইবেন ?

উদ্বোধন

শ্রীতুলসীনারায়ণ চক্রবর্তী

তোমার আসার সময় এবার হ'লো জানি, জানি।
অসীম আলোয় ভরিয়ে দিলে আমার ভুবনখানি।
যা কিছু মোর আছে 'আমার'
শেষ ক'রে সব দেব এবার,
পথে তোমার বিছিয়ে দেব আমার হৃদয়-খানি।

বুকের মাঝে শুনি বাজে তোমার পরম-বাণী,
পাতায়, ফুলে, ঘাসে শুনি তোমার চরণ-ধ্বনি।
সন্ধ্যা বেলার রক্ত-রাগে,
শুধুই স্মৃতির বেদন জাগে,
আকাশ বাতাস করে তোমার আসার কানাকানি।

অব্যক্ত প্রাণ

ডক্টর শ্রীমুরলীমোহন বিশ্বাস

প্রাণের ধর্ম নিজেকে প্রকাশ করা। কর্ম করিয়া বিকশিত হওয়া। প্রাণ ও কাজ যেন এক। কাজ পাই বলিয়া কথায় কথায় কত পদার্থেও পরমায়ু আরোপ করি। অথচ কথার কথায় তাহাতে প্রাণ স্থাপন করিতে প্রাণ টানে না।

প্রাণের প্রকাশ বিভিন্ন মুখোশ পরিয়া। আমাদের-ঢঙে কথা কাজ আহার নিদ্রা আমাদের প্রাণের পরিচয়। কিন্তু এ-ধরন সকল ক্ষেত্রে খাটে না। পাখির বুলির হরফ আলাদা, জীবনযাপনের ভংগি ভিন্ন। তাহার যাহা স্বাভাবিক আমাদের কাছে তাহা অস্বাভাবিক ঠেকে। উদ্ভিদে প্রাণের অভিব্যক্তি আরেক রূপ লইয়া। বস্তু আপন রীতে কাজ করে। বস্তু-প্রাণ বস্তুজগতের সামগ্রী। আমাদের মাপকাঠি অনুযায়ী না-হইবার কথা। হয়ত আমাদের পুঁজি ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরাও যায় না। কিন্তু প্রাণ-মাত্র বিশ্বপ্রাণের বিভিন্নবেশে ছদ্মবেশ।

একথালা জল রোদে রাখিলে তাপ শোষণ করে। রোদ হইতে সরাইয়া দিলে শোষিত তাপ ছাড়িয়া দেয়। ইহা কি আমাদের অজ্ঞাত কোনো প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া নয়? চুম্বকে চুম্বকে টানাটানি চলে। এ-আগ্রহ কি প্রাণের সহিত প্রাণের মিলিবার ইচ্ছা নয়? প্রাণ তো প্রাণের সহিত আত্মীয়তা গড়িতে চায়। চুম্বকে চুম্বকে ঠেলাঠেলিও চলে। এ-সংঘর্ষ কি প্রাণের শক্তিপরীক্ষা নয়? প্রাণ তো প্রাণেরই সহিত রেষারেষি করে। লজ্জাবতী-পাতা আমাদের স্পর্শে লজ্জিত হয়, আমাদের ডাকে সাড়া দেয়। সাড়া বিভিন্ন পরিবেশে বস্তুও দেয়। তবে কেন সে নিষ্প্রাণ?

কাচের গ্লাস সত্যই কি প্রাণহীন? গ্লাস অগণিত অণুর সমষ্টি। তাহারা গ্লাস আকারে কয়েদী হইয়া চব্বিশঘণ্টা ছটফট করে। ইহা তো আবদ্ধ প্রাণের মুক্তিলাভের অস্থিরতা। ইলেকট্রন পরমাণুকেন্দ্রের চারিদিকে অহরহ ঘুরে। গতি প্রাণেরই রীতি। বস্তুর মধ্যে সে কত ছন্দে সুরে খেলা করে। এ-তো সূক্ষ্ম প্রাণেরই পুলক। তেজস্ক্রিয় বস্তু আপন স্বভাবে তেজ বিকিরণ করে; কাহারো হুকুমের ধার ধারে না। কোনো জবরদস্তি খাটে না। এ-স্বাধীনতা প্রাণেরই লক্ষণ। বীজ হইতে জন্মিয়া উদ্ভিদ পাতা ফুল ফল দেখাইয়া প্রাণ জাহির করে। প্রাণ আসে কোথা হইতে যদি বীজ নির্জীব? নিষ্প্রাণ হইতে প্রাণের সঞ্চার কি সম্ভব? বীজ শুধু অণুপরমাণুর রাশ? প্রাণ অণুপরমাণুর সমাজে যে-কোনোভাবে নিদ্রিত না থাকিলে কেমন করিয়া তাহাদেরই কোন-এক নিগূঢ় সমাবেশে জাগিয়া উঠে?

প্রাণ কত রূপে রঙে রসে ভরা। ইহাও বস্তুর মধ্যে ফুটিয়া উঠে। বস্তুর কত রূপের খেলা রঙের মেলা রসের ধারা। কি করিয়া হইল? ইহা তো প্রকাশধর্মী প্রাণের বিভিন্ন-মুখী বিকাশ। নরম বস্তুর সহিত বিষাক্ত গ্যাসের সংগমে লবণাক্ত বস্তু হয়। কি করিয়া হয় যদি প্রাণশক্তি কাজ না করে? রবার টানিলে বাড়ে। টানিলে বস্তুর ভাষায় রবারের মধ্যে এক আর্তনাদ ছড়াইয়া পড়ে। বস্তু-প্রাণের শব্দহীন আর্তনাদ আমাদের শব্দগত কানে পৌঁছয় না। কিন্তু এ-প্রাণের ডাকে

বস্তুর সমস্ত অংগপ্রত্যংগ সাড়া দেয়। টানকে পাল্লা দেওয়ার জন্য একযোগে প্রতিটান দেয়। টানাপোড়েন তো প্রাণেই চলে। উদ্ভিদ আহত হইলে উদ্ভিদপ্রাণের আবেদনে সাড়া দেয়। পাতা ছিঁড়িলে আহত উদ্ভিদের নীরব ব্যথা আমাদের ব্যথিত করে না। নিঃশব্দ ভাষা আমাদের বোধে আসে না। আমরা শব্দময় ভাষা নিঃশব্দ করিয়া বাহিত করি, পুনরায় শব্দময় করি। অথচ উদ্ভিদের নীরব ভাষায় রব দিতে পারি না কিন্তু বিশ্ব-প্রাণে সকল প্রাণের সকল ভাষা ধ্বনি পায়। তাহার সহিত নাড়ীর টান সকলের।

বস্তুর প্রাণসত্তা শোষণ করিয়া প্রাণধারণ করি। তাহার শক্তি লইয়া শ্রবণশক্তি দর্শন-শক্তি কর্মশক্তি পাই। কিন্তু বস্তুপ্রাণকে অনুভব করিবার শক্তি নাই বলিয়া স্বীকার করি না। বিষাক্তদ্রব্য কোথা হইতে তাহার প্রকৃতি পাইল? যদি সে প্রাণহীন তবে কেমন করিয়া আরেকটি প্রাণকে হানিতে পারে? বস্তুর কোনো স্তরের প্রাণ না থাকিলে কেমন করিয়া প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস চালাইয়া প্রাণকে সজীব রাখে? প্রাণ তো প্রাণকেই বাঁচায়। প্রাণ প্রাণেই স্পন্দিত হয়। প্রাণের দুখে প্রাণ কাঁদে। প্রাণের হাসিতে প্রাণ হাসে। যাহা আমাদের প্রাণকে বিভিন্নভাবে ভাবায়, আমরা তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি না। যাহা বুঝি না তাহার আমল দিই না।

উদ্ভিদ প্রাণবস্তু আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেও প্রাণময় ছিল। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে ছিল নিষ্প্রাণ। এ সত্য আবিষ্কৃত না হইলে উদ্ভিদ বিশ্বসংসারে চিরকাল প্রাণহীন হইয়া থাকিত। ব্রহ্মাণ্ডবিচারে এমনি অবিচার ঘটিবার কথা। দর্শনশক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা আঁধারে বিশ্বরূপ দেখিতে পাই না। আবার সাপ আঁধারে বিভিন্ন রঙের রূপ দর্শন করে। আমাদের আলোকিত জগৎ পেচকের ঘোর নিশা। বিভিন্ন প্রাণে একই ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার কত অক্ষমতা! বিশ্বদর্শনের যোগ্যতার কত ভেদ! আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে চারিটি থাকিলে রূপরসগন্ধ-শব্দস্পর্শময় ব্রহ্মাণ্ড হইত চতুরিন্দ্রিয়ের। আবার ছয়টি থাকিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হয়ত কোনো-এক ষষ্ঠরূপ ধরা পড়িত। কে জানে তাহার আসল-রূপটি? জানালার ফাঁক দিয়া দৃষ্ট জগৎটুকুতে জগতের পূর্ণরূপটি প্রকাশিত হয় না। যাহারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তরূপটি জানে তাহারা অনন্ত-প্রাণকে চিনে। তাহারাই বস্তুতে প্রাণ এবং প্রাণেরও উৎস আবিষ্কার করিতে পারে। বলিতে পারে, 'সর্বং ব্রহ্মোপনিষদম্'। সকল বস্তু উপনিষদুক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ।

"প্রাণই গতিশক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্নায়ু-শক্তিপ্রবাহরূপে, চিন্তাশক্তিরূপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম শক্তি পর্যন্ত সব কিছুই প্রাণের বিকাশ মাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জগতের সকল শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে তখন তাহাদের সমষ্টিকেই 'প্রাণ' বলে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনায় বেদান্তরহস্য

স্বামী বুধানন্দ

মা-ই ধরে নিয়ে এলেন ন্যাংটাকে, ছেলেকে অদ্বৈত শেখাতে। এতে রয়েছে নব্য বেদান্তের এক রস-রহস্য কথা।

লীলারূপিণীর লীলা ও রূপই শেষ কথা নয়। আরো কথা আছে।

সংহারিণী রুধিরপ্রিয়া, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নয়, দেবার জন্যে। তাই তাঁর সংহরণেই হয় সত্যের শেষ প্রাপ্তি।

আদিকাণ্ডে কত কাঁদলেন ঠাকুর। দিন-রাত সে কি ডাকছেড়ে কান্না। মাটিতে আর্তিতে মুখ-ঘষা। মাতৃহীন দিনের যাওয়া-আসার সে কি অসহ বেদনা। ক্রিয়াকাণ্ড ভুললেন। আচারবিচার উঠে গেল দেহ-জ্ঞান উড়ে গেল। হলেন পাগল, নিরেট পাগল। মা পাগল শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিশ্বজননী কি শ্রুতিহীনা? শুনতে কি পান না অধীর সন্তানের হৃদয়ের রক্ত ক্রন্দন? এত করা হল, আর কি করা যায়? এ দুর্বহ অসহ জীবন ধিকি-ধিকি-জ্বলা ব্যর্থতার ইন্ধনে বাঁচিয়ে রেখে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ পড়ল মন্দিরের কোণে ঝুলিয়ে রাখা খড়্গাটির উপর। কি হবে এই ব্যর্থ জীবন রেখে? উন্মাদ উদ্যত হলেন নিজের গলা কেটে নিজেকে নিঃশেষে দিতে বলিপ্রিয়াকে।

ঐ শেষ দেওয়ার চূর্ণ মুহূর্তে হল পূর্ণ প্রকাশ। প্রপঞ্চের আসন ভেঙে লীলানাটকসূত্রভেদনকরী হলেন আবির্ভূতা। জ্যোতিষ্মান অতল নিঃসীম চৈতন্যসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলল শ্রীরামকৃষ্ণকে। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন অনুভূতির সাগরে নিমজ্জিত।

সব না দিলে দেওয়াই হয় না। সব না দিলে সব কি করে পাওয়া যাবে?

নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কে পেলেন। আর সে কি পাওয়া! আর হারানোর উপায় রইল না। মা-ই যে সব হয়ে আছেন। কোথায় তাঁকে আর হারানো চলে?

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনে মা আবির্ভূতা হলেন—বিশ্বজোড়া উচ্ছলিত ভাস্বর চৈতন্যসমুদ্র। মা-মা ডাকটি তবু রাখা হয়েছিল।

এখন সব-হওয়া মায়ের ইঙ্গিতে ওঠেন, বসেন, চলেন, ফেরেন সব-পাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণ। কি করবেন না করবেন নিজে কিছুই জানেন না, মা-ই সব জানেন।

চাঁদনীতে বসে আছেন বিস্ফারিতনয়ন আত্মারাম, জ্যোতিরুজ্জ্বল বয়ান। দেখে তোতা বললেন: তোমায় উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে; বেদান্ত সাধন করবে?

"কি করব না-করব আমি কিছু জানিনে। আমার মা সব জানেন। তিনি যদি বলেন, করব", বললেন বালক শ্রীরামকৃষ্ণ।

"তবে যাও, জিজ্ঞেস করে এসো তোমার মায়ের কাছে। বেশী দিন আমার থাকা হবে না এখানে।"

গেলেন মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে। জবাব নিয়ে ফিরে এলেন জগদম্বার কাছ থেকে, "যাও শিখে নাও, তোমাকে শেখাবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আসা হয়েছে।"

মন্দিরের শিলারূপিণী "মায়ের" কাছ থেকে এই যে আদেশ নিয়ে আসা হল, এই সারল্যটুকু ব্রহ্মবিলাসী জ্ঞানী তোতা শুনলেন কৌতুকভরে। ভেবেছিলেন হয়ত, অজ্ঞানের সহজ বিশ্বাসে কি যেন এক মাধুর্য আছে!

জগদম্বাও নেপথ্যে একটু চটুল হাসলেন। ব্রহ্মের ঘরে উঠলেও মায়ার ঘরে, মায়ের ঘরে সেলামিটি দিতে হয়। না দিলে হয় জ্ঞানাপরাধ। তোতা ভুলে গিছলেন এই কথাটি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গমহিমায় জানতে পেরেছিলেন এ সত্য—মায়ের চরণে তখন প্রণত হয়ে সাশ্রু-নয়নে করেছিলেন কৃপাভিক্ষা। তবে শেষ ছুটি মিলেছিল মহাপ্রস্থানের চলা-না-চলার চিহ্নবিলীন পথে। সে অন্য কথা।

•

মায়ের আদেশে অদ্বৈত-সাধনে লেগেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়েরই ধরে নিয়ে আসা গুরু, ন্যাংটা।

প্রাথমিক ক্রিয়াদি সমাপ্ত। ধ্যানে বসেছেন সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ। সব করা চলে। মনকে প্রপঞ্চ থেকে উঠিয়ে আনা কিছু নয়। কিন্তু শেষের বাধা হয়ে দাঁড়ালেন মা নিজেই।

বিভুঁই বিদেশে চলে যাবে ছেলে, নৈর্ব্যক্তিক অচিন দেশে। আর হয়ত আসবে না ফিরে কোনকালে মায়ের ঘরে, ডাকবে না মা-মা বলে। কোন্ মা পারে থাকতে দুয়ারে এসে না দাঁড়িয়ে? শ্রীরামকৃষ্ণের এত করে ডাকা মা এত করে পাওয়া মা, মা-ছাড়া-আর-কিছু-না-জানা এই ছেলের সাধন-সন্ধিক্ষণে বার বার এসে দাঁড়ান চৈতন্যের দোরগোড়ায়। মায়ের মন তো!

ন্যাংটা গেলেন ক্ষেপে। কাঁচের টুকরো শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূমধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে আদেশ করলেন, "এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনো।"

আবার চেষ্টা। আবার এসে লীলাময়ীর চৈতন্যের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো।

আর যেই দাঁড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাসিতে বলিপ্রিয়াকে দিলেন বলি। মাকে কেটে দুখানা করে ফেললেন। মায়ার হল শেষ। হল শেষ বাঁধন কাটা, শেষ না জানার বাঁধন। সাধনায় হল সিদ্ধি।

হুহু করে মন উঠে গেল সীমাদুষ্ট ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অবস্থা থেকে। লীন হল অন্তবিহীন ব্রহ্মে—একেবারে নির্বিকল্প সমাধি।

নিজে নিঃশেষিত হয়ে মা-ই কিন্তু শ্রীরাম-কৃষ্ণকে উত্তীর্ণ করলেন ব্রহ্মের ঘরে।

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের এই মায়ার পরপারে আচম্বিতে অবস্থিতিকেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে তোতা স্বাগত করলেন চারটি অসমঞ্জস শব্দে "যহ ক্যা দৈবী মায়া।"

ব্রহ্মের ঘর থেকে তোমাকে মা তাই ধরে এনেছিলেন, শেখাতেই নয় শুধু, শিখতেও। তার পালা হল সুরু। যার যা দরকার। যার যা পেটে সয়। ন্যাংটার আমাশয়ের অর্থটি হচ্ছে সেলামি আদায়।

একদিন নিজেকে বলি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পেয়েছিলেন মা-কে। আর আজ মাকে বলি দিয়ে পেলেন ব্রহ্মকে।

*　　*　　*　　*

শেষ হতে পারত শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে। কিন্তু হল না। নূতন এক কিশলয় ফুটল জ্ঞানের মহাকাশে।

ছয়মাস ব্রহ্মলীন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রপঞ্চের ঘরে ফিরে এলেন জ্ঞানের আলো হয়ে। এসে দেখেন মা তেমনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে স্বাগত করতে। কিন্তু এ যেন আর এক মা—ক্ষণে তরঙ্গ, ক্ষণে সমুদ্র,

পলে লীলা-চঞ্চল, পলে এক-রস। এই আছেন সব হয়ে, এই নেই কোন বিষয়রূপে।

যাঁকে ব্রহ্মরূপে পেয়েছেন—তাঁকেই দেখলেন প্রতিভাত কালীরূপে। যাঁকে জেনেছেন মা বলে, তাঁকেই পেলেন ব্রহ্মজ্ঞানচৈতন্যে।

এখন "কাকে নিন্দি কাকে বন্দি, দোনো পাল্লা ভারি।" "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্মাধর্ম সব ছাড়ার ব্যাপারটি ধর্মজগতে মানুষ পেল এক অভিনব "বস্তু"-বৈতরণী রূপে—ভাবমুখে থাকা।

"কাক-বিষ্ঠা" জগৎকেই ঠাকুর আমাদের পাইয়ে দিলেন মায়ের সব হওয়া রূপে। মায়া হলেন মা। মা-ই মহামায়া। মহামায়া ব্রহ্মপ্রকাশ। মায়াকে ধরা ছোঁয়া যায় না। মহামায়াকে কেঁদেকেটে বিরক্ত করা চলে। তখন ঝনাৎ করে বাক্স খুলে প্রাপ্যটুকু দিয়ে পান নিষ্কৃতি। এই স্বীকৃতিটুকু ঠাকুর কত সহজ করে দিয়েছেন। মা শুনতে পান, কথা কন, খেতে পরতে দেন, লালন পালন করেন, চতুর্বর্গের সব দেন। কত নিবে নেওনা। পরে নিজে বলি হয়ে ব্রহ্মলীন করে দেন।

ঠাকুরের 'ভাবমুখে থাকা' বেদান্তে এনেছে এক মহা ভাব-বিপ্লব; ধূলির ধরায় এক নব্য রস-প্লাবন। ব্রহ্ম শক্তি যুগ্ম বস্তু নয়, মিতালির পাড়া-পড়শী নয়—এক বস্তু। যিনি রস বই আর কিছু নন, তাঁতে ডুবে গিয়ে ডাঙায় উঠে দেখা যায় ডাঙাই জল হয়েছে—আবার জল হয়েছে ডাঙা।

এ দেখতে পাওয়ার পর শুধু আনন্দ, অভীঃ, সঙ্গীত আর প্রেম।

অদ্বৈতকে ঠাকুর বলেছেন "শেষ কথা"। আবার বলেছেন—ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ। যাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তাঁকেই ডাকা হয়েছে, "আমার মা"।

অন্যদিকে জীবই শিব। আর মা-ই সব হয়েছেন।

ঘৃণ্য-পূজ্য, তুচ্ছ-বরণীয়, সুন্দর-বীভৎস, ভয়ানক-সৌম্য, বিদ্যা-ভ্রান্তি, ভীতি-বীরত্ব, পীড়া-শান্তি—সব কিছুই মা-র হওয়া।

পুণ্যবানের ঘরের শ্রী, দুর্ভাগার ঘরের অলক্ষ্মী, সতীর পবিত্রতা, কুলটার লজ্জাহীনতা—সবই মা-র হওয়া।

তুমি যাঁকে পূজা করলে, যাকে লাঞ্ছনা করলে—সব মা।

কালীর ভোগ বেড়ালকে দিয়েছিলেন। না দিয়ে করেন কি?—দেখতে পেলেন যে মা-ই ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঐ রূপে।

অদ্বৈত সাধন করে জীবকে পেলেন শিব-রূপে। আবার সব-হওয়া মাকেই স্পষ্ট দেখলেন 'ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা'।

তাই মহাবাক্য উচ্চারণ করলেন: খালি-পেটে ধর্ম হয় না।

পূজার, সাধনের নূতন পথ খুলে দিলেন।

'ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা'কে দেখলেন পতিতা-রূপে। পাপীকে দেখলেন মায়ের অধিষ্ঠানরূপে।

তাই সবার পায়ে করলেন প্রণতি।

মায়ার জগতে ঈশ্বরের শক্তি কতটুকু? আছেন যেন অজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। মায়ের জগতে মায়ের জোর ব্রহ্ম-বিস্তীর্ণ। শক্তি-ব্রহ্ম অভেদ।

এটি ঠাকুরের উত্তম রসিকতা। রসস্বরূপকে বিজ্ঞানে পাওয়া।

'নেতি-নেতি'র বেদান্তকে 'ইতি-ইতি'র ঘরে ফিরিয়ে আনলেন মায়ের সব হওয়ার জোরে। 'ইতি-ইতি'র বেদান্তকে ধাতে-ধাতুতে আনতে হলে মায়ের ছেলে হওয়া চাই।

মায়ার কীট যদি ভ্রমবশে 'ইতি-ইতি' করে, অজ্ঞানের পাঁকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে সে মরে।

মায়ের ছেলে কিন্তু মায়ের জোরে সব পারে।

এই সব-হওয়া মায়ের সন্তান হয়ে যে ঠাকুরের জীব-শিব মন্ত্র সাধন করবে তার অসাধ্য থাকবে না কিছু জগতে কোন কালে। সে হবে অভীঃ, আনন্দ-সুন্দর, শক্তিধর, প্রেমী।

মানুষের জটিল কুটিল মহাসমস্যার আর কোন সমাধান আছে কি ?

ভয় পেয়ো না। তোমার মা-ই সর্বশক্তিময়ী। যা মায়ের, সব তোমার। আর তোমার আত্মাই অবিনাশী, বিশ্বব্যাপী।

অত আর ভেবো না। "মা সব জানেন।"

এস এই সব-হওয়া মা কে আমরা হৃদয় ভরে জীবন ভরে বোধন করি এই শিউলি-শরতে।

মহাপূজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দশভুজা পূজায় দেখা—
এর বেশী কি ভাগ্য আছে ?
যেবার পূজা না দেখিলাম
সে বছর তো গেল বাজে।
গত বছর অসুখেতে
পাইনি তোমায় দেখতে যেতে,
এবার যেন পাই মা দেখা
মোর কমল তোর পদে রাজে।

তিনটি দিনের জন্য মাগো
এমন কাছে তোমায় পেয়ে,
কি পরম আনন্দে থাকে
যুগের যুগের ছেলে মেয়ে !
যত কৃপা, মায়া তত,
বুড়াও হয় ছেলের মত,
লভে যেন নূতন জনম
স্নেহের ঝরণা ধারায় নেয়ে।

সবারে আনন্দে রাখ
এসো মা আনন্দময়ী,
সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি দাও মা
সর্বকর্মে কর জয়ী !
সন্তোষ অমৃত দানে
শুচি কর দেহে প্রাণে,
যেন তোমার মহিমা গাই
তোমার কৃপার কথা কহি।

স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণে

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

আমাদের বর্তমান যুগের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে যেসকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত শ্রী আর. জি. প্রধান-রচিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত India's Struggle for Swaraj গ্রন্থখানিই বোধ হয় প্রথম। এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে, "স্বামী বিবেকানন্দকেই আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তার জনক বলা যাইতে পারে। ইহা প্রধানতঃ তাঁহারই সৃষ্টি এবং তাঁহার জীবনেই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম উপাদানের বিকাশ দেখা যায়।" লেখকের এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ স্বামীজী সাধারণের নিকট ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং বাক্যে ও কার্যে তাঁহার আধ্যাত্মিক বাণীর শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ধর্মজগতেই আমরা তাঁহার স্থান সাধারণতঃ নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু বিংশশতাব্দীতে যে জাতীয়তার স্রোতে ইংরেজের বিশাল সাম্রাজ্য ভাসিয়া গেল—স্বামী বিবেকানন্দই যে তাহার উৎস, ইহা আমরা সচরাচর মনে করি না। অথচ একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এই জাতীয়তাবোধের যে কয়টি মূল ভিত্তি তাহা স্বামীজীর জীবনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। প্রথমতঃ দেশের প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ। তাঁহার বক্তৃতায়, রচনায়, চিঠিপত্রে ও অন্যান্যরূপে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, তিন বৎসর বিলাসিতাপূর্ণ পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানের পর এখন ভারতবর্ষ আপনার কেমন লাগিবে?" উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "এদেশে আসিবার পূর্বে আমি ভারতকে ভালবাসিতাম। এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্র—ইহার বায়ু পবিত্র, এ দেশ আমার পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র।"

দ্বিতীয়তঃ ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে স্বামীজী সর্বদা সচেতন ছিলেন। ইহার পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি সর্বদাই দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "বহু বৎসর আমি প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি ভারতের চিন্তা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই তাঁহার প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখিত।" ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শহরে একদল যুবককে তিনি বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের বই (আনন্দমঠ) পড এবং দেশভক্তি শিক্ষা করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ কর। সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।"

তৃতীয়তঃ তিনি দৃঢকণ্ঠে ঘোষণা করেন—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের পন্থায় স্বাধীনতা লাভ হইবে না। ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বেড়াইলে বণিক-সরকারের নিকট হইতে কিছুই আদায় হইবে না। ইহার জন্য চাই 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষা ও আত্মিক শক্তি। ঝাঁসির রাণীর মত পৌরুষ অর্জন কর—অন্য সব দেশ যে উপায়ে বড় হইয়াছে সেই উপায় অবলম্বন কর। তাহাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি এই দুইয়ের যোগ

ভিন্ন ভারতের উন্নতি হইবে না। জাতীয় ঐক্য ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। জাপানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি ভারতের যুবকগণকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে বলেন।

চতুর্থতঃ তিনি বলেন যে, ধর্মের ভিত্তি ব্যতীত জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু এ ধর্ম কোন আচার-ব্যবহার বা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নহে। সকল ধর্মের প্রাণ যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সেই ধর্মের ঐক্যের দ্বারা সমগ্র ভারতে ঐক্যের বন্ধন বাঁধিতে হইবে, নচেৎ ভারতের জাতীয়তা অসম্ভব।*

এই সমুদয় উদ্দীপনাময় উপদেশ দ্বারা তিনি ভারতে জাতীয়তার যে নূতন ও মহান আদর্শ স্থাপিত করিযাছিলেন—তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিম্নলিখিত চারিটি স্তম্ভের উপরই স্বামীজী ভারতের জাতীয়তা-রূপ বিরাট সৌধ নির্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

১। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা অর্থাৎ জনসাধারণের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন।

২। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ।

৩। আধ্যাত্মিকতার, ধর্মের ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্য স্থাপন।

৪। ভারতের প্রাচীন গৌরব ও মহিমার সম্যক উপলব্ধি।

স্বামীজী তাঁহার বহু বক্তৃতার মধ্য দিয়া ও গ্রন্থের সাহায্যে এই আদর্শ নানা রূপে নানা ভাবে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে যুবকদল গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই ক্ষণস্থায়ী দেহ বিসর্জন ও নানাবিধ দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই জন্যই ইংরেজ সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে বিপ্লববাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল—তাহার মূল কারণ স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা। এ ধারণা যে একেবারে অমূলক, তাহা বলা যায় না। দেশের জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগ বরণ করিবার ও সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিবার জন্যই তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি কোন কালেই সুদৃঢ় হইবে না। এখনও বহুদিন পর্যন্ত এই নীতি সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। কারণ আমাদের জাতীয়তাবোধের কেবল সূত্রপাত হইয়াছে—ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির এখনও অনেক বাকী।

ভারতের যুবকবৃন্দই যে কেবল স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের যে তিনজন মহাপুরুষ সমগ্র বিশ্বে বন্দিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অরবিন্দ যে আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা হইতে লাভ করিয়াছিলেন সে কথা তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আছে—বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। একজন বিদেশীয় মনীষী বলিয়াছেন যে, এ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার বা উপনিষদের নিকট পান নাই, যিনি বলিয়াছিলেন—লক্ষ বার জন্ম হয় হউক, তবু দেশের লোকের দুর্দশা দূর

* A Nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune.

না করিয়া আমি কেবল নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করিব না—ইহা সেই বিবেকানন্দের নিকটই শিক্ষা। অস্পৃশ্য নিম্নজাতির প্রতি উচ্চশ্রেণীর নিষ্ঠুর আচরণের কথা স্মরণ করিয়া দেশবাসীকে ধিক্কার দিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন —শত শতাব্দীর অসম্মান-ভার মাথায় বহন করিয়াও মানুষের নারায়ণকে নমস্কার করিতে শিখিলে না? ইহাও সেই স্বামীজীর প্রচারিত দরিদ্র-নারায়ণসেবার প্রতিধ্বনি। যিনি অবহেলিত পদদলিত দুঃস্থ নিরন্নের মধ্যেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া মনে করিতেন—এ তাঁহারই শিক্ষা। মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন'ও ঐ 'দরিদ্রনারায়ণের'ই অন্য সংস্করণ।

"মা"

(গান)

[মালকোষ—তেওরা]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

প্রলয়-বহ্নি লুকালে কেমনে
করুণা-কোমল নয়নে
ভীম অট্টহাস কেমনে লুকাও
হাসি-সুধামাখা বদনে ॥

সদা বরাভয় বিতর যে করে
কেমনে সে কর অসিমুণ্ড ধরে
অমিয়ভাষিণী ত্রিলোক ত্রাসিছ
কেমনে মা ভীম গরজনে ॥

তুমি তো অভয়া, কণ্ঠে তোমার
মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী
ভীষণ হইতে বিভীষণা পুনঃ
কেমনে হও মা শুনি।

তুমি রামকৃষ্ণ-শকতি-রূপিণী
সব অসম্ভব সম্ভব কারিণী
লীলাময়ি মাগো, খেলিছ কি তাই
সৃজনে পালনে নিধনে ॥

"অগ্নিমীলে"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'অগ্নিমীলে' ঋগ্‌বেদের প্রথম মন্ত্র—সুসভ্য, জ্ঞানবিজ্ঞান-সচেতন, শ্রেয়স্কামী মানুষের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির প্রথম অভিব্যঞ্জনা। আবার বেদ যদি অপৌরুষেয় ভগবদ্‌বাণী হয় তাহা হইলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাগ্‌বিভূতির প্রথম উপন্যাস এই মন্ত্রেরই মাধ্যমে। যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা গভীর, যাহা সর্বাবগাহী তাহা দিয়াই তো মহৎকীর্তির সমারম্ভ করিতে হয়। অতএব অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসত্তার প্রকাশ করিতে বসিয়া পরমেশ্বর যে শব্দগুলি প্রথম নির্বাচন করিয়াছেন সেগুলি নিশ্চতই সামান্য নয়। ঋগ্‌বেদের প্রথম মন্ত্রে অতিলৌকিক প্রেরণার একটি বিপুল উৎকর্ষ যে নিহিত রহিয়াছে, ইহা মনে করা নিশ্চিতই সমীচীন।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেবং ঋত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

অগ্নির বন্দনা করি—সম্মুখে যিনি অবস্থিত, যজ্ঞকর্মের যিনি দ্যোতক, যজ্ঞের আহুতি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেন বলিয়া যজ্ঞের যিনি প্রকৃত ঋত্বিক, প্রকৃত হোতা—আবার যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া আমরা যে নানা ফল লাভ করিতে চাই সেই সব ফলকে যিনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন—সেই জ্যোতির্ময়, নিষ্কলুষ, সর্বকলঙ্ক-দাহী অগ্নির আবাহন করি, তাঁহার শুক্রসত্তার স্তুতি করি, তাঁহার সর্বৈশ্বর্যপ্রদ ঋদ্ধির অনুধ্যান করি।

কে এই অগ্নি? এই প্রশ্নের উত্তর একটি নয়। বস্তুতঃ অগ্নির নানা রূপ—স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম। অগ্নিতে প্রদেয় আহুতিও এক প্রকার নয়; যজ্ঞ দ্বারা যে 'রত্ন' আমরা লাভ করিতে চাই তাহারও রূপ বহুবিধ। যাহার যেমন সংস্কার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি অগ্নির দ্যুতি ও দাক্ষিণ্য সেই ভাবেই তাহার নিকট উপস্থিত হয়। অগ্নির মহিমা ও প্রকাশ পৃথিবীর বুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত। অবশেষে সেই মহিমা লোকাতীত অবাঙ্‌মনসোগোচর সত্যে তাদাত্ম্যলাভ করে। বলিতে গেলে মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনা অগ্নিরই নানা মূর্তি এবং যজ্ঞ-ক্রিয়ার নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বিকশিত হয়। অতএব সাধনার সকল স্তরেই 'অগ্নিমীলে' মন্ত্র সমানভাবে আমাদিগকে শক্তি ও প্রেরণা দিতে পারে।

আমাদের দেহে যে উত্তাপ বর্তমান—যাহা কমিয়া গেলে আমাদের জীবনও স্তিমিত হইতে থাকে—উহা অগ্নির এক প্রত্যক্ষ রূপ। এই অগ্নিতে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আহুতি দিতে হয়—খাদ্য, পানীয়, বায়ু। দেহে অনুক্ষণ একটি যজ্ঞ চলিতেছে—প্রাণযজ্ঞ। দেহস্থিত অগ্নি আমাদের আহুতিকে প্রাণের নিকট পৌছাইয়া দিতেছেন। এই অগ্নি আমাদের পক্ষে নিশ্চিতই 'রত্নধাতম'। জীবনধারণের বহুবিধ সুখ ও সার্থকতাই হইল সেই রত্নরাজি। যিনি জড়বাদী তিনি এই অগ্নিকে নিছক একটি জড়প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। বেদদৃষ্টি কিন্তু আলাদা। এই দৃষ্টি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন :—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥[১]

---

১ প্রাণিবর্গের দেহে বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে অবস্থিত থাকিয়া আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে প্রাণীদের ভুক্ত চতুর্বিধ খাদ্য পরিপাক করি। গীতা, ১৫।১৪

প্রাণিদেহের যে উত্তাপ তাহা পরমেশ্বরেরই অগ্নিমূর্তির প্রকাশ। বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে তিনি দেহে প্রাণযজ্ঞের ঋত্বিক। বৈদিক সাধক দেহে অগ্নিদেবতার অবিচ্ছিন্ন উৎস্ফূর্তি দেখিয়া ভাব-তদ্‌গত কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন, 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং ।'

মুণ্ডক উপনিষদ্‌ আমাদের মস্তকে সাতটি অগ্নির বর্ণনা করিয়াছেন :

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥[২]

দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র এবং জিহ্বা এই সাতটি স্থানে সপ্তযজ্ঞ নির্বাহ হইতেছে। সপ্তস্থানে অগ্নি দীপ্যমান। চক্ষুর্দ্বয়ে অসংখ্য রূপ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কত শত শব্দ দুই কানে আসিয়া বাজিতেছে, কত গন্ধ দুই নাকে আমরা গ্রহণ করিতেছি, জিহ্বা দিয়া আমরা খাদ্য পেয় আস্বাদন করিতেছি। এই প্রত্যেকটি ক্রিয়া যজ্ঞবিশেষ। উপনিষদ্‌ বলিতেছেন এই যে সাত-ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নি, ইহারা—"তস্মাৎ প্রভবন্তি" সেই চৈতন্য পুরুষ হইতেই আবর্তিত। বেদের প্রারম্ভে যাঁহার স্তুতি সেই অগ্নিদেবতাই বিচিত্র মূর্তিতে সপ্ত ইন্দ্রিয়বিবরে জ্বলিতেছেন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে একটি হোম বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে। যিনি এই ভাবনার অভ্যাস করেন তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পারমার্থিক স্বরূপ আবিষ্কার করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি তাঁহার নিকট বন্ধনের কারণ হয় না। চোখ দিয়া যখন তিনি রূপ দেখেন তখন তিনি গাহিতে থাকেন, "অগ্নিমীলে—", কান দিয়া যখন তিনি শব্দ শোনেন তখনও তাঁহার চিত্তে গুঞ্জিত হইতে থাকে—"অগ্নিমীলে—।" প্রত্যেক ইন্দ্রিয়জ্ঞান তাঁহার নিকট পুণ্য হোমক্রিয়া।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেমন যজ্ঞবিশেষ, উহার বিপরীত ইন্দ্রিয়নিরোধও তেমনি অপর একটি যজ্ঞ। সংযম-রূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণক্রিয়াকে যেন আহুতি দেওয়া হইতেছে। গীতা বলিতেছেন—

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥[৩]

আত্মসংযম-রূপ যোগাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সাধক ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিক্ষেপ এবং দেহ-স্থিত প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান—এই পঞ্চ-প্রাণের সকল ক্রিয়াকে সেই অগ্নিতে অর্পণ করেন। ইন্দ্রিয়ের সকল অনুভূতি এখন স্তব্ধ, প্রাণস্পন্দন স্তিমিত। সাধক নিরুদ্ধ মনের গভীর স্তরে আত্মসত্যের স্পর্শলাভে ধন্য। কঠোপনিষদ্‌ এই অবস্থার বর্ণনা করিযাছেন :

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥

"যখন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান এবং মনের যাবতীয় সঙ্কল্প বিকল্প স্থির হইয়া অবস্থান করে এবং বুদ্ধিরও যাবতীয় নিশ্চয় যখন নিষ্ক্রিয় তখনই সাধনার পরমপ্রাপ্তব্য অবস্থা লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।"

---

২ অক্ষর পুরুষ (ঈশ্বর) হইতে (মস্তকস্থ) সাতটি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়। ইহারা যেন সাতটি অগ্নি। উহাদের সাতটি বিষয়ও তাঁহা হইতে উদ্ভূত। উহারা যেন সাতটি সমিধ্। সাত প্রকার বিষয়-বিজ্ঞান যেন সপ্ত হোম। এই হোমও অক্ষর পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। মস্তকস্থিত সাতটি ইন্দ্রিয় যেখানে অবস্থান করিতেছে সেই সাতটি ইন্দ্রিয়-গোলকেরও উৎপত্তি তাঁহা হইতে। মুণ্ডক উঃ ২।১।৭

৩ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে কোনও কোনও যোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার এবং প্রাণক্রিয়া আহুতি দেন। গীতা ৪।২৭

"এই সুস্থির ইন্দ্রিয়-নিরোধই যথার্থ যোগ। এই যোগাবস্থা দ্বারা মানুষ সর্বপ্রকার ভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি অতিক্রম করে। যোগ আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার উদ্ভব এবং অনাদি অবিদ্যার বিলয়-স্বরূপ।" কঠ উপনিষদ্ ২।৩।১১-১২

ঋগ্‌বেদের প্রথম মন্ত্র যোগীর নিকট পরম উদ্দীপনা বহন করিয়া আনে। সারা জগৎ যখন প্রমত্ত বাসনার বশে ইন্দ্রিয়-পরিপূর্তিতে ব্যস্ত, যোগী 'অগ্নিমীলে' মন্ত্রে সংযমাগ্নিকে আবাহন করিয়া স্বীয় হৃদয়বেদীতে স্থাপন করেন। সেই অগ্নিতে কী আশ্চর্য হোমই তিনি উদ্‌যাপন করেন! সাধারণ মানুষ উহা বুঝিতে পারে না। যোগী যেখানে জাগিয়া, সাধারণ মানুষ সেখানে নিদ্রিত। সাধারণ মানুষের নিকট যাহা দিবালোক, যোগীর নিকট তাহা রাত্রির ন্যায় অন্ধকার। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকে এই ঘোষণাই আমরা শুনিতে পাই :—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

'সকল প্রাণীর নিকট যখন রাত্রি, সংযমী তখন জাগিয়া থাকেন। সকল প্রাণীর নিকট যাহা দিবালোক তাহা তত্ত্বদ্রষ্টা মুনির নিকট রাত্রির তুল্য।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিবস্তোত্রে চিত্তবৃত্তিনিরোধকে শিব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বলিতেছেন, "তমহহ হরমীড়ে"—সেই শিবের আবাহন করি। কোন্ শিব? যে শিব সংযমাগ্নি-রূপে হৃদয়ে "শুভ্রতেজঃ-প্রকাশঃ"—শুভ্র তেজ বিকিরণ করিতেছেন। কার্য-কারণ-ভাব, চিত্তের অসংখ্য বৃত্তি, অগণিত সংস্কার সেই অগ্নিতে সমর্পিত। সকল প্রকার বিকার শিবের সেই শুভ্র দ্যুতিতে বিলীন। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুই জগৎই তিরোহিত। "তমহহ হরমীড়ে"—সেই শিবের আবাহন করি।[৪] 'হরমীড়ে' এখানে 'অগ্নিমীলে'রই নামান্তর।

ভর্তৃহরি তাঁহার 'বৈরাগ্যশতকম্'-এর প্রথম শ্লোকে শিবকে 'জ্ঞানপ্রদীপ'-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—যে প্রদীপের আগুনে কামদেব পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছিলেন। যোগীর হৃদয়ে শিবরূপ অগ্নিশিখা দীপ্তি পাইতেছেন। কামনা বাসনা আসক্তি মোহ ভয় প্রভৃতি পরমশ্রেয়োলাভের যত প্রতিবন্ধ সব সেই অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হউক, ইহাই যোগীর আকাঙ্ক্ষা। মদনান্তক মহাদেবকে যোগী 'অগ্নিমীলে' বলিয়া হৃদয়ে আবাহন করেন।

যিনি কর্মযোগী, 'অগ্নিমীলে' তাঁহারও মহামন্ত্র। তিনি কর্ম করেন কিন্তু কর্তৃত্ববুদ্ধি, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হইল তাঁহার সাধনা। তাঁহার হৃদয়ের যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞাধিপতি শ্রীভগবানকে প্রতিনিয়ত তিনি আহুতি অর্পণ করিতেছেন—কর্মফলাসক্তি ও অহঙ্কার। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কর্মযোগ-রূপ মহাযজ্ঞের রহস্য ও সিদ্ধি অষ্টাদশাধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করিয়াছেন :

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

"যাঁহার শক্তিতে ভূতবর্গের সমস্ত প্রবৃত্তি সম্ভবপর এবং যিনি সারা বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, নিজ নিজ কর্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা

---

৪ জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অগণনবহুরূপা যত্র চৈকো যথার্থঃ।
শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তিনিরোধম্।

গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ।
যমিজনহৃদিগম্যো নিষ্কলো ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ।

করিয়া মানুষ পরমা সিদ্ধি লাভ করে।" পরমেশ্বর অনির্বাণ অগ্নিরূপে অন্তরে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছেন। আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম সেই অগ্নিতে যদি আমরা অর্পণ করিতে পারি তাহা হইলে কর্ম আর আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না। আমাদের চিত্তের সকল বিক্ষেপ ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে। সেই প্রশান্ত চিত্তে তখন আমরা সর্বকারণ অক্ষয় অনন্ত ভগবৎ-সত্যকে বোধে বোধ করিতে পারি।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে নানা যজ্ঞের বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "সকল প্রকার যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জ্বলন্ত আগুন যেমন কাঠকে পুড়াইয়া ছাই করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করে। ধীরে ধীরে সাধন করিতে করিতে যথাসময়ে মানুষ নিজেই আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জ্ঞান দ্বারা সে পরা শান্তি লাভ করে। যাবতীয় বস্তুকে আত্মাতে দেখা এবং আত্মাকে যাবতীয় বস্তুর মধ্যে দেখার নামই জ্ঞান।" গীতা ৪।৩৩-৩৯

অন্য যে কোনও প্রকার যজ্ঞে কর্তা করণ ক্রিয়া—এই ত্রিবিধ ভেদ স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়। আমি ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতেছি, আমি পরমেশ্বরকে কর্মফল সমর্পণ করিতেছি—পূর্বোক্ত এই প্রকার আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাতেও ঐ ভেদ বর্তমান। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞে এই ভেদ তিরোহিত। কর্তা, করণ ও কর্ম—তিনই এক চৈতন্য-সত্যে একাকার। জ্ঞান কোনও ক্রিয়া নয়, ইহা একটি অসামান্য অনুভূতি। এই অনুভূতির ফলে মানুষের সকল ক্ষুদ্রতা, সীমাবদ্ধতা, ভয়, সংশয়, মোহ দূর হইয়া যায়। অসংখ্য বহুর মধ্যে এক নিবিড় একতা উপলব্ধ হয়। ইহারই নাম পরমা মুক্তি।

'অগ্নিমীলে' জ্ঞানীর নিকট এক অভিনব অর্থ প্রকাশ করে। 'অগ্নি' এখানে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অনাদি অনন্ত সর্বাবগাহী চৈতন্যসত্তা ব্রহ্ম বা আত্মা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু—দেশ, কাল, ভূত, প্রাণ, মন সবই অগ্নি হইতে নির্গত স্ফুলিঙ্গের মতো ব্রহ্মসত্তারই বিচ্ছুরণ মাত্র। জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন :

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥[৫]

'ভাবাঃ' বলিতে উপনিষদ্ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করিতেছেন,—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, গ্রহনক্ষত্র, অসংখ্য জীবনিবহ, দেবগন্ধর্ব, পৃথিব্যাদি সকল লোক, বেদ, যজ্ঞ, কর্মবিধান, তপস্যা—এককথায় সমগ্র জগৎ-সংসার। যাহা কিছু অস্তিত্ববান তাহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ, ব্রহ্মধর্মী। সমস্ত জগৎ-ব্যাপার অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যস্ফুরণ, যিনি জ্ঞানী তাঁহার নিকট এই সত্য কোনও পরিকল্পনা নয়, একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই অনুভূতির নামই জ্ঞানযজ্ঞ। সৃষ্টিস্থিতিলয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে ঘটিতেছে—উহারা আত্মারই অভিব্যক্তি—এই আশ্চর্য ঘটনা যেন এক বিপুল যজ্ঞ। ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, সেই অগ্নিতে যাহা আহুত হইতেছে তাহাও ব্রহ্ম। আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞান আত্মচৈতন্যেরই বিলাস। তৈত্তিরীয়

---

৫ যেমন সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা বিকীর্ণ হয়। সেইরূপ হে সোম্য, অক্ষর (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) হইতে বিবিধ ভাব অনবরত উৎপন্ন হইতেছে এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে।

মুণ্ডক উঃ ২।১।১

উপনিষদ্ বলেন (২।৭) একটি সামান্য বিন্দু পর্যন্ত ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। যেহেতু ব্রহ্ম সব কিছুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সব কিছুর অন্তরে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন সেই জন্যই তিনি ব্রহ্ম—বৃহত্তম। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের অপর নাম। "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্"—এই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা ব্রহ্মই। "আত্মৈবেদং সর্বম্"—এই যাহা কিছু অনুভব করিতেছ তাহা আত্মাই।

সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ—জ্ঞানযজ্ঞ—মানব ও জগৎ-সত্যের পূর্ণানুভূতি। যতক্ষণ মানুষ তাহার দেহ মন বুদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ, যতক্ষণ সে জীব ততক্ষণ তাহার যজ্ঞ কর্তা-করণ-কর্ম—এই ত্রিবিধ ভেদ দ্বারা আবদ্ধ। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার জীবত্ব ঘুচিয়া যায়। সে তখন অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত তাদাত্ম্য বোধ করে। এই অবস্থায় তাহার সকল সাধনা ফুরাইয়াছে, করিবার আর কিছু নাই। শুধু দেখিয়া যাওয়া যে অন্তবিহীন চৈতন্য-সমুদ্রে জগৎসংসার বুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে আবার মিলাইতেছে। সমুদ্রও জল, বুদ্বুদও জল। নামরূপহীন সচ্চিদানন্দ যাহা, নামরূপময় সংসারও তাহা। এই দেখিয়া যাওয়ার নামই জ্ঞানযজ্ঞ।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, ২৪ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃতি :—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া, ভক্তদের প্রতি)—"কি দেখছি জান? তিনি সব হয়েছেন। মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনি হাত পা মাথা নাড়ছেন। যেমন একবার দেখেছিলাম মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু সব মোমের—সব এক জিনিসে তৈয়ারী।

"দেখছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাঠ হয়েছে।" ঈশ্বরই কামার, বলি, হাড়িকাঠ হইয়াছেন—এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—'আহা! আহা!'

*

ঠাকুরের এই সুখদুঃখের অতীত অবস্থা দেখিয়া ভক্তেরা অবাক্ হইয়া রহিয়াছেন। লাটুর দিকে তাকাইয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন—

"ঐ লোটো,—মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে,—তিনিই মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন।"

*

অগ্নিমীলে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেবং ঋত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

বিশ্বতোব্যাপ্ত সর্বপ্রবিষ্ট সর্বস্বরূপ জ্ঞান-জ্যোতির বন্দনা করি। এই চিরভাস্বর জ্যোতি আমাদের সদা সন্নিহিত। জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা পরমঋত্বিক সাজিয়া আপনাতে আপনাকে আহুতি দিয়া জগৎ-প্রপঞ্চের বিস্তার করিতেছেন। এই বিস্তারই মহাযজ্ঞ। তিনি নিজেই এই মহাযজ্ঞের দেবতা। এই মহাযজ্ঞকে জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ মুক্তি লাভ হয়।

নামরূপের মধ্যে বহুমূর্তিতে প্রকাশমান আবার নামরূপের অতীতে পরমসত্য-স্বরূপে বিরাজমান অগ্নির বন্দনা করি।

একটি দুর্গাপূজার ঘটনা

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

অনেকদিন আগে একদিন এক বাড়ীর বারান্দায় আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেদিন দুর্গাপূজা, ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। পথের এখানে-সেখানে সর্বজনীন পূজার মণ্ডপ গড়ে উঠেছে। আর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়েছে পথে নতুন কাপড়-জামা-পরা বালক-বালিকা ও ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র ইতর-ভদ্র নরনারীর স্রোত। বিরাম নেই। থামা নেই। অপেক্ষা নেই। এক আনন্দময় কলকোলাহলময় জনস্রোত চলেছে 'আনন্দময়ীর আগমনে'র উৎসব-মণ্ডপে। বেশভূষা হাসিকথায় উজ্জ্বল জনস্রোত।

সে বারান্দায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয়ও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মসমাজের মানুষ। অত্যন্ত আনন্দিত মুখে শিশু বালক ছোট বড় পথচারীদের দেখতে দেখতে বললেন, 'এ যেন একটা জাতির প্রাণের জীবনের আনন্দ-*স্রোত বয়ে চলেছে সমগ্রভাবে।'...আর কি* বলেছিলেন তা মনে পড়ে না, কিন্তু এই জাতীয় উৎসবের আনন্দময় রূপটিতে তিনি উৎসবের অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সমগ্রতা ও আনন্দকে দেখতে পেয়েছিলেনও যেমন স্পষ্ট করে, তেমনি আনন্দও পেয়েছিলেন একান্তভাবে। পৌত্তলিকতা বা নিরর্থক আচার-অনুষ্ঠান ভাবেননি। 'আনন্দময়ী'র আনন্দময় রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। সরলা দেবী (চৌধুরাণী) তাঁর 'জীবনের ঝরা পাতায়' উল্লেখ করেছেন এই আনুষ্ঠানিক উৎসবের অভাবের কথা আদি ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীর দু'শাখায়—হিন্দু ও ব্রাহ্ম শাখায়।

১৩৭২তে এবারে সেদিন এমনি এক অনুষ্ঠানময় উৎসব-প্রাঙ্গণের দুর্গামণ্ডপ বা চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দরকারী অ-দরকারী লোকজনের ভিড়ের সীমা নেই। যে কাজ করছে সেও যত ব্যস্ত, যে কিছুই করছে না সেও তত ব্যস্ততা প্রকাশ করছে।

জিনিসও সব চাই! সব লাগবে পূজায়। নবপত্রিকায় ন'রকম গাছ চাই। ভোরের শিশিরের বিন্দু থেকেও মায়ের স্নানের জলে কয়েক বিন্দু লাগবে। বেশ্যার দুয়ারের মাটিও চাই। কত কি যে চাই তার জন্য কত রকমের লোক ছুটোছুটি করছে। ষষ্ঠীর বোধন থেকে সপ্তমীর ভোরের মঙ্গল আরতির বাজনা থেকে সেই কর্মযজ্ঞের আরম্ভ। ত্রুটি না হয়, ভুল না হয়, দেরী না হয়।

চারদিকে ভিড় জমে ওঠে। ঠাকুর-*দালানের মাঝখানে প্রতিমা। সপরিবারে।* সুশোভিতা, সুসজ্জিতা। চালচিত্রে আছেন সব দেবতা। নানারকম পশুপাখীর বাহন তাঁদেরও রয়েছে।

মনে হ'ল তাই তো, সব মিলিয়ে নিতে মিলিয়ে দিতেই বুঝি এই মাতৃরূপ? সর্পভূষিত বৃষভবাহন মহাদেব আছেন, সঙ্গে নন্দী আর ভৃঙ্গী।

ক্রূর সাপ, হিংস্র সিংহ, সুন্দর ময়ূর, হাঁস, রাত্রিচর গোপনজীব পেঁচা, বিবরবাসী ইঁদুর, মহাকায় মহিষ-অসুর—জগজ্জননীর দশপ্রহরণের ইঙ্গিতে পরস্পরের খাদ্য-খাদক-ভাব, হিংসা ক্রূরতা আক্রোশ অহঙ্কার থেমে রয়েছে যেন!

জগন্মাতা বুঝি দেখাচ্ছেন সকলেই এক

জগতের প্রাণী, অধিবাসী, চিরদিনই একত্রে তাদের বাস করতে হবে ভালবাসায় প্রেমে হিংসায় ক্রূরতার মাঝেই। আশাভালবাসাময় হিংসাদ্বেষময় জীবনমৃত্যুর মাঝেই এই বাঁচার 'বাসা' এবং মৃত্যুর মাঝেই বেঁচে থাকা ফল-ফুল-শস্য-আলো-অন্ধকারময় জগতে—রূপরসময় পৃথিবীতে। শূন্যেও শূন্যময় রূপ-রঙের লীলা। পৃথিবীতেও মাটিতেও রূপরসের লীলা। নবপত্রিকায় রয়েছেন ফল-ফুল-শস্য-মূলময়ী দেবী পৃথিবী-দেবী, ওষধি-ফুল-শস্য-বৃক্ষময়ী প্রাণদেবতা। কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদ, জয়ন্তী (জায়ফল) গাছ, বেলগাছের অশোকগাছের শাখা, ধান, মান (কচু) আর শ্বেত অপরাজিতার লতাময়ী ধরণী ভরণী জীবজননী পৃথিবীদেবী —মাতা।

...

উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যস্ততার মাঝে এসে দাঁড়ালাম চার বছরের পর। চার বছর অন্তর পূজা এ সরিকের।

বর্ষীয়ান বর্ষীয়সী বড়রা আর বড় কেউ বেঁচে নেই, আমরা দু'একজন ছাড়া—যাদের কাজ করার ক্ষমতা 'কাল' হরণ করে নিয়েছে।

চুপকরে গিয়ে দুর্গাদালানে বসে রইলাম। না, চন্দনঘষারও ক্ষমতা হাতে নেই। ফুল-বিল্বপত্র বাছারও দৃষ্টি চোখে নেই; বেলপাতার 'চক্র' থেকে যাবে, দেখতে পাব না।

দেখি সব পুত্রবধূস্থানীয়া বৌ-গুলি কাজ করছেন।

মঙ্গলারতির সঙ্গেই তাদের স্নান হয়ে গেছে। নৈবেদ্যঘরে সবাই জড় হয়েছেন, পট্টবস্ত্রপরা ভিজেচুলজড়ানো উৎকণ্ঠিত হাসিভরামুখ কমবয়সের বৌগুলি। শহরে তারা কত সাজে, যা খুশি করে। আজ কি উৎকণ্ঠিত নিষ্ঠা! তাদেরও কারুর কারুর পুত্রবধূ হয়েছে। নাতি-নাতনী হয়েছে। তবু বয়সে বর্ষীয়সী নয় তারা।

এদিকে পূজা আরম্ভ হয়ে গেছে। ৺মাকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে।

পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন। নৈবেদ্য মহা-নৈবেদ্য আগের মত বিরাট বড নয়, তবু সাধারণ নৈবেদ্যের চেয়ে বেশ বড়, এসে পড়ছে মার পাশে। নৈবেদ্যের ঘরে কাজের কামাই অবসর একেবারেই নেই। সেবারে দুটি সপ্তমী। ১৩৭২তে।

দেবীর সপরিবার পূজা। অন্ন বস্ত্র ফুল অর্ঘ্য নৈবেদ্য-সম্ভার সকলের জন্যই দিতে হবে। সব বাহন সব দেবতার জন্যই চাই নৈবেদ্য ও বস্ত্র।

হ্যাঁ, সিংহ অসুর ময়ূর মূষিক হাঁস পেচক থেকে ওপরের মহেশ্বর-ব্রহ্মা-বিষ্ণুসহ চালচিত্রের দর্শক দেবদেবীরাও, পঞ্চদেবতা থেকে সবাই সম্পূজিত হবেন। 'সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ' বলে।

'ওরে পঞ্চদেবতার নৈবেদ্য হয়েছে? ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য বায়ু বরুণ? আর সর্বদেবতার নৈবেদ্য? সব দেবতা—সর্বভূতময় দেবতারা কি তাঁরা? আব্রহ্মস্তম্ব প্রাণময় জগন্ময় দেবতা? পুরোহিতের অবসরের ফাঁকে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হয়ে গেছে। এক অধ্যায় শেষ হচ্ছে আর ঘণ্টা কাঁসর ঢাক বেজে উঠছে অধ্যায়-সমাপ্তির।

বৃদ্ধবৃদ্ধা আমাদের শুধু দেখা আর শোনা ছাড়া আর কাজ নেই।

মা যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন কর্মশক্তি হরণ করে,—কেউ কিছু নয়। কেউ না হলে চলবে না, জগতে এমন কোনো কথাই নেই। মহাকাল আর মহাকালী-ই শুধু আছেন। কালস্রোত বয়ে চলেছে তাঁদের পায়ের তলা দিয়ে। আমরা কীটপতঙ্গেরই মত।

সেকালের মানুষ কয়েকজন বসে আছি। বাড়ীর এক বৌ ছিলেন বিদেশিনী মেমসাহেব। তিনিও আসেন। আনা হয়। দালানে বসে থাকেন চুপচাপ। পূজার কাজ অবশ্য কিছু করেন না, বরণও না। তবু স্বামী বর্তমান থাকতে এবং এখনও বৈধব্যের পরও আসেন। আস্তে আস্তে কথা কইছেন। তিনি বাংলা বোঝেন। একটু বলতেও পারেন। এখন শ্বশুরভাসুররা কেউই বেঁচে নেই। শুধু ভাসুরপো আর তাদের সন্তানরা বড় হয়েছে। কাজ সব করে। আগের মত সমারোহ উৎসব আর হয় না। জিনিস মহার্ঘ হচ্ছে দিন দিন। পুরোনো আমলের টাকার মাপে একালে কুলোয় না।

সহসা মেমটি বললেন, 'দেখ, কত বছরের পূজা তিনশো বছর ধরে এই দালানেই এই পূজা হচ্ছে। লোকে ভাবে কি করে কি হবে, পরে তারা না থাকলে। কত ভাবনা। কিন্তু দালান তো খালি থাকে না। বছরের পর বছর যাঁর পূজা তিনিই করিয়ে নিচ্ছেন।'

বললেন: "একবার আমি বিলেতে ছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল সেপ্টেম্বর মাস। এবারে ওদের কোন্ সরিকের পূজা—আমাদের বাড়ীর কি? দেশে ফিরলাম, দেখলাম এদেরই পূজা। আর একবার ভেবেছি, কি আর হবে পূজায় গিয়ে। আমি তো খৃষ্টানই। এবারে যাব না। স্বপ্ন দেখলাম—একটি ভারী সুন্দরী মহিলা লালপাড়শাড়ী পরে গহনায় সেজে আমার কাছে আসছেন। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে আছি। এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি তো যাবে না ভাবছ, তা আমিই এলাম।' চিনতে পারলাম না। বলি, কে তুমি? হঠাৎ দেখি, তাঁর পিছনে ঐ তোমার শুঁড়ওয়ালা দেবতাটি আসছেন।" মেমসাহেব হাসলেন। বললেন, "তখন বুঝতে পারলাম মহিলাটি তোমাদের দুর্গা ঠাকুর।"

আমরা আশ্চর্য হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনিও বাড়ীর বৌ, আমরাও। কিন্তু তিনি বিদেশিনী। ভিন্ন ধর্মের সংস্কারে মানুষ, বিবাহ-সংস্কারেও হিন্দু হয়ে বিবাহ হয়নি, খৃষ্টানই ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য কোন্ সংস্কারে তাঁর মনে এই শ্রদ্ধাময় চিন্তা জেগেছিল! মনে হল শ্বশুরকুলের কোনো সংস্কারই তো গ্রহণ করে বরণ করে কুলবধূর মত তিনি বধূ হয়ে আসেননি। অথচ সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি তিনি পরম শ্রদ্ধায় দূর থেকে দেখেছেন কোন্ জন্মান্তরের সংস্কারে অথবা এ জন্মেরই শ্রদ্ধা-পরায়ণতায়? বৃদ্ধা তারপর বললেন, 'দেখ এবারে আসবার কোনো ঠিক করিনি। হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল, আর মন টানলো।

আশ্চর্য। কিন্তু জান তো আমি তোমাদের মত নিয়ম-নিষ্ঠাময় বৈধব্য পালন করি না। পূজার মণ্ডপে কাজ করিনি কখনো। আবার মা মেমসাহেব। আমি তো বিধর্মীর মেয়ে। কিন্তু তোমাদের বাড়ীর বৌ। তাই কি এমন হয়?'

কোনো আচার-অনুষ্ঠান তিনি পালন করেননি কখনো। কোনো সংস্কারও তাঁর নেই। তিনি অঞ্জলিও দিলেন না, ব্রতনিয়মও করলেন না দেখলাম। কিন্তু নীরবে পূজার দালানে বসে সব অনুষ্ঠানগুলি দেখেছেন। আর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ও শুনলাম তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির একটি দূরত্ব ও শ্রদ্ধাময় কাহিনীর কথা।

আর মনে পড়ল 'কথামৃতে'র কথা: সব ঘাটেই এক জল, নামটি শুধু আলাদা। তিনি সাকারও, নিরাকারও এবং আরো কত কি।

মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের অনুধ্যান

স্বামী সন্তোষানন্দ

ভগবানের অপার করুণায় আমার ভাগ্যে মহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ ঘটে খুব সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯১৬ সনে, আর তাঁর মহাপ্রস্থান ঘটে ইংরেজী ১৯৩৪ সনে। এই দীর্ঘকাল ধরে বহুভাবে বহুবার তাঁর দর্শনলাভ ঘটেছে। কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তাঁর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করবার জন্য কোনকালে আমার কাছেও অনুরোধ আসবে। তাই এ অনুরোধকে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষজীর অলঙ্ঘনীয় আদেশ-রূপে গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। বহুদূরে ফেলে আসা কয়েকটি দিনের যে অস্পষ্ট ছবি স্মৃতির ক্ষীণ আলোকে তাঁরি কৃপায় ভেসে উঠবে তাই ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করবো। অনেক খুঁটিনাটি বাদ তো যাবেই, দিনতারিখও কিছু বলা যাবে না।

তখন তখন আমাব মঠে যেতে প্রায় ১২টা সাড়ে-১২টা হতো, কারণ আমি যেখানে থাকতাম সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে যেতে হতো। খুব সম্ভবতঃ ১৯১৬ সনের একদিন এইরকম মঠে গেছি। দেখি মধ্যাহ্নের আহারান্তে তাঁদের নিত্য অভ্যাস-মতো পরমারাধ্য মহাপুরুষজী ও শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ মঠবাটীর পশ্চিমের বারান্দার বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। আর একখানা বেঞ্চিতে বসে আছেন কয়েকটি ভক্ত। নানা কথার মধ্যে পরমপূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বললেন, "এইখানে বসে স্বামীজী একদিন আমাকে বললেন, 'দেখ বাবুরাম, ভারতবর্ষের আগামী ৪।৫শো বছরের ইতিহাসের পাতা উল্টে গেল, সব দেখে ফেললাম।' আমি বললাম, বেড়ে বাবা, বেড়ে আছ, আমরা ৪।৫ দিন দেখতে পাই না, আর তুমি ৪।৫শো বছর দেখে ফেললে! বেড়ে আছ।"

শুনেই মহাপুরুষজী বলে উঠলেন, "চার পাঁচ দিন? চার মুহূর্ত পরে কি হবে তাই জানি না। Next moment-এ কি হবে তাও জানি না, বলে কিনা ৪।৫ দিন!" মহাপুরুষজী উত্তর দিকের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "এইখানে বসে একদিন স্বামীজী (নিজের উরুদেশ দেখিয়ে) এইখানে এক থাপ্পড় মেরে বললেন, 'দেখ্, ঐ জাপানের ধার-করা সভ্যতা, ওটা টিকবে না। ঐ যে চীনে আফিম খেয়ে ঘুমুচ্ছে, ওটা উঠবে।'"

একথা ও-কথার পরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বললেন, "ঠাকুরের ব্যাপার! কিছুই বোঝা যায় না। তাঁর একটি ভক্তের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরেই সে একদিন এসে ঠাকুরের পায়ে ধরে কান্না! বলছে—'বৌকে ভালবাসতে ইচ্ছা করছে। এই তো মায়া। আমি তো ডুবে যাবো, আমাকে বাঁচান।' ঠাকুর বললেন, 'তুই একদিন কিছু খাবার নিয়ে আসিস্, তোর মায়াটাকে খেয়ে দেব।' কয়েকদিন পরেই সে একদিন এক চ্যাঙারী জিলিপি নিয়ে এলো। ঠাকুর তাকে বললেন সেটা তাকের উপর রেখে দিতে। সে তাই করলো, আর খানিকবাদে প্রণাম করে চলে গেল। রাত্রে তিনি আহারে বসলেন, আমি কাছেই ছিলাম, খাওয়াশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক কি নিয়ে এসেছে না?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, জিলিপি এনেছে।'

বললেন, 'দে দুখানা।' তাঁর পাতে দুখানা জিলিপি দিলাম। ঠাকুরের কাণ্ড কি কিছু বোঝা যায়? কি করে ওর ভেতরে ওর মায়া ঢোকালেন, কে জানে। তার পরে যাই না জিলিপিতে হাত ঠেকিয়েছেন আর যেন সিঙ্গি মাছের কাঁটা বেঁধার মতো যন্ত্রণায় হাত সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিলেন। তারপরে হাত ধুলেন। হাত ধুয়ে আবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জিলিপি ছুঁতে পারলেন না। উঠে বাইরে গেলেন, মুখ হাত ধুয়ে এলেন, এসে আবার বসলেন। কিন্তু থালা পর্যন্ত হাত পৌছালো না। তখন বাঁহাতে করে ডান হাতটা ধরে টানছেন আর বললেন, 'ছাড মা, ছাড। আমি কথা দিয়েছি। মা, ছাড। ছাড় মা, ছাড।' কিন্তু কিছুই হলো না, খাবার থালা পর্যন্ত আর ছুঁতে পারলেন না। তখন উঠে গেলেন, আমাদের বললেন, এই জিলিপি যেন আমরা না খাই, যেন ফেলে দেই। পরে দেখা গেল, ওঃ, সেই বৌকে নিয়ে তার কি নাজেহাল। কিছুতেই সেটাকে ছাড়তে পারলো না। অতখানি আসক্তি ছিল বলেই ঠাকুর সেদিন খেতে পারলেন না।"

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বললেন, "মহারাজ, সে তো ঠাকুরের কাছে মুক্তি চাইলেই পারতো।" জবাবে প্রেমাবতার স্বামী প্রেমানন্দজী বললেন, "ঠাকুরকে দেখেছে, মুক্তির কি আর তার বাকি আছে? মুক্তি হয়েই গেছে।" এর পরে সভা ভঙ্গ হলো। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ উঠে সিঁড়ির দিকে রওযানা হলেন, উপরে যাবেন বিশ্রামের জন্য। একজন ভক্ত বললেন "মহারাজ, আমরা তো আর ঠাকুরকে দেখিনি, আমরা আপনাকে দেখছি।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো —"আমরা কে? ঠাকুরই সব।" বলেই দু-হাত তুলে সুর করে বললেন, "তোমার কর্ম তুমি কর, মা, লোকে বলে করি আমি।"

*

১৯১৭ সালের দুর্গাপূজা; কলকাতাতেই যদিও ছিলাম, তবুও পূজার কয়েকদিন মঠে যাওয়া হয়নি। গেলাম মহানবমীর দিন সন্ধ্যার পরে। তখনও পর্যন্ত পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয়ই ঘটেনি। তিনি গম্ভীর থাকতেন বলেই বোধ হয় তাঁর কাছে যেতে ভয় হতো। তাই মঠে গেলে কোন গতিকে একটি প্রণাম করেই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতাম। যাই হোক মহানবমীর সন্ধ্যার পরে যখন মঠে গিয়ে পৌছলাম তখন সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যা দেখলাম তা জীবনে ভোলবার নয়। আগে কখনও এরকম দৃশ্য দেখিনি। তখন পূজা হতো পুরোনো ঠাকুরমন্দির আর মঠবাড়ির মাঝের জায়গাটিতে। দেখলাম মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা মহানন্দে নৃত্যগীতে মগ্ন। একদল গাইছেন, 'জয় শিব, জয় জগৎপিতা', অন্যদল গাইছেন, 'জয় দুর্গা, জয় জগৎমাতা'। আরও দেখলাম যে সাধু-ব্রহ্মচারীদের একপাশে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজও গান গাইছেন ও নৃত্য করছেন। তাঁর একটি হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত আর তিনি সঙ্গীতের দুটি পদই সমানভাবে গাইছেন। একবার গান শেষ করেই সব সাধু-ব্রহ্মচারী দেবীর সম্মুখে প্রণাম করে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকেও প্রণাম করছেন। মহাভাবে মাতোয়ারা মহাপুরুষজী বলছেন, "আজ আমরা সব শিবের দানা। আবার এখানে প্রণাম কেন? মাকেই প্রণাম কর।" অবশ্য একথায় কেউই তাঁকে প্রণাম করা থেকে নিরস্ত হয়নি।

ভাব ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো যেন আনন্দের বন্যা উঠেছে। বোধ হলো যেন এই সাক্ষাৎ কৈলাসধাম। জগদম্বা প্রেমে করুণায় দয়ায় যেন বিগলিত হয়ে আপন সন্তানদের অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করছেন। আর যেন দেবশিশুগণ মহানন্দে বিভোর হয়ে মহামায়ার পদপ্রান্তে উন্মত্তপ্রায় হয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য করছেন। আর মহাপুরুষ মহারাজ? মনে হলো যেন আমাদের পরিচিত স্থূল জগৎ তাঁর দৃষ্টি থেকে কোথায় লোপ পেয়ে গেছে। সঙ্গীতের মাঝে মাঝে যখন সকলে তাঁকে প্রণাম করছিল তারই মধ্যে একবার অন্য সকলের সঙ্গে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পালও তাঁকে প্রণাম করবার জন্য যখন নতজানু হয়ে মস্তক অবনত করার প্রয়াস করছে, সেই মুহূর্তে দেহবোধশূন্য শিবস্বরূপ শিবানন্দ মহারাজ, 'আমরা সব শিবের দানা; শিব শিব বলে এখনই ঘাড়ে লাফিয়ে উঠবো' বলেই জিতেনের কাঁধে পা দিয়ে সোজা লাফিয়ে উঠলেন। অতর্কিতে তাঁর কাঁধে পদস্থাপন করে দাঁড়িয়ে ওঠায় জিতেন তাঁর সেই বিরাট দেহের গুরুভার ধারণে অসমর্থ হলো। তার মাথা সজোরে বাঁধানো উঠানের উপর ঠুকে গেল। এদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জ্ঞানরহিত মহাপুরুষজী পূর্বেরই ন্যায় নৃত্যগীতে মগ্ন রইলেন।

সহসা স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম, তিনি অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বেগে গঙ্গার দিকের বারান্দার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন, মুখে একমাত্র বাণী — "বেরোও শালা , বেরোও।" অতি সন্তর্পণে তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলাম, ঐ বারান্দায় দুই বেঞ্চের উপর দুজন ভদ্রবেশী লোক বসে আছেন। আর বাম হস্তের তর্জনী উত্তোলন করে তাঁদের সক্রোধে বলছেন, "বেরোও, বেরোও, এখুনি বেরোও।" তাঁরা কিছু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করায় তিনি যেন আরও রেগে গিয়ে গর্জে উঠলেন, "বেরোও এখান থেকে, এখুনি বেরোও।" অন্য উপায় না থাকায় তাঁরা উঠে রওনা হলে তিনি একজন ব্রহ্মচারীকে আদেশ করলেন, "একেবারে গেটের বার করে দিয়ে আসবে।"

সমস্ত ব্যাপারটি বোধ হয় মিনিট দুয়েকের মধ্যে ঘটে গেল। আমার কিন্তু তাঁর এই আচরণ মোটেই ভাল লাগলো না। ভাবতে লাগলাম, এই পুজোর দিনে দু'দুজন ভদ্রলোককে এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া—এ কি অন্যায়! এদিকে মহাপুরুষজী কিন্তু পূজাস্থানে এসে পূর্বের ন্যায় মহোল্লাসে গান ধরলেন ও নৃত্য করতে লাগলেন। যেন যে লোকটি একটু আগে আগন্তুক দুজনকে মঠ থেকে বের করে দিলেন তিনি অন্য কেউ! যাহোক অল্প পরে আমাকে সেই আনন্দমেলা থেকে বিদায় নিতে হলো। কারণ আমাকে ফিরতে হয়েছিল কলকাতায়।...

কয়েক মাস কেটে গেছে; গ্রীষ্মের শুরু। একদিন দুপুরে মঠে গেছি। তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে একই পঙ্গতে বসে আহার করতেন এবং দুপুরের খাবার পরে চায়ের টেবিলের ওখানে বেঞ্চিতে বসে তামাক খেতেন ও একটু-আধটু গল্প করতেন। সেদিন গিয়ে দেখি তিনি মধ্যাহ্নের আহারের পরে উক্ত বেঞ্চিটিতে বসে আছেন, আর সেখানে উপস্থিত কয়েকজন প্রাচীন ভক্তের সঙ্গে আলাপ করছেন। তিনি বলছেন, "এবারে মঠের পুজোয় মায়ের মূর্তিটি ভারি সুন্দর হয়েছিল। মুখখানি হয়েছিল অতি চমৎকার!" বলেই বলতে আরম্ভ করলেন, "নবমী পুজোর দিন রাত্রে সবাই প্রণাম কচ্ছিল;

তার মধ্যে একজন বাইরের লোক প্রণাম করে আমার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা চাটতে আরম্ভ করলো। চাটতে চাটতে কসের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কট্ করে এক কামড় দিয়ে ছেড়ে দিলে, আমি বললাম, 'পা উচ্ছিষ্ট করলে! গঙ্গাজল এনে ধুইয়ে দাও। সবাই প্রণাম করবে যে।' তারা জল এনে পা ধুইয়ে দিলো, কিন্তু পরেই পাটা জ্বলতে আরম্ভ করলো। বুঝলাম যে ওর saliva-তে poison আছে। ওর ··· ব্যারাম আছে (একটি ইংরেজী কথা বলেছিলেন, ভুলে গেছি)। তখন ওদের তাড়িয়ে দিলাম।" কথা শুনে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বললেন, "মহারাজ, ওরা কর্তাভজা, ওরা মনে করে মহাপুরুষদের পায়ের বুড়ো আঙুল চুষে শক্তি সংগ্রহ করা যায়।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী হেসে বললেন, "শক্তি-ফক্তি নেযা বুঝলাম না, তবে পাটা জ্বালা করছিল।" বলেই হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি সেই সময় ছিলে না।" বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, ছিলাম।" সেই পূজোর মহানবমীর রাত্রে অনেকের মধ্যে আমিও তাঁকে দু-চারবার মাত্র প্রণাম করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে কোন বাক্যালাপই হয়নি। আর তখন মঠে বিদ্যুৎবাতি ছিল না। কয়েকটি হ্যারিকেন জ্বলছিল মাত্র। পূজামণ্ডপের সামনে মঠের উঠোনের বড় আমগাছের ঘনছায়ায় অনেকখানি জায়গা, বিশেষ করে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী যে স্থানে দাঁড়িয়ে নৃত্যগীত করছিলেন, সে স্থানটি অন্ধকারেই ঢেকে রেখেছিল। সুপরিচিত কাছের লোককেও সে অবস্থায় সহসা চেনা শক্তই ছিল। অথচ তিনি সেই বিশেষ ঘটনাটির সময়ে যে আমি উপস্থিত ছিলাম, তা লক্ষ্য করেছিলেন! শুধু তাই নয়, বুঝতে বাকি রইল না যে তখনকার তাঁর সেই আচরণে আমার মনে যে অসঙ্গত চিন্তার উদয় হয়েছিল, তাও তিনি জেনেছিলেন। অথচ আজকের কথার মধ্যে তিনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সেই সময় ছিলে না?" তখন ও-কথাটি এমন সাধারণ ভাবেই বললেন যেন মনে হয় তিনি সেই রাত্রের ঘটনার জন্য একটি সম্ভাব্য সাক্ষীই মাত্র খুঁজছিলেন। এই সব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষির আচরণ সাধারণ লোকের বুদ্ধির গণ্ডির বাইরের বস্তু। কিন্তু বুদ্ধির স্বভাব—এটা ভাবা যে তার অগম্য কিছুই নাই।* (ক্রমশঃ)

* 'শিবানন্দ-স্মৃতি-সংগ্রহ' গ্রন্থের জন্য লিখিত।

দুর্গা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মাগো, এক হাতে তোর রূপসংহার, আন হাতে শুভ সৃষ্টি,
তাই বিরহের বুকে আজো ঝরে মধুমিলনের সুখবৃষ্টি।

মাগো, এক হাতে তোর করাল কৃপাণ, আন হাতে শুভ শঙ্খ,
তাই মন্থর মেঘমন্দিরে বাজে বিদ্যুৎ-জয়ডঙ্ক।

মাগো, এক হাতে তোর নিশীথ শ্মশান, আন হাতে উষাবরাভয়,
তাই চিরবিদায়ের ক্ষণে নাই তোর নব-উদয়ের পরাজয়।

মাগো, এক হাতে তোর আশাঝরা ব্যথা, আন হাতে প্রেমবিকশন,
তাই ভরিয়া আঁধার কাঁপে অনিবার পূর্ণিমাহাসি-শিহরণ।

মাগো, এক পায়ে তোর কলকল্লোল, আন পায়ে গাঢ় শান্তি,
তাই যুগান্তরের সান্ধ্য অচলে জ্বলে রবি-অভ্রান্তি।

মাগো, এক পায়ে তোর তাণ্ডব তাল, আন পায়ে মধুসুপ্তি,
তাই প্রলয়ের মাঝে নাই তোর নব জীবনলীলার লুপ্তি।

মাগো, এক পায়ে তোর সীমার মুক্তি, আন পায়ে ধরাবন্ধন,
তাই জল চায় মেঘে শ্যামল পর্ণ, মেঘ চায় জলদর্পণ।

তুই দ্বন্দ্বের আলোছায়ায় ঝরাস সুষমার মহানন্দ,
রণি' বহ্নিবিষাণে নিভৃতিনূপুর, গরলে অমৃতছন্দ।

স্বামীজীর আদর্শ

অধ্যাপক রেজাউল করীম

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, একদা বাঙলা দেশের যে তরুণ যুবকটি জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, ডেভিড হিউম প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থাদি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁদের ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, পরিণত বয়সে তিনি নাস্তিক হলেন না, অথবা জড়বাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হলেন না, বরং চরম আধ্যাত্মিকতার পথ অবলম্বন করলেন। একথা সত্য যে, নাস্তিকতা ও জড়বাদ-মূলক পুস্তকাদি তাঁর চিন্তাকে প্রসারিত করেছিল, প্রত্যেক বিষয়কে নানা দিক দিয়ে দেখতে ও বুঝতে সাহায্য করেছিল। পাশ্চাত্য দেশের এই সব পুস্তক তাঁর মনে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগ্রত করেছিল। তিনি স্বাধীনভাবে ও মুক্তমনে অনুসন্ধান করতে করতে চিন্তা ও ভাবের নানা স্তর পার হলেন এবং অবশেষে এমন এক স্থানে উপনীত হলেন যেখান থেকে আর কোন কূলকিনারা পেলেন না। জড়বাদী দর্শন তাঁকে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যেতে পারলো না। তিনি দিশেহারা হয়ে শান্তির আশায় ছুটোছুটি করতে লাগলেন। অবশেষে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে এসে সমস্ত সন্দেহের, সমস্ত দ্বিধা ও সঙ্কোচের চরম সমাধান লাভ করলেন। তিনি এতদিন মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এই সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে এসে তিনি কূল পেলেন, আশ্রয় লাভ করলেন। সুনিশ্চিত পথের সন্ধান লাভ করলেন। জগতের বহু মহামানবের প্রথম জীবনে এরূপই হয়েছিল। তাঁরা প্রথম জীবনে কিছুই বিশ্বাস করতেন না। দার্শনিক ডেকার্ট ঠিক এইভাবে সন্দেহ থেকে বিশ্বাসের নিশ্চয়তার উপর আশ্রয় লাভ করতে পেরেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্তের এই যে রূপান্তর, তা দেশ ও জাতির পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়েছিল।

এই তরুণ বাঙ্গালী যুবকই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দরূপে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের মহিমময়ী বাণী প্রচার করেছিলেন। এদেশের তরুণদের সামনে তিনি এক মহৎ আদর্শ তুলে ধরেছিলেন এবং দিশেহারা মানুষের কানে অমৃতের বাণী শুনিয়েছিলেন। যুবকবয়সে তিনি সত্যপথের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?" এই প্রশ্ন তিনি আরও অনেক দার্শনিক ও মহাপুরুষের নিকট করেছিলেন। কিন্তু কেহই সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে সদুত্তর দিতে পারেননি। তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা দার্শনিক মত শুনাতে লাগলেন। কিন্তু ঈশ্বরকে দেখার ব্যাপারে সকলেই মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। অনেকে স্পষ্টই বললেন —না, তাঁরা ঈশ্বরকে দেখেননি। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রশ্নকরা মাত্র, তিনি বিনাদ্বিধায় উত্তর দিলেন—"হাঁ, আমি দেখেছি, যেমন তোমাকে দেখছি, বরং তার চেয়ে আরও ভালভাবে গভীরভাবে ঈশ্বরকে দেখেছি এবং তোমাকে তা দেখাতে পারি।" এই অকপট স্বার্থহীন ও নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনে বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কই, এমনভাবে কেউ ত তাঁকে ঈশ্বরের কথা বলেনি। তিনি কোথাও

এই ধরনের পরিষ্কার দ্বিধাহীন উত্তর পাননি। ঠাকুরের সরল বিশ্বাস, ভাবগম্ভীর অপার্থিব ব্যক্তিত্ব, পবিত্র জীবন-পদ্ধতি তাঁকে বিমোহিত করলো। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের বশীভূত হয়ে গেলেন। ঠাকুরের জ্বলন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস তাঁকে পুলকিত করলো। ঠাকুরের ঈশ্বর-প্রেম তাঁর মনে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন যে, তাঁর উত্তরে অপরে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, নানা উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে সহজ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অভিজ্ঞতার কথা কেহই বলেননি। এই প্রথম তিনি এমন এক মহাপুরুষ দেখলেন, যিনি কোন তর্ক করলেন না, বরং গভীর বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথাই বললেন। সত্যো-পলব্ধির ইহাই প্রকৃত পথ। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি স্বচক্ষে ঈশ্বর দেখেছেন, তাঁকে অনুভব করেছেন, তাঁর অস্তিত্বকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর সমগ্র জীবন তিনি তাঁরই সঙ্গে অবস্থান করেছেন। এই স্বামীজী অবশেষে তাঁর মনের মানুষকে খুঁজে পেলেন। তাঁকেই গুরু বলে স্বীকার করলেন। তিনি এতদিন যে গুরুর সন্ধানে দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছিলেন, অবশেষে ঠাকুরের মধ্যে সেই পরম গুরু লাভ করলেন ও নিজেকে তাঁর চরণে বিলিয়ে দিলেন।

রামকৃষ্ণদেব এই নূতন শিষ্যের মধ্যে দেখলেন এমন এক শক্তি যা তাঁর অন্য কোন শিষ্যের মধ্যে ছিল না। ঠাকুরের সংস্পর্শ লাভ করে বিবেকানন্দ পৃথিবীর সব ছেড়ে দিয়ে তাঁরই মতো ঈশ্বরচিন্তায় আত্মসমাহিত হতে চাইলেন। এই তুচ্ছ জড়জীবনের সকল মোহপাশ কেটে দিয়ে মহান ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হতে উদ্যত হলেন, যাতে তাঁর নিত্য দর্শনসুধা পান করতে পারেন। এইভাবে অন্তর্জীবনের আনন্দের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিতে চাইলেন, পাপে ভরা এই পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে বললেন—'না, তা হবে না। এটা এক ধরনের স্বার্থপরতা। তোমার এই শক্তি, এই তেজ, এই কর্মোদ্যম ও উৎসাহ এসব কি তোমার নিজের আধ্যাত্মিক সুখের জন্য বিসর্জন দিবে? না, তা হতেই পারে না। তোমাকে আরও অনেক বড় কাজ করার জন্য বিধাতা প্রেরণ করেছেন। কি লজ্জা, কি লজ্জা! কেন তুমি কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির কথা চিন্তা করছো? সারা বিশ্বচরাচরে যত সব বস্তু আছে সে-সবই সেই মহান ঈশ্বরের স্বরূপের একটা দিকমাত্র। এদের কথাও ভাবতে হবে।' ঠাকুরের এইসব উপদেশ দ্বারা তিনি বুঝালেন যে, সত্যই ত ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তি চাওয়া একপ্রকার স্বার্থপরতা। তারপর থেকে তিনি সমগ্র মানব-সমাজের ব্যথা-বেদনাকে নিজের মনে অনুভব করলেন। তখন তিনি স্থির করলেন যে, সকল মানুষের যথার্থ কল্যাণ করবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। তাদের সকলকে মনুষ্যত্বের আলোক দিতে হবে। আমরা সকলেই মানবদেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি। সকলকেই জৈব নিয়ম মেনে বাঁচতে হবে। কিন্তু তিনি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করলেন, কেউ ত বাঁচার মত বেঁচে নাই। তাই তিনি চাইলেন যেন প্রত্যেক মানুষ শক্তি পায়, সৌন্দর্য পায়, ক্ষমতা ও মর্যাদা পায়। প্রত্যেকে যেন সত্যিকারের মানুষ হতে পারে। বিবেকানন্দ লক্ষ্য করলেন যে, দেশের অগণিত নরনারী দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত, লক্ষ লক্ষ লোক দরিদ্র ও গৃহহীন। অভাবে ও অশিক্ষায় তারা মৃতপ্রায় হয়ে আছে। যে দেশে এইসব

ঘটনা নিত্য ঘটে যাচ্ছে সে দেশে কেমন করে কেবল নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হবো? তাই তিনি স্থির করলেন যে তাঁর কাজ হবে এইসব দরিদ্র নরনারীকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। যতদিন মানবসমাজ এই প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে ততদিন তিনি কেমন করে নিজের কথা ভাববেন? ঈশ্বরকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা সকল মানুষের সেবা করা। তাই দেখি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মানব-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে স্বামীজী ত সন্ন্যাসী মানুষ। তাঁর এসব খেয়াল হলো কেন? কিন্তু তাঁর কথা-বার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তিনি নবযুগের বৈপ্লবিক সন্ন্যাসী। এ সন্ন্যাসী গৈরিক বসন পরতেন সত্য, কিন্তু মন তাঁর বিশ্বমানবের জন্য আকুলি-বিকুলি ক'রে কাঁদত। তিনি মানবতার উপাসক, দেশপ্রেমিকের আদর্শ-স্থানীয়। তাঁকে আমরা নানা অবস্থার মধ্যে নানা ভাবে ও নানা মূর্তিতে দেখেছি। যখন তিনি ধ্যান করেন তখন তিনি মহাদেবের মত 'তপের সাগরে মগ্ন বাহ্যজ্ঞানহত।' সেই একই ব্যক্তিকে দেখি দুঃস্থ আতুরের সেবায় সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকের মত অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সে যুগে সারা ভারতে দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের এই দেশপ্রেম কিছুটা ছিল পাশ্চাত্য ধাঁচের। আন্দোলন, রাজনৈতিক অধিকার-আদায় এইসব ছিল দেশ-প্রেমিকগণের আদর্শ। এই শ্রেণীর দেশপ্রেমিক-গণ দেশের অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের কথা ততটা ভাবেননি। স্বামীজী এদেরকে দেশপ্রেমের নূতন সংজ্ঞা দিলেন। তিনি দেশপ্রেমের কথাই বললেন। কিন্তু তা রাজনীতিবিদের দেশপ্রেম নয়। তাঁর দেশপ্রেম মানব-প্রেমের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাতে ঘৃণা নাই, ধ্বংস নাই, লুণ্ঠন-শোষণ নাই। তাতে আছে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানবপ্রেম। তাঁর ধর্মবোধ তাঁকে বললো, সমস্ত মানবকে আত্মীয়জ্ঞানে ভালবাসতে হবে, শিবজ্ঞানে সর্বজীবের সেবা করতে হবে। এমন ভাবে মানুষকে ভালবাসতে হবে যেন সকলেই এক পরিবারের অন্তর্গত—এই বোধ জাগ্রত হয়। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই মানবধর্মই গ্রহণ করলেন, এই শিক্ষাই তিনি দিলেন ভারত-বাসীকে। Man-making religion (অর্থাৎ 'মানুষকে মানুষ করার ধর্ম')—এই হল তাঁর নব ধর্মবোধ, এই ধর্মের একদিকে যেমন আছে ধ্যান ও তপস্যা, আবার অপরদিকে তেমনি আছে নিঃস্বার্থভাবে মানবসমাজের সেবা। ধ্যান ও সেবার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি আমরা মনের মধ্যে ঈশ্বরের চরম সত্যকে লাভ করি তবে মানবসমাজকেও পরিহার করতে পারি না। পৃথিবীতে যে-সব মানুষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে তাদেরকে উদ্ধার করা সকলের কর্তব্য। ইহাই আসল ধর্ম। তাই স্বামীজী বললেন, 'যখন আমাদের দেশের লোককে দেখি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে খাদ্যাভাবে পীড়িত হচ্ছে, যখন দেখি লক্ষ লক্ষ মানুষ অভাবে অনটনে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে তখন তাদেরকে উদ্ধার করাই হল, আমার মতে অন্যতম প্রধান ধর্ম।' তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে হবে। এই পূর্ণতা আসবে তখনই, যখন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব আছে (Divinity) তাকেই সেবার দ্বারা পরিস্ফুট করে তোলা হবে। এই ধর্মবোধের নাম হচ্ছে humanity, man-making religion—এই ধর্মবোধ একদা এ-দেশের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর এই আদর্শ রাজনৈতিক আদর্শকে ধর্মীয় আদর্শে

উন্নীত করে তুলেছিল। তাঁর প্রভাবে এদেশে একদিন শত শত তরুণের প্রাণে পুলক সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর সেই সেবামূলক ধর্মবোধকে আবার এদেশের তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে।

আজ জগতের চারিদিকে সঙ্কট প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। মানুষ যেন এক আগ্নেয়গিরির মুখে দণ্ডায়মান। কোন বস্তুর আসল মূল্যকে গুরুত্ব দিতে চায় না। জীবনের মানদণ্ড অত্যন্ত নিম্নস্তরে পড়ে গিয়েছে। আশাভঙ্গজনিত মনোভাব সর্বত্র বিশ্বাসকে শিথিল করে দিচ্ছে। আজকের দিনে স্বামীজীর জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই। তাঁর মত বিশ্বাস, আশাবাদ বলিষ্ঠ আত্মচেতনা জাগ্রত করতে হবে। তিনি জাতিকে তথা মানবসমাজকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আজ তাকেই বাস্তবরূপ দিতে হবে। তাঁর মূল্যবান উক্তি "নিজেদের স্পিরিচুয়াল সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে"—এই উক্তিটির সারমর্ম উপলব্ধি করতে হবে। ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত না করলে কিছুই হবে না। জড়বাদের চাকচিক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হলে চলবে না। প্রত্যেক বিষয়ের গভীরে আছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ—সেই অনুগ্রহ লাভের জন্য সাধনা করতে হবে। দেশের এই দুঃসময়ে স্বামীজীর আদর্শকে সামনে রেখে চললে দেশ ও জাতির মহদুপকার হবে, জাতির সঙ্কট কেটে যাবে। প্রার্থনা করি চিরতরুণ স্বামীজীর আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্য দেশের তরুণগণ যেন বিনা-দ্বিধায় এগিয়ে আসে।

পূজা

আনন্দ

হারিয়ে যাওয়া বেদনাগুলি হইয়া হাসি-রাশি
হৃদয়-সরোবরের বুকে উঠেছে আজি ভাসি।
স্মৃতিতে রাখা পুরানো যতো বেদনা-হাসি-গান,
দুঃখ-সুখের দ্বন্দ্বে ভরা যা-কিছু অবধান
সকলি যেন সফল হয়ে সাজিয়া নব সাজে
কমল হয়ে ফুটিয়া উঠে মোদের হৃদিমাঝে
লুটিয়া পড়ে চরণে তব সফল নিবেদনে—
এটুকু শুধু কাতরে যাচি আজিকে শুভ'খণে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী আদিদেবানন্দ

আধুনিক ভারতের সর্ববিধ মহান প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নামের সহিত সংযুক্ত আন্দোলনগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতের প্রতি তার আনুগত্য আছে ঠিকই কিন্তু ভবিষ্য সম্ভাবনাকে সে অস্বীকার করে না। ভারতাত্মার গভীরে এর মূল অনুপ্রবিষ্ট, একথা সত্য, কিন্তু এর দৃষ্টি বিশ্বজনীন। কাজেই এই-ই হল ভারতের যথার্থ জাতীয় অবচেতনা।

আধুনিক ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যাকে হিন্দুধর্ম বলি আমরা, তাকে সামগ্রিকভাবে পরিব্যাপ্ত করেছে তাঁর জীবন ও বাণী, কোন অংশবিশেষকে মাত্র নয়। তিনি ভক্ত ছিলেন, আবার জ্ঞানীও ছিলেন। তাঁর কাছে চরমসত্য-স্বরূপ ভগবান হলেন সাকার এবং নিরাকার দুই-ই, সগুণ আবার নির্গুণও। ত্যাগপূত ও ধ্যানরত সন্ন্যাস-জীবনের ওপর তিনি যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি সমভাবেই জোর দিয়েছেন সৎকর্ম- ও সদাচার-মণ্ডিত গার্হস্থ্যজীবনের ওপরও। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মত অনুরূপভাবেই তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন অধিকারীকে মর্যাদা দিয়েছেন। আবার উপনিষদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন যে, সব ধর্মের মূল উৎস একটিই, বিভিন্ন ধর্মগুলি যেন বিভিন্ন ধরনের আলোক-বর্তিকার মত, যেগুলির ভেতর দিয়ে একই আত্মার জ্যোতিঃ-ধারা সারাক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে; বিভিন্ন ধাতের মানুষের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে এই একই আত্মাকে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। এটা তাঁর কাছে মত বা তত্ত্ববিশেষ মাত্র ছিল না—বিভিন্ন ধর্মমতে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করে এ সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, প্রমাণিত করেছেন।

ক্রীষ্টোফার ইশারউড্‌ বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন ধর্মসমূহের ইতিহাসে একটি 'Phenomenon'—বিস্ময়কর ঘটনা; কারণ মামুলি শিক্ষার একঘেঁয়ে পদ্ধতির ভেতর দিয়ে না গিয়েও তিনি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার গোটা পথটিই অতিক্রম করে গেছেন। যে বিদ্যাদ্বারা নিত্যবস্তুকে লাভ করা যায় সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যার, পরাবিদ্যার ছাত্র এবং শিক্ষক দুই-ই ছিলেন তিনি। বেদান্তের চিরন্তন সত্যগুলিকে তিনি নিজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধিরূপ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত করেছেন; অপরের নিকট যা কথার কথা মাত্র সেই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, সমাধি, ঈশ্বর প্রভৃতি ছিল তাঁর কাছে উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্য।

অনুষ্ঠানের বেড়াজালে আবদ্ধ অনড় ধর্মের মধ্যে মুক্তির শক্তি কোথায়? মানুষকে তা বাহ্যানুষ্ঠানের বেড়াজালে বদ্ধই করে রাখে। কিভাবে যথার্থ ধর্মের শীর্ষদেশে পৌঁছে তার অভ্যন্তরীণ মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে তা দেখিয়ে গেছেন। নিষ্ঠা নিয়ে নীতি পালন করার শক্তি যে কী বিপুল, তাঁর জীবন হল তারও দৃষ্টান্তস্থল। যা করা উচিত নয় বলে মনে করতেন তিনি, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কখনও তা করতে পারতেন না। এমন একটা উচ্চাবস্থায় তিনি উন্নীত হয়েছিলেন যেখানে তাঁর চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ম সবই হয়েছিল সত্যানুস্যূত। তাঁর

প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি কর্ম মানবজাতির পরম কল্যাণের নিদান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িকদের মধ্যে বড় বড় শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসংস্কারক ছিলেন। তাঁদের অনেকের ধারণা ছিল অতীতের সবকিছুকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলতে হবে, আবার অনেকের ধারণা ছিল অতীতের কোন কিছুরই পরিবর্তন করা চলবে না। এই উদারপন্থী এবং গোঁড়া উভয় দলেরই অনেক কিছু শিখবার আছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ-সংস্কারকে মূল্য দিতেন কিন্তু একথা বিশ্বাস করতেন না যে, শুধু বাহ্য সংস্কারের দ্বারাই সমাজের সব দোষ দূর করা যায়। তাঁর মতে আধ্যাত্মিক শক্তির মুক্তিপ্রবণ প্রভাবই সমাজকে মালিন্যমুক্ত করতে পারে, কেবল কতকগুলো নেতিবাচক নিষেধ জারি করে তা হবার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের পুনরুজ্জীবনকল্পে যে সব পরিকল্পনা করেছেন, তার সবগুলিতেই বার বার এই দিকটির ওপর জোর দিয়েছেন।

অতীন্দ্রিয়রাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির কথা ভাবলে মন বিস্ময়-স্তব্ধ হয়। তাঁর শুদ্ধ অন্তঃকরণ অতীন্দ্রিয় বিষয় অনুভব করতে সক্ষম ছিল। এমন সব উপলব্ধি তাঁর হয়েছে—যা তিনি দেখেছেন, শুনেছেন, স্পর্শ করেছেন ও অনুভব করেছেন—কোন মর্ত্য মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত, যা পরবর্তী জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্বের অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরপ্রেম ছিল তাঁর কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এসে নিজ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের প্রসারের উপযুক্ত পরিবেশ পেলেন তিনি। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দামতা ভরা অধ্যায়ের সূত্রপাত হল এখানে। কালীমন্দিরে পুরোহিতের কাজের মাধ্যমেই তিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। তিনি 'জ্যোতির্ময়, সীমাহীন চেতনা-সাগর' দর্শন করেছিলেন, জগজ্জননীর নিরন্তর দর্শন লাভ করেছিলেন। কত বিচিত্র ঈশ্বরানুভূতিই না তাঁর হয়েছিল, সমগ্র মানবজাতির ধর্মাচার্যগণের জীবনেতিহাসে যা অতুলনীয়! বিভিন্ন ধর্মপথ ধরে একটির পর একটি সাধনা করেছিলেন তিনি। শাক্ত-মতে সাধনা করার সময় উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই জগন্মাতার মূর্তিবিশেষ। বৈষ্ণবমতে সাধনকালে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তার একটি সম্বন্ধ পাতিয়ে পৃথক্‌ভাবে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবাবলম্বনে সাধনা করেছিলেন। তারপর করেন অদ্বৈত সাধনা। অদ্বৈত সাধনায় তিনি ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন।

সুফীসম্প্রদায়ের একজন ফকিরের কাছে দীক্ষিত হয়ে তিনি মুসলমানধর্মমতে সাধনা করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, এ পথও আধ্যাত্মিক অনুভূতির একই লক্ষ্যে, একই ভগবানের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর কিছুকাল পর যীশুখৃষ্ট ও তাঁর বাণীর গভীর অনুধ্যানের ফলে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এ পথও চরমে গিয়ে মিশেছে একই লক্ষ্যে যা হল সকল ধর্মপথেরই মিলনভূমি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনুভব করেছিলেন যে তাঁকে জীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে—মানুষকে অজ্ঞান-নিদ্রা থেকে জাগাতে হবে এবং শাস্ত্রসমূহ ও ধর্মাচার্যগণ যে সত্যের সাক্ষ্য বহন করছেন, যে সত্য তাঁর নিজের কাছেও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট সেই সত্যের দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

নিজ সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবীই তাঁর প্রথম

শিষ্য; সারদাদেবীকে তিনি গৃহস্থালীর খুঁটি-নাটি কাজ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সব কিছুই শিখিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নতুন তত্ত্ব শেখাতে আসেননি, তাঁর আগমনে পুরাতন তত্ত্বগুলি নতুন আলোকে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কথাগুলি আপ্তবাক্য; গীতোক্ত ও উপনিষদুক্ত সত্যগুলি, প্রাচীন ঋষিদের বাণীগুলি তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত হয়েছে নবালোকে উদ্ভাসিত হয়ে। তাঁর যথোপযুক্ত উপমা, সহজবোধ্য গল্প ও অনবদ্য রসিকতা সহযোগে বিমূর্ত ভাবগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায় ও গল্পে গম্ভীর এবং হালকা ভাব, সম্ভ্রম ও হাস্যোদ্রেককারী ভাব একত্র মিলিত হয়েছে সুসামঞ্জস্যে।

কোন বিশেষ দর্শন, বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়-গত বিশেষ মতবাদ তিনি শেখাননি। মানুষকে তিনি এমন একটা ভাব দিয়ে গেছেন যা জীবনের একঘেয়েমির ওপর একটা অর্থ ও উদ্দেশ্যের আলোকপাত করেছে, যা তাকে ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের চরম প্রকৃতিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দেখতে শিখিয়েছে। প্রতি যুগের মানুষই তাঁর বাণীর ভেতর থেকে তৎকালের উপযোগী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ আবিষ্কার করতে পারে। প্রথমতঃ এ বিষয়টিতে তিনি অক্লান্তভাবে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করতেন সব সময় যে, ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এইটাই হল সব ধর্মেরই সারকথা। দ্বিতীয়তঃ সব ধর্মমতই একই লক্ষ্যে পৌছিবার বিভিন্ন পথ—যত মত, তত পথ। তৃতীয়তঃ জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথের লক্ষ্য এক হলেও কলিযুগে ভক্তিপথই অবলম্বনীয়। চতুর্থতঃ জীবনের সবকিছুর ওপরে, এমনকি জনসেবারও ওপরে স্থান হওয়া উচিত আধ্যাত্মিকতার। আধ্যাত্মিক জীবন সাংসারিক জীবনের প্রতিষেধক-স্বরূপ, আধ্যাত্মিকতাই জীবনকে অসাধুতা ও লোভের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। জীবনে আগে ভগবানের স্থান, তারপর সমাজ-সেবার। অনাদিকাল হতে ভারতীয় সত্যদ্রষ্টাগণ এই শিক্ষাই দিয়ে আসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সচ্চিদানন্দই হলেন চরম সত্তা। এই অদ্বয় সত্তাই বিভিন্ন ধর্মে ভগবান, আল্লা, বুদ্ধ, ব্রহ্ম, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে কথিত হন। এই সত্তা স্বরূপতঃ কার্য-কারণ-নিয়মের অতীত হয়েও জগতের কারণ-রূপে, পালক- ও আধার-রূপে জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ভক্তের কাছে তিনি প্রেমময় ঈশ্বর। তিনি ভক্তের প্রার্থনা শোনেন, অসীম কৃপাপরবশ হয়ে তা পূরণ করেন। অবতার তাঁরই করুণাঘনমূর্তি। কিভাবে সৎ-জীবন যাপন করে মুক্ত হওয়া যায়, মানুষকে তা শেখাবার জন্যই তিনি যুগে যুগে মানবদেহ ধারণ করে আসেন।

অধ্যাত্মগগনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি উপচীয়-মান জ্যোতিষ্ক। তাঁর আবির্ভাবের পর শতাব্দীকাল মধ্যেই সারা জগতে তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়েছে। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন ত্রিশকোটি হিন্দুর গত দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি। লোকে তাঁকে পূর্ণ-অবতাররূপেই দেখে। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

নমঃ শিবায়

বনফুল

হে শঙ্কর,
চর্ম-চক্ষে তোমায় দেখিনি কখনও
মানস-চক্ষে দেখেছি।
আমার সে দেখা সত্য না মিথ্যা
সার্থক না নিরর্থক
তা বিচার করবারও বুদ্ধি নেই আমার।
হে বিরাট, হে বিশাল,
হে রজতসন্নিভ পরম বিস্ময়,
হিমালয় রূপে ধ্যান-মগ্ন দেখেছি তোমায়
নীলাম্বর-লীন ঃ
হে মহাকাল,
তোমার বুকেই দেখেছি আবার
উন্মাদিনী দিগম্বরী মহাকালীকে।
কত বিচিত্র রূপ তোমার !
হে ফণী-হার, হে নীলকণ্ঠ,
হে গজাসুরবিজয়ী কৃত্তিবাস,
তোমারই জটাজালে
সুর-ধুনীর সুর-কল্লোল তরঙ্গিত।
আবার তোমারই পদতলে
তপস্বিনী উমা।
কুবের তোমার ঐশ্বর্যের রক্ষক
কিন্তু ভিক্ষুক তুমি।
জীবনের তুমি স্রষ্টা
কিন্তু শ্মশানেই তোমার বিলাস।
পাথরের মতো পড়ে' আছ কোথাও
অখ্যাত তরুমূলে বা মন্দিরে
সানন্দে গ্রহণ করছ
সরল জনপদবাসীদের সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি।

হে শিব, হে রুদ্র,
হে করুণাময়, হে নির্বিকার,
দক্ষ-যজ্ঞ-পণ্ডকারী
হে আশুতোষ,
তোমার নানা কাল্পনিক ছবির পায়ে
প্রণাম নিবেদন করছি সারাজীবন
সে প্রণাম তুমি পেয়েছ কি ?
হঠাৎ মনে হ'ল
যদি না পাও আমার দোষ নেই
আমাকে যে দৃষ্টি দিয়েছ
তাই দিয়েই তো তোমায় দেখব।
আমার কল্পনা তো তোমারই দান।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামী বিবেকানন্দ বিদায় নেবার আগে নিজের জায়গায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিংবা বলা যায়, নিজেকে দু-ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষেত্রে অন্তত:—ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের মধ্যে। নিবেদিতা এক চিঠিতে (ম্যাকলাউডকে লেখা —১৯.২.১৯০৩) তাই লিখেছেন—

"যদি জাপানে কয়েক মাস কাটাবার পরে স্বামী সারদানন্দের পথ আমেরিকার জন্য পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, খুবই খুশী হব। সারদানন্দ আমেরিকায় ক্রিস্টিনের কাজের জন্য (শিক্ষা-কাজ) টাকা তুলতে চান। আমার মতে তাঁর সর্বত্র ঘোরা উচিত, কেননা ভবিষ্যতে পৃথিবীর চারিদিকে তরুণবয়স্কদের স্থাপন করবার দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তাবে। আমি তাঁকে খুঁটিনাটি কাজের মানুষ অপেক্ষা মূল সংগঠক ও দায়িত্ব-বাহকরূপে দেখি। আর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখি অধ্যাত্মকেন্দ্ররূপে এবং কর্তারূপে।"

এই চিঠি নিবেদিতা লিখেছেন—রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কয়েক মাস পরেই। গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে এই বিচ্ছেদ হয়েছিল। যে-সংঘের সঙ্গে গুরু যুক্ত করে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ নিবেদিতাকে মর্মান্তিক বেজেছিল।[১] অপরপক্ষে সংঘের পক্ষেও এই ক্ষতি দারুণ, এবং যাঁরা নিবেদিতাকে স্নেহ করতেন, তাঁদের কাছে দুঃখদায়ক। সংঘের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই এই বিচ্ছেদের অন্যতম প্রকাশ্য অংশীদার হতে হয়। স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব অপসৃত, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের গোটা দায়িত্ব মাথার উপরে, তদুপরি যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভরূপে জনসমাজে পরিচিত, তাঁদেরই একজন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন—এমন ইন্দ্রপাত এবং বজ্রপাত কোনো প্রতিষ্ঠানের জীবনে একসঙ্গে হয়েছে কি না সন্দেহ। অনুরাগীদের কী গভীর বেদনা, এবং বিরোধীদের কী উল্লাস! এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, তখন বিরোধীরা অনুরাগীদের তুলনায় অন্তত: সংখ্যালঘু নন।

দ্রুত পরিবর্তমান ঘটনাধারার চেহারা এই রকম :

৪ঠা জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ।

অধিকাংশ সংবাদপত্রে সে সংবাদ প্রকাশিত হল ৬ই জুলাই।

৮ই জুলাই নিবেদিতা মঠে গেলেন। সঙ্গে ওকাকুরা। ইতিমধ্যে মঠের কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে তাঁর রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে বলেছেন। নিবেদিতা রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন নীতিগতভাবে রাজনীতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত। বিষয়টি নিয়ে বোঝাপড়া করার অভিপ্রায় ছিল নিবেদিতার, কিন্তু ওকাকুরা সঙ্গে থাকায় ৮ই জুলাই তা করা সম্ভব হল না।

১০ই জুলাই নিবেদিতা পুনশ্চ মঠে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হল। নিবেদিতা সম্পূর্ণ মনস্থির

---

১ কতখানি যাতনা নিবেদিতাকে পেতে হয়েছিল, তার কিছু পরিচয় সিস্টার দেবমাতা তাঁর স্মৃতিকথায় দিয়েছেন।

করতে পারলেন না, কিন্তু রাজনৈতিক সম্পর্ক বা অভিপ্রায় ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে বোঝা গেল।

কয়েকদিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতার অভিপ্রায় জানতে চেয়ে পত্র লিখলেন। ১৮ই জুলাই নিবেদিতার উত্তর এল।—

প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

আজ সন্ধ্যায় আপনার যে চিঠি পাইলাম, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি, আপনি সংঘের ও আমার পক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করুন। ব্যাপারটি বেদনাদায়ক। তথাপি আমার পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে-কোন ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহাতে আমার সম্মতি আছে।

যাহা হউক, বিশ্বাস আছে, আপনি এবং সংঘের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আমার শ্রীগুরুর ভস্মাবশেষের বেদীমূলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে ভুলিবেন না।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে লিখিয়া যথাসম্ভব সহজভাবে তাহাদিগকে আমার নূতন পরিস্থিতির বিষয় জানাইয়া দিব।

কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততাসহ

রামকৃষ্ণের নিবেদিতা[২]

আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে নিবেদিতা একটি বাক্যকে অমর করে রেখেছেন—**রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা**। উদ্ধৃত পত্রে তার অর্ধাংশের জন্ম: **রামকৃষ্ণের নিবেদিতা**; আগে লিখতেন: **রামকৃষ্ণ-সংঘের নিবেদিতা**। কিছু দিনের মধ্যে বিবেকানন্দ নামটি যুক্ত হয়ে দাঁড়াবে: **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা**।

১৯শে জুলাই 'অমৃতবাজারে' প্রকাশিত হল: "জনসাধারণকে এই কথা অবগত করাইবার জন্য আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের শোকদিবস-সমাপনান্তে বেলুড় মঠের সদস্যগণ ও ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে স্থির হইয়াছে, অতঃপর ভগিনী নিবেদিতার কার্যাবলী সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, মঠ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।"

একটা আলোড়ন ঘটে গেল। স্বামী বিবেকানন্দের পরেই রামকৃষ্ণ-সংঘ-ভুক্ত যাঁকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত ভারতবাসীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা—তিনিই স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেই সংঘত্যাগী। স্বামীজীর উপর শোকপ্রবন্ধগুলির অধিকাংশের মধ্যে নিবেদিতার নামোল্লেখ ছিল, এবং স্বামীজীর ত্যক্ত দায়িত্ব যে তিনিই বহন করবেন, এমন কথাও লেখা ছিল।[৩] সেই নিবেদিতা যখন সংঘের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, তখন বেলুড় মঠের সর্বনাশের কল্পনায় আনন্দে শিহরিত হলেন বহু জনই! কী উল্লাস ফুটেছিল সরলা দেবীর 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনায়, তার পূর্ণরূপ আমরা সরলা দেবী প্রসঙ্গে উপস্থিত করব, সেই সঙ্গে তৎকালীন আরও কিছু আমোদের রচনা। নিবেদিতার প্রতি সহানুভূতি উথলে উঠল নানা স্থানে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে। অযাচিত সহানুভূতিতে নিবেদিতা এমনই বিব্রত হলেন যে, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সেই স্নেহপ্রবাহ রোধ করার চেষ্টা করতে হল তাঁকে। সে বিবৃতি নিবেদিতার ব্যক্তিগত মহত্ত্ব এবং স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রতি শ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিবৃতিটি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ৩১শে জুলাই, ১৯০২।[৪] নিবেদিতা লেখেন—

"গভীরতম বেদনার সঙ্গে শুনেছি, কোনো

২ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা-অনূদিত।

৩ যেমন অমৃতবাজার পত্রিকায়।

৪ Vivekananda in Indian Newspapers দ্রষ্টব্য।

কোনো মহলে বলা হচ্ছে—আমি নাকি আমার মহান গুরু স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ-সংঘের অধ্যক্ষ হয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে যেন আমার নিম্নের বিবৃতিটিকে সর্বাধিকভাবে প্রচার করেন।

১। রামকৃষ্ণ-সংঘের কেন্দ্র বেলুড় মঠ, হাওড়া। এই সংঘের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের উপর ন্যস্ত—যাঁদের তুল্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অল্পই দেখা যায়।

২। এই সংঘ তার গুরু ও প্রতিষ্ঠাতার (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ) নিকট থেকে ধর্মদর্শন এবং ধর্মীয় উপলব্ধির সুনির্দিষ্ট ভাণ্ডার লাভ করেছে, অতঃপর যার সংরক্ষণ এবং বিস্তারসাধন করা এই সংঘের কর্তব্য হবে।

৩। এই ধর্মীয় সম্পদভাণ্ডারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক—দীন শিক্ষার্থিনীর ব্রহ্মচারিণীর, পূর্ণব্রতী সন্ন্যাসিনীর নয়, আমি সংস্কৃতজ্ঞ এমন কোনো অভিমান আমার নেই, ধর্মব্যাপারে আমার উর্ধ্বস্থ কর্তৃপক্ষের। বিশেষ অনুগ্রহ করে তাঁদের নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণের বহির্বর্তী সামাজিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাগত কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে, আমার গুরুর দেহত্যাগের পরে গুরু-ভগিনী ভিন্ন গুরু-ভাইদের সঙ্গে অধিক যোগাযোগ না রাখাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

৪। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুর জন্য ইউরোপীয় নেতৃত্ব প্রয়োজন—এর থেকে বেদনাদায়ক ভ্রান্তি, আমার মতে, সম্ভবপর নয়। উল্টোটাই হওয়া উচিত—আমার এই ধারণা।

ভরসা করি আমার এই পত্র অনেক সংবাদপত্র-লেখকেরই দৃষ্টিগোচর হবে,—এই পত্রটিকে তাঁরা তাঁদের রচনাপাঠের স্বীকৃতি এবং উত্তররূপেই ধরবেন।"

পত্রটির বিষয়ে মিরার-সম্পাদক লেখেন—

"সিস্টার নিবেদিতা সহযোগী হিন্দু কর্মীদের সম্বন্ধে আদর্শ ব্যবহার করেছেন। এ আচরণ তাঁরই যোগ্য—যদিও এ পত্রের প্রয়োজন ছিল কি না সন্দেহ। আমাদের এই উচ্চাশয়া ভগিনী বহুগুণান্বিতা, প্রতিভাময়ী—যদিও তিনি নিজের বিষয়ে নম্রভাবে 'অতি দীন শিক্ষার্থিনী' লিখেই তৃপ্ত। মর্মস্পর্শী এই দীনতাবোধ ও অহংশূন্যতা—জনসেবায় ব্রতী কর্মীদের কাছে আদর্শ হোক এ জিনিস!"

নিবেদিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের যে দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশনকে একদিন অহেতুক নিতে হয়েছিল, সে দায়িত্ব এবং তদনুযায়ী গঞ্জনা, অতীব দুঃখের বিষয়, এখন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিতে হচ্ছে, কারণ নিবেদিতার জীবনীসমূহ থেকে বাঙালী জনসাধারণ জেনে গিয়েছেন যে, ব্রহ্মানন্দই মিশনের সঙ্গে বিচ্ছেদের নিমিত্ত এবং বাঙালীরা রাজনৈতিক সত্যকেই একমাত্র সত্য বলে মানেন! একথা সত্য, স্বামীজীর সম্পূর্ণ ভাবধারাকে রামকৃষ্ণ মিশন বহন করতে পারবে কি না, এ সন্দেহ নিবেদিতার ছিল—কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন কি কখনোই দাবি করেছে—স্বামীজীর সমস্ত ভাবকে রূপায়িত করতে সে ব্রতী? রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, স্বামীজী মিশনের জন্য যেটুকু দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, কালোপযোগী করে সেটুকু পালন করা। সাধারণ সামাজিক মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর বহু উক্তি আছে—গৃহীর সেসব দায়িত্ব কি সন্ন্যাসী-সংঘ পালন করতে পারে? যে সংঘকে স্বামীজী রাজনীতির বাইরে স্থাপন করেছিলেন—সেই সংঘ নীতিত্যাগ না করে কিভাবে রাজনৈতিক কর্মের অভিলাষী নিবেদিতাকে ঠাঁই দিতে পারত?

যাই হোক, কোনো কোনো বাংলা জীবনীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্ক যেরকম তিক্ত ও সংঘর্ষময় করে দেখানো হয়েছে—সত্যই যে তা ছিল না, তার একটি প্রমাণ আমরা সূচনাতেই দিয়েছি—যেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার পত্রাংশ উদ্ধৃত আছে। এখন আরও কিছু সংবাদ দেওয়া যাক। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কী চোখে নিবেদিতা দেখতেন, তার যথেষ্ট পরিচয় এইসব স্থান থেকে পাওয়া যাবে।

স্টেটসম্যানের র‍্যাটক্লিফদের যখন সন্তান-সম্ভাবনা হল, তখন নিবেদিতা মিসেস র‍্যাটক্লিফকে ১৯০৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর লিখলেন—

"সারা ও আমার পক্ষ থেকে আগামীকাল যে ছোট উপহারটি তোমার কাছে নিয়ে যাব, সেটি একটি ভারতীয় কবচ। তার মধ্যে শিশুর জন্য প্রার্থনা রয়েছে—সে প্রার্থনা স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন। ব্যাপারটি তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

"আমার বিশ্বাস এই ছোট অলঙ্কারটি তুমি পছন্দ করবে—এটি এমন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়, আর ভাবী প্রাণটিকে আবাহন ও রক্ষণের উদ্দেশ্যে যে পবিত্র ভাবনা এর মধ্য দিয়ে প্রেরিত হল—তার প্রভাব ও শক্তিও তুমি অনুভব করবে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন চাইলেন নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী জীবনী রচনা করুন, তখন তাঁর সেই ইচ্ছ'কে আদেশতুল্য জ্ঞান করে গভীর আনন্দ ও আবেগ নিবেদিতা বোধ করেছিলেন। নিশ্চয় ব্রহ্মানন্দের এই ইচ্ছাকে তাঁর প্রতি গভীর আস্থার নিদর্শন বলে নিবেদিতা ধরেছিলেন! ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখলেন—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ চান, আমি স্বামীজীর ইংরাজী জীবনী লিখি। সুতরাং যত শীঘ্র পার, এর জন্য উপাদান প্রার্থনা, ভিক্ষা ও হরণ' কর।"

বুদ্ধগয়ার পরিচালনার অধিকার নিয়ে এই সময়ে, পূর্ব থেকেও, পরিচালক হিন্দু মোহন্তের সঙ্গে নতুন দাবিদার ধর্মপাল প্রভৃতির সংঘর্ষ চলছিল। নিবেদিতা এই সংঘর্ষে অংশ নেন, এবং ধর্মপালের অবুঝ অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করেন। এই ব্যাপারে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতা দুবার বুদ্ধগয়া যান। ১৯০৪-এর ২১শে জানুয়ারী চিঠিতে তিনি লিখছেন—"এই যাত্রায় যেভাবে আশীর্বাদ পেয়েছি বলবার নয়—গোপালের মা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও আর একজনের (স্বামীজী যাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন)।"

নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় একটি ইতিহাস-বিদ্যালয় খুলুন—ব্রহ্মানন্দের এই অভিপ্রায়ে নিবেদিতার পরম উৎসাহের রূপ—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ এখন আমাকে একদল ছেলে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় এক ইতিহাস-বিদ্যালয় খুলবার ভার দিচ্ছেন। এটা মনে হয় পরে বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষার এক কলেজ হয়ে দাঁড়াবে। এখানে আমি নিজের চিন্তাকে কার্যকর করবার আশা করছি। অন্তত্র আমি পরিকল্পনাকে সফল করবার চেষ্টা করি।" (৩রা মার্চ, ১৯০৪)

"শোনো, স্বামী ব্রহ্মানন্দ চান, আমি জন ছয়েককে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় ইতিহাস-স্কুল খুলি, সেখানে মাসে এক সপ্তাহ কাটাব—বাকি সময়ে আমার অনুপস্থিতিতে তাদের কাজ করতে হবে। আইডিয়াটা দারুণ। এখনই কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করব।" (২০শে মার্চ, ১৯০৪)

ঐ বছরেরই ৬ই নভেম্বরে নিবেদিতার মনোভাব—

"প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কখনোই তাঁর হৃদয়কে আমার থেকে সরিয়ে নেননি। কিন্তু অন্যদের কাছে, একেবারে সোজা ভাষায় বলতে গেলে, আমার নিজের স্থান সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় নই।"

পরের সপ্তাহেই, ১৩ই নভেম্বর লিখছেন—

"আমরা গতকাল মঠে গিয়েছিলাম। ফিরলাম নবীন চাঁদকে মাথায় নিয়ে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুতর পীড়িত হয়েছিলেন। এখন ভালো হয়ে গেছেন, যদিও তিনি তা ভাবেন না। আসল ব্রহ্মানন্দের সহসা আবির্ভাব দেখলাম—যখন গতকাল বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম। তাঁকে মনে হল—স্বামীজী। ওরা বললেন, এখন পাঁচ বছরের শিশুর মত স্বভাব তাঁর। অপরূপ! এর পরে সারা রাত ধরে স্বামীজীর স্বপ্ন দেখলাম: আমি পাশে বসে আছি; তাঁকে বললাম—আশীর্বাদ করুন! তিনি হাসলেন। আমার মাথায় হাতের চাপ দিলেন।—ব্রিটানীর দিনগুলির স্বপ্ন কী!—অনুপম সেই সপ্তাহ, যখন তাঁকে পেয়েছিলাম মানবের স্বর্গপ্রাপ্তির মত করে।"

ব্রহ্মানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে যিনি সর্বাধিক তথ্য জানেন, সেই লিজেল রেমঁ কিন্তু উত্তেজনাপ্রিয় বাঙালী লেখক বা বক্তাদের বিপরীত কথাই লিখেছেন। মিশনের সঙ্গে বিচ্ছেদকালে, যখন সম্পর্ক সবচেয়ে সংঘর্ষময় হওয়ার কথা, রেমঁ সেই সময়কার কথা লিখেছেন—

"নিবেদিতার ধরনধারনে সায় না থাকলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। এই মন-কষাকষি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য নিবেদিতা আচমকা একদিন তাঁকে ধরে বসলেন। কিন্তু আলোচনাটা তলিয়ে গেল ধ্যানতন্ময়তায়। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে ব্রহ্মানন্দ চোখ মেলে চাইলেন। নিবেদিতা তখনো নিস্পন্দ, অক্ষুব্ধ শান্তির পারাবারে তাঁর মন ডুবে গিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় ঐক্যবোধ।"

এই বিবরণের উৎস নিবেদিতা-ভগিনীর স্মৃতিকথা। অনুরূপ আর একটি বর্ণনা—

"নিজের কার্যকলাপের কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জানানোতে তিনি সস্নেহে হাসলেন একটু। বেশী কথা বললেন না ব্রহ্মানন্দ। আলাপ-আলোচনার ধার দিয়ে না গিয়ে বললেন, 'বেশ করেছ মা, খুব ভাল কাজ করেছ।' নিবেদিতা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একা-একা যেভাবে নিবেদিতা কাজ করে চলেছেন, দেখে সন্ন্যাসীর চমক লাগে। এ-রুদ্রবীর্য কি চিরদিনই সমান থাকবে?

"নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে নিবেদিতাকে উৎসাহ দেন ব্রহ্মানন্দ, তার অগ্রাভিযান যেন অব্যাহত থাকে। বলেন, 'তোমার সহযাত্রী অনেকেই তোমার মন ভেঙে দিতে চাইবে। বলবে, তোমার এ কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের কাজ নয়। তাদের কথায় কান দিও না। সমস্ত জগৎ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও যা ঠিক বলে বুঝেছ, তা ছেড না···।'

নিবেদিতা কথা বলেন তাড়াতাড়ি, আর তারই তোড়ে নিজের বক্তব্যকে ছবির মত ফুটিয়ে তোলেন। ব্রহ্মানন্দ আর তাঁর মধ্যে বোঝাপড়া হওয়ার পক্ষে এই এক অন্তরায়। কারণ সন্ন্যাসী ইংরাজী ভাল জানতেন না, সব কথা যে বুঝছেন না, তাও বলতেন না। এদিকে কথার তোড় ক্রমেই বাড়তে থাকে, শেষকালে ব্রহ্মানন্দের ধ্যানে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। প্রথমটা নিবেদিতা ধাক্কা খেয়ে চুপ হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর তন্ময়তার ছোঁয়া লেগে তিনিও ধীরে ধীরে অন্তর্মুখ হয়ে পড়েন। হঠাৎ-ঘনিয়ে-আসা এক

স্তব্ধতায় কথা হারিয়ে যায়। ব্রহ্মানন্দের নীরব আশীর্বাদে প্রীতিরসে গলে পড়ে নিবেদিতার মন।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য, অধুনা বিখ্যাত স্বামী প্রভবানন্দ এই বিষয়ে লিখেছেন—

"আর মহারাজের (ব্রহ্মানন্দের) মুখে শুনেছি নিবেদিতার প্রশংসা। নিবেদিতা মহারাজের কাছে আসতেন, কথা বলতে বা শুনতে নয়—মহারাজের সন্নিধানে ধ্যান করতে। আর মহারাজ বলেছিলেন—নিবেদিতা কাছে এলে মহারাজের মনও হু হু করে উচ্চ স্তরে উঠে যেত।"[৫]

সবশেষে উদ্ধৃত করছি স্বামীজীর একটি পত্রের কিছু অংশ। এইটিই সম্ভবতঃ নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর শেষ চিঠি। এতে নিবেদিতার বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে স্বামীজী লিখেছিলেন—

"তোমার চিঠি পেয়ে অতীব উল্লসিত। উল্লাসের অধিক কারণ, তুমি অখণ্ড ইচ্ছা এবং পুনঃপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসহ ফিরে এসেছ। · 'মা' যেভাবে চালান ঠিক সেইভাবেই চলো; যদি সম্ভব হয়, তোমাকে সাহায্য করব, কিন্তু আমি এখন কম্বলবস্ত বই আর কিছু নই । কিন্তু তোমাকে আমার পূর্ণ, সম্পূর্ণ আশীর্বাদ – যদি আরও বেশী থাকে, তাও।

"আমার কোনো অভিযোগ নেই। যেভাবেই হোক, আমাকে বলি হতে হবে—স্বেচ্ছাবলি—কোনো সন্দেহ নেই।·· তুমি ইস্পাতের মত খাঁটি এবং বিশ্বস্ত—নিজের ছায়ার মতই বিশ্বস্ত। ধনী বন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া মাত্র তুমি বেশী এগিয়ে পড়নি বা বিদ্রোহী হওনি। তোমার জন্য আমার সর্বশেষ আশীর্বাদ রইল।"

এই চিঠিতেই স্বামীজী সর্বাধিক জোর দিয়ে লিখেছিলেন—

"আগে এক চিঠিতে আমার সামান্য যা অনুরোধ করার আছে তা লিখেছিলাম,—আমি আর কারো উপর নির্ভর করতে বলি না—আর কেউ নয়—একমাত্র ব্রহ্মানন্দ। সেই 'বুড়ো লোকটি'র বিচারে কখনো ভুল হয় না[৬]—আমার সর্বদাই হয়। যদি কোনো বিষয়ে তোমার পরামর্শের প্রয়োজন হয়, কিংবা কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নিতে চাও—তাহলে ব্রহ্মানন্দেরই নাম করব—অন্য কেউ নয়, কেউ নয়। এ বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার।"

(I recommend you none—not one—except Brahmananda. That old man's judgement never failed—mine always do. If you have to ask any advice or to get anybody to do your business Brahmananda is the only one I recommend, none else, none else. With this my conscience is clear.)

---

৫ এই অংশটি শ্রীব্রহ্মগোপাল দত্তকে লিখিত একটি পত্রের অংশ নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (সম্পাদক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ) প্রকাশিত। স্বামী প্রভবানন্দ ঐ পত্রে আরও লিখেছিলেন—

"যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। গুপ্ত মহারাজের কাছে বাগবাজারে বসেছিলাম, নিবেদিতা এলেন গুপ্ত মহারাজের কাছে বিদায় নিতে, দার্জিলিঙ যাবেন। ঐবারেই দেহত্যাগ হয়।

"আমার মাথায় ছিল টেরী কাটা, আর পকেটে ছিল ঘড়ি চেন। এই দেখে নিবেদিতার চোট—

'Swamiji wanted boys who are strong, muscular, brave, not sissies.' আরও অনেক উপদেশ দিলেন, সে সব মনে নেই। কিন্তু স্মরণে আছে তাঁর cultured voice, diction ইত্যাদি—ইংরাজীতে যখন কথা বলছেন—যেন কবিতার মত সুন্দর।"

৬ 'That old man' কি ব্রহ্মানন্দ না শ্রীরামকৃষ্ণ? বলা শক্ত। পত্রের রচনাগতিকে মনে হয় ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু স্বামীজী 'old man' শ্রীরামকৃষ্ণকেই সাধারণতঃ বলতেন, এবং 'failed' শব্দের প্রয়োগে মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণও হতে পারেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা শক্ত। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ হন, তাহলেও কার্যতঃ অর্থ একই দাঁড়ায়—ব্রহ্মানন্দের বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা নির্ভুল ইত্যাদি।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কথোপকথন

স্বামী ধীরেশানন্দ

(২৫.৫.৫৬, কনখল সেবাশ্রম)

"মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ"— এই শ্লোকটি গীতার সার। 'মৎপরমঃ' হলেই তবে 'মৎকর্মকৃৎ' হওয়া যায়। আর 'মদ্ভক্তঃ' হলেই 'মৎপরমঃ' হয়। আবার 'সঙ্গবর্জিতঃ' হলেই 'মদ্ভক্তঃ' হয়। এই গীতার কর্মযোগ। স্বামীজী সেটাকে আরও বিস্তার করে দিলেন। মৎকর্ম—ঈশ্বরের কর্ম—সেই ঈশ্বরের সেবা—ঈশ্বর সর্বভূতে—তাই সর্বভূতের সেবা তাঁরই সেবা। ইহাই স্বামীজীর কর্মযোগ। ঠাকুরের ওপর ভালবাসা এলেই মিশনের কাজ ঠিক ঠিক হবে। মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করে, 'সর্বত্যাগী সাধুদের ভেতর এত মনোমালিন্য হয় কেন ?'

মহারাজ উত্তর দিলেন, 'ঠাকুরের উপর ভালবাসা নেই বলে।'

.

মহারাজ Madras-এ। 1908. পূর্ব-সেবক অসুস্থ হয়ে Bangalore যায় ও সেখানে বসন্ত হয়ে মারা যায়। আমি সেবক। খুব আনন্দ পাচ্ছি সেবায়। জপ ধ্যান করি না। গাড়ীতে কেষ্টলাল মহারাজ, শশী মহারাজ, আমি ও মহারাজ Triplicane যাচ্ছি। কেষ্টলাল মহারাজ মহারাজকে বলেন, 'জিতেন আপনার সেবক হয়েই থাকতে চায়—অন্য কোথাও যেতে চায় না।'

মহারাজ (উত্তেজিত হয়ে) বললেন, 'As a friend, as a brother I tell you that work and worship must go together.'

মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জপ-ধ্যান করিস্ ?'

আমি বললাম, 'না, আপনার সেবাতেই খুব আনন্দ পাই।'

মহারাজ বললেন, 'না, জপ-ধ্যান করবি। কাজের সঙ্গে জপ-ধ্যানও চাই—তাঁর প্রতি ভাব-ভালবাসা আনবার জন্যে।'

...

শশী মহারাজের জীবন—আদর্শ। দেখেছি—ঠাকুর-তুলেই তরকারী কাটতে বসতেন। তারপর আমাদের পড়াতেন—মনুসংহিতা, এইসব। তারপর স্নান সেরেই পূজো। বাইরে class-lecture আবার। ঠিক সন্ধ্যায় এসে আবার আরতি। গরম—ঘরে কাপড় ছেড়ে ফেলে ছটফট করছেন। হঠাৎ মনে হল ঠাকুরেরও গরমে কষ্ট হচ্ছে। অমনি উঠে কাপড় জড়িয়ে ঠাকুর-ঘর খুলে বেলা ৪টা পর্যন্ত বড় পাখা দিয়ে ২।২½ ঘণ্টা বাতাস করতে লাগলেন। বাইরে ক্লাসে ৭।৮টি লোক। অফিসে কাজ করে এসে কেউ ঝিমোয়, কেউ বা ঘুমোয়। সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি ঠাকুরের সেবাবোধে করে যাচ্ছেন। বললে বলতেন—'কে ঘুমোয় বা কি করে তার আমার কি দরকার। আমি ঠাকুরকে শোনাই।'... স্বামীজীর এক কথায় Madras চলে গেলেন।

---

* ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শুভাগমনকরতঃ দুই মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। নৈশ আহারের পর নিত্য তিনি আমাদের সঙ্গে বাহিরে উন্মুক্ত আকাশতলে বসিতেন এবং নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। ইহা সেগুলির অনুলিখন।—লেখক

Asansol-এর এদিকে যাননি। ১১ বছর ঠাকুরের অস্থি নিয়ে একনিষ্ঠ সেবায় ছিলেন। ইংরেজী অনেক ভুলে গেছেন—Madras গিয়ে আবার চেষ্টা করে শিখেন। Kidi-র (Singaravelu Mudaliar) কাছ থেকে। ক্লাসে ইংরেজী ভুল হলে Kidi বলত—'স্বামীজী, আজ এটা ভুল হয়েছে।' কিডি মানে তামিলে পাখি। পাখির মত অল্প আহার করত বলে স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) নাম দিয়েছিলেন কিডি।…সভায় বক্তৃতা করেছেন - মালা দিয়েছে। এসে স্বামীজীর ছবির সামনে হাত জোড় করে বলছেন—'দেখো, যেন নাম-যশ না হয়।'

·

কাশীতে মহারাজ। আমি টিপছি (মাসাজ করছি)। বেশ জোরে। মিনিট বিশেক পরে tired হয়ে পড়েছি। কিন্তু মহারাজ থামতে বলছেন না। আমার ঘাম বেরুচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, সংসারে থাকলে কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত, এখানে ঠাকুরের সন্তানের সেবায় ঘাম বেরুচ্ছে—এ ত মহা সৌভাগ্য। আশ্চর্য। অমনি সব ক্লান্তি কোথায় চলে গেল। দ্বিগুণ জোরে টিপতে লাগলাম। অমনি মহারাজ বললেন—'থাক্—আর টিপিস্‌নি।'

—গীতায় আছে 'মামনুস্মর যুধ্য চ'।

যতীশ্বরানন্দ P. B.-র editor হয়ে যাচ্ছে। সে হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ, আমি কি জানি? কি লিখব?'

মহারাজ বললেন, 'শোন্,—লিখবার আগে ঠাকুরকে চিন্তা করবি, মধ্যে চিন্তা করবি ও শেষে চিন্তা করবি। দেখবি কত লেখা আসবে।'

তা সে বেশ চালিয়ে দিলে ত।

মহারাজ গঙ্গার ধারে ইজিচেয়ারে বসে। প্রভাসকে (বেদানন্দ) ডেকে এনে বললেন, 'তোমায় বৃন্দাবনের charge নিতে হবে।'

প্রভাস বললে, 'আপনার আদেশ, অবশ্য যাব। কিন্তু আমায় সেখানে কি করতে হবে?'

মহারাজ বললেন, 'এই একটু হোমিও-ওষুধ দিবি আর কি।'

প্রভাস বললে, 'মহারাজ, আমি ত হোমিও-র 'হ'-ও জানি না।'

মহারাজ বললেন, 'শোন্, কাছে আয়। রোগীদের কথা শুনবি, বই-র সঙ্গে একবার মেলাবি, তারপর ধ্যান করবি। তখন যে ওষুধটা মনে flash করবে, সেটা দিবি। দ্যাখ্, দিকিন্, কল্যাণানন্দ—লোকে ডাক্তার ছেড়ে তাকে ডাকে।'

প্রভাসও পরে ডাক্তারী বেশ করত। তাঁকে স্মরণ সব সময়ে রাখতে হবে।

"শুভহেতুরীশ্বরী"

ডক্টর রমা চৌধুরী

"করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী।
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥"
—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫।৮১

"মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী
করুন শুভ সতত।
ধ্বংস করুন আপৎসমূহ
এই প্রার্থনা বিনত ॥"

আজ পরমশুভ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-কালে ঘরে ঘরে উত্থিত হচ্ছে এই সশ্রদ্ধ প্রার্থনা - মা, সকলের মঙ্গল কর, সকলের বিঘ্ন-বিপদ বিনষ্ট কর সানুগ্রহে।

মায়ের উপর এরূপ নির্ভরশীলতা সন্তানের দিক্ থেকে অতি সুষ্ঠু, শোভন ও স্বাভাবিক। কারণ বিপদের সময়ে, প্রয়োজনের সময়ে, প্রগতির সময়ে মায়ের কল্যাণ-কমল আশীর্বাদই ত আমাদের পরম-কাম্য, তাঁর মঙ্গল-মোহন সহায়তাই ত আমাদের পরম-সম্বল, তাঁর মমতা-মধুর নির্দেশই ত আমাদের পরম-শক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনিই আমাদের মঙ্গল করুন, অমঙ্গল দূর করে দিয়ে—এরূপ প্রার্থনা কি আমরা সত্যাই করতে পারব আমাদের নিজেদেরই ভারতীয়-শাস্ত্রানুসারে?

না; নিশ্চয়ই নয়! তার কারণ হল এই যে, আমাদের ভারতীয়-শাস্ত্রানুসারে, সুবিখ্যাত "কর্মবাদই" আমাদের জীবনের মূলতত্ত্বস্বরূপ। এই মূলীভূত কর্মবাদানুসারে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, তা সবই আমাদের নিজেদেরই কর্মের ফল। এই মতানুসারে প্রত্যেক সকাম-কর্মই এক-একটি যথোপযুক্ত ফল প্রসব করে—ভালো অথবা মন্দ। এবং যেহেতু আমাদের এরূপ বিচারবুদ্ধিপ্রসূত স্বাধীন কর্মের জন্য আমরা কর্মকর্তারাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী, সেহেতু সেই-সকল সকাম কর্মেরই যথাযথ ফল সেই কর্ম-কর্তাকে ভোগ করতে হয়ই হয়—আজ, না হয় কাল, এ জন্মে, না হয় পরজন্মে। এই ভাবে, আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ-রূপেই আমাদের নিজেদেরই কর্মানুসারে গঠিত। এরূপে আমাদের নিজেদের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সাফল্য-অসাফল্য, মঙ্গল-অমঙ্গল, পুণ্য-পাপ—সবই ত আমাদের নিজেদেরই স্বহস্ত-সৃষ্টি—তাতে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করার অধিকার পৃথিবীতে কারো নেই, এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবানেরও নয়, যেহেতু "বন্ধ" বা সংসারাবস্থা আমাদের নিজেদেরই সকাম-কর্মের ফল; "মোক্ষ" বা মুক্তিলাভও আমাদের নিজেদেরই যথাযোগ্য সাধনাবলীর ফল। এর মধ্যে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? তিনি জীবের কর্মানুসারেই করেন "সৃষ্টি"; পুনরায়, জীবের সাধনানুসারেই আনেন "মুক্তি"। এতে সত্যাই তাঁর করণীয়ই বা কি, আর কৃতিত্বই বা কতটুকু?

তাহলে আমরা কেন এবং কি করে জগজ্জননীকে "মঙ্গলদায়িনী," ও "অমঙ্গল-নাশিনী" বলতে পারি? মঙ্গলদায়ী আমরা নিজে, অমঙ্গলনাশীও আমরা নিজে। তাহলে এরূপ অর্থহীন প্রার্থনা কেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর ন্যায় সর্বজনমান্য গ্রন্থে স্থান পাবে?

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা-সম্বন্ধেও সেই একই ন্যায্য প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। সেক্ষেত্রেও, সেই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে যে, প্রপত্তি অথবা

শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ ও আশ্রয়গ্রহণকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে গ্রহণ করলে, ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি "কর্মবাদের" স্খালন ঘটবে। এই কর্মবাদানুসারে, যা উপরেই বলা হল, আমাদের কৃতকর্মের ফল আমরা আমাদের নিজেদের অধিকারেই ভোগ করব—কারো অনুগ্রহ-নিগ্রহের দ্বারা নয়। সেজন্য নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ যদি মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধনই হয়, তাহলে সেই-সকলের যথাযথ সাধন দ্বারাই ত আমাদের অনায়াসে মোক্ষলাভ হবে—প্রপত্তির প্রয়োজনই বা কি, ভগবদনুগ্রহের অবসরই বা কোথায়, এবং শ্রীভগবানকেই বা আমাদের মুক্তিপথে ও মোক্ষ-লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে কেন?

এর উত্তর হল এই যে, প্রপত্তিবাদ ও ঈশ্বরকৃপাবাদ কর্মবাদের পরিপন্থী নয় কোনো-ক্রমেই। এই অমোঘ কর্মবাদানুসারে, ন্যায়-স্বরূপ ঈশ্বর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ ক'রে কর্মফলকে ব্যাহত করতে পারেন না কিছুতেই—সর্বশক্তিমান হয়েও তিনি পাপকে পুণ্যে এবং পুণ্যকে পাপে পরিণত করতে পারেন না কিছুতেই, কারণ তা যে হবে তাঁর নিজেরই ন্যায়ঘন স্বরূপের বিরুদ্ধে যাওয়া, তাঁর নিজেরই ন্যায়ঘন কর্মবাদকে অস্বীকার করা। কিন্তু কে নিজেরই স্বরূপের বিরুদ্ধে যেতে পারেন? কে নিজেরই রচিত নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন?

সেজন্য আমাদের কৃতকর্মের ফল অতি অবশ্যই আমাদের নিজেদেরই অধিকারলব্ধ, ঈশ্বরানুগ্রহলব্ধ নয়। অবশ্য মোক্ষ ত এরূপ জন্য অনিত্য ফল নয়, মোক্ষ নিত্য। অর্থাৎ, মোক্ষ জীবের শাশ্বত স্বরূপের আবরণ উন্মোচনই মাত্র, জীবের শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণ প্রকাশনই মাত্র। সন্দেহ নেই যে, আমাদের সাধন-বলেই, আমাদের আত্মার, তথা ব্রহ্মের, অজ্ঞানাবরণ অপসৃত হয়। এইভাবে, মোক্ষে আমাদের সকলেরই পূর্ণ অধিকার আছে, আমাদের নিজেদের সাধনবলেই, আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টাফলেই। সেজন্য, ঈশ্বর বা কারো কৃপা, সাহায্য, সহানুভূতি প্রভৃতির জন্য আমাদের মুহূর্তমাত্রও অপেক্ষা করতে হয় না, সুনিশ্চিত। তা সত্ত্বেও, কেবল "অধিকারের", কেবল "দাবী-দাওয়ার" কথা বললে, মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেবল-মাত্র যেন "মালিক-শ্রমিকের" সম্বন্ধ; অর্থাৎ, যেন কেবলমাত্র "গায়ের জোরে" অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষগণের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করে নেওয়া, নিজেদের দাবী তাঁদের মানতে বাধ্য করার তিক্ত, শুষ্ক, কঠোর সম্বন্ধই মাত্র। সেক্ষেত্রে হয়ত মনে হতে পারে যে, স্বয়ং ঈশ্বর যেন আমাদের মোক্ষদানে নিতান্তই অনিচ্ছুক, আমরাই যেন তাঁকে জোর করে বাধ্য করছি তাঁর স্বরূপ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করতে, মোক্ষের অভিব্যক্তি করতে।

কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এরূপ নয় একেবারেই কোনদিনই। কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই ত আমাদের সাধনপথের নিত্য সহচর; আমাদের সাধনানুসারে আমাদের নিকট স্বরূপাভিব্যক্তিতে যে তাঁরও সানন্দ, সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষা; আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বাইরের কঠোর, রুক্ষ, শুষ্ক, তিক্ত সম্পর্ক নয়—এবং এই সত্য মধুর তত্ত্বটি প্রকাশিত, প্রমাণিত করবার জন্যই ভারতীয় দর্শন প্রপত্তি-সাধন ও ঈশ্বরানু-গ্রহের কথা তুলেছেন। আমরা স্বপ্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সাধনাবলম্বন ক'রে, তাঁরই উপর ন্যস্ত করি কোন্ ফললাভের আমরা উপযুক্ত, এই পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যে, তিনি ন্যায়ধর্মানুসারেই এই বিষয়ে স্থির করবেন, এবং সেই ভাবেই আমাদের

ফলদান করবেন। এরই নাম "অনুগ্রহ"। এই সুন্দর শব্দটির ব্যবহারে, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে নিকটতম, মধুরতম প্রাণের ব্যক্তিগত প্রীতি-ভক্তি, স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতার অতি সুন্দর সম্বন্ধ অতি মনোরম ভাবে প্রকটিত হয়েছে। তিনি যে আমাদের সর্বস্ব,—আমাদের প্রাণ-প্রদীপের অনির্বাণ আলোক, আমাদের মনোবীণার অনন্ত সঙ্গীত, আমাদের আত্মপাত্রের অফুরন্ত অমৃত, আমাদের জীবন-শতদলের ভাস্বর ভাস্কর। তাঁকে ছাড়া যে আমরা মুহূর্তমাত্রও থাকতে পারি না—জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সম্পদে বিপদে আমরা যে নিরন্তর তাঁরই ধ্যান করছি, তাঁরই আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি, তাঁরই সহায়তা কামনা করছি। দার্শনিক তত্ত্ব যাই হোক না কেন, প্রাণের তত্ত্ব যে অস্বীকার করা যায় না—এ ত সবার বড়। সেই প্রাণের টানেই ত আমরা অহরহ ছুটে যাচ্ছি তাঁরই রাতুল-চরণে, বারংবার তাঁকে ডাকছি "মা মা" বলে, প্রাণ-মন-জীবন ভরে বলছি—

"মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী
 করুন শুভ সতত।
ধ্বংস করুন আপৎসমূহ
 এই প্রার্থনা বিনত॥"

এই মধুর-মাতৃনামোচ্চারণে যে মহাতৃপ্তি, এই সশ্রদ্ধ মাতৃকৃপাপ্রার্থনে যে মহাশান্তি, এই মাতৃচরণাশ্রয়ণে যে মহামুক্তি—কেবলমাত্র শুষ্ক-রুক্ষ তর্কজালে তাদের যেন বিনষ্ট না করে ফেলি—আজ শুভ মাতৃপূজাকালে এই আমাদের প্রাণোত্থ-প্রার্থনা।

আমাকে নির্দ্বন্দ্ব করো

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমাকে নির্দ্বন্দ্ব করো সর্ব দুঃখে সুখে,
আনন্দ-বেদনা মাঝে, আলোকে-আঁধারে;
এই দুঃখ, এই শোক, এই কান্না হাসি
এ দু'য়ের পারে আছে যে স্নিগ্ধ নিভৃতি
অচঞ্চল তৃপ্ত ভূমি; একান্ত সেখানে
একটি আশ্রয় চাই, কোলাহলহীন
সর্বগ্লানিমুক্ত সেই নিস্তব্ধ নির্জনে,
মুক্তি পেতে চায় মন ক্লিষ্ট অবসাদে।

এখানে ক্লান্তির ভারে অবসন্ন আমি,
শুধু দাহ, অর্থহীন বিষণ্ণ জীবন;
আকাশে যন্ত্রণা ঝরে, মৃত্তিকায় জ্বালা,
অস্থির জীবন, নেই তৃপ্তি কোনখানে।
এ জীবন চাই নাকো, এ কান্না দুঃসহ,
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

মাতৃভাব ও বর্তমান প্রগতি

স্বামী জীবানন্দ

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই সম্মুখে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, অধোভাগে এবং ঊর্ধ্বদেশে পরিব্যাপ্ত। তিনি সর্বত্র ওতপ্রোত, সর্বানুস্যূত। এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, বাক্য-মনের অতীত। এই আবাঙ্‌মনসো-গোচর ব্রহ্ম গুণযুক্ত হইয়া ঈশ্বররূপে সাধকগণের কল্যাণে বিভিন্নরূপে প্রকটিত হন। ঈশ্বরের অনন্ত মূর্তি, তিনি পুরুষ কি নারী কে বলিতে পারে? সাধকগণ তাঁহাকে পিতা মাতা সখা প্রভু কতভাবে চিন্তা করিয়া জীবনে কৃতকৃত্যতা লাভ করেন।

অনন্তভাবময় ঈশ্বরের যে-কোন একটি ভাবে নিষ্ঠা রাখিয়া ঐকান্তিকতা সহকারে আরাধনা করিলে জীবন ধন্য হয়। কিন্তু মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা যে সর্বোৎকৃষ্ট ও অতি শুদ্ধ তাহা সর্বভাবময় অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

সর্বপ্রকার মূর্তির মধ্যে মাতৃমূর্তি শ্রেষ্ঠ, মাতৃমূর্তি পবিত্রতার প্রতীক। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে সম্বন্ধ তেমন আর কাহারও সঙ্গে নয়। জন্মাবধি সন্তানের মন মা অধিকার করিয়া থাকেন। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে মা-ই সর্বাপেক্ষা আপনার। মাতৃভাবে উপাসনায় ঈশ্বরকে অত্যন্ত আপনার বলিয়া ভাবা যায়। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পক্ষে মাতৃভাবের সাধন উপযোগী এবং সহজ।

যুগে যুগে কত সাধক মহাপুরুষ মাতৃভাবের সাধন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে মাতৃভাব কিরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সেই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

"যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজা ভারতে বর্তমান যুগে আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রতীকে এমন বিশুদ্ধভাবের শক্তিপূজা জগৎ আর কখন দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। জগন্মাতার ধ্যানসমাধিতে নিরন্তর তন্ময় হইয়া থাকা এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার উপর সর্বদা সকল বিষয়ের জন্য আত্মনির্ভর করা, সকল নারীর ভিতর জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সকল সময়েই তাঁহাদের যথার্থ ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ উপাস্য ইষ্টদেবতার মূর্তি জ্ঞান করা,... শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যময় জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্ যুগে, কোন্ অবতারপুরুষের জীবনেই বা নারীপ্রতীকে শক্তিপূজার ঐরূপ জলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে?"

মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে দেবী-উপাসনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে, আর শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুদ্ধ দেহ ও মনের আধারে যুগধর্মপালনী মহাশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। মাতৃভাবের পূর্ণ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাব এত স্বাভাবিক ও গভীর ছিল যে, তাহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতিধর্মনির্বিশেষে জ্ঞানী গুণী মূর্খ বিদ্বান পাপী তাপী ধনী নির্ধন সকলের উপর তাঁহার

স্নেহ করুণা সমভাবে অজস্র ধারায় বর্ষিত হইত। বিশ্বমাতৃত্বের অধিকারিণী শ্রীশ্রীমায়ের অতুলনীয় জীবনানুধ্যান মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বিশেষ অনুকূল ও সহায়ক।

মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে নারীমাত্রকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করিতে হয় এবং উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময় জীবন হইতে এই শিক্ষাই আমরা পাই। নিখিল জগতের যাবতীয় নারীমূর্তি মহামায়া আদ্যাশক্তিরই বিভিন্ন রূপ। 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।'—তিনিই অম্বারূপে জগৎ পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

নারী আদ্যাশক্তির অংশসম্ভূতা বলিয়া স্ত্রীজাতির অবমাননা করিলে তাঁহারই অবমাননা করা হয়। যে গৃহে নারীগণ পূজিত ও সম্মানিত, সেই গৃহে শ্রী সম্পদ ও আনন্দ নিত্য বিরাজিত, সেখানে অনুষ্ঠিত কর্ম সুফল প্রদান করে, সেখানে ঈশ্বরের মহাকৃপা বিদ্যমান। যে গৃহে নারী সম্মানপ্রাপ্ত হন না, সেখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়াও নিষ্ফল হয়, সেখানে সর্বদা অশান্তি ও নিরানন্দ বর্তমান। ভগবতী স্বয়ং বলিয়াছেন :

যোষিতি ক্লেশযুক্তায়াং মম ক্লেশঃ প্রজায়তে।
যোষিতো বিপ্রিয়কারী মম দ্বেষী ন সংশয়ঃ॥

—'নারী যদি ক্লেশযুক্তা হয় তাহা হইলে আমারই ক্লেশ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নারীর অনিষ্ট সাধন করে, সে আমাকেই বিদ্বেষ করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।'

মহামায়ার দুই রূপ—বিদ্যাশক্তি, অবিদ্যাশক্তি। অবিদ্যাশক্তিতে তিনি জীবকে মায়ামোহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। বিদ্যাশক্তিতে তিনি জীবের সর্ববন্ধন মোচন করিয়া পরমানন্দ প্রদান করেন। উদগ্র কামনা, রিপুর তাড়না, হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অবিদ্যাশক্তি হইতে উদ্ভূত। অপরপক্ষে বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি প্রেম দয়া সহানুভূতি পরোপকার-স্পৃহা প্রভৃতি বিদ্যাশক্তি হইতে প্রসূত। বিদ্যাশক্তির কৃপাবলেই মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তিনিই শক্তির প্রকৃত উপাসক ও মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত, যিনি সমগ্র স্ত্রীজাতিতে মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারে জগতের অন্যান্য দেশের মত বর্তমানে ভারতেও অবিদ্যাশক্তির বিশেষ প্রভাব দেখা যাইতেছে। নারীজাতির মধ্যে বিদ্যাশক্তি আচ্ছন্ন ও সঙ্কুচিত। বিবিধ বৈষয়িক ক্ষেত্রে সমাজে নারী পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারিণী হইতেছেন, নানা প্রকার বিদ্যাচর্চায় অনেক স্থলে অগ্রগামিনী হইতেছেন—শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কারণ যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মতে জাতির তথা দেশের উন্নতি পুরুষ এবং নারী উভয়েরই উন্নতির উপর নির্ভরশীল। নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ সতীত্ব ও মাতৃত্ব। এই গুণ দুইটি যদি নারীজাতির মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে বিদ্যাশক্তি ক্রমশঃ স্তিমিত হইতেছে এবং ভারতীয় শাশ্বত আদর্শের বিচ্যুতি ঘটিতেছে।

'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ··· ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।' নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার চাই, কিন্তু শাশ্বত আদর্শকে বাদ দিয়া নয়। যে নারীর মধ্যে সতীত্ব ও মাতৃত্বের বিকাশ ঘটে তাঁহাকে দেখিলেই মন পবিত্রতায় পূর্ণ হয়, হৃদয়ে মাতৃভাব জাগরিত হয়। এই প্রগতির যুগে নারীকে সুশিক্ষিতা, কর্মকুশলা ও পদমর্যাদাসম্পন্না হইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে তিনি মহামায়ারই অংশ। পুরুষ নারীকে মহামায়ার প্রতিমূর্তি জ্ঞান করিয়া উপযুক্ত সম্মান দিবেন

এবং নারী নিজেকে মহাশক্তির অংশ বিবেচনা করিয়া তদনুকূল আচরণ করিবেন, তবেই মাতৃভাবের প্রসার ও পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হইতে থাকিবে।

বর্তমানে শুদ্ধভাব মাতৃভাবের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে—এবিষয়ে চিন্তাশীল ও সমাজের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। মাতৃভাবই যুগধর্ম—জগতে পবিত্র শান্ত ও আনন্দময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিবার সর্বোত্তম উপায়রূপে ইহাকে গ্রহণ করিয়া সকলেরই এই মহাভাবের পরিবিস্তৃতিতে অগ্রণী হওয়া কর্তব্য। এবিষয়ে নারীজাতির দায়িত্বও কম নয়। স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন: "আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, রমণীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত ও ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণে দিবার আছে।"

ভারতীয় সমাজকে পুরাপুরি পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া নূতন রূপ দিতে গেলে তাহার ফল বিষময় হইবে, এবিষয়ে স্বামীজীর অভিমত: "আমার পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য-অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় এদেশে নিষ্ফল হইবে।"

নারীজাতির জীবনচর্যায় যদি 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—এই শুদ্ধভাব জনসাধারণের মধ্যে জাগরূক হয়, তবে ভারত জগতে সর্ববিষয়ে শীর্ষস্থান লাভ করিবে এবং জগৎকে নূতন আলো দেখাইবে। স্বামীজী বলিতেছেন: "মনে রাখিবে মেয়ে-পুরুষ দুই-ই চাই···শক্তির বিকাশ চাই, হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যাহারা আগুনের গোলার মত হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী—উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণ-মেরু, দুনিয়াময় ছড়াইয়া পড়িবে।" তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন যে, এক মহান তরঙ্গ উঠিবে যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।

এই মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে শাশ্বত আদর্শের যাহাতে বিচ্যুতি না ঘটে, তদ্বিষয়ে সকলেরই সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে।

যিনি ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক এবং যাঁহার আবির্ভাবে নূতনের সার্থক অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনের ছাঁচে নারীজাতি যদি জীবন গঠন করিতে কৃতসংকল্প হন, তবে জগতে শুদ্ধ মাতৃভাবের পরিবিস্তৃতি হইবে নিঃসন্দেহ। শ্রীশ্রীমায়ের অলোকসামান্য জীবন অনুধ্যান করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসী পবিত্র মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হউক, তাঁহার রাতুল-চরণে ইহাই প্রাণের প্রার্থনা।

ভগিনী নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

(অবতরণিকা)

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

পটভূমিকা

বর্তমান সময়ে আমাদের জাতির জীবনে যে এক কঠিন সংস্কৃতি-সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে, সে বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অবহিত। এ সঙ্কটের অন্যতম লক্ষণ হল এই যে, আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার সঙ্গে ক্রমশঃ আমাদের সংযোগসূত্র হারিয়ে ফেলছি। এ পরিস্থিতি কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ অতীতের পথ বেয়েই বর্তমান উপনীত হয়, আর এই বর্তমানে বসেই অতীতের মালমসলা দিয়েই ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে হয়। যে-কোন জাতির এই হল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূলকথা। এজন্যই August Comte বলেছিলেন, "By the Past, through the Present, to the Future." সুতরাং যে-কোন জাতির পক্ষেই তার অতীত হতে চ্যুত হয়ে পড়াটা শুভ লক্ষণ নয়। অথচ তাই আমাদের দেশে ক্রমশই অধিক পরিমাণে ঘটছে।

এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ— আমরা ভগিনী নিবেদিতার অসামান্য চিন্তাবাজিকে প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছি। ঐতিহাসিকেরা তাঁকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকরূপে স্থান দিয়েছেন জাতীয় ইতিহাসে। কিন্তু তাঁর সুনিপুণ ও অসামান্য সমাজ-চিন্তা আজ নিদারুণ অবহেলায় দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে। জাতির পক্ষে এটি পরম দুর্ভাগ্যের কথা। কারণ নিবেদিতা আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমাজ-তাত্ত্বিক গবেষণার একজন আদি প্রবর্তক। এ কথাটি ক'জনের আজ জানা আছে তা জানি না। ভারতীয় সমাজ-জীবনের ভিত্তিতে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সহায়ে যেসকল আলোচনা তিনি করে গিয়েছিলেন তা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর প্রভূত আলোকসম্পাত করেছে। সেসকল আলোচনা আমাদের জাতীয় জীবনের সম্যক পরিচয় গ্রহণ করতে হলে বিশেষ সহায়ক হয়। তাছাড়া, আজকের দিনে যেসকল সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনকে পর্যুদস্ত করছে তা তখনই জন্মলাভ করেছে। আর নিবেদিতা নিছক তত্ত্বজ্ঞানী নন, বাস্তবকর্মী। এইসকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েই তিনি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর সেইসকল চিন্তা আজকের দিনের সমস্যা-সমাধানেও আশ্চর্যরকম উপযোগী, যদিও সে চিন্তাগুলি আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মলাভ করেছিল। যখন গুরুর আহ্বানে এ দেশের মাটিতে তিনি পদার্পণ করেছিলেন, তখন তিনি একটি উন্মুক্ত মন নিয়ে এসেছিলেন— এ দেশের মর্মের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে, এই ছিল সে দিন তাঁর সঙ্কল্প। সেজন্য তাঁর সমাজ-চিন্তায় আমরা দু'টি জিনিস পাই। এক, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্লেষণ, এবং এ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে সমাজের গতি-প্রকৃতি নিয়ে মৌলিক আলোচনা; দুই, ভারতে সমাজ-বিবর্তনের বর্তমান ধারায় তাকে সচেতন প্রয়াসের দ্বারা বাঞ্ছনীয় রূপ দেবার জন্য একটি বাস্তব কর্মপদ্ধতি উপস্থাপনা।

ভারতে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে নিবেদিতার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি

এ দেশকে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতির সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত করেন। এ বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ। তাছাড়া, আজও পর্যন্ত যে সকল স্বদেশীয় বা বিদেশীয় পণ্ডিত, যাঁরা এ দেশের পটভূমিকায় সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় রত হয়েছেন, তাঁদের সকলের মধ্যে সম্ভবত: নিবেদিতারই সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল। কারণ তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে মুহূর্তের জন্যও কোন পূর্বপোষিত ধারণার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে দেননি। এ বিষয়ে তাঁর আদর্শ ছিল—"The search for the stern truth is the best fruit of best scientific training"[১] সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সত্যের পূজারিণী—একমাত্র সত্য ছাড়া তাঁর আর কোন উপাস্য দেবতা ছিল না। এবং এই সত্যের জন্য তাঁর হৃদয়-দুয়ার সর্বদা উন্মুক্ত থাকত—নিরাবরণ সত্যের রূপ যাই হোক না কেন, যত কঠিনই হোক না কেন, একমাত্র তাই-ই তাঁর কাছে চিরবরণীয় ছিল। "সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম, যে কখনও করে না বঞ্চনা"—রবীন্দ্রনাথের এই কথাই নিবেদিতার মর্মবাণী। এই সত্যনিষ্ঠার জন্য তাঁর দৃষ্টি ছিল সকল সময়েই মুক্ত ও স্বচ্ছ। তাঁর এই দৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"The mental sense, by the help of which we feel the spirit of a people, is like the sense of sight, or of touch—it is a natural gift. It finds its objects, not by analysis, but by direct apprehension. Those who have not this vision merely see events and facts, and not their inner association. Those who have no ear for music, hear sounds, but not the song."[২] ···রবীন্দ্রনাথের মতে নিবেদিতার এ বিষয়ে একটি সহজাত দৃষ্টি ছিল।

কিন্তু নিছক সহজাত দৃষ্টিই এটা নয়। সমাজতত্ত্বে নিবেদিতার বিশেষ অধিকার ছিল। Herbert Spencer, Auguste Comte প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানের আদি স্রষ্টা এবং Kropotkin, Taylor, Lubbock প্রভৃতি পরবর্তীকালের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের—প্রত্যেকের চিন্তার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। তা শুধু নয়, সমাজবিজ্ঞানের ফলিত (applied) দিকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Prof. Patrick Geddes-এর সহযোগী হিসাবে তিনি হাতেকলমে কাজও করেছিলেন কিছুকাল। এবং এই আচার্য ও শিষ্যা পরস্পরের প্রতি যে অনুপম শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন তা জগতের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। নিবেদিতা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক রচনা 'Web of Indian Life'-এর প্রারম্ভে লিখেছেন—"In sending this book out into the world, I desire to record my thanks··· to Prof. Patrick Geddes, who by teaching me to understand a little of Europe, indirectly gave me a method by which to read my Indian experiences."[৩] Geddes-ও নিবেদিতার মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন, "Eager to master these evolutionary methods and to apply them to her own studies, to Indian problems therefore above all, she settled above our home into an attic cell, which suited at once her love of wide and lofty outlook and her ascetic care of material simplicity and there she worked for strenuous weeks"[৪] Prof.

১ Footfalls of Indian History—P 24

২ Introduction to 'Web of Indian Life'

৩, ৪ — Studies From An Eastern Home

Geddes-এর এই উক্তি হতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সর্বাধুনিক সমাজতত্ত্ব ও তার পদ্ধতির সঙ্গে নিবেদিতা নিবিড় পরিচয়-স্থাপনের বিশেষ প্রয়াস পেয়েছিলেন। Geddes নিবেদিতার অসামান্য মনীষার উপর আরো আলোকপাত করে বলেছেন—"She was open at once to the concrete and the obstract, to the scientific and philosophic"[৫] —অর্থাৎ নিবেদিতার স্থূল ও সূক্ষ্মকে একই সঙ্গে সমানভাবে দেখবার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল, তাঁর মনই একই কালে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গঠন-সম্পন্ন ছিল। Mr. Nevinson-ও এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, তিনি বলেছেন—"Spiritual as she was, hers was no impractical dreamy spirit."[৬] সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতিতে জ্ঞান, সহজাত অন্তর্দৃষ্টি, মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি, ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা, একই সঙ্গে স্থূল ও সূক্ষ্মকে দেখবার ক্ষমতা, একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মত এবং অতিবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী—এতগুলি দুর্লভ শক্তির অধিকারিণী নিবেদিতা তাঁর ভারত-অনুসন্ধান-প্রয়াস-অন্তে ভারতের বাহ্য জীবনের অন্তর্লীন যে অন্তরতম জীবন, তার সত্য পরিচয়লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "Sister Nivedita had uttered the vital truths about Indian life." Prof. Patrick Geddes এই একই সাক্ষ্য দিয়েছেন নিম্নোক্ত উক্তিতে, "…for my part I must no less recognize how her keener vision and more sympathetic and spiritual insight carried her discernment of the rich and varied embroidery of the Indian web far beyond that simple texture of the underlying canvas, of the material conditions of life, which it was my privilege at the outset of our many conversations to help her to lay hold upon".[৭] তাই ভারত-জীবন সম্বন্ধে তিনি যা উদ্ঘাটন করেছেন, তা একান্ত সত্য, তাঁর জীবনের পরমতম সত্য। এই সত্যকে ভারতবাসী হয়ে আমরা কি করে উপেক্ষার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারি?

তাঁর ভারতের সমাজ জীবন নিয়ে সত্যানুসন্ধানমূলক আলোচনায় তাঁর গুরু বিবেকানন্দের অবদানও কিছু কম নয়। একথা অনেকের অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। কারণ তাঁরা বিবেকানন্দকে জানেন একমাত্র একজন ধর্মনেতা বলে। সন্দেহ নাই, বিবেকানন্দ বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবক্তা, আধুনিক পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার একমাত্র ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ। তাঁর প্রখ্যাত জীবনীকার Marie Louise Burke-এর মতে "Never before had the people of America seen one in whom spiritual truths had been fully realised."[৮] নিবেদিতাও লিখেছেন, "In him I found the heir to the spiritual discoveries and religious struggles of innumerable teachers and saints in the past of India and the world…".[৯] কিন্তু তিনি ধর্মপ্রবক্তা—এখানেই তাঁর সকল পরিচয় শেষ নয়। অগাধ ছিল এই মহামনীষীর ব্যবহারিক অর্থে পাণ্ডিত্য, যার পরিচয় লাভ করে একদা পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবর Dr. Wright বলেছিলেন, "He is more learned than all our professors

---

৫, ৬ Tributes—Studies From An Eastern Home

৭ Tributes, ৮ Marie L. Burke—Swami Vivekananda—New Discoveries, P. 67.; ৯ The Master As I Saw Him, P. 97

put together." এ জ্ঞান কেবল ধর্মতত্ত্ব বা শাস্ত্রের জ্ঞান নয়, এ জ্ঞান সকলপ্রকার মানববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। এ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বহু ব্যক্তি প্রচুর সাক্ষ্য দিয়েছেন। মাদাম এমা কালভে এ বিষয়ে বলেছেন, "Science, Philosophy and History had no secrets from the Swami." Eric Hammond-এর সাক্ষ্য —"Swamiji soon showed that he was equally versed in history and political economy". মেরী লুই বার্ক এর অভিমত—" he studied and understood modern civilization with the combined insight of a sociologist, psychologist, historian, philosopher and mystic".[১০] ধর্মনেতা হয়েও অর্থনীতি-শাস্ত্রে তাঁর কতখানি অধিকার ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ধর্মমহাসভায় যোগদানের পূর্বে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানীদের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান 'Social Science Association' এর সম্মেলনে তিনি 'দ্বিধাতুতত্ত্ব' (Bimetalism) সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেছিলেন।[১১] আর সকল সময়ে সর্বাবস্থায় আজীবনই তিনি ছিলেন গভীর মনোযোগসহকারে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন পাঠরত ছাত্রের মত—কি ভারত-পরিব্রজ্যা-কালে, কি আমেরিকায় বিপুল কর্মের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও। অবিরাম পাঠ—এই তাঁর রীতি ছিল। শুধু পাঠ নয়, সর্বপ্রকারে বিদ্যার অনুশীলন করেছেন তিনি। এদিকে প্রচুর আলোক-পাত করে নিবেদিতা বলেছেন, "Museums, Universities, Institutions, Local history found in him an eager student". মেরী লুই বার্কও আর একটি দিক উদ্ঘাটিত করে লিখেছেন, "...he acquired the greatest familiarity with the institutions of this country, religious, political and social. Nor was this familiarity acquired through contacts with intellectuals alone, rather he spoke also with labourers and farmers; his finger was, as it were, on the pulses of the nation."[১২] সুতরাং তাঁর এই বিপুলপরিমাণ পাণ্ডিত্য কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই ছিল না। ভারত পরিক্রমাকালে এবং পৃথিবীর নানা দেশে পরিভ্রমণকালে বিচিত্র ও বিপুল জনগোষ্ঠীর একান্ত নিকটে এসে নিবিড় পরিচয়স্থাপনের মাধ্যমে তিনি নানান দেশের ও অঞ্চলের বহু বিচিত্র জনজীবনের আচার, নিয়ম, প্রথা, বিশ্বাস, ধর্ম, আচরণ, আর্থিক সং-গঠন প্রভৃতি বিষয়ে বিপুলপরিমাণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এবং আধুনিক সমাজ-তাত্ত্বিক পদ্ধতিও যা এদেশে তখন প্রায় অবিদিত ছিল, তাঁর অজানা ছিল না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা 'Aryans and Tamilians'-এর মধ্যে। এ বিষয়ে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda—Patriot Prophet' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে একটি সমীক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। সমীক্ষান্তে বিচারগুলি ডাঃ দত্তের পূর্বপোষিত ধারণার দরুন যুক্তিগ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু সমীক্ষাটির মধ্যে বিবেকানন্দের 'পুরাতত্ত্ব', 'সমাজতত্ত্ব' প্রভৃতি শাস্ত্র এবং বাস্তব প্রথা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিপুল জ্ঞান ও বিদ্যা নিবেদিতার গুরু তাঁকে অকাতরে দান করেছিলেন।

---

১০ Burke, P. 596 ; ১১ Ibid, P. 42

১২ Anthropological Sayings and Sociological Sayings—P. 345-371.

সুতরাং বেলুড়ের গঙ্গাতীরে কত সকাল-সন্ধ্যায়, হিমালয়ের পথে পথে ভ্রমণকালে, অর্ধ পৃথিবী পরিক্রমাকালে, সাগরবক্ষে—সর্বত্র চলমান গুরুর কাছ হতে নিবেদিতা শুধু আত্মজ্ঞানেই শিক্ষা পাননি, পেয়েছেন ইতিহাস দর্শন সমাজ তত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিদ্যায়ই শিক্ষা। নিবেদিতা তাঁর দু'টি মহান গ্রন্থে 'The Master As I saw Him' এবং 'Notes of some Wanderings with the Swami'—সেকথা লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, কখনও গুরু তাঁকে সন্ন্যাসের আদর্শ, তার ইতিহাস, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে তার প্রভাব সম্পর্কে বলছেন, কখনও বলছেন গ্রীক দেবতাদের সম্বন্ধে। কখনও তাতার জাতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করছেন, কখনও খ্রীষ্টধর্মের ঐতিহাসিক বিচার করছেন, কখনও অবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব, কখনও প্রাণী-বিজ্ঞানের বিবর্তন, কখনও বা সমাজ-বিবর্তন-রীতি সম্বন্ধে পৃথিবীর যাবতীয় পণ্ডিতবর্গের মত সহ নিজের একান্তমৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করছেন। এ ত মাত্র কয়েকটি বিষয়। নিবেদিতা এরূপ বহু প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। আর সবই কি তিনি লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন? আর বিশদ বর্ণনাসকল যুক্তিতথ্য সহ কি আর লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন? তা পারা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যেটুকু লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন তার থেকে একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সমগ্র মানব-সভ্যতা, তার ইতিহাস, তার বিবর্তন-ধারা, তার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আনুপূর্বিক ইতিহাস, তাদের সমাজতাত্ত্বিক বিচার—এ সব সম্বন্ধে যে সাগরপ্রমাণ বিপুল জ্ঞান তাঁর ছিল, মুক্তহস্তে তিনি তা নিবেদিতাকে দান করেছিলেন।

সর্বোপরি বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন এক অখণ্ড মানবতাবোধ, এই অখণ্ড মানবতা-বোধই নিবেদিতার সমাজ-চিন্তার ভিত্তিস্বরূপ হয়েছে। যে অপূর্ব মানবসত্তা দেশে দেশে কালে কালে জাতিতে জাতিতে নানা লোক-গোষ্ঠীর জীবনযাপন ধ্যান-ধারণায় বিচিত্র প্রকাশ লাভ করেছে, বিবেকানন্দ তাকেই সব সময় দেখেছেন, দেখেছেন তার প্রকাশ মানুষের যে-কোন সৃষ্টিকর্মে, যেকোন প্রয়াসে, ধর্মজীবনে, শিল্প সাহিত্য-কৃতিতে, আর্থিক সংগঠনে, প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রসারে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের উন্নতিতে। এবং সে প্রকাশ-মহিমা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তাকে তিনি দেখেছেন এক অখণ্ড ঐক্যের প্রকাশ বলে, এর মধ্যে বিরাট ব্রহ্মকেই দেখতে পেয়েছেন তিনি বহুবিতত্তরূপে। সেজন্য এ প্রকাশের যে-কোন রূপই তাঁর মুগ্ধ চিত্তের পূজা পেয়েছে। ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মহিমায় তিনি যতখানি গৌরব অনুভব করেছেন, ঠিক ততখানিই করেছেন স্পার্টার বিজয়-গৌরবে, মিশরীয় স্থাপত্য-কৃতিতে, গ্রীসের জ্ঞানানুশীলনের ঐতিহ্যে, তাতার জাতির প্রাণপ্রাচুর্যে, মুসলমানদের ধর্ম-প্রাণতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে, আধুনিক আমেরিকার ধনোৎপাদন-কৃতিত্বে। তিনি মানুষ, অতএব মানুষের এসকল গৌরবই তাঁর নিজস্ব গৌরব। এ বিষয়ে তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে এক যোগীর দৃষ্টি, কবির মন, শিল্পীর চেতনা এবং মরমীর হৃদয়ের আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছে। এই বিরাট বিশ্বের পথে তিনি যে মানব-মহিমার রসপিপাসু বিমুগ্ধচিত্ত চিরপথিক! তাঁর এই দুর্লভ দৃষ্টির আলোতে নিবেদিতা বিভিন্ন দেশ-কালের মানুষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিগূঢ় সম্পর্ক ও তাৎপর্য—সব সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। সেজন্য বিবেকানন্দের মধ্যে শুধু একজন ধর্মনেতাকে নয়, তিনি আরও দেখেছিলেন "The pioneer

and phophet of a new world order". সে নূতন পৃথিবীর ভিত্তি হবে কেবল মানবতা, আর কিছু নয়। বিবেকানন্দ তাঁর চোখে সেই নূতন জগতের মূর্ত প্রতীক। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, "... he represented the transition from the old to the new, a transition which was inevitable, but which had been rendered secure and non-disruptive by the fact that he combines in his single person the strength of both the phases of society "[১৩] বিবেকানন্দ তাঁর চোখে অতীত বর্তমান প্রাচ্য পাশ্চাত্য এ সকলকেই এই অখণ্ড মানবতাবোধে সংযুক্ত করেছেন—"He becomes the meeting-point not only of East and West, but also of past and future." এই মানবতাবোধ নিবেদিতার মধ্যে কিভাবে জাগ্রত হয়েছিল তার প্রমাণ নিবেদিতার নিজের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়— "... and I have perceived a longer existence than I had conceived before— a certain immense life of Humanity, in which time and distance are alike merged".[১৪]

আর এই মানবতার নিপীড়ন যখন ঘটেছে, যেভাবে ঘটে থাকুক, যেখানে ঘটে থাকুক, নিবেদিতা দেখেছেন তার প্রতিবেদনে বিবেকানন্দের মধ্যে বিপুল অগ্নি উদ্গীরণ। "যে সকল কোটি কোটি মানুষ আজ অনাহারে আছে, যুগ যুগ ধরে অনাহারে আছে, ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত অজ্ঞানতার অন্ধকার যাদের ছেয়ে ফেলেছে," "যাদের যুগ যুগ ধরে শোনানো হয়েছে তারা কেউ নয়, কিছু নয়, মানুষ নয়, যাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমন আতঙ্কের মধ্যে রাখা হয়েছে যে তারা পশুতে পরিণত হয়েছে, এমন কি তারা অত্যাচারীদের চিনে নিতে পারছে না"- সেইসকল মানুষের মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্যে নিবেদিতা দেখেছিলেন বিবেকানন্দকে সর্বদা এক বিপুল বহ্নিমান হৃদয় বহন করে নিয়ে বেড়াতে। ফলে বনের বেদান্ত বিবেকানন্দের হাতে রূপান্তরিত হয়েছিল এক অভিনব বিপ্লব-শাস্ত্ররূপে, যা তাঁর মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেছে এই অগ্নিময় বাণী—"তাদের শুনতে দাও যে তাদের মধ্যে সেই আত্মা আছেন—অজ্ঞ অশক্ত নরনারী সকলেই শিখুক··কেউ দুর্বল নয়, আত্মা অনন্ত অসীম সর্বব্যাপী। ওঠ, দাঁড়াও, নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রচার কর, তোমার মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁকে ঘোষণা করো, তাঁকে অস্বীকার ক'রো না।" এই বেদান্তের বাণীতে তাই ধর্মাচার্য, পণ্ডিত বা বিদ্বৎসমাজেরই অধিকার নয়, সকলের অধিকার —"এই মহান্ ভাবধারা উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, শিক্ষিতদের অপেক্ষা অশিক্ষিতরা, শক্তিশালী অপেক্ষা দুর্বলেরা অধিক চাহিতেছে।" মানবদুঃখে অগ্নিময়-হৃদয় গুরুকে দেখে সেই পূত পাবকস্পর্শে নিবেদিতার অন্তরও অগ্নিময় হয়ে উঠল। তাঁর বিপ্লবের পথে চলার গূঢ়তম কারণ এখানে। গুরুর এই শিক্ষার ফলেই তাঁকে আমরা দেখতে পেলাম দুঃখী-আর্তের বন্ধুরূপে, সর্বপ্রকার অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে "জ্বলন্ত তরোয়াল-হস্তে সৈনিক" রমণী রূপে। নিবেদিতার এই বিদ্রোহিনী মূর্তির চিত্র পাওয়া যায় Mr. Ratcliffe-এর বর্ণনায়—"They (friends) think of her as tending the victims of

---

১৩ Civic and National Ideals : Chapter on the Indian Vivekananda Societies

১৪ Studies from An Eastern Home, P. 9.

famine and plague, or ministering day by day among the humble folk with whom her lot was cast : putting heart into the helpless and the defeated, and showing to the young and perplexed the star of a glowing faith and a purpose" ('Tribute'). Mr. Nevinson এর বর্ণনায় আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিবেদিতার এই মূর্তি —"For a spirit like hers was not likely to meet with anything but battle in this world, and it is as a soldier in the war of liberation that I remember her—a soldier with a flaming sword" ('Tribute'). ভারত তাঁর এই "soldier with a flaming sword" মূর্তিখানির সঙ্গে পরিচিত। তার মূলে তাঁর গুরু বিবেকানন্দ। তাঁরই অন্তরের অগ্নিস্পর্শে এক সত্যানুসন্ধিৎসুর এই সমাজ বিপ্লবীরূপে রূপান্তর। তাঁর জীবনের কেন্দ্রশক্তি বিবেকানন্দ। তার প্রমাণ নিবেদিতার নিজের উক্তিসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। গুরুর বাণীকে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হাতে তুলে দেবার যন্ত্ররূপেই তিনি নিজেকে বিবেচনা করে গিয়েছেন, তা জানা যায় তাঁর নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে— "I knew that here I was but the transmitter, but the bridge, between him and that countless host of his own people, who would yet arise, and seek to make good his dreams". এবং এই উদ্দেশেই তিনি গুরুর প্রতিটি কথা মর্মে গেঁথে রেখেছিলেন—"I listened with an anxious mind, striving to treasure up each word that he let fall."[১৫] ভবিষ্য বংশধরেরা বিবেকানন্দের মহান স্বপ্ন পৃথিবীর 'আমূল রূপান্তর-সাধনে'র প্রয়াস করবে —এই বিশ্বাস নিয়ে ভারতীয় সমাজ-জীবনের মর্মে প্রবেশ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। সেজন্য নিবেদিতার সকল সমাজ-চিন্তার ভিত্তি —বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও তাঁর প্রভাব। একথা বিস্মৃত হলে আমাদের সমীক্ষাশেষে বিচার ভুল হবে। এজন্যই এখানে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হল। এ আলোচনা ব্যতীত নিবেদিতার সমাজ-চিন্তার উৎস ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতো। (ক্রমশঃ)

১৫ The Master As I Saw Him, P. 227

"আগে মাধবপ্রতিষ্ঠা"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নন্দবসু শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি?"

"তুমি আম খাওনা! তোমার ওসব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কিনা—তাতে কি হয়—এসব খবর।

আম খাও। আম প্রয়োজন, তাঁতে ভক্তি—"

কেশব সেনও শ্রীরামকৃষ্ণকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি একই উত্তর দিয়েছিলেন: "এসব হিসাবে তোমার কি দরকার?"

মনের বাজে-খরচ ঠাকুর একেবারেই পছন্দ করতেন না। কামিনী-কাঞ্চনে যে-হেতু মনের বাজে-খরচ হয় সেই হেতু ঐ দুটী সম্পর্কে বারংবার সতর্ক হতে বললেন তিনি।

ঠাকুর বলতেন, "নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই।" পাণ্ডিত্য-অর্জনের জন্য মনের এতটা শক্তি ব্যয় করা—সেও তো মনের বাজে-খরচ! "নিজের বধের জন্য একটী নরুনেই হয়।"

একই কারণে লেকচার দিয়ে বেড়ানো তাঁর পচন্দসই ছিল না। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামানো—সেও তো মনের বাজে-খরচ।

ঈশ্বর-দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দর্শনের এই হোলো মূল কথা। জগতের উপকার করবার জন্য হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটাছুটি করা—একেও ঠাকুর মনের বাজে-খরচ জ্ঞান করতেন। কৃষ্ণদাস পাল এসেছিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "মানুষের কি কর্তব্য?" পাল উত্তর দিলেন, "জগতের উপকার করবো।" এই কথোপকথন-এর উপরে ঠাকুর মন্তব্য করেছেন: "একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই।"

একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার। ঠাকুর গীতাকে সর্বশাস্ত্রের সার মনে করতেন। আর সমস্ত গীতার চূড়ান্ত কথা তো দুইটী সংক্ষিপ্ত সরল শ্লোকে যেখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন: "আমাকে আশ্রয় করো। সমস্ত পাপ আর দুঃখ থেকে তোমাকে উদ্ধার করবো।" পৃথিবীতে দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, পাপ আছে। 'জীবন-যৌবন-ধন-মান'—কালস্রোতে ভেসে যায় সব-কিছুই। হাতের নাগালের মধ্যে যা-কিছু অত্যন্ত কাছের, সবই জল বুদ্বুদ। এই আছে, এই নেই! এমন কেউ কি আছেন যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্ষণে ক্ষণে বিলীয়মান এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল বস্তু-পুঞ্জের ঊর্ধ্বে, পশ্চাতে, সমস্ত কিছুতে অনুস্যূত হ'য়ে? এমন কেউ যাঁকে লাভ করলে কবির ভাষায় কণ্ঠ গান গেয়ে ওঠে?—

"এ দয়া যে পেয়েছে, তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে চাঁই।"

মৃত্যুর ছায়ায় মানুষ যুগে যুগে চেয়েছে এমন-কিছু "যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি (নারদীয় ভক্তিসূত্র)।" মানুষ ডুবতে চেয়েছে এমন এক অমৃতের সাগরে যে সাগরে ডুব দিলে, ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, "মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়।"

সেই আদিকাল থেকে মানুষ অন্বেষণ করছে এমন-কিছু "that gives meaning to all that passes and yet eludes apprehension." সবই যে জলের ভুড়ভুড়ি। এই আছে, এই নেই। এই সব অনিত্যের মধ্যে এমন কি আছে, এমন কে আছেন যিনি অনাদি এবং অনন্ত, যিনি আছেনই, যিনি নিত্য, যাঁকে জানলে যা কিছু ক্ষণে ক্ষণে সরে সরে যাচ্ছে তাদের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়, অথচ পরিমিত মানববুদ্ধিতে যাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানা কোনকালেই সম্ভব নয়?

একথা ঠিক যে, যুক্তির পথ ধ'রে ঈশ্বরকে জানতে পারা সম্ভব নয়। তবু চরম দুঃখের আঘাতে আমাদের সমস্ত শক্তি যখন ভেঙে পড়ে, মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে আমাদের অতি আপনার জনেরা যখন হারিয়ে যায়, প্রবৃত্তির ঝড় উঠে আমাদের বুদ্ধির হালকে যখন ভেঙে দেয় এবং আমাদের আত্মার সম্পদরাশি কেড়ে নেয়, যখন ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করতে গিয়ে দেখি তা দিয়ে প্রবৃত্তির ঝড়ের ঝাপটা ঠেকানো যায় না, তখন অন্ধকারের মধ্যে অসীমের পানে আমাদের বাহু দুটীকে আমরা স্বতই প্রসারিত ক'রে দিই। অনন্তের দিকে মানুষের এই বাহু-প্রসারণকে ধর্ম বললে কি ভুল হবে? একজন ইংরেজ মনীষী তো স্পষ্টই বলেছেন, "Religion is the stretching forth of our hands toward the illimitable." নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ—এ তো শূন্যগর্ভ ভাবোচ্ছ্বাসের কথা নয়। এ হচ্ছে তারই কথা যার অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে রূঢ় বাস্তবের কঠিন ধাক্কায়, যে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছে—কোন মানুষই তার নিজের কর্তা নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রভাবে কর্তৃত্বাভিমান নিঃশেষে চলে গেলে তবেই মানুষ অহং ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের শরণাগত হয় আর কি ক'রে শরণাগত হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয় ভক্তির জন্য, সেই শিক্ষা দেবার জন্যই তো ভগবান মানুষ হ'য়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

যে দুটী শ্লোকে গীতার চরম রহস্য ব্যক্ত হয়েছে তার প্রথমটী সুরু হয়েছে "মন্মনা ভব" দিয়ে এবং দ্বিতীয়টি শেষ হয়েছে "মা শুচঃ" দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ গীতাভাষ্যে মন্তব্য করেছেন: The last, the closing supreme word of the Gita expressing the highest mystery is spoken in two brief, direct and simple slokas and these are left without further comment or enlargement to sink into the mind and reveal their own fulness of meaning in the soul's experience এর সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হোলো, গীতার পরমতত্ত্ব নিহিত আছে দুইটী সরল শ্লোকে। শ্লোক দুটীর ভাব খুব সোজা। আত্মার অভিজ্ঞতার আলোকেই শুধু তাদের পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধিগত হতে পারে। শ্লোক দুটীতে বলা হয়েছে, ভগবানের অনুগ্রহেই শুধু সমস্ত পাপের আর দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। এই বিশ্বাসে অটল থেকে তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির দ্বারা পরমানন্দঘনমূর্তি অনন্ত বাসুদেবের ভজনা করো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন,—"তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া—এই দুটী দরকার।" কি বিশ্বাস? এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল অনিত্য সংসারের পিছনে, একে অতিক্রম ক'রে এবং এর মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে এমন কেউ আছেনই আছেন যিনি সত্য, নিত্য। আর কি বিশ্বাস? তিনি অমৃতের সাগর। তাঁর মধ্যে আমাদের আত্মার পরম সান্ত্বনা, জীবনের সমস্ত আনন্দ রয়েছে।

আর কি বিশ্বাস? তিনি কল্পতরু। তাঁর কাছে ব্যাকুল হ'য়ে কিছু চাইলে তিনি তা দেন। অতএব শরণাগত হ'য়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করো যেন তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

ঈশ্বরলাভই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে তাঁর কাছে পৌছাবো কেমন করে? গীতায় ভগবান বললেন ভক্তকে 'মন্মনা ভব'। ষোল আনা মন আমাকে দাও। তবেই 'মামেবৈষ্যসি' —আমার কাছে আসবে। তাই তো ঠাকুর বেশী কর্মের ভিতর জড়িয়ে পড়তে বারবার নিষেধ করেছেন। যে-মন ঈশ্বরে নিশিদিন লেগে থাকলে তাঁকে লাভ করা যায়, সেই মন রাতদিন যদি হাসপাতাল ডিসপেনসারি আর জগৎ-উদ্ধারের চিন্তায় মুগ্ধ থাকে তবে বুঝতে হবে মনের বাজে খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বলেছেন, "যারা হাসপাতাল ডিসপেনসারি করবে, আর এতেই আনন্দ করবে, তারাও ভালো লোক। কিন্তু থাক্ আলাদা।" ঈশ্বরলাভ যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে ঠাকুরের ভাষায় "একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়, যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই।" উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া কিছুতেই চলবে না। লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যেটা প্রথম করণীয় সেটা প্রথমেই করতে হবে। সমুদ্রগর্ভ থেকে রত্নতোলাই যদি লক্ষ্য হয় তবে আগে ডুব দিতে হবে, সাধন-ভজন করতে হবে। আর ভজনা বলতে গীতাভাষ্যকার মধুসূদন সরস্বতী বলছেন, "অনুক্ষণং ভাবনয়া ভজস্ব।" অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা ভজনা করো। সাধনের রাজা তো একতান-স্মৃতিসাধন, সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। স্মরণ-মননে শৈথিল্য ঘটলে, সাধন-ভজনে উৎসাহের কমতি থাকলে রত্নতোলা তো হবে না। তাই ঠাকুর আক্ষেপ ক'রে বলেছেন,—"কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক বৈরাগ্য নাই। দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।" বক্তৃতা দিতে, লোকশিক্ষা দিতে, সংসারধর্ম করতে ঠাকুর নিষেধ করেছেন, এমন কথা ঠিক নয়। কিন্তু বারংবার তিনি আমাদিগকে বলে গেছেন, মনের বাজে খরচ যেন আমরা বন্ধ করি। কেন? কারণ মনের বাজে-খরচ বন্ধ না করলে তো শূন্য হৃদয়মন্দিরে মাধব-প্রতিষ্ঠা হবে না। আর অন্তরে মাধব-প্রতিষ্ঠা না ক'রে যা-কিছুই করতে যাইনে কেন, তা বালিতে লাঙল দেওয়ার মতোই একটা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই ঠাকুর বললেন, 'আগে মাধব-প্রতিষ্ঠা, তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা দিও।' বললেন, "আগে ডুব দাও, ডুব দিয়ে রত্ন তোল। তার পর অন্য কাজ।" আগের কাজ আগে, পরের কাজ পরে—এই পারম্পর্য-বোধ নিশ্চয় আমরা হারাবো না। আর সর্বাগ্রে মাধব-প্রতিষ্ঠা, তারপর অন্য কাজ—এ কথা না বুঝলে ঠাকুরের সমগ্র জীবন ও বাণীর নির্যাস আমাদের বুদ্ধির নাগালের বাইরে থেকে যাবে। এই মাধব-প্রতিষ্ঠার কাজ নেহাত চাট্টিখানি কথা নয়। পথ দুর্গম। মন-করীকে বশে আনা কঠিন। ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য পুরো দাম দিতেই হবে—মনের ষোল-আনাই।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যকৃত "বেদান্তকেশরী"

[অনুবাদ]

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

দৃষ্টান্ত না দেখা যায় ত্রিভুবনে সদ্‌গুরুর, দান যাঁর জ্ঞান-উন্মীলন।
স্পর্শমণি? সেও নয় উপমা তাঁহার—লোহেরে সে বাহ্যরূপে দেখায় কাঞ্চন,
পরশপাথরে নাহি করে পরিণত। গুরুবর নিজ শিষ্যে আশ্রিলে চরণ
করি লন আপন সমান। অতুলন তিনি তাই, অলৌকিক বলি গণ্য হন।১

যেরূপ চন্দনতরু বিতরি সুবাস চৌদিকে যে বৃক্ষচয়ে করে গন্ধময়
সেগুলিও গন্ধদানে হরে স্থূলদেহধারী সবার সন্তাপ,
সেই মত দৈবযোগে আচার্যকৃপায় লভি জ্ঞান, শিষ্যগণ করুণহৃদয়
উপদেশদানে সদা করেন ক্ষালন সমীপাগতের দুঃখ ত্রিবিধ, ও পাপ।২

সত্য ও মিথ্যার যোগে রচিত সংসার, অগ্রে তাই আত্মানাত্ম-বিবেক বিহিত;
পরে দুই সূত্রে লভ্য ব্রহ্মজ্ঞান—নিজ অনুভব আর যুক্তিবলে—শাস্ত্রে অভিহিত।
প্রথমটি দেহসত্ত্বে ইহ সাধ্য হয়, সর্বব্যাপী আত্মা বোধে দ্বিতীয় সম্ভব;
'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান পূর্বে উপজিলে, 'যাহা কিছু সব ব্রহ্ম' হয় অনুভব।৩

সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ, অনুভবে-পরিচিত আত্মাই করেন এই দেহ নিয়ন্ত্রিত;
তবু মূঢ়চিত্ত জন অনিত্য এ দেহটিরে 'আমি' বলি করে নিরূপিত—
অস্থি স্নায়ু মজ্জা মাংস রক্ত বসা চর্ম মেদে বাহিরে আবৃত,
মল মূত্র কফাদিতে পরিপূর্ণ নিজ-পর সব কায়া—যদিও তা সবার বিদিত।৪

তথাপি মানব সবে দেহ পত্নী সুত, মিত্র ভৃত্য অশ্ব বৃষে ভাবি সুখাকর,
করে বৃথা প্রসিদ্ধ এ আয়ুক্ষয়, এই মত মাংসপর মীমাংসা-নিরত;
যার বলে নিজ নিজ ব্যাপারে কুশল, করে ভোগ সৌভাগ্যনিকর,
সেই প্রাণ-অধিপতি, অন্তর্যামী, মৃত্যুহীন তত্ত্ব নাহি হয় অবগত।৫

সুকৌশল কীট যথা কোনমতে চারিধারে কণ্টকে রচিয়া বাসার্থ কুটীর
তারি মাঝে নিরন্তর সাধিয়া ব্যাপার, যতদিন আয়ু তার, করে বিচরণ
সেইরূপ প্রতি জীব নানারূপ শুভাশুভ কর্মফলে নিরমিয়া এ স্থূল শরীর
তারি সাথে অনুক্ষণ কাটায় জীবন, তাহা লয়ে করে এই জগতে ভ্রমণ।৬

ব্যাঘ্রবেশ করিয়া ধারণ বিচরে যে প্রাণী 'ব্যাঘ্র আমি' ভাবি ইহা চিতে
আহার-সংগ্রহতরে ভীত করি মূঢ় পশুগণে, মনুষ্যাদি জীবে সেই পারে কি বধিতে ?
নারীবেশে সাজি 'নারী আমি' এই বোধে নট কভু স্বামী তার বাঞ্ছা কিবা করে ?
'দেহ হতে ভিন্ন মোর স্বরূপ' জানিয়া, সাক্ষী বুঝি আপনারে আত্মা দেহ ধরে।৭

বহুক্ষণ কাঁদিতেছে দেখি নিজ শিশু, জননী যেমন তারে শান্ত করিবারে
সম্মুখে তাহার আম, আঙ্গুর, খেজুর, পাকা কলা আদি লোভনীয় বস্তু ধরে,
সেইরূপ শ্রুতিশেষ, ফিরাইতে বিমুগ্ধ অবশচিত্ত জীবে, বহু জন্মভোগে
সংস্কারে আচ্ছন্ন জানি, প্রবোধ তাহারে দিয়াছেন নানাবিধ উপায় প্রয়োগে।৮

যার প্রতি প্রীতিহেতু শরীর রমণী, আত্মজ ধনাদি সব হয় প্রীতিকর,
সেই আত্মা প্রিয়তম তাই ; অন্য সব দুঃখহেতু ; কেমনে তা হবে প্রিয়তর ?
ভার্যা আদি প্রাণতরে করে বিসর্জন, শ্রেয়স্কামী করে তথা দেহ সমর্পণ,
বিজ্ঞের উপাস্য তাই একমাত্র আত্মা প্রিয়তম, অন্য কিছু নহে কদাচন।৯

যে বিষয় হতে যত প্রীতি লভি, তাহা তত হয় প্রিয়—এই প্রীতিমান।
যাহা হতে যতখানি হয় দুঃখ, অপ্রিয় তা' তত হয়—অপ্রিয়ের এই পরিজ্ঞান।
সর্বকালে এক বস্তু অপ্রিয় বা প্রিয় নহে, অপ্রিয়ও কভু হয় প্রিয়,
অতিপ্রিয় সময়ে অপ্রিয়, চিরন্তন প্রিয় শুধু নিত্যবস্তু 'আত্মা' নামধেয়।১০

বস্তুকণা

ডক্টর বিশ্বরঞ্জন নাগ

দৃশ্যমান জগতের 'বিভিন্ন পদার্থের মূল স্বরূপ কি ?'—এই প্রশ্ন মানুষের মনে জেগেছে ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই। দার্শনিকরা এর উত্তর খুঁজেছেন বুদ্ধি ও অনুভূতির মাধ্যমে এবং এক ধরনের উত্তর তাঁরা পেয়েছেনও। 'এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার আত্মবিকাশ'—এ সিদ্ধান্ত কেউ কেউ করেছেন, যদিও সৃষ্টিকর্তার আসল স্বরূপ ঠিক ঠিক কেউই বোঝাতে পারেননি। যিনি সেই স্বরূপ নিজে জেনেছেন বা বুঝেছেন, তিনি একাই তা আস্বাদন করেছেন। বিজ্ঞানীরাও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন—তাঁরা খুঁজেছেন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পদার্থজগৎ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাকে বুদ্ধির দ্বারা বিচার ক'রে। গ্রীসদেশের মনীষীরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, ক্ষিতি অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চারটই বিশ্বের মূল উপাদান। ভারতীয় মনীষীরা এই চার ভূতের সঙ্গে একটি পঞ্চম ভূত 'ব্যোমের'ও প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করতেন। একভাবে দেখতে গেলে এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেই মনে হয়। জীব-জগতের পরিবর্ধন যদি আমরা একটু বিশেষ-ভাবে দেখবার চেষ্টা করি তাহলেই দেখা যায় এই পঞ্চভূতই মূল বস্তু। সামান্য একটি গাছ যখন বীজ থেকে ক্রমান্বয়ে মহীরুহে পরিণত হয় তখনই দেখা যায় যে, ক্ষিতি অপ্ এবং বায়ু থেকেই এর নিজেকে তৈরী করার যাবতীয় মালমসলা সংগ্রহ হয়। তেজের মাধ্যমে এই মালমসলা থেকে গাছটি তৈরী হয় এবং ব্যোমকে আশ্রয় করেই নিজেকে বিকশিত করে। আবার অন্যভাবে দেখতে গেলে এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন স্বরূপে দেখা যায়। পদার্থ ছাড়া আর যা আছে তাকে আমরা দেখি শক্তিরূপে। কাজেই ক্ষিতি অপ্, মরুৎ ও তেজ দ্বারা যদি এই চার ধরনের পদার্থ বোঝান হয় তাহলেও বলা যেতে পারে বিশ্বপ্রকৃতি এই চার স্বরূপে ব্যোমে প্রকাশিত। ক্ষিতি, অপ্ ও মরুৎ হ'ল বস্তুজগতের মূল স্বরূপ। কিন্তু ক্ষিতির মধ্যেও বিভিন্নতা আছে, অপ্ ও মরুতেও আছে এই বিভিন্নতা। সব ধরনের কঠিন পদার্থ, তরল পদার্থ বা বায়বীয় পদার্থ এক নয়। অসংখ্য-রূপে এই তিন ধরনের পদার্থকে পাওয়া যায়। পদার্থকে খুঁটিয়ে দেখার উপায় জানার পরে দেখা যায়, সব রকমের পদার্থেরই মূল বস্তুরূপে কতগুলি বিশেষ ধরনের পদার্থকে ভাবা যায়। এদের নাম দেওয়া হয় মৌলিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থের আকৃতি, তাপমাত্রা বা অন্যান্য ভৌতিক গুণের পরিবর্তন হলেও এদের নিজের স্বরূপের পরিবর্তন হয় না। এদের যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রমান্বয়ে ছোট করা যায় তাহলে এদের একটা ক্ষুদ্রতম অবস্থা পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রতম মৌলিক পদার্থের কণাকে বলা হয় পরমাণু। কোন মৌলিক পদার্থের সব পরমাণুই এক রকমের এবং সাধারণ পরীক্ষায় এরা সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে। মৌলিক পদার্থের মোট সংখ্যা হ'ল বিরানব্বইটি। সাধারণতঃ বিরানব্বই ধরনের পরমাণুই প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরীক্ষাগারে আরও কিছু পরমাণু তৈরী করা সম্ভব হয়েছে—তাদের সংখ্যাও যোগ করলে মৌলিক পদার্থের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৩টি। প্রকৃতির যাবতীয় পদার্থ এই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরস্পরের মিলনের

দ্বারাই গঠিত। একভাবে তাই বিশ্বের মূলবস্তু মৌলিক পদার্থগুলিকেই মনে করা যেতে পারে। কিন্তু দার্শনিকদের ন্যায় বিজ্ঞানীদের মনেও একটা ধারণা ছিল যে, মূলবস্তুর সংখ্যা এত বেশী হবে না. হবে অনেক অনেক কম। তাই বিভিন্ন পরমাণুর বৈচিত্র্যের মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কিনা তা নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা চলতে থাকে।

বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্যও ধরা পড়ে। কতগুলি মৌলিক পদার্থ যেমন হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্টন সাধারণ তাপমাত্রায় বায়বীয় অবস্থায় পাওয়া যায় এবং অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে এরা মিলিত হয় না। আবার সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লিথিয়াম এরা সকলেই ধাতু, এদের কাঠিন্য কম এবং এরা অক্সিজেন বা ক্লোরিনের সঙ্গে সহজেই মিলিত হয়ে যৌগিক পদার্থ তৈরী করে। বিভিন্ন পরমাণুর গুণাগুণের সাদৃশ্য থেকে ধরা পড়ে যে, যদি বিভিন্ন পরমাণুকে ভরের মাত্রায় সাজানো যায় তাহলে সঙ্গীতের সপ্তমের নিয়মে প্রথম ও অষ্টম পদার্থের মধ্যে মিল অনেক। তাই বলা যেতে পারে যে, যদিও মৌলিক পদার্থগুলি সকলেই বিভিন্ন, তবুও মোটামুটি-ভাবে আট ধরনের মৌলিক পদার্থ আছে। এই সাদৃশ্য থেকে এ সিদ্ধান্তও করা যায় যে. মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে বিশেষ ধরনের কিছু বস্তু অন্তর্নিহিত আছে, যাদের সাদৃশ্য থেকে মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আসে।

তড়িৎবিজ্ঞানের পর্যালোচনা থেকে এই অন্তর্নিহিত বস্তুগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। কম চাপের বায়ুতে তড়িৎপ্রবাহ চালালে যে আলো বিকীর্ণ হয়, সে আলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, পরমাণুর চেয়েও পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা আছে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাটির নাম দেওয়া হয় ইলেকট্রন। এই কণাটি স্বভাবতই ঋণাত্মক-তড়িৎযুক্ত। তড়িতের পরিমাণ $১^{\cdot}৬ \times ১০^{-১৯}$ কুলম্ব এবং কণাটির ভর হ'ল ৯×১০^{-৩১} কিলোগ্রাম। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইলেকট্রন পরমাণুরই একটি অংশ। জানা যায় পরমাণু সাধারণ পরীক্ষায় অবিভাজ্য হলেও এর একটি গঠন আছে। এর কেন্দ্র-স্থানে একটি অংশ আছে, যে অংশে পরমাণুর ভর কেন্দ্রীভূত এবং এই অংশটি ধনাত্মক-তড়িৎযুক্ত। এই অংশটির নাম দেওয়া হয় কেন্দ্রীন। এই কেন্দ্রীনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে ইলেকট্রন। সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। এর কেন্দ্রীনে যে-পরিমাণের তড়িৎ থাকে, কেন্দ্রীনের চারপাশে ছড়িয়ে-থাকা ইলেকট্রনগুলির তড়িতের মোট পরিমাণও ঐ পরিমাণের সমান। বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভর বিভিন্ন এবং তড়িতের পরিমাণও বিভিন্ন। তড়িতের পরিমাণ যেমন বিভিন্ন, তেমনি ইলেকট্রনের সংখ্যাও বিভিন্ন। ইলেকট্রনগুলিও বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। পরমাণুদের মধ্যে যে রাসায়নিক গুণা-গুণের সাদৃশ্য দেখা যায়, তার মূল কারণ হ'ল কোন কোন পরমাণুর ইলেকট্রনের নিবেশের সাদৃশ্য। সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের ধাতব প্রকৃতি আসে ইলেকট্রনগুলি যেভাবে কেন্দ্রীনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে তারই অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য থেকে। ইলেকট্রনকে জানার পরে যদিও প্রমাণিত হয় যে, পরমাণু অবিভাজ্য নয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা যায় যে, রাসায়নিক গুণের সাদৃশ্যের জন্য দায়ী হ'ল ইলেকট্রনের সন্নিবেশ। বিরানব্বইটি পরমাণুর কেন্দ্রীন সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং পদার্থের মূলস্বরূপ এই বিরানব্বইটি কেন্দ্রীনকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত। (ক্রমশঃ)

স্বামীজীর প্রগতি-ভাবনা

অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীজীর বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁর বাণী ও রচনার পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে। দীর্ঘ ৮০ বছর পরেও তাঁর তারুণ্য ও আধুনিকত্ব ম্লান হয়নি একটুও। বরঞ্চ বলা যায়, বেড়েছে। বর্তমান বিশ্বসমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিতও বিস্তর রয়েছে তার মধ্যে, অবশ্য নিজের বুদ্ধির আলোকেই আধুনিক মানুষকে তার মধ্য থেকে বাছাই করে নিতে হবে। হাতে-কলমে তা' কার্যকরী করার নৈপুণ্য বা প্রয়োগ-কৌশলও তারই উপর নির্ভর করছে। স্বামীজী তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যুজ্জ্বল জীবনকালের মধ্যে মূলতঃ দিগ্‌দর্শনই দিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর বহু বস্তুনিষ্ঠ ভাবনার মধ্যে প্রগতি-ভাবনা এত স্বচ্ছ ও সুসমঞ্জস যে, এর তুলনা পাওয়া ভার। 'বাস্তব বেদান্তবাদের' (Practical Vedantism) চেয়ে এর গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। একদিক থেকে বলতে গেলে, বাস্তব বেদান্তবাদ এর অংশমাত্র।

সারা পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে তাঁর প্রগতি-ভাবনা। খুব সহজভাবেই প্রগতির সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, কিন্তু তার বিস্তার প্রায় মহা-জাগতিক করে তোলা যায়। তিনি বলছেন, প্রগতির অর্থ হ'ল এককথায়—প্রকৃতিকে বশীভূত বা জয় করা। এখন প্রকৃতি বলতে, পাশ্চাত্য মণ্ডলের আধুনিক বিজ্ঞান-গর্বীরা শুধু বহিঃপ্রকৃতি বা বিশ্বপ্রকৃতিকেই সচরাচর বুঝে থাকেন। এরূপ ধরে নেওয়া ভুল নয়, কিন্তু ইহা আংশিক সত্যমাত্র এবং নিঃসন্দেহে খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচায়ক। বর্তমান পৃথিবীর বহু সমস্যার মৌল কারণও এই খণ্ডিত দৃষ্টি। সমাধান যে হচ্ছে না, সমস্যা যে বেড়েই চলেছে—তারও কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি। বহুকাল পূর্বে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট নাকি বলেছিলেন, তিনি দুটি বিষয়ের কোন সীমা খুঁজে পান না—একটি হ'ল মাথার ওপরের আকাশের, আর একটি হ'ল মানুষের হৃদয়ের। এর থেকে বোঝা যায়, তাঁরও সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতিকে একই সঙ্গে অনুধাবন করার মানসিক কাঠামো তাঁরও ছিল। কিন্তু স্বামীজীর বাণীতে যে নিঃসংশয় সমাধানের আশ্বাস আছে, তা' কান্টের পূর্বোক্ত কথায় ছিল না, এমনই আমাদের মনে হয়।

এখন দেখা যাক, স্বামীজীর প্রগতি-ভাবনার সার্বিক স্বরূপটি (Integral character) কী? প্রগতি বলতে তো প্রকৃতিকে জয় করা বোঝায়। এখন, প্রকৃতি বলতে কী বোঝায়? তিনি নিঃসন্দিগ্ধ ভাষায় বলছেন, প্রকৃতি বলতে মূলতঃ দুটি বিষয় বোঝায়—(১) মানুষের বাইরের প্রকৃতি বা বিশ্বপ্রকৃতি এবং (২) তার অন্তঃপ্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করার প্রয়াস মানবসভ্যতার সূত্রপাত থেকেই শুরু হয়েছে। নিছক বেঁচে থাকার তাগিদেই এর প্রথম উদ্ভব, কিন্তু মানবের জিজ্ঞাসা ও জিগীষায় এর অভূতপূর্ব বিস্তার হয়েছে গত দুই শতাব্দীতে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা (Science and Technology) এবং শিল্পবিপ্লব এরই বিকাশ। মানব-প্রগতিতে এদের অনন্ত অবদান অনস্বীকার্য। পশ্চিমী দেশগুলোর অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি এবং সারা পৃথিবী জুড়ে গত দুশো বছর ধরে খবরদারি করবার শক্তির মূল উৎসও এতেই

নিহিত। সুতরাং স্বামীজীর অকুণ্ঠ পরামর্শ হ'ল, ভারত ও অন্যান্য দেশ যারা এই বস্তুবিজ্ঞান ও যান্ত্রিকবিদ্যায় অনুন্নত, তারা এই বিষয়-গুলোতে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছ থেকে এইসব শিখে নিক। না হ'লে বহুযুগ-সঞ্চিত 'তামসিকতা' (যাকে এখনও ভারতে অনেকে 'সাত্ত্বিকতা' বলে ভুল করেন) কোনকালেই ঘুচবে না।

কিন্তু সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশগুলো সম্বন্ধেও তাঁর সুপারিশ আছে। তারা বিশ্বপ্রকৃতিকে ক্রমাগতই জয় করে চলেছে [বর্তমানে 'মহাকাশ-অভিযান'ও চালাচ্ছে]; কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে (যেখানে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, ভয় ইত্যাদি অহরহ ক্রিয়া করে চলেছে) বিশেষ জয় করতে পেরেছে এমন তো মনে হয় না। তারই ফলশ্রুতি দেখা গেছে পরবর্তীকালে দুটি বিশ্বযুদ্ধে, পারমাণবিক অস্ত্রনিক্ষেপে, কোরিয়ার যুদ্ধে, ভিয়েতনাম সংগ্রামে ও অগণিত ছোট-বড় আন্তর্জাতিক সংঘাতে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সমৃদ্ধ দেশগুলোতে যেখানে মাথাপিছু আয় অত্যুচ্চ এবং ভোগ্যপণ্যের অভাব নেই, সেখানে আত্মহত্যা এবং অপঘাতমৃত্যু ও মানসিক অশান্তি বেড়েই চলেছে। আন্তর প্রকৃতিকে জয় করার অক্ষমতাই এদের জননী।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে এবং স্বামীজীর প্রগতি-সংজ্ঞার নিরিখে পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলোও যথার্থ প্রগতি লাভ করেনি। তারা প্রগতির আধখানা মাত্র পেয়েছে, আর আধখানা পায়নি। না পাওয়ার কারণ—মানবের আন্তর প্রকৃতিকে স্ব-বশে আনয়নের অক্ষমতা; স্বামীজী সুস্পষ্ট বলছেন এখানে, সমগ্র পৃথিবীকে ভারতের কাছ থেকে শিখতে হবে মানবপ্রকৃতিকে জয় করার কৌশল। এটিও বিজ্ঞান, তবে বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করার বিজ্ঞানের চাইতেও গভীরতর ও দুরূহতর। এরই নাম যোগ। নিজপ্রকৃতিকে জয় করার চেয়ে বেশী কঠিন কিছু নেই মানুষের পক্ষে। এজন্যই শাস্ত্র বলছেন, নিজেকে জানো ('আত্মানং বিদ্ধি'), যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায় তাঁকে জানো, ইত্যাদি।

তাহলে স্বামীজীর মাপকাঠি অনুযায়ী *বর্তমানে কোন দেশই সত্যিকার প্রগতি* অর্জন করে উঠতে পারেনি। পারবে তখনই, যখন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি উভয়কে জয় করার প্রয়াস যুগপৎ চলতে থাকবে। আপাততঃ আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের জন্য এবং মানুষের আত্মঘাতী সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ নিরসনের জন্য পাশ্চাত্য সমৃদ্ধ দেশগুলো তাদের আন্তর প্রকৃতি অনুসন্ধান ও জয় করার ওপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করুক। আর, ভারতপ্রমুখ অসচ্ছল দেশগুলো বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করার নেশায় মেতে উঠুক, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠুক। কিন্তু সবসময়েই মনে রাখতে হবে, কোন ক্ষেত্রেই অপর প্রকৃতিটিকে যেন কোনক্রমে অবহেলা না করা হয়। বস্তুবিজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞান উভয়ের উন্নতি নিয়ে মানব-প্রগতি। স্বামীজী তাই উভয়েরই যুগপৎ উন্নয়ন চেয়েছিলেন।

দেবীভাগবতে মধুকৈটভ-বধ

শিবদাস

দেবীভাগবতে আছে, মহাশক্তিই জগতের সব কিছু হয়েছেন, তিনি ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সনাতন বা নিত্য সত্তা আর কিছুই নাই—"সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্।" বেদান্তে যাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়েছে, তিনিই মহাশক্তি, বিশ্বজননী। তিনিই সগুণা হয়ে জগতের সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশ করেন। নির্গুণ ও সগুণ তাঁরই দুটি বিভিন্ন অবস্থা।

তিনিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-রূপে প্রকাশিতা। তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই শক্তিতে এঁরা সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন। মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী প্রভৃতি সগুণ রূপ নিয়ে তিনিই এঁদের শক্তিরূপেও প্রকাশিতা।

দেবীভাগবতে একটি কল্পারম্ভের বর্ণনায় এই তথ্যটি সুপরিস্ফুট করা হয়েছে। অনন্তকাল ধরে নির্গুণা মা সগুণা প্রকৃতিরূপিণী হয়ে একবার করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ ধারণ করছেন—সৃষ্টি করছেন, সুদীর্ঘকাল তার স্থিতির পর আবার সৃষ্টিকে নিজের দেহে মিশিয়ে নিচ্ছেন—বিনাশ বা প্রলয় ঘটাচ্ছেন। আবার নতুন সৃষ্টি করছেন। মায়ের এই খেলা পরপর চলছেই। প্রলয়ের সময় কিন্তু মা নতুন সৃষ্টির জন্য আগের সৃষ্টির সব কিছুই সূক্ষ্মাকারে বীজাকারে রেখে দেন নিজের কাছে।

এমনি একটি কল্পারম্ভের বর্ণনায় আছে—সীমাহীন কারণ-সলিল-সাগরে একটি বটপত্রের উপর শায়িত অবস্থায় শিশুদেহধারী বিষ্ণু ভেসে চলেছেন। চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন তিনি, সলিল ছাড়া চারিদিকে কোথাও আর কিছু দেখতে পেলেন না। তখন আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, "আমি এখানে এলাম কোথা থেকে? কে আমায় সৃষ্টি করলেন, কি দিয়েই বা গড়লেন এই শরীর, কি উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই বা সৃষ্টি করলেন আমাকে? যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যময় সত্তা।" বিষ্ণু গভীরভাবে যখন এই চিন্তায় মগ্ন, তখন দৈববাণী শুনলেন তিনি—মহাশক্তি বললেন—"সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্"—"যা কিছু দেখছ, তা সবই আমিই হয়েছি—আমি ছাড়া জগতে সনাতন নিত্য সত্তা আর কিছুই নাই।"

উপাখ্যানটির মধ্যে ব্যাসদেব বারে বারে এই কথাটি নানাভাবে উত্থাপন করেছেন যে, শ্লোকার্ধমাত্র হলেও এইটিই হল সর্বশাস্ত্রের সার কথা, একটি চৈতন্যময় নিত্য সত্তাই নিজ শক্তিবলে নিজেকে বিশ্বরূপে রূপায়িত করছেন, তিনি ছাড়া বিশ্বজগতে নিত্য সত্তা আর কোন কিছুরই নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংক্ষেপে যা বলেছেন: "ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন", "ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু," "তিনি ও তাঁর শক্তি অভেদ।"

বিষ্ণু কথাগুলি শুনতে পেলেন বটে, কিন্তু মাকে দেখতে পেলেন না। আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, "কে বললেন এ কথা কয়টি? তাঁকে দেখতেই বা পেলাম না কেন?" অনেক ভেবেও যখন কিছু বুঝতে পারলেন না, তখন বটপত্রশায়ী অবস্থাতেই ঐ শ্রুত মন্ত্রটিই জপ করতে লাগলেন—"সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্।" জপ করতে করতে সমাধিস্থ হলেন। তখন

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দিব্যালঙ্কারভূষিতা সহাস্য-বদনা শান্তমূর্তি মহালক্ষ্মী সখীগণ-সমাবৃতা হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূতা হলেন। দেখে আবার অবাক হলেন বিষ্ণু—"ইনি আবার এঁদের সঙ্গে নিয়ে এলেন কোথা থেকে? কে ইনি? তবে ইনিই কি আমার জননী, ইনিই কি এসবের সৃষ্টিকর্ত্রী দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তি?"

বিষ্ণুকে এইভাবে চিন্তান্বিত দেখে মহালক্ষ্মী বললেন, "আমি তোমার জননী নই, পরমা প্রকৃতিই আমার ও তোমার উভয়েরই জননী। তুমি আমাকে ভুলে গেছ, নিজের কথাও ভুলে গেছ। কত কোটি বার সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটেছে আর প্রতিবারে তুমি আমি দুজনেই এভাবে এসেছি। আমাদের জননী পরমা শক্তি নির্গুণা, মায়া-গুণের অতীত। কিন্তু তুমি বা আমি তা নই, আমি শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী। আমি তাঁরই আদেশে তোমার কাছে এসেছি, আমি বৈষ্ণবী শক্তি, তোমার হৃদয় আমার নিত্য আবাস। তোমার নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করবেন। তখন তুমি সেই জগৎ পালন করবে। তারপর মহেশ্বর আবির্ভূত হয়ে নিজশক্তি মহাকালীর সহায়তায় এই জগৎ ধ্বংস করবেন। এই সবকিছুর মূলে সেই মহাশক্তি। তিনি গুণাতীতা অথচ গুণের আশ্রয়—সৃষ্টির মূল সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ তাঁহা হতেই উদ্ভূত হয়েছে। তুমিও সগুণ, আমিও সগুণ, তাই আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ, মহাশক্তি নির্গুণা, গুণাতীতা বলে তাঁকে দেখতে পাওনি। সেই মহাশক্তিই তোমাকে এই মহামন্ত্রটি বলেছেন। এটি সর্বশাস্ত্রের সারকথা, মহাবিদ্যা, ত্রিভুবনে এর বেশী আর কিছু জানবার নেই।"

বিষ্ণু তখন সেই মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে রইলেন। পরে মহামায়ার শক্তিবলে যোগ-নিদ্রায় অভিভূত হয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইলেন।

তাঁর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা আবির্ভূত হবার পর চারিদিকে তাকিয়ে তিনিও বিষ্ণুর মতই বিস্মিত হলেন—"আমি কে, কোথা থেকে এলাম।" এইসব চিন্তা করছেন তিনি, এমন সময় দেখেন অগাধ গম্ভীর সেই জলরাশির ওপর দিয়ে দুটি দৈত্য তাঁর দিকে ছুটে আসছে।

এই দৈত্য দুটি মধু ও কৈটভ। বটপত্রশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জন্মগ্রহণ করে এরা সেই কারণ-সলিলে মহানন্দে খেলা করে বেড়াচ্ছিল এরাও জন্মের পরই বিস্মিত হয়ে ভেবেছিল, "আমরা এলাম কোথা থেকে, এ জলই বা এল কোথা থেকে?" বহুক্ষণ একথা চিন্তার পর কৈটভ মধুকে বলল, "দেখ মধু, আমার মনে হচ্ছে, যে-শক্তিবলে আমরা জলে ভেসে থাকতে পারছি তা কোন মহাশক্তির প্রকাশ; এই জলরাশিতেও সেই মহাশক্তিই ওতপ্রোত রয়েছেন। তিনিই আমাদের ও এই সলিলের কারণ। আবার সব কিছু রয়েছে তাঁকেই অবলম্বন করে।" দুজনেই তখন এ বিষয় নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। তখন দুজনেই দৈববাণীরূপে একটি বীজমন্ত্র শুনতে পেল। একাগ্র ও সংযতচিত্তে দুজনেই সেই মন্ত্র জপ করতে লাগল। সুদীর্ঘ কাল এভাবে তন্মনস্ক হয়ে জপের পর পরমাশক্তি প্রসন্না হয়ে তাঁদের বর দিলেন যে, নিজে মরতে ইচ্ছা না করলে কেউ তাদের মারতে পারবে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে পরমানন্দে তারা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল কারণ-সলিলে। সেই সময় হঠাৎ ব্রহ্মাকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে ছুটে এসে বলল, "বেশ মজা করে এমন সুন্দর পদ্মাসনটির উপর বসে রয়েছ দেখছি! নামো ওখান থেকে! নেমে যেখানে মন চায় সরে পড়।

আর না হয় যুদ্ধ কর আমাদের সঙ্গে। এমন সুন্দর আসন দুর্বলের বসবার জন্য নয়, ও আসন বীরভোগ্য।"

ব্রহ্মা দেখলেন এরা দুজন, এবং দুজনেই মহাপরাক্রমশালী। তখন ভেবে চিন্তে তিনি বিষ্ণুকে জাগানোই ভাল মনে করলেন, বিষ্ণু নিশ্চয়ই এদের সংহার করতে পারবেন। কিন্তু বহু প্রার্থনাতেও বিষ্ণু জাগলেন না দেখে অবাক হয়ে ভাবলেন, "এ কি হল! তাহলে ইনি কি নিজের ইচ্ছায় জাগতে পারেন না, অন্য কোন শক্তি দ্বারা চালিত হন? যদি নিজের ইচ্ছায় জাগতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার প্রার্থনায় জাগতেন।" এই ভেবে, যে শক্তি বিষ্ণুকে নিদ্রামগ্ন করে রেখেছেন, সেই মহাশক্তির স্তব করতে লাগলেন তিনি—"মা, তুমি জগজ্জননী! তুমিই আমাদের সৃষ্টি করেছ। তুমিই নিজশক্তিবলে বিষ্ণুকে নিশ্চল করে রেখেছ। তোমার ইচ্ছাতেই জগতের সব ঘটনা ঘটে; এই অসুর দুটি যে আমাকে বধ করতে এসেছে, সে তোমারই ইচ্ছায়। জানি না, কেন এদের পাঠালে। তোমার লীলা বোঝা ভার; ছেলেরা যেমন খেলা করে, জগতের সব ঘটনাই তেমনি তোমার খেলা। আমাকে সংহার করার জন্য যদি এদের পাঠিয়ে থাক, তাহলে তাই হোক। তা না হলে, হয় বিষ্ণুকে জাগরিত কর এদের বধ করার জন্য, আর না হয় তুমি নিজেই এদের বধ কর।"

যোগনিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তি তখন বিষ্ণুকে ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন, বিষ্ণু জেগে উঠলেন। তারপর বিষ্ণুর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ হল মধু-কৈটভের। মধু যখন যুদ্ধ করে, কৈটভ তখন বিশ্রাম পায়। আবার কৈটভ যখন ক্লান্ত হয়, মধু যুদ্ধে নামে, সে বিশ্রাম করে। বিষ্ণুকে কিন্তু যুদ্ধ করতে হয় একা। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর বিষ্ণু তাই তাদের বললেন, "তোমরা বিশ্রাম করার সময় পাচ্ছ, কিন্তু আমি তো পাচ্ছি না। আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।" অসুর দুটি এ যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে রাজী হল। বিষ্ণু তখন ধ্যানমগ্ন হয়ে জানতে পারলেন, মহাশক্তির বরে এরা ইচ্ছামৃত্যু। বুঝলেন এভাবে কেবল নিজের বলে যুদ্ধ করে এদের সংহার করা অসম্ভব। তখন ব্রহ্মবিষ্ণুরূপিণী মহাশক্তিকে ধ্যান করতে লাগলেন। মা প্রসন্না হয়ে দেখা দিলে বিষ্ণু বললেন, "মা তুমি এদের ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছ, আমি এখন এদের সংহার করি কি উপায়ে?" মা বললেন, "তুমি আবার যুদ্ধ কর এদের সঙ্গে—আমি এদের সংহারের ব্যবস্থা করছি। আমি আমার মায়াপ্রভাবে কটাক্ষমাত্রে এদের মোহগ্রস্ত করব। সেই অবস্থায় তুমি এদের বঞ্চনা করে হত্যা করবে।" মা তখন মোহিনীরূপে দেখা দিয়ে মায়াবলে তাদের মুগ্ধ করলেন। বিষ্ণু তখন অসুরদের বললেন, "তোমাদের শৌর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, বর নাও।" মধুকৈটভ তখন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ থাকার জন্য একথা শুনে অভিমানে ফুলে উঠল। তারা অভিমানভরে বলল, "আমরা তোমার কাছে বর নেব কি? তুমিই আমাদের কাছে বর নাও।" বিষ্ণু বললেন, "তাহলে তোমরা আমার বধ্য হও—এই বর চাচ্ছি।" অসুর দুটি একথা শুনেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বুঝল যে, গোলমাল করে ফেলেছে, এখন কি করা যায়? দুজন কিছুক্ষণ পরামর্শ করে বলল, "ঠিক আছে, বর দেব বলেছি, দিচ্ছি। কিন্তু তুমিও তো আমাদের বর দেবে বলেছিলে? আমরা এই বর চাচ্ছি—জলশূন্য সুপরিসর স্থানে আমাদের বধ কর।" মধু-

কৈটভ পরামর্শ করে স্থির করেছিল, চারিদিকে যখন জল ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন এই বর চাইলে বিষ্ণুকে বর দেওয়াও হবে অথচ বিষ্ণু তাদের বধও করতে পারবেন না। বিষ্ণু কিন্তু নিজের উরুদেশকে অতিবিস্তৃত করলেন, এবং তার ওপর রেখে অসুর দুটিকে বধ করলেন।

মধু-কৈটভকে বধ করার পর বিষ্ণু বট-পত্রশায়ী অবস্থায় যে মহামন্ত্রটি শুনেছিলেন, সেইটির জপে মগ্ন হলেন আবার—"সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্।" বিষ্ণুকে জপ করতে দেখে ব্রহ্মাও তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রটি জেনে নিলেন।

দেবীভাগবতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত এই 'মধু-কৈটভ-বধ' বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তাকারে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্য' বা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের প্রথম অধ্যায় এটি।

"শক্তির বিচিত্র প্রভাবেই সর্ষপতুল্য বীজে বিশাল বৃক্ষ, মাংসপিণ্ড মনুষ্যশরীরে জড়জগন্নিয়ামিকা চৈতন্যময়ী বুদ্ধি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাধারণ শক্তির প্রভাবই যখন এমন অদ্ভুত, তখন অন্তর্জগন্নিয়ামিকা আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমার কিরূপে ইয়ত্তা হইবে? কেনই বা না জগৎ আবহমান কাল ধরিয়া উহার পূজায় প্রাণপাতে অগ্রসর হইবে?"

—স্বামী সারদানন্দ (ভারতে শক্তিপূজা)

সমালোচনা

যুগনায়ক বিবেকানন্দ : [তৃতীয় খণ্ড : প্রবর্তন] : স্বামী গম্ভীরানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ ; পৃঃ ৪৮৪ ; মূল্য সাত টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের অধুনাতন পূর্ণাঙ্গ জীবনীরচনার মহৎব্রত উদ্‌যাপন করে স্বামী গম্ভীরানন্দজী আজ বাংলা জীবনীসাহিত্যে স্মরণীয় সার্থকতার অধিকারী। ব্রত-উদ্‌যাপন স্বয়ংসার্থক কৃতিত্ব। তবু বর্তমান বাংলাসাহিত্যে জীবনীরচনার একান্ত দৈন্যের কথা স্মরণ করলে 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ পাঠকচিত্তে আশা ও আনন্দের বাণী বহন করে আনে। স্বামীজীর লোকোত্তর জীবনকাহিনীর একটি সামগ্রিক তাৎপর্য এখন বাংলাভাষাভাষী পাঠকের কাছে এই অমর গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে বিধৃত হয়ে রইল। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র দশটি খণ্ড প্রকাশের পর স্বামীজীর এই অমূল্য জীবনীগ্রন্থ-খানি 'উদ্বোধন কার্যালয়ে'র সাম্প্রতিক কৃতিত্বের অন্যতম উদাহরণ। পর পর এ দুটি প্রকাশনের দ্বারা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অনুরাগীদের তাঁরা অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

তৃতীয় খণ্ডের প্রাগ্বাণীতে প্রথমেই গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বিশ্বজনীন তাৎপর্যের কথা পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন—"মনুষ্যসমাজের কোন স্তরই তাঁহার পরিকল্পনার বাহিরে ছিল না : 'বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না ; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে, সর্বত্র এইসকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে।' সকলে আত্মার মহিমা শুনিয়া শক্তিলাভ করিবে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ করিয়া অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইবে। অতীতের ধর্মেতিহাস এই বিষয়ে তাঁহার সহায়ক ছিল, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ইহার সমর্থক ছিল এবং স্বীয় দার্শনিক দৃষ্টিও ইহার পরিপোষক ছিল। 'যে জ্ঞানে ভববন্ধন হইতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।' 'আমি সেই ঈশ্বর বা সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি বিধবার চোখের জল মোছাতে বা অনাথের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেন না'—ইহাই ছিল তাঁহার দৃপ্ত ঘোষণা।"

বস্তুত এই একান্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীই আচার্য বিবেকানন্দকে পৃথিবীর দীনতম মানুষেরও সুখদুঃখের অংশীদার অন্তরতম বন্ধুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের হিমালয়োপম সান্নিধ্যে এসেও পাঠক-মাত্রেই তাঁর অন্তরের স্নেহনির্ঝরে অভিষিক্ত হয়ে অস্তিত্বের পরমসার্থকতা মুহূর্তের আভাসে উপলব্ধি করেন। যথার্থ মহত্ত্ব তার অনুভব-বৃত্তের মধ্যে যে কেউ এসে পড়ে, তাকেই মহৎ করে তোলে – মহৎজীবনীপাঠের এই তো পরম সার্থকতা।

দীপ্ত মণিখণ্ডের বিচিত্র দ্যুতির মতো বিবেকানন্দ-চরিত্রের বহুধা-সমুজ্জ্বল ভাবসৌন্দর্য তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি পাঠক-হৃদয়ের কৌতূহল-আকর্ষণে অদ্বিতীয়। আর এই দুরন্ত জীবনপ্রবাহ তথ্য ও যুক্তির নিপুণ সমাবেশের দ্বারাই আপন গভীরতা ও চলমানতার রুদ্রমাধুর্যে পাঠকহৃদয়কে সর্বক্ষণ আবিষ্ট করে রাখে। জীবনীরচনার ক্ষেত্রে

এ যে কত দুরূহ নৈপুণ্য, সে কথা লেখক-মাত্রেই উপলব্ধি করবেন।

প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ ও বাণীপ্রচারের সত্যবদ্ধ-রূপায়ণের প্রচেষ্টা থেকে ১৯০২ এর ৪ঠা জুলাইয়ে দেহাবসান অবধি বিবেকানন্দজীবনের শেষ ক'টি বছরে আসন্ন বিদায়ের অন্তরাগ স্বামীজীর বাক্যে, ব্যবহারে, লেখনীতে নানাভাবে গোধূলির ইংগিত জানিয়ে গেছে। মৃত্যুর আলোকে এই পুরুষসিংহের মহাজীবনে শৌর্য ও সাধনা আরো প্রদীপ্ত, আরো সমুন্নত শিখায় আত্মার অমরবাণী বিশ্বজনের উদ্দেশে উচ্চারিত। ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকথায় বিধৃত তাঁর সেই মহামন্ত্র—Manliness—মনুষ্যত্ব। 'Yes, the older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness.' 'হ্যাঁ, যত আমার বয়স হচ্ছে, ততই বেশী করে বুঝতে পারছি, সব কিছুর মূলে রয়েছে মনুষ্যত্ব।' 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের শেষ স্তবকটিতে তাঁর প্রার্থনা—'মা, আমায় মানুষ কর।' সেই মনুষ্যত্বের জ্বলন্ত বিগ্রহ তো তিনি নিজে। নবযুগের ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের কোন্ আদর্শকে গ্রহণ করবে—তাঁর সমগ্র জীবন সেই আদর্শের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' নামকরণেও সেই সার্থকতা।

শোভন, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত মুদ্রণ-পারিপাট্যে আগের দুটি খণ্ডের মতো এই তৃতীয় খণ্ডটিও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যে কোন গ্রন্থাগারের আগ্রহের সম্পদ। ভবিষ্যৎ পাঠক ও গবেষকদের কথা স্মরণ করে এ গ্রন্থে স্বামীজীর রচনাবলী থেকে যেভাবে উদ্ধৃতি-সংগ্রহের সমাবেশ দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে একটি বক্তব্য নিবেদন করি। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র বিভিন্ন খণ্ড থেকে উদ্ধৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে মূল গ্রন্থের রচনার বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু উদ্ধৃত, সেই মূলটির নামও থাকলে ভাল হয়। তার দ্বারা স্বামীজীর বিভিন্ন গ্রন্থ, রচনা বা বক্তৃতা সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা গড়ে উঠবে, সেই সঙ্গে 'বাণী ও রচনা' যাঁর সংগ্রহে নেই, তিনিও আয়ত্তাধীন সংগ্রহের উপরে নির্ভর করেই এই জীবনী অনুধাবন করতে পারবেন। অবশ্য, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' যে সাধ্যপক্ষে বিবেকানন্দ-অনুরাগীমাত্রেরই সংগ্রহে থাকা প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' পড়তে পড়তে স্বভাবতই স্বামীজীর একটি কথা মনে পড়ে: তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) আবির্ভাবকাল থেকেই সত্যযুগের সূচনা। সেই 'সত্য'-যুগস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনতথ্যসম্বলিত এমনি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী বাংলাসাহিত্যে আজও অপেক্ষিত। 'যুগনায়ক বিবেকানন্দে'র তিনটি খণ্ডে যে নিপুণ তথ্যসমাবেশ, গভীর মননদৃষ্টি ও সাধকহৃদয়ের তন্ময়তার ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে, ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের কাছে তা নিশ্চিত পথপ্রদর্শকের নিদর্শন হয়ে থাকবে।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্যে গত জুলাই মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়:

১। **বিহারে** (ক) হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরী, চম্পারণ ও প্রতাপপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫৪ কেজি চাল, বিস্কুট ৩,৭৮০ গ্রাম, ১,১১,৭৬০ কেজি গম, ১,২৯০ কেজি জোয়ার, ২,৯৮৩ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ৮,৮৪৬ টি ভিটামিন ট্যাবলেট, প্রাপ্তবয়স্কদের পরিচ্ছদ ৮৪টি, ধুতি ও শাড়ী ১৯৯ খানি, লংক্লথ ১৮ গজ, পুরাতন বস্ত্রাদি ২,০৩৪টি এবং ২৬২টি শিশুদের পোশাক বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২৭,১২৬।

(খ) সাঁওতাল পরগণা জেলায় রিখিয়া সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭১,১৮১ কেজি গম, গুঁড়া দুধ ৪,৬০৮ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ৯১ খানি, কম্বল ৮৩৩টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ২,০৫৪ খানি, মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট ৯,৬৫০টি এবং একটিন বিস্কুট বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১১,২৩৫।

২। **উত্তরপ্রদেশে**—মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,০২৮ কেজি গম, গুঁড়া দুধ ৮১২ কেজি, বিস্কুট ২৯২ কেজি এবং ৯,৬০০ টি ভিটামিন ট্যাবলেট বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫,১৮৪।

৩। **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) পুরুলিয়া জেলায় পারা, হুড়া, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালিতোড়া এবং নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭,৪১৭ কেজি চাল ও ২১,৯১২ কেজি গম বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৪,৮৮২।

(খ) বাঁকুড়া জেলায় হাট-আস্থরিয়া, দধিমুখা, খাণ্ডারী, রামহরিপুর এবং জয়রামবাটী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৭,৭০৮ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১১,৮৫৩।

(গ) মালদহ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,৪০০ কেজি বার্লি বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২,৫২৪।

ছাত্রের কৃতিত্ব

বেলুড় বিদ্যামন্দির কলেজের জনৈক ছাত্র এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় সাহিত্য-শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

ম্যাঙ্গালোর—রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬—মার্চ, ১৯৬৭) আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

বালকাশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। আলোচ্য সময়ে ছাত্রাবাসে স্কুলের ৩৭ (১৬+২১) জন এবং কলেজের ৮ জন বিদ্যার্থী ছিল। বালকদের শারীরিক মানসিক নৈতিক সর্ববিধ উন্নতির জন্য এখানে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম, ললিত-সহস্রনাম প্রভৃতি ধর্মপুস্তক হইতে তাহাদিগকে আবৃত্তি করিতে শিখানো হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে সাময়িক উৎসব ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের রোগগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণের সেবাকল্পে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মাঙ্গালোরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এই চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্ত-সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২৯,৮৭৯, তন্মধ্যে নূতন রোগী—৫,৭৭২।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি—স্বামী বিবেকানন্দের ৬৫তম তিরোভাব উৎসব : স্বামী বিবেকানন্দ ৪ঠা জুলাই মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই তারিখটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে এই দিনটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। স্বামীজীর '৪ঠা জুলাই-এর প্রতি' শীর্ষক ইংরেজী কবিতাটি ইহার প্রমাণ। আমেরিকার বেদান্ত সমিতিসমূহের সভ্য ও বন্ধুগণের নিকট ৪ঠা জুলাই দুই দিক দিয়া অর্থপূর্ণ এবং হৃদয়ের গভীরভাবদ্যোতক।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি কয়েক বৎসর যাবৎ ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব-স্মরণে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসর উহা নিউইয়র্ক হইতে ৮০ মাইল দূরে সমিতির দুইজন সভ্যের 'মস হিল ফার্মস্' নামক ৫০ একর বিস্তৃত একটি বাগানে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। এই উৎসব-ভূমির প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী অত্যন্ত মনোরম। একটি বেদিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্র শোভা পাইতেছিল। অপর একটি বেদিতে রাখা হইয়াছিল স্বামীজীর প্রসিদ্ধ চিকাগো ধর্মমহাসভার সময়ে গৃহীত বীরবেশী আলেখ্যটি। প্রায় ১০০ জন নরনারী এই উৎসবের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দজী এবং প্রভিডেন্স ও বস্টন বেদান্ত কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী সর্বগতানন্দের উপস্থিতিতে নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গের মধ্যে দ্বিপ্রহরের পর সকলে বনভোজন সমাধা করেন। বেলা ৩॥ টায় উৎসবের কার্যসূচী আরম্ভ হয় স্বামী সর্বগতানন্দের একটি সংস্কৃত প্রার্থনা-আবৃত্তি দ্বারা। তৎপরে সমিতির কতিপয় সভ্য কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে রচিত একটি গীতিনাট্য পুরুষ-ভক্তগণ কর্তৃক অভিনীত ও গীত হয়। নাটিকাটি চার ধাপে প্রযোজিত—(১) স্বামীজীর যৌবন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট শিষ্যত্বগ্রহণ, পরিব্রজ্যা (২) পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার (৩) ভারতে কার্য (৪) শিষ্যদের শিক্ষাদান, মহাসমাধি।

গীত, ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা এবং ফাঁকে ফাঁকে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিক বাণী—এই তিনটির সমন্বয়ে নাটিকাটি সমবেত সকলের চিত্তে একটি আশ্চর্য আধ্যাত্মিক ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কতকগুলি গান ছিল সমবেত, কয়েকটি দ্বৈত এবং আর কয়েকটি ছিল একক। অনেকগুলি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য যন্ত্র এই গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। মহামানব বিবেকানন্দের কর্ম জ্ঞান ও প্রেমময় জীবন, সঙ্গীত ও কথিকার মাধ্যমে শ্রোতবৃন্দের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

নাট্যাভিনয়ের পর আরতি এবং স্বামীজীর "খণ্ডনভববন্ধন" এবং "ওঁ হ্রীং ঋতং" স্তোত্র—সমবেতভাবে গীত হয়। পরে কিছুক্ষণ ধ্যান এবং স্বামী পবিত্রানন্দজীর শান্তি-বাচন দ্বারা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

স্বামী নিশ্চলানন্দের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৫শে আগস্ট বেলা ১০টার সময় লখ্‌নৌ আশ্রমে স্বামী নিশ্চলানন্দ (নিতাই মহারাজ) ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না, তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সাধু-জীবনের অধিকাংশ সময়ই বারাণসী, কনখল এবং বৃন্দাবন আশ্রমে সেবাকার্যে ব্যয়িত হয়। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি লখ্‌নৌ সেবাশ্রমে ছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে মিলিত হইয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ॥ শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন মাতৃভবন (৭এ, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-২৬): এপ্রিল, ১৯৬৪—মার্চ, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাতৃভবনের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

এই প্রসূতিসদন হাসপাতাল (Maternity Hospital) রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখা-কেন্দ্ররূপে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের উপর ইহার পরিচালনা-ভার সমর্পিত হইয়াছে।

মাতৃভবনের মুখ্য কার্য—প্রসূতিচিকিৎসা ও শিশুপরিচর্যা। এখানে দুইটি বিভাগ আছে—বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ। অন্তর্বিভাগে ৫০টি শয্যা আছে, তন্মধ্যে ২৪টি ফ্রি। উভয় বিভাগই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত প্রথম টেলি-যোগাযোগ

গত ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ আমেদাবাদ হইতে পি.টি.আই.-সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে: ভারতবর্ষ মহাকাশ-যোগাযোগের যুগে প্রবেশ করিল। আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর বি. এম. সরাভাই এবং এখানকার নব প্রতিষ্ঠিত আণবিক শক্তি-ঘাঁটির ডিরেক্টর উইংকমাণ্ডার কে. কে. রাও সাংবাদিকদের জানান, 'মার্কিন জাতীয় মহাকাশ ও মহাকাশ পরিক্রমা সংস্থার একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ১২ হাজার মাইল উচ্চে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছিল। সেইটি লক্ষ্য করিয়া আমরা কথা ও টেলিভিশন ছবি পাঠাইয়াছি এবং দুইটিই আবার কৃত্রিম উপ-গ্রহটিতে প্রতিফলিত করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে লইয়া আসিতে পারিয়াছি।

'মহাকাশ টেলি-যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতের এই প্রথম পদার্পণ। কৃত্রিম উপ-গ্রহটিকে ডাক করার জন্য আমরা এক সপ্তাহ যাবৎ চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই। অবশেষে গত বুধবার অপরাহ্ণ ৪টা ১৫ মিনিটে আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। মহাকাশের দিকে যে কথাগুলি বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সেগুলি অবিকল ফিরিয়া আসিয়াছে, যে ছবিগুলি প্রেরিত হইয়াছিল, সেগুলিও আবার ফিরিয়া পাইয়াছি।

'আজও পুনর্বার সে পরীক্ষা চালানো হইয়াছে এবং সাফল্যও লাভ করিয়াছি।'

রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশেষ ভাণ্ডারের অর্থানুকূল্যে আমেদাবাদের পরীক্ষামূলক টেলি-যোগাযোগ ঘাঁটিটি স্থাপিত হইয়াছে।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়শমনীং সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং
নিত্যানন্দোদয়েশাং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাং।
মিথ্যাকার্যানুরাগাদনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসঙ্ঘৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥ ৭

তুমি যে জননী মোর ভবভয়-নাশিনী,
নিত্যানন্দোদয়-বিধায়িনী, ঈশানী,
শাস্ত্র-অর্থময়ী, লীলাময়ী, সদয়া,
সর্বসিদ্ধিপ্রদা—জানি নি তা জননি।
ভাবি নি তোমার কথা; অনুরাগভরে মা,
মিথ্যাকার্য করি নিশিদিন বিফলে
সদাই সকল দিকে বহু দুখে ভুগেছি!
ক্ষম অপরাধ মোর, প্রকটিত-দশনে!
যথেচ্ছ-রূপিণি মা—কামরূপে! করালে!

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা।

সংসারস্যৈকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা ভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৮

প্রলয় জলদ সম শ্যামশোভাময়ি মা !
খড়্গ-মুণ্ডধরা, বরাভয়-দায়িনি !
নিবিড়-মুক্তকেশি ! শবশির-মালিনি !
দীর্ঘ আয়ত কম সরসিজনয়নি !
জগতে তুমিই সার—একথা তো কখনো
ভাবি নি, করি নি তোমা ধ্যান হৃদি-কমলে ।
তুমি যে জননী মোর—অপরাধ নিও না,
ক্ষম অপরাধ মোর প্রকটিত-দশনে !
যথেচ্ছ-রূপিণি মা—কামরূপে ! করালে !

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননীজঠরগস্তাবদালব্ধদেহঃ
ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা ।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থা জগদিদমখিলং ত্বামৃতে নাস্তি মাতঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১৩

—অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্—শঙ্করাচার্য

পিতার শরীর হতে জননীর জঠরে
আসিয়া যেদিন হতে পেয়েছি এ দেহ মা,
ঈশ্বরী, কর্ত্রী মা সেই হতে তুমি যে,
(আমার এ 'আমি'-রূপে তুমিই তো জননি,)
করাতেছ সবকিছু অন্তরে থাকিয়া !—
অদৃষ্টরূপা তুমি, প্রবৃত্তি তুমি মা,
তুমিই তো বিষয়েতে, ইন্দ্রিয়সকলে,
চিত্তে বুদ্ধিরূপে তুমিই তো উদিতা,
তুমি ছাড়া কিছু নাই এ নিখিল ভুবনে !
ক্ষম মোর অপরাধ প্রকটিত-দশনে !
যথেচ্ছ-রূপিণি, মা—কামরূপে, করালে !

কথাপ্রসঙ্গে

‘মৃত্যুর উপাসনা’

“মৃত্যুকে উপাসনা করিতে সাহস পায় কয়জন? এস, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি।”
—স্বামী বিবেকানন্দ

নির্ভীকতাই জীবনকে সর্ববিধ উন্নতির পথে আগাইয়া লয়, মানুষের অন্তরস্থ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। যাহা অনিবার্য তাহা সমীপাগত হইলে, এমনকি মৃত্যুও আসিলে কাপুরুষের মত ভীত, পলায়নপর না হইয়া সাহসের সহিত তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে অতিক্রম করার চেষ্টা বা অসম্ভব ক্ষেত্রে তাহাকে বীরের মত বরণ করাই ‘মানুষের’ ধর্ম, ইহাতে সন্দেহ কি?

কিন্তু মৃত্যুর উপাসনা কেন? মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহা আমরা বুঝি তাহা আমাদের সব কিছুর চির-অবসান। নিজের অস্তিত্ব আমাদের দেহ-সীমিত, মনবুদ্ধি-সীমিত, দেহ ছাড়া, মনবুদ্ধি ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব যে থাকিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিতেই পারি না। আমাদের দেহের অবসান তাই আমাদের চিরবিলুপ্তির কথাই মনে করাইয়া দেয়। আমাদের অস্তিত্ব বলিতে, উন্নতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা তো এই মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যুর দিকে টানিয়া লওয়া প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করিয়াই আমরা লাভ করি। আমাদের দেহের, আমাদের মনের, আমাদের সভ্যতার সব উন্নতিই তো আমরা লাভ করিয়াছি এই লড়াই-এর মাধ্যমে। তবে মৃত্যুর উপাসনা কেন?

সাধারণ প্রত্যক্ষের এই পরিবেশে দাঁড়াইয়া এই মৃত্যুর উপাসনার কথা স্বামীজী বলিতেই পারেন না, বলেনও নাই; বরং ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন বহুস্থানে, বহুভাবে। স্বামীজী নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন, “ভীষণের পূজা কর, মৃত্যুর উপাসনা কর। বাকী সবই বৃথা; সমস্ত চেষ্টাই বৃথা। ইহাই শেষ উপদেশ। কিন্তু ইহা কাপুরুষের মৃত্যুবরণ নয়, আত্মহত্যাও নয়—ইহা শক্তিমান পুরুষের মৃত্যুবরণ, যিনি সব কিছুর অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন যে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্য নাই।”

আমরা আপেক্ষিক সত্যের প্রায় নিম্নতম স্তরে জ্ঞানের সীমা আবদ্ধ রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হই। এখানে আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সীমিত, আমাদের আনন্দের অধিকাংশই দেহসীমিত; আমরা ধরিয়া লই চিরদিনই এসব থাকিবে। নিজের দেহ ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা সম্বন্ধে, উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান বা উহা লাভের ইচ্ছাও থাকে না। এই স্তরে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই কাপুরুষের মৃত্যুবরণ, প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নকমাত্র হইয়া বাধ্য হইয়া মৃত্যুবরণ। আমরা এখানে ‘আমি দেহ’ ‘আমার সুখদুঃখ’, ‘আমার মান’—এসব মানিয়া লই, আমাদের উপর বাহ্য- ও অন্তঃ-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ মাথা পাতিয়া লই, অসংখ্য জাগতিক বস্তুর বিভিন্নতাকে, মানুষে-মানুষে বিভিন্নতাকে মানিয়া লই। এই নিম্নতম আপেক্ষিক সত্যবরণই কাপুরুষতার জন্ম দেয়, বুদ্ধিকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া ‘অধর্মকে ধর্ম’ বলিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা বলিয়া ভাবিতে শেখায়, ইহাই জাগতিক

বিষয়সম্ভোগকে জীবনের সর্ববিধ পরিকল্পনার শীর্ষদেশে রাখে, ঘোর স্বার্থপরতার জন্ম দিয়া পরিবার, সমাজ ও দেশের সেবাকে পরিণামে নিজের সেবায় পরিণত করে। দৈহিক মৃত্যুর বহুপূর্বেই ইহা মানবতার মৃত্যু ঘটাইয়া মানুষকে পশুত্বের সমপর্যায়ে টানিয়া আনে, ব্যক্তিগত- ও জাতিগত-ভাবে আচরণে পর্যন্ত হিংস্র শ্বাপদতুল্য করিয়া তোলে।

বিশ্বজীবনের অন্তর্নিহিত নিরাবরণ সত্যকে জানিয়া উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচেষ্টাই, মানবতার সর্বোচ্চ বিকাশের সাধনাই 'মৃত্যুর উপাসনা'। আমাদের যাহা স্বরূপ, আমরা আসলে যাহা, তাহা দেহ মন প্রভৃতি হইতে, 'জীবন' হইতে, জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট সবকিছু হইতে পৃথক, মৃত্যু তাহাকে কখনো স্পর্শ করিতে পারে না, আর সব কিছুরই মৃত্যু একদিন ঘটিবেই, আর সবই মৃত্যুকবলিত। ইহা জানিয়া এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচেষ্টায় যাহা আমরা নহি, যাহার কেশপাশ সৃষ্ট হইবার মুহূর্ত হইতেই মৃত্যুর হস্তধৃত, তাহা হইতে 'আমি'- বা 'আমার'-বোধের বন্ধনকে শিথিল করার, জ্ঞানাসি সহায়ে স্থূল সূক্ষ্ম সর্ববিধ দেহাত্মবোধকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রচেষ্টারই নাম মৃত্যুকে ভালবাসা। নিজের দেহের প্রতি, নিজের সুখ-দুঃখ মান অপমানের প্রতি, নিজের ইচ্ছা বা মতামতের প্রতি মমতা ত্যাগ করার—এক কথায় 'আমি'-বোধের মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার নামই 'মৃত্যুকে ভালবাসা'। এই জন্য স্বামীজী সর্বত্যাগের, সন্ন্যাসেরও অপর নাম দিয়াছেন 'মৃত্যুকে ভালবাসা'। এদিক দিয়া দেখিলে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে জনসেবাকেও স্বামীজীর 'মৃত্যুর উপাসনা' বলা যায়। তাঁহার উপদিষ্ট জনসেবা কোন ক্ষেত্রেই জড়বাদসীমিতবুদ্ধির জনসেবা নয়—জড়কে অস্বীকার করিয়া জড়ত্বের আবরণমধ্যস্থ সত্যের, চৈতন্যময়ী মাতৃরূপার সেবা—তাঁহারই চরণে আত্মবলিদান। ইহাই অন্য নামে, "ত্যাগ ও সেবা" নামে আমাদের জাতীয় আদর্শ। ইহারই কথা তিনি বলিয়াছেন তাঁহার ভারতমন্ত্রে, "ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"

ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে, সত্যলাভেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সমাজরূপী মায়ের চরণে আত্মবলিদানের মাধ্যমে 'মৃত্যুর উপাসনা'ই আমাদের সর্ববিধ কল্যাণের, সর্ববিধ উন্নতির পথ। জনসেবার, দেশসেবার যে রূপ আজ অন্যায় অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছে, বহু ক্ষেত্রে সৎ, নিরপরাধ এমনকি দেশের যথার্থ কল্যাণকারীকেও নিপীড়িত করিতেছে, তাহা মৃত্যুর চিরকবলিত জড়ের আবরণ সরাইয়া সমাজের জনগণের মধ্যে বিরাট মহামায়াকে—নিজেরই স্বরূপকে—দেখিবার প্রচেষ্টার অভাবের ফল। ভারতের কল্যাণে মা যেন তাঁহার অসির আঘাতে এই অজ্ঞানের আবরণ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেন।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীপ্রভুশরণম্

(আলমবাজার) মঠ

রবিবার, (9th May, 1897)

ভাই শশী,

অনেক দিন হইল তোমায় পত্রাদি লিখি নাই, ক্ষমা করিও। মঠের নিয়মাদির কথা বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ। প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ধ্যান। তারপর স্তবপাঠ ধারাবাহিকরূপে, এক একজন এক একদিন পাঠ করে, তারপর Delsarte[১] হয়, তৎপরে হালুয়া ভক্ষণ ইত্যাদি। আমি প্রত্যহই স্নান করিয়া পূজাদি করিতেছি। ভাই, ঠাকুরপূজা বড় কঠিন কাজ দেখিতেছি। বিকালে ৫টা হইতে ৬টা হরিভায়া গীতা-class করেন। আচার্যের ভাষ্য হইতেছে, তৃতীয় অধ্যায় আগামীকল্য আরম্ভ হইবে। আরতির পর পুনর্বার একঘণ্টা ধ্যান ও পরে question class হয়। মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভুর কথাও হইয়া থাকে এবং একদিন গান হয়। মোটের উপর মঠের কার্য আজকাল অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে।

স্বামী নরেন্দ্রনাথ আলমোড়ার নিকটে একটি নির্জন বাগানে আছেন। প্রথম তথায় গিয়া ভাল ছিলেন না, আজকাল বেশ ভাল আছেন, বল পাইয়াছেন—এইরূপ চিঠি লিখিয়াছেন। যোগানন্দ ভায়া বদ্রিসার নিজ বাটীতেই আছেন, ভাল নাই। অচ্যুতানন্দ (গুপ্ত), G. G., তারকদাদা, নিরঞ্জন, লাটু, Goodwin এবং বদ্রিসার ২।৩টী ভাই স্বামীজীর সঙ্গে থাকে।

নিত্যানন্দ (চাটুজ্যে), অখণ্ডানন্দ ও সুরেন (অমৃত বোসের ভাইপো) মহুলায় দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-কার্য করিতেছে। কালীভায়া বিলাতে বেশ কার্য চালাইতেছেন, Mrs. Sevier সিমলা পাহাড় হইতে এখানে চিঠি লিখিয়াছে।

গত mail-এ শরৎ ভায়ার চিঠি আসিয়াছে, ভাল আছে। কার্য বোধ হয় অতি সুন্দর রকমেই চলিতেছে। Kidi গত মঙ্গলবার মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছে। আমাদের আর আর সকল খবর তাহার মুখে শুনিও। আমরা সকলে ভাল আছি। আমাদের সকলের ভালবাসা ও নমস্কারাদি তুমি জানিও এবং গুপ্তকে জানাইও। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কামারপুকুরে ভাল আছেন।

ভবনাথ ভাল নাই, কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আছে। স্বামীজী চিকিৎসার জন্য ১০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং দরকার হইলে আরও দিবেন, কহিয়াছেন।

---

১ একপ্রকার ব্যায়াম

তোমার মঠ নাকি খুব সচ্ছলভাবে চলিতেছে। এ মঠ ভিক্ষা করিয়া চালাইবার হুকুম গতকল্য আলমোড়া হইতে আসিয়াছে। তোমার কুশলাদি লিখিয়া সুখী করিবে। যে ঔষধ গিয়াছে তাহা খাইবার—জানিও। ঘাসের মত ও কাঠের মত যে ঔষধ তাহা ভিজাইয়া খাইবার এবং শোলার মত যাহা তাহাও খাইবার, কানাই কিনিয়া আনিয়াছিল। উহা তেলের ঔষধ নহে।

ইতি

দাস বাবুরাম

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণ ভরসা

মঠ (নীলাম্বরবাবুর বাড়ী)

বেলুড

রবিবার, ৬ই মার্চ, '৯৮

ভাই শশী,

অনেক দিন হইল তোমার চিঠি পাইয়াছিলাম। কিন্তু নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় উত্তর-দানে দেরী হইল, ক্ষমা করিবে।

প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথ তোমার চিঠি পড়িয়া ও তোমার কার্যের বিবরণ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছে। তোমার উপর মহা খুশী এবং তোমায চিঠি লিখিয়াছে; তাহা এতদিনে বোধ হয় পাইয়াছ। তাহার শরীর তত ভাল নহে। অসুখ সম্পূর্ণ সারে নাই। তবে থমথমে হয়ে আছে, কমবার মুখ। শরীর সবল আছে, স্ফূর্তিরও কম নাই। তাই তাহার হৃদয় কি উদার হইয়াছে! জগতের লোকের জন্য সর্বদা চিন্তিত।

তিথিপূজার দিন সুশীল পূজা ও সুধীর তন্ত্রধারকের কার্য করিয়াছিল। ঐ দিন শতাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছে :

খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায,
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
গাহিছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার ॥

সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুণ্ডল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করায় এক অপূর্ব শোভা হয়েছিল। আমরা অনেকেই ঐরূপ সাজিয়াছিলাম। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত পূজা-হোমাদি হইয়াছিল। ঐদিন গঙ্গা ও সুরেন মহলা হইতে একমণ ওজনের দুই

ছানাবড়া লইয়া হাজির। স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম কি ?'—এ সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তোমায় একখানি পাঠাইব।

গত রবিবার দাঁ দের বাগানে মহোৎসব আদি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রায় অন্য বৎসরের তুল্য। ঐদিন নূতন জায়গায় নরেন্দ্র নিজে ঠাকুর লইয়া গিয়া পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। এবং পায়সান্ন ভোগ হইয়াছিল। গতকল্য ঐ জায়গাটী ৩৯০০০৲ হাজার টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে। শ্বেতপাথরের মন্দির ও প্রকাণ্ড বাটী তৈয়ারের আয়োজন হইতেছে। শীঘ্রই কার্য আরম্ভ হইবে। দেখে শুনে লোকে অবাক হইয়াছে। তাঁর কার্য তিনিই করেন। লোক না পোক, হিংসায় মরে। মঠে আজকাল অনেক লোক—শরৎ, হরিভায়া, তারকদাদা, সুশীল, সুধীর, হরিপ্রসন্ন, কানাই, নন্দ, কালীকৃষ্ণ, অজয় নামে একটী নূতন লোক, গুপ্ত, আর নিত্যানন্দ—ইনিই পূর্ববঙ্গে গিয়া প্রায় ৫০।৬০টী শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন। তাদের গুটিকত মহোৎসবে আসিয়াছিল। এইবার কলিকাতায় lecture হইবে। আগামী শুক্রবারে Miss Noble Star Theatre-এ lecture দিবে। তাহার পরে শরৎ lecture দিবে। নরেনের বড় ইচ্ছা কলিকাতা মাতায়, ইচ্ছা হলেই কার্য। হাজারিবাগ অঞ্চলে শীঘ্রই এখান হইতে দুইজন প্রচার ও উপনিবেশ-স্থাপন জন্য যাইবে। এই রবিবারে ভবানী (ব্রহ্মবান্ধব) আসিয়াছিল। আগামী রবিবারে রামবাবুর বাগানে নরেন যাইবে। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমরা আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবে। তুলসী, খোকা, দাদা ও শুকুলকে আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানাইবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা

বেলুড় মঠ
৫ই ডিসেম্বর (১৯০০)

পরমপ্রিয় ভাই শশী,

আজ কয়েকদিন হইল তোমার এক চিঠি পাইয়াছি, কিন্তু কুড়েমির জন্য জবাব দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিও, ভাই। আর আট নয় দিনের মধ্যেই হরিপদ তোমার কাছে যাইবার জন্য যাত্রা করিবে। তাহার সঙ্গে তোমার ঔষধাদি পাঠান হইবে। সব যোগাড় হয়েছে। আর যদি কিছু দরকার হয় শীঘ্র শরৎকে লিখিও। তোমার শরীর এখন কেমন আছে ?

পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ৫।৭ দিনেই বোধ হয় কলিকাতায় আসিবেন। বাটী ভাড়া হইয়াছে। দেশে তাঁর শরীর ভাল নাই।

শ্রীমান স্বামীজী এখন Constantinople-এ আছেন। বোধ হয় এখন ঐ অঞ্চলে কিছুদিন বেড়াইবেন। তাঁহার শরীর তত ভাল ছিল না, এখন মন্দ নাই, গত mail-এ চিঠি আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল ভায়ার শরীরও অসুস্থ, হয় পেট খারাপ, নয় সর্দি—একটা না একটা আছেই। কোথাও যাবার ভারি ইচ্ছা ও দরকার, কিন্তু যাবার যো নেই, মকদ্দমার জন্য। জায়গা হলেই মামলা সঙ্গে সঙ্গে। Municipality tax ধরেছে প্রায় কিছু কম ২০০৲ টাকা। আমরা বলচি public place of worship—এখানে tax হতে পারে না; কাজেই মামলা এখন হচ্ছে হুগলীতে। রাখাল এই নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। ২৮শে জানুয়ারী দিন পড়েছে। শরতের আমাশয় ভাল আছে, কোথাও change-এ যাবার ইচ্ছা। কোন্ দিকে যাবে তার স্থির নেই। তারকদা ১৬ মাস দার্জিলিং-এ কাটিয়ে এখানে মাসাধিক হল এসেছেন। তুলসীও প্রায় ১৫।২০ দিন এসেছে। তার শরীর ঔষধ খেয়ে একটু ভাল আছে। আর এলাহাবাদ, নাগপুর ঘুরে হরিপ্রসন্নও পৌঁচেছে। সুধীর শরীর সারাবার জন্য কাশী গিছলো, কিন্তু রোগা হয়ে ফিরে এসেছে। গোপাল দাদা আজ তিন দিন হলো দ্বারকাধাম-দর্শনে যাত্রা করেছেন। খোকা গঙ্গার সঙ্গে ভাবদায় আছে। আর সারদার ভাই আশু বৈরাগ্য করবার জন্য প্রয়াগে গেছে। আর আর সকলে আপাতত ভাল আছে। জ্বরজারি মঠে এবার খুব কম, কিন্তু চাকরদের ভিতর আমাশয় রোগটা কিছু বেশী।

মাষ্টার মহাশয় আছেন ভাল, তোমার কথা প্রায় জিজ্ঞাসা করেন। গিরিশবাবুর একটি কন্যা ছিল, তাও সম্প্রতি গিয়াছে। বাস্তবিক বড়ই কষ্টের কথা। তিনি মাদ্রাজে যাইতে ইচ্ছা করেন। সেদিন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আর আর সকল ভক্ত ভাল আছেন। তুমি দিনকতকের জন্য মঠে এলে আমরা সকলেই খুব খুশী হব। আসা কি চলে না? এই ত রেলে আসবার বেশ সুবিধা। তুমি নৈলে মঠ মিট্‌মিট্‌ করে। ২।৫ দিনের জন্য এলে হল কি? জান এখানে শীত পড়েছে, কাজেই ফুল কমেচে। বকফুল এখন আসর রেখেছেন, নানা জাতের গোলাপ বসান হয়েছে। কিছুদিন পরেই খুব ফুল হবে। রাখাল ও গোপালদাদার গোলাপের উপর ভারি নজর।

পালং শাক আজকাল অনেক হয়েছে। মুলা হবে মন্দ নয়। এবার বর্ষার জন্য অন্য ফসল ভাল হলো না। বেগুন একেবারে বিগড়ে গেছে। কাঁচকলা মন্দ হচ্ছে না, তোমার দরুন কলা অনেক ফলেছে, এখনও পাকে নাই।

আমেরিকার খবর তুমি যেমন পাচ্ছ, আমরাও তেমনি। আমার ভালবাসা ও প্রণাম তুমি জানিবে। কানাই কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। ইতি—

দাস বাবুরাম

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কথোপকথন

স্বামী ধীরেশানন্দ

28.5 56

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ, শশী মহারাজ ও মহারাজ—এই তিন জনের নিকট আমি বিশেষ ঋণী। জীবনের দীর্ঘ ১২ বৎসর দক্ষিণদেশেই কেটেছে। শশী মহারাজ বলতেন, 'আমার দুটি বাসনা ছিল—মহারাজ ও শ্রীমাকে দক্ষিণদেশে আনা। …তা হয়ে গেছে, এবার আর শরীরের জন্য ভাবি না।' সর্দি, Bronchitis, T.B.—ডাক্তার দেখাবেন না, কারণ তাহলেই শুয়ে পড়তে হবে। মা এসেছেন। তাঁর ব্যবস্থাদি কে করবে? মার ওদেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থার strain-এই ওঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এল। ডাক্তার বলেছিল—'কি করেছেন? এ যে একেবারে advanced stage. আর দু'মাস বড়জোর বাঁচবেন।'…"

29.5.56

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী বললেন, "Madras Math-এ মহারাজ। দেবমাতার লেখা স্বামীজীর 'Inspired Talks' ছাপা হয়েছে। মহারাজের খুব উৎসাহ। সব কাগজে Review-র জন্য পাঠাতে বলছেন। মহারাজ বললেন শশী মহারাজকে, 'এ বইটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।' মহারাজই এ বই বিক্রীর সব ব্যবস্থা করেন। একদিন শশী মহারাজের সঙ্গে কথা হচ্ছে। মহারাজ বললেন, 'একখানা কপি মাদ্রাজের Hindu কাগজে পাঠাও। তাদের Review-র cutting সহ ঐ বই আবার Bombay-র কাগজে পাঠাও।' শশী মহারাজ বললেন, 'না, ওদের cutting-সহ পরে পাঠাবার কি দরকার? একসঙ্গেই সব জায়গায় পাঠানো হোক।' এ নিয়ে ৪।৫ মিনিট কথা-কাটাকাটি। মহারাজ একেবারে হঠাৎ গুম্ হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, 'আমি কি foolish, তোমাকে গেছি suggestion দিতে' ইত্যাদি।—Tense atmosphere. বোঝ ব্যাপার। কথাগুলি শশী মহারাজের ভিতরে কি রকম আঘাত করছে। শশী মহারাজও চুপ করে বসে আছেন। মহারাজ আমায় বললেন—'ওরে, পাঁজিটা নিয়ে আয় তো।' আমি যন্ত্রের মত এনে দিলাম। ৩।৪ দিন পর যাবার দিন ঠিক করলেন। আমাকে দিয়ে postcard আনিয়ে চিঠি লেখালেন। পুরী যাবেন। চিঠি Mount Road-এর পোস্ট অফিসে post করতে আদেশ দিলেন। শশী মহারাজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তিনি আমার হাত থেকে postcard নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আমি তো stunned! মহারাজ জিজ্ঞেস করলে কি বলব? ভাগ্যিস্ মহারাজ আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি। ১ দিন, ২ দিন, ৩ দিন যায়। মহারাজ শশী মহারাজের সঙ্গে কোন কথা বলেন না। শশী মহারাজ রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ করেন। হাত-জোড় করে মহারাজ ভাল আছেন কি না জিজ্ঞেস করেন। মহারাজের কোন কথা নেই। 3rd day-তে শশী মহারাজ একেবারে পা-জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মহারাজ, আমায় ক্ষমা করো; তোমার ইঙ্গিতমাত্রে কত শশী ভেসে যায়!'

মহারাজ বললেন, 'আরে শশী-ভাই, কি কচ্ছ। ওঠ ওঠ।'

মহারাজ জল হয়ে গেলেন। দুই গুরু-ভায়ে কি ভালবাসা।

.. ...

দেবমাতা বাজারে যাচ্ছেন মহারাজের জন্য তরকারী কিনতে। মহারাজ কচি ঢ্যাঁড়স ভালবাসতেন। দেবমাতা মঠের কাছেই এক বাড়িতে থাকতেন।

আমি বললাম, 'Get some lady's fingers.'

দেবমাতা তো হেসেই আকুল। আমি অপ্রস্তুত। মঠে এসে একটা ঢ্যাঁড়স নিয়ে তাকে দেখালুম। তখন আরও হাসি। আমি বললুম, 'মাদ্রাজীরা আমাকে এ জিনিসের এই ইংরেজীই তো শিখিয়েছে। রগড় আর কি। আমেরিকায় ওরা ঢ্যাঁড়সকে বলে okra.'

মঠে মহারাজ বৈকালে আমায় ডেকে নিতেন বেড়াবার সময়। কল্যাণেশ্বর-দর্শনে যাচ্ছেন। রাস্তার মাঝে একটা ইট-খণ্ড পড়ে আছে। মহারাজ পা-দিয়ে সেটা রাস্তার পাশে ফেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন দেখে আমি সেটা হাতে ধরে ফেলে দিলাম। মহারাজ বললেন, 'এটা ঠাকুরের কাছে শিখেছি।'—ওই ইটটাতে কত লোকের অসুবিধা হত তো।

কাশী থেকে মঠে এলাম—মাদ্রাজ যেতে হবে। আমি, গিরিজা ও খগেন মার কাছ থেকে গেরুয়া নিয়ে জয়রামবাটী থেকে হেঁটে কাশী গিয়েছিলাম। সকলেই শুনেছে তো। বুড়ো গোপালদা আমায় ছেলেমানুষ দেখে বললেন—'ওহ্। এ সেই ছেলেটি যে কাশী হেঁটে গিয়েছিল। এ কি পারবে শশী মহারাজের সঙ্গে থাকতে?' শশী মহারাজ খুব strict কিনা! সেখানে তামাক খাওয়া চলবে না জেনে Madras-এর আগের স্টেশন Basin Bridge-এ খুব সিগারেট খেয়ে নিয়ে মনকে বললাম—'ব্যস্, এই নাও শেষ।' Madras-এ মহারাজ যাবার পর গড়গড়া, তামাকের ছড়াছড়ি। আবার তামাক খাওয়া ধরি। পড়বি তো পড় একেবারে শশী মহারাজের সামনে—একেবারে হুঁকো হাতে। তখখুনি মহারাজের কাছে নালিশ—মহারাজ, এদেশে তামাক খাওয়া নিন্দনীয়। এই জিতেন তামাক খায়। ওকে মানা কর। ও চা কফি যা খুশি খাক, তামাক খেতে মানা কর।' মহারাজ চুপ করে শুনে বললেন—'তাতে কি হয়েছে? আমি তো ১২ বছর বয়স থেকেই তামাক খাই।'

শশী মহারাজের ইচ্ছা মহারাজকে দিয়ে ঠাকুরের পূজো করান। তাকে-তাকে আছেন। অমনি তো রাজি হবেন না। মহারাজ স্নান করে বুকে কাপড় জড়িয়ে আসছেন—শশী মহারাজ দু'হাত প্রসারিত করে রাস্তা আগলে মহারাজকে হাতজোড় করে বলছেন—'মহারাজ, আজ তোমায় ঠাকুরের পূজো করতে হবে; তুমি পূজো করলেই আমার এতদিনের পূজো করা সার্থক হবে।'

মহারাজ—আরে, না না। এ কি বিপদে ফেলছো বল দিকিন্, আমি মন্ত্র-তন্ত্র জানি না!

শশী মহারাজও ছাড়েন না। অবশেষে মহারাজ পূজোর ঘরে ঢুকলেন। আমরা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব। শশী মহারাজ দরজা টেনে দিলেন। মহারাজ মিনিট পনর পরে পূজো সেরে বেরিয়ে এলেন।

মহারাজের জন্য ফল আসত। ফুরিয়ে গেছে। বলাতে শশী মহারাজ বললেন—'ঠাকুরের ফল নাই? তাই থেকে দাও।' ঠাকুরের জিনিসের অগ্রভাগ কি করে দিই।

. শশী মহারাজ—তোরা সব মূর্খ। মহারাজ খেলেই ঠাকুরের খাওয়া হবে।

তাই করা হল। মহারাজের ওপর এঁদের কি শ্রদ্ধা।

ঠাকুরের ভোগ দিতেন পুরো আধঘণ্টা। ভোগ দিয়ে বাইরে হাতজোড় করে পাইচারি করতেন আর বলতেন—'প্রাণবল্লভ প্রভু তুমি আমার!' পুনঃ জোরে—'প্রাণবল্লভ প্রভু তুমি আমার।'

Madras Math-এ ঠাকুরের উৎসব। মহারাজ গোলমাল ভালবাসতেন না। তাঁকে আগেই খাইয়ে-দাইয়ে সামনের এক বাড়িতে দুপুরে বিশ্রামের জন্য রাখা হয়েছে। আমি সঙ্গে। তামাক-টামাক কখন কি লাগে। মহারাজ প্রায়ই অন্তর্মুখ থাকতেন। ঘরের মধ্যে বসে স্বগত কি বলছেন—'তখন কি এত জানতে পেরেছিলাম ··?' আমি ভাবছি আমায় ডাকছেন। বারান্দা থেকে ভিতরে গেলাম। বললাম, 'আমায় ডেকেছেন, মহারাজ?' মহারাজ বললেন, 'না।'

দলে দলে লোক—জজ-টজ কত লোক যাচ্ছে ঠাকুরের উৎসবে, তাই দেখে স্বগতোক্তি করছিলেন। মহারাজ বললেন—'কাশীপুর বাগানে দেহত্যাগের ৩।৪ দিন আগে ঠাকুর আমায় দেয়াল থেকে তাঁর সমাধিস্থ বসা-ফটো এনে দিতে বললেন।···আমি ফুলও নিয়ে এলুম। ঠাকুর ঐ ছবি মাথায় ঠেকালেন, বুকে ঠেকালেন, তারপর একটি একটি করে ফুল দিয়ে পূজো করলেন। বললেন—এ-ছবি ঘরে-ঘরে পূজো হবে। তাই দেখছি। তখন কি এত জানতে পেরেছিলাম?'

শশী মহারাজ কি সেবাই ঠাকুরের করেছিলেন। কাশীপুরে বালিশের ওপর বালিশ দিয়ে উঁচু করে ঠাকুর হেলান দিয়ে থাকতেন, আর শশী মহারাজ নিজের শরীর দিয়ে পেছনে ধরে রাখতেন। সেই অবস্থায় একহাতে পাখা দিয়ে ঠাকুরের মাথায় বাতাস করতেন। এমনি রাতের পর রাত।*

এসো মা

(গান—ভৈরবী)

স্বামী প্রেমেশানন্দ

শত কোটি শশী হাসে মায়ের চরণ-নখরে।
আলো করে কালরূপ হৃদয়-কন্দরে॥
প্রীতির সাগর উছলে নয়নে
উজ্জ্বল কপোল প্রসন্ন বয়ানে
(আমার) মনে হয় রাখি নয়নে নয়নে
বাঁধি' হৃদি-কারাগারে
তাঁরে চিরদিন তরে॥

বাহু বাঁধা পড়ে হৃদয় মাঝারে
কটি মনোহর হর-মন হরে
উরু চারু অতি, চরণ-যুগল
হৃদি বিয়াকুল করে
তাহে চাহে মিশিবারে॥

এসো এসো অয়ি ভুবনমোহিনি
সর্বস্ব আমার, আমার জননী
(তুমি) ফিরে চাও যদি, কৃপা কর যদি
পড়ুক অশনি শিরে
আমি স'ব সাধ করে॥

ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি-সঞ্চয়ন*

স্যর যদুনাথ সরকার

[অনুবাদক—ব্রঃ জ্ঞানচৈতন্য]

১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য হয়। তিনি তখন স্যর জগদীশ বোস ও ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বুদ্ধগয়াতে ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্র, শিল্প এবং লোক-কাহিনীর উপর তাঁর তীব্র সন্ধানী আলোকপাত আমাদের মুগ্ধ করে দিত; ডঃ ঠাকুরের কাছে উহা অধিক সমাদর লাভ করত। ভারতের ঐ সব মহান ঐতিহ্যে প্রকাশের ভঙ্গিমা কবির যদিও সুন্দর হত তবুও তিনি বলতেন যে, নিবেদিতার বাচনভঙ্গী মর্মস্পর্শী এবং বস্তুর নিগূঢ় রহস্য-প্রকাশের ক্ষমতা তাঁর অসীম। গোধূলি বেলায় আমরা বোধিদ্রুমতলে ধ্যানে বসতাম। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধ যে বোধিবৃক্ষমূলে বসে নির্বাণ লাভ করেছিলেন—এই গাছটি হল তারই মূল বংশধর। অনেকেই জানেন যে, সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ঐ গাছের একটি শাখা কেটে সিংহলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাজা টিসা সেখানে তা প্রোথিত করেন। বোধিবৃক্ষের অনতিদূরে বজ্রক্ষোদিত একখানি বড় মণ্ডলাকার পাথর দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে—উহা ইন্দ্র বুদ্ধকে দিয়েছিলেন। অনেকেই হয়ত ভগিনী নিবেদিতার বইগুলির উপর ঐ বজ্রপ্রতীকটি দেখে থাকবেন। ঐ প্রতীকটি দেখে নিবেদিতা বলেছিলেন: এই বজ্রপ্রতীকটি ভারতের জাতীয় প্রতীক হওয়া উচিত। এর তাৎপর্য হল—মানুষ যখন মানুষের সেবায় সব কিছু উৎসর্গ করে এবং ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্ম করে তখন সে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী হয়। ঐ প্রতীকটি যে কতখানি বীরত্বব্যঞ্জক নিবেদিতা তা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রতীকটি ভারত থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তিব্বতীয় বৌদ্ধদের মধ্যে উহার প্রচলন রয়েছে।

ঐ সময়ে আমরা নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে বের হতাম। একদিন সুজাতার প্রশ্ন উঠল। সুজাতা খুব সম্ভব উরুবেল গ্রামাধ্যক্ষের মেয়ে ছিল। একটা গাছের নীচে উপবিষ্ট শীর্ণকায় বুদ্ধকে সে স্বর্ণপাত্রে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করেছিল। কথা বলতে বলতে আমরা সেদিন (এখনকার) উরুবেল নামক গ্রামে পৌঁছালাম। নিবেদিতা বলে উঠলেন: এই এই সেই উরুবেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুজাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন এবং বললেন যে সুজাতা ছিল আদর্শ গৃহী, প্রকৃত সন্ন্যাসীর প্রয়োজন মেটানোই তার কর্তব্য। ভাবোচ্ছ্বাসে নিবেদিতা একতাল মাটি তুলে নিলেন এবং আবেগের সঙ্গে বললেন, "This, the home of Sujata, was sacred soil" অর্থাৎ এই হল সুজাতার জন্মভূমি—এ মাটি অতি পবিত্র।

বর্তমানে যে আন্দোলনের নাম হয়েছে Aggressive Hinduism, উহা নিবেদিতার দেওয়া। আমি aggressive শব্দটা পছন্দ করি না। আমি উহাকে Active Hinduism

---

* ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা থেকে অনূদিত।

বলতে ইচ্ছা করি। কারণ aggression-এর সঙ্গে খানিকটা জোর-জবরদস্তির ভাব রয়েছে। উহার অর্থ হচ্ছে—স্বার্থপরতা, নিয়মলঙ্ঘন এবং অপরকে ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করা, যেমন বর্তমানে (১৯৪৩ এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে) জাপান ও জার্মানী করছে। যাঁরা দর্শনশাস্ত্রাদি পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে সেখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—Passivism এবং Activism। Passivism-এর অর্থ হচ্ছে সব সময় আত্মপক্ষ বাঁচিয়ে চলা। আর হিন্দুধর্ম তাই করে আসছে, ইহা কখনও অপর জাতিদের ধর্মান্তরিত করেনি। Brother Douglas নামে একজন ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান মিশনারীকে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি ভাবতে পাঠান। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "যদুবাবু, অঙ্ক কষেই বলে দেওয়া যায় যে হিন্দুজাতি নিঃশেষ হয়ে যাবে, কারণ আপনারা আপনাদের সম্প্রদায়ে আগন্তুক ব্যক্তিদের স্থান দেন না।" একথা খুবই সত্য যে, যদি ধর্মান্তরিতকরণ না করা হয় এবং হিন্দুধর্ম যদি প্রগতিশীল না হয় তবে একশ-দেড়শ বছরের মধ্যে হিন্দুজাতির বিলুপ্তি ঘটবে। তাই নিবেদিতা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের নবজাগরণ এবং প্রগতিশীলতা। তিনি বুদ্ধকে হিন্দুধর্মের সংস্কারক বলে মনে করতেন, হিন্দুধর্মের বিরোধী কোন পৃথক সম্প্রদায়ের স্রষ্টা বলে মনে করতেন না। বৌদ্ধধর্মের একটা মুখ্য লক্ষ্য ছিল—হিন্দুসমাজ ও তার জীবন-ধারাকে সংশোধিত করা। বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ইউরোপ, চীন, জাপান এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়েছিল ধর্মান্তরিত-করণের উদ্দেশ্যে এবং সংশোধিত হিন্দুধর্ম-বিস্তারের জন্য। আমি এখানে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ অর্থ ছেড়ে ব্যাপক অর্থ ব্যবহার করছি।

বুদ্ধ এবং অশোক উভয়েই ধর্মের দ্বারা মানুষের নৈতিকতা এবং সত্যবাদিতার উপর জোর দিয়েছেন। যুগপ্রয়োজনে প্রতি যুগে একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়—যাকে বলে অবতার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ব্রাহ্মসমাজ ভারতীয় সংস্কারের পুরোধা হতে গিয়ে বঞ্চিত হল এবং দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস এলেন। শিখধর্ম হিন্দুধর্মের ভিতরে থেকে সংস্কারে যত্নবান হল। শিখদের ধর্মপুস্তক 'আদিগ্রন্থে' আমরা দেখতে পাই—তাতে গুরু নানকের উপদেশ রয়েছে পঞ্চাশ ভাগের কম এবং অর্ধেকের বেশী রয়েছে দাদূ কবীর প্রভৃতি হিন্দুসাধকদের উপদেশ। নিবেদিতা সব সময় জোরের সঙ্গেই বলতেন যে, বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুসংস্কারক; তাঁর প্রচারকেরা হিন্দুধর্মের পবিত্র নৈতিক দিকটাই প্রচার করেছেন। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন যে, অপরদের এমন কি খ্রীষ্টানদের কাছেও হিন্দুধর্মের কিছু দেবার আছে। হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা অধিক যুক্তিসিদ্ধ। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে যে, মুক্তি কেবলমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই আসবে। আজকাল বহু খ্রীষ্টান বিশ্বাস করে না যে, শয়তান একটা বাস্তব সত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি-বিশেষ। শয়তান হচ্ছে প্রতি হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির রূপক মাত্র। নিবেদিতা বলতে চাইতেন যে, হিন্দুধর্মের মৌলিক তত্ত্বগুলি থেকে—যা আমাদের কোন বিধিবদ্ধ সংকীর্ণ মতবাদকে জোর করে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে না—এ জগৎ বহু কিছু পেতে পারে। পূর্বোক্ত হিন্দুধর্ম কোন ধর্মমত বা মতবাদ নয়, এবং যে-কেউ এমন কি খ্রীষ্টানরাও উহা অভ্যাস করতে পারে। নিবেদিতা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং আচার-পদ্ধতির মৌলিক সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। অতীত ভারতের বস্তুনিচয় এবং চিন্তারাজি উল্লেখ করবার কালে তাঁর জীবন্ত

সহানুভূতি এবং অদ্ভুত বাচনভঙ্গী প্রকাশ পেত।

এর কিছু পরেই বাংলাদেশে ফিরে তিনি Kali the Mother-এর উপর বক্তৃতা শুরু করলেন। আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না যে, সে সময় ঐ বক্তৃতার নাম শুনলেই কলকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের মনে কী বিভীষিকার সঞ্চার হত। তাঁদের কালী সম্বন্ধে এক বিকট ধারণা ছিল। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এবং পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন অত্যধিক যুক্তিবাদী এবং একটু নাস্তিক গোছের লোক। তিনি বলেছিলেন—কারো কালীঘাটে গিয়ে কালীদর্শন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতার কালী শীর্ষক বক্তৃতার সভাপতি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এন. এন. ঘোষ প্রথমে রাজী হয়েছিলেন, পরে পিছিয়ে গেলেন। নির্ভীক নিবেদিতা বিনা সভাপতিতে আলবার্ট হলে বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি বললেন: মা কালী তমোনাশিনী, অসুরমর্দিনী। তিনি নৈতিক শক্তি ও সাহসের মূর্ত প্রতীক। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—পরমাত্মা কোন দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা লভ্য নন। এইভাবে নিবেদিতা কালীপূজার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের দিগ্‌দর্শন করলেন।

ভারতের বর্তমান অধঃপতন এবং দুর্বলতা দেখে নিবেদিতা দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন। তিনি চাইতেন ভারতীয়েরা জগৎসভায় সাহস ও সম্মানের সঙ্গে নিজেদের স্থান দখল করুক। তারা মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হোক। আমাদের দেশে এমন কতিপয় মহাপুরুষ সব সময়েই থাকবেন, যাঁরা ধ্যানধারণা এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিজেদের যোগসূত্র স্থাপন করবেন। এবং যাঁরা তা পারবেন না তাঁদের উচিত বৌদ্ধিক-জগতে নিত্যনূতন গবেষণা এবং মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বে দান করা। একমাত্র এই পথেই আমরা বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্য স্থান পেতে পারি। সুতরাং যখনই কেউ কোন ভারতীয় সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করতে এগিয়ে আসত, নিবেদিতা আনন্দে আটখানা হয়ে যেতেন। ঠিক এই কারণেই তিনি স্যর জে. সি বোসকে খুব সম্মান করতেন এবং নিজের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করতেন। একজন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছিলেন যে, ডঃ বোসই প্রথম পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে ভারতের স্থান নির্দিষ্ট করেন, যদিও পরবর্তীকালে রমণ প্রভৃতি মনীষীরা বহু মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। বর্তমান লেখক পারস্যভাষার পাণ্ডুলিপি থেকে ভারতের ইতিহাস-গবেষণার ব্যাপারে নিবেদিতার কাছ থেকে বহু উৎসাহ পেয়েছেন।

নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থস্থান দর্শন করেছেন। তিনি ঐ কালে নিষ্ঠাবান হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মত ক্লেশ ও নিয়ম পালন করতেন। তাঁর তীর্থমাহাত্ম্য-কীর্তনের ভঙ্গীটি ছিল সুন্দর ও সাবলীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ—হরিদ্বার ও প্রয়াগ, যেখানে দুটি করে স্রোতস্বিনীর মিলন ঘটেছে। এই পবিত্র সঙ্গমস্থানগুলিতে দাঁড়িয়ে স্বতই মনে হয় যে, যদিও উহাদের ধারাগুলি বিভিন্ন তবুও উহারা একত্র মিলিত হয়েছে এবং একই লক্ষ্যে—সেই সমুদ্রে পৌছুবে। সেরূপ আমাদের লক্ষ্য যদি ঈশ্বরানুভূতিই হয় তবে আমাদের সাধনপথ যত রকমেরই হোক না কেন, আমরা শেষে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরেই পৌছুব। সেজন্যই তো উত্তর-ভারতের তীর্থগুলি গঙ্গার তীরে এবং দক্ষিণ-ভারতের তীর্থগুলি গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর তীরে গড়ে উঠেছে। কই,

মাড়োয়ারের মরুভূমিতে তো তীর্থ গড়ে ওঠেনি।

কোন বস্তুর মাহাত্ম্য-নিরূপণে নিবেদিতার অপূর্ব দূরদর্শিতা এবং সন্ধানী শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। ভারতের অনেক পূজানুষ্ঠান, আচার-নিয়ম এবং চিরাচরিত প্রথাসমূহের অন্তর্নিহিত কারণগুলি আমরা ভুলে গেছি, কিছু আমরা অন্ধের মতো বিশ্বাস করি এবং কিছু আমরা পুরোহিতদের কথা মেনে নেই—কিন্তু ভগিনী ঐগুলিকে স্ব স্ব রঙে রাঙিয়ে, উহাদের গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব আরোপ করতেন এবং উহাদের যৌক্তিকতা দেখিয়ে দিতেন। প্রথম তিনি The Web of Indian Life বইখানি লেখেন এবং হিন্দুদের বিভিন্ন প্রথার উপর নবালোকপাত করেন। এই ধরনের তিনি অনেক বই লিখেছিলেন।

ভারতীয় শিল্পের তিনি একজন বড পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতীয়দের যে কোন মৌলিক গবেষণায় নিবেদিতার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। তিনি The Modern Review পত্রিকাতে শিল্পের উপর মন্তব্য লিখতেন এবং শরীর যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (১৯০৮-১১) বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' ছবি যখন The Modern Review-তে প্রকাশিত হল তখন নিবেদিতা খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি শিল্প-সমালোচনা লিখতেন এবং আমাদের তরুণ শিল্পীদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতেন। তিনি দক্ষ শিল্প-সমালোচক ছিলেন এবং ইউরোপের শিল্প আগাগোড়া পড়েছিলেন। ভারতীয় শিল্পের ব্যাপারে বেঙ্গল স্কুল তাঁর বহু সাহায্য পেয়েছে। অজন্তার চিত্রাবলী তাঁকে বিহ্বল করে দিত। রাহুল ও যশোধরার ছবিটি তার মধ্যে অন্যতম। কত যুগ পূর্বেকার সেই চরিত্র দুটি যশোধরা ও রাহুল! কিন্তু তাদের চোখ ও মুখের অভিব্যক্তি নিবেদিতার কাছে জীবন্ত বলে মনে হত। অজন্তার প্রাচীর-চিত্রাবলীর তিনি খুব প্রশংসা করতেন এবং বলতেন ওর ভিতর ভারতীয় শিল্পের যথার্থ ছাপ রয়েছে। এলিফাণ্টা গুহার ত্রিমূর্তিটিকে তিনি বলতেন, 'The Synthesis of Hinduism in Stone' অর্থাৎ একখণ্ড প্রস্তরে হিন্দুধর্মের সমন্বয়।

নিবেদিতা রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার চাইতেন। ভারতের মুক্তিফৌজের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন রাজনৈতিক ব্যাপারে বন্দী হন, তখন তাঁর জামিন হবার জন্য কেউই এগিয়ে আসতে সাহস পেল না। সকলে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল নিবেদিতা ডঃ দত্তের জামিন হবার জন্য কোর্টে উপস্থিত। ভারত-দরদী এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী নিবেদিতা বলতেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে লাহোরের রণজিৎ সিংহের একত্র মিলন হওয়া দরকার, অর্থাৎ ভারতের রাজনৈতিক পুনরভ্যুত্থান-ক্ষেত্রে বাংলার বুদ্ধিমত্তা এবং পাঞ্জাবের সাহসিকতা পাশাপাশি থাকা দরকার। তিনি জাতীয়তাবাদীদেরও জাতীয়তা-বাদী ছিলেন।

ভারতমাতাকে তিনি নিজের জন্মভূমিরূপেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সুন্দর মহান বৈশিষ্ট্যগুলির খুব প্রশংসা করতেন। এ ব্যাপারে লণ্ডনে একবার একটা ঘটনা ঘটে। ভারতে কর্তব্যরত একজন ইংরেজ অফিসারের স্ত্রী একটি সভায় ভারত-সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে বলেন, 'Immorality prevails in the harems of the Indian gentry.' অর্থাৎ ভারতের

ভদ্রসমাজের অন্দর-মহলে অনৈতিকতার ছড়াছড়ি রয়েছে। নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে বক্তার কথার যথার্থতা-প্রমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেন। বক্তা বেগতিক দেখে নিবেদিতার কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন যে তিনি উহা একজন ভারতীয় মিশনারীর কাছে শুনেছেন। নিজে না জেনে একটা জাতির উদ্দেশ্যে এরূপ অর্বাচীনের মত কথা বলায় নিবেদিতা তাঁকে খুব তিরস্কার করলেন।

পূর্বকথিত ঘটনাবলীর মধ্য থেকে আমরা পাই নিবেদিতা কতভাবে না ভারতের পুনরভ্যুত্থানের ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন। আমাদের সংস্কৃতির মূল্যায়ন, প্রগতিশীলতা এবং ধর্মান্তরিতকরণের ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্মের সংস্কারের চেষ্টা, গণজীবনের প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং আন্তরিকতালাভের জন্য আহ্বান এবং ভারতীয় শিল্পের মহিমাখ্যাপন প্রভৃতির দ্বারা ভারতের প্রতি বিভিন্নভাবে তিনি তাঁর মহান কর্তব্য সমাপন করে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার অকাল প্রয়াণে রামকৃষ্ণ মিশন যোগ্য বাগ্মীমুখর মুখ এবং শক্তিশালী লেখনী হারিয়েছে। আর ভারত হারিয়েছে এমন অনেক কিছু যা এখনও সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর।

কুণ্ঠা, লজ্জা, শঙ্কা

শ্রীকালিদাস রায়

নানা কুবচনে ক্লিন্ন অশুচি কণ্ঠ মোর
তব নাম তায় হে প্রভু গাহিতে কুণ্ঠা পাই।
নানা অপরাধে আবিল মলিন জীবন মোর
মার্জনা তায় হে প্রভু চাহিতে কুণ্ঠা পাই।
নানা চিন্তায় কুটিল চিত্তে শুচিতা নাই
সেথায় তোমায় হে প্রভু ডাকিতে লজ্জা পাই।
যেই শিরে বহি যত কুৎসিত পাপের ভার
তোমার চরণে সে শির রাখিতে লজ্জা পাই।
হিংসায় প্রতিহিংসায় মোর হৃদয়ের মাঝে শান্তি নাই
সে হৃদয়ে তোমা স্মরণ করিতে শঙ্কা পাই।
তোমার রুদ্রমুর্তির কথা ভাবিতে চিত্ত কাঁপিয়া উঠে
তোমারে তাহাতে বরণ করিতে শঙ্কা পাই।

ধর্ম ও সমাজে আনুষ্ঠানিকতা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

আনুষ্ঠানিকতার বিপক্ষে ও সপক্ষে অনন্তকাল ধরেই অনন্ত মতবাদ-আলোচনার প্রচার হয়েছে। আনুষ্ঠানিকতা নিরর্থক আচার-নিয়ম মাত্র মনে হয়েছে কারুর। কারুর মনে হয়েছে অন্যদিক দিয়ে, তাতে সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য আছে, রূপ-রুচিময়তা আছে, অতএব থাকে থাকুক। আবার কেউ ভেবেছেন এবং বলেছেন, রূপ-রুচির দিক দিয়ে নয়, নিরর্থকতার দিক বিচারও নয়, বলেছেন আরো এক গভীর সুন্দর কথা, যে কথাটী হল কথামৃতে ঠাকুরের উক্তি, "তোমরা নৈবেদ্য করবে, ফুল বিল্বপত্র বাছবে, পুষ্পপাত্র সাজাবে, চন্দন ঘষবে···মন ভালো থাকবে, মন ভালো হবে ।"

কেন? তা, ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলেননি, কোনো অনুষ্ঠানে কিছু সত্য থাক বা না থাক করা উচিত, কেননা করলে "লোকসংগ্রহ" (গীতার ভাষায়) হয়—এমন কথা উপদেশ দেননি। বলেননি যে, বিশ্বাস কর বা না কর,—'লোক দেখিয়ে' করে যেয়ো, শুধু আচার-নিয়ম পালন করার মতই করে যেয়ো। এসব কিছুই যুক্তি দেননি। শুধু মিষ্ট স্নেহে—স্মিত হেসে বলেছেন 'মন ভালো থাকবে' অর্থাৎ ভালো কাজ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তোমাদের মনকে ভাল দিকে নিয়ে যাবে। ঠাকুরের কথার টীকা 'টীকাভাষ্য' করি এমন ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আমি পড়ে আর নানা পূজার আচার-অনুষ্ঠানের জগতে মিশে বারে বারেই উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি—ঐ 'মন ভালো থাকার' পরম সত্য তাতে। এবং তার অর্থ গভীর।

দেখেছি আনুষ্ঠানিক কৌলিক পূজাবাড়ি দোল রাস দুর্গোৎসবের দেওয়ালীর দিনে সকল শ্রেণীর সব স্তরের মানুষের মিলে মিশে ঐ 'দেবকর্ম' নৈবেদ্য-সাজানো পুষ্পপাত্র-রচনা চন্দন-ঘষা আদি মঙ্গল কাজ করা, পরম প্রসন্নতায় মিশে যাওয়া। ঠাকুরের উক্তির সত্যতা—'মন ভালো থাকবে'।

এখন বলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজা আচার-অনুষ্ঠানের কথা। তাতেও তো দেখি, মানুষ আচার-আনুষ্ঠানিকতাহীন উৎসবে—মাঙ্গলিক উৎসবে ফুলফল, পবিত্র জল, আলো, অন্ধকার, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়, সাগর, পৃথিবী থেকে আনন্দ গ্রহণ না করে থাকতে পারে না। কে কোন্ পূজায় কোন্ প্রেমে, কোন্ ভালবাসাতে উপকরণ বাদ দিয়ে, অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে পূজা-প্রেম ভালবাসাকে আনন্দময়-রূপে গ্রহণ করতে পেরেছে?

সবাই জানেন হিন্দুদের যত আচার-বিচার শুচিতাবোধ বাইরে প্রবলভাবে আছে যেমন দেখা যাবে, তেমনি দেখা যাবে হিন্দুরা সবধর্মসমন্বয়ী জাতি, সবগ্রাহী, সর্বধর্মে শ্রদ্ধাবান, সর্বমতে সহিষ্ণু ও সংস্কারমুক্ত তাদের জাতি, স্বভাবে ও মনে। যে বৈশিষ্ট্য অনেক সম্প্রদায়েরই নেই। হয়ত থাকলেও তাঁরা নিজ সম্প্রদায়কে ভয় করে সেটা প্রকাশ করতে পারেন না। অথচ সবাই বলেন হিন্দুরা আনুষ্ঠানিকতাপ্রিয়, আবার নিয়ম মেনে চলা জাত, প্রতিমা-প্রতীক-উপাসক এক বিশাল ধর্মসম্প্রদায়। যদিও আচার-নিয়ম-অনুষ্ঠানহীন ধর্মকর্মের পথের নির্দেশও তাতে কম নেই। আবার ঠাকুরের কথাই

মনে পড়ে, দেখি "তাঁকে লাভ করলে কর্ম (অনুষ্ঠান ?) আপনিই ত্যাগ হয়ে যায়।"

সে কথা থাক। যা আমাদের মনে হচ্ছে, তা হচ্ছে যে, আনুষ্ঠানিকতাটার সবটাই কি দোষের ? মানুষ কি জীবনের কোনো জায়গায় আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিতে পেরেছে ? প্রতিদিনের মোটা স্থূল প্রয়োজনের আড়াল থেকে তার মানব মনটী থেকে থেকে প্রয়োজনকে ভুলে গিয়ে সরিয়ে রেখে বিনা-প্রয়োজনের বস্তুকে—আলো বাঁশী গানকে বর্ণে রংএ সুরে ফুলে গন্ধধূপদীপের সমারোহকে চারদিকে জড় করেছে। কখনো সুরভি সুবাস, কখনো সুন্দর, কখনো দীপাবলীতে প্রদীপে দীপে, কখনো রংএ বর্ণে তার ঘর সাজায়নি, মন ভোলায়নি ? কোন্ জাতি সম্প্রদায় অনুষ্ঠানকে বাদ দিতে পেরেছে তার জীবন থেকে, সমাজ থেকে ? সকল জাতেরই দেখি জন্মোৎসব বিবাহ মিলন-উৎসব নানা প্রয়োজনের উৎসবকে আর ধর্ম-উৎসবকেও, জীবনের 'দশকর্ম' সকল প্রয়োজনীয়কে অপ্রয়োজনীয়ের রংএ রংএ রঞ্জিত করেছে। কথা সুরে কাব্য গান রচনা করেছে। গান গেয়েছে। ধূপে দীপে সুরভিত আলোকিত করেছে। এও তো অনুষ্ঠান। এও তো প্রতীকময়তা মানব-মনের পূজার আকাঙ্ক্ষায়।

এবং এই আনুষ্ঠানিকতাকে বরণ করেনি এমন মানবজাতি নেই। সুসভ্য সভ্য অসভ্য বর্বর সব জাতিই, নিরীশ্বর একেশ্বরবাদী বহু দেববাদী সকলেই কোনো না কোনো রকমে আনুষ্ঠানিক। স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন, "দেওয়াল চুরি করে না। গরু মিথ্যা কথা বলে না।" আমরা সেই বাক্য অনুসরণ করেই বলতে পারি মানুষ পশু নয়, মানুষ জড় নয়, তার মন আছে, কল্পনা আছে, বিশ্ব-জগৎ-অতিরিক্ত এক আশ্চর্য জগৎ আছে—মনোজগৎ, প্রত্যহের প্রয়োজনকেই সে সবচেয়ে বড় মনে করেনি। এক মহা ও মহান্ অপ্রয়োজনীয়ের জগৎ আছে তার, সেই জগৎ হ'ল রূপরসগন্ধময় ঐশ্বর্যের আনন্দঘন মনোজগৎ—যা বারে বারে পৃথিবীর আকাশের রূপের সাগরে ডুবে যায়, ভেসে যায় সেই কোন্ জগন্নাথের জগন্ময়ের রূপকে দেখার জন্য—আচারে অনুষ্ঠানে পূজায় মিশিয়ে অনুভব করার জন্য। তাই তার ফুল চাই, আলোর প্রদীপ চাই, গান চাই, নৃত্য চাই। তার আনুষ্ঠানিকতা চাই।

দেখি বারে বারে মানব-সমাজে মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে; জগতের বিচিত্ররূপ-স্রষ্টাকে, অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে, রূপগুণহীন 'অরূপকে' কখনো সগুণ রূপময় প্রতীকেই আবার নির্গুণ ব্রহ্মরূপেও ধারণা করার কথা তাঁরা বলে গেছেন। বেদ উপনিষদের কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি সে রূপ দেখার, অনুভবে উপলব্ধিতে জানার চেষ্টার আজো শেষ হল না। অনামা মুনি ঋষি তপস্বী থেকে বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ চৈতন্য নানক কবীর রামমোহন রামকৃষ্ণ অবধি তা চলে এসেছে। তবু সেই 'অরূপের' রূপও নির্ণয় করা গেল না এবং 'রূপের' মহিমা-বর্ণনারও শেষ হল না।

আমাদের শুধু মনে হচ্ছে, যদি মানুষ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে আনুষ্ঠানিকতা রাখাতে 'আনুষ্ঠানিক' না হয়, দেবার্চনায় পূজা-অনুষ্ঠানে কেন আনুষ্ঠানিকতা নিন্দিত হবে ?

যাদের ধর্মে কোনো প্রতীক-উপাসনাই নিষিদ্ধ, তাঁদের ধর্মমন্দিরেও দেখি যে মহামানব ধর্মজিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলেন, প্রচার করেছিলেন, তাঁরই বেদনাদগ্ধ ক্রুশবিদ্ধ করুণাময় মূর্তি,

কোথাও জননীর কোলে মাতৃমূর্তির কোলে শিশু দেবপুত্র-মূর্তি।

মানুষ সেখানে ফুল এনেছে পূজায়। প্রদীপ জেলেছে পাদপীঠে। পয়সা এনেছে প্রণামীর। মানুষ যে-কোনো রকমেই নিজেকে কিছু অনুষ্ঠান দিয়ে প্রকাশ করতে চায়। সেখানে সে শুধু ঈশ্বরপুত্র বা মানবপুত্রকে কল্পনাতে ধ্যানই করেনি, নতজানু হয়ে আত্মনিবেদন ও প্রণাম করেছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মসজিদে কোনো প্রতীক নেই। কিন্তু তাঁদেরও অর্চনা করার উপাসনার সময়ে একটা বিশেষ 'দিক' আছে, আমাদের 'পূর্বাস্য', 'উত্তরাস্য' হয়ে পূজা-অর্চনা করার মত। অনুষ্ঠান নেই, কিন্তু অঙ্গশুদ্ধি আছে—বিশেষভাবে ওঠা, দাঁড়ানো, নতজানু হয়ে বসা, প্রণাম জানানোর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী আছে।

তা ছাড়াও অনুষ্ঠানহীন অনুষ্ঠান আছে, পীর সাহেবদেব আস্তানায় তাঁদের কবরখানায়। 'সত্যপীর সিন্নি'দান অর্চনায় হিন্দু মুসলমান দেবতার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে। আধি-ব্যাধি-ত্রিতাপ-দগ্ধ নরনারী হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে সেখানে আসেন। আমরাও গিয়েছি পীরসাহেবের কবরস্থলে, 'সাঁই'বাবার ('সাঁই' স্বামী প্রেমানন্দ) আস্তানায় সেখানে 'লোবান' (ধূপ), ময়ূর-পাখার চামর, সিন্নি অর্থাৎ মিষ্টান্ন রেউড়ী, বরফী পট্টবস্ত্রাবৃত কবরেব সামনে সকলে রাখেন। লোবান জেলে দেন। সাঁই ফকীর-সাহেব ময়ূর-পাখার চামর ঢুলিয়ে দেন কবরে, ঢুলিয়ে সেটা ভক্তদের গায়ে ছুঁইয়ে দেন। নিবেদন-করা প্রসাদ—থালা-ভরা মিষ্টান্ন, বরফী, জিলাপী, রেউড়ী আমরা সকলেই ঘরে নিয়ে আসি; এবং আশ্চর্য, হিন্দুরা তা প্রসাদ বলে গ্রহণ করেনও! ফকীর সাহেবের উপদেশ শোনেন। ঝাড়ানো নেন আধিব্যাধিতে। কবচ, মাদুলীও তৈরী করিয়ে নেন। আরো দেখি পরম শোকের প্রকাশ তাঁদের মহরমে, সেও তো আনুষ্ঠানিক শোক। শোককারীর পরিচ্ছদের ইমামী রং (সবুজ) পরার বিশেষ বিধি।

বুদ্ধদেব আনুষ্ঠানিকতা, যাগযজ্ঞ করার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধর্মবচন সংক্ষেপে চারটি বচনে ও চারটি 'মুদ্রায়' ব্যক্ত হয়েছে। 'মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা।' সর্বভূতে মৈত্রী, সর্বজীবে করুণা, সবার আনন্দে আনন্দ, কারুর দোষে উপেক্ষা। তখন তাঁদের কোনো মন্দির দেবালয় ছিল না। দেবতাও ছিলেন না। গ্রন্থে গ্রন্থে শিষ্যদের শ্রুতি ও স্মৃতিতে সঞ্চিত উপদেশ-সমষ্টিই ছিল শুধু।

কিন্তু তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর—কতদিন পরে বলা যায় না—তাঁকেই লোকে দেবতা করে নিলেন। মন্দিরে, মঠে, স্তূপে অর্চনা করছেন। সেখানেও ধূপ, দীপ, মালা, ফুল, ঘণ্টাবাদ্য, 'জপচক্র', 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'-মন্ত্র-উচ্চারণ, মালা ফুল ঘণ্টাবাদ্য, নাম গান অনুষ্ঠানের প্রথা রয়েছে! চিত্রে চিত্রে মঠ, গুহা, মন্দির সাজানো হয়েছে। তাঁরই কথাকীর্তি ইতিহাসের চিত্রলেখায়—শিল্প-কারুকাজে বন-অরণ্যময় পাহাড়ের নিভৃত গুহা-মন্দিরে মানুষ তার শিল্পী মনের আনুষ্ঠানিক মানস পূজা চিত্রিত করেছে রূপের অক্ষরে।

এও একরকম নীরব শিল্পকলাময় পূজারই অনুষ্ঠান। শাঁখ ঘণ্টা নাই বাজুক, নৈবেদ্য-সম্ভার নাই সাজাক কেউ, কিন্তু এই মানস পূজার প্রতিমা তো তাঁরই—প্রতীক-উপাসনা—কীর্তি-কাহিনীর আর ইতিহাসের। সঙ্গে সঙ্গে এলো বিরাট বিশাল ধ্যানমূর্তি তাঁরই। বুদ্ধগয়ায় প্রাচীরে প্রাচীরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ মূর্তির শেষ নেই। তিনিই ঈশ্বর, তিনিই বুদ্ধদেব।

বিহার থেকে গান্ধার অতিক্রম করেও সে মূর্তি চীন, জাপান, বর্মায়।

তারপর কতদিন পরে এলেন গুরু নানক। সব মানলেন—রাম হ্যায় ভগবান। আবার 'ঈশ্বর এক' বলে গেলেন। বললেন, তিনি অরূপ—প্রতিমাতে নেই, মন্দিরে নেই। তিনি বিশ্বময়, তিনি জগন্ময়, তিনি মনোময়। নিজেকে বললেন, "নিরঙ্কারী নানক" (নিরাকারী)।

তবু গড়ে উঠল সোনার মন্দির চতুর্থ গুরু রামদাসের আমলেই। সোনার কাজে মীনা-কারে কাজে রূপে সমৃদ্ধ জলাশয়-মধ্যবর্তী আশ্চর্য সুন্দর মন্দির। আরও আশ্চর্য সেখানে হল বেদী। তাতে প্রতিমা নয় কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হলেন গ্রন্থাবলী। গুরুদের উপদেশামৃত কথামৃত। 'গ্রন্থসাহেব' নামে।

তিনিই প্রতিমা? তিনিই দেবতা? তিনিই ঈশ্বর? হ্যাঁ, তিনি গুরু এবং গ্রন্থরূপে—গুরুরূপে ঈশ্বর।

তারপর আরম্ভ হল মানুষের মনের ভিতরের ভক্তসভা—সেবক-শিষ্যের পূজার অনুষ্ঠান। স্বর্ণখচিত মন্দির হল। ভোগ এলো কড়া প্রসাদের (মোহনভোগ, হালুয়া)। ফুল, ফুলের মালা সাজানো হল বেদীর উপর, "গ্রন্থ সাহেবের" গায়ের উপর। চামর দিয়ে ব্যজন করা হল। প্রণামী পড়ল থালা ভরে। আর হল অপূর্ব সঙ্গীত দিয়ে স্তুতি অর্চনা অহোরাত্র ধরে। এক গায়কদল চলে যান, আবার নতুন গায়ক এসে গান, ভজনে সঙ্গীতে অন্তরের নৈবেদ্য নিবেদন করে যান। গ্রন্থসাহেবই দেবতার বা ভগবানের প্রতীক হয়েছেন যেন। ঐ গ্রন্থসাহেবকেই ভক্তমণ্ডলী গড় হয়ে প্রণাম করে যায় দলে দলে। 'মানসিক' জানায় আধিব্যাধিতে।

তারপর দেখি ব্রাহ্ম-সমাজের অর্চনা-উপাসনার বেদী। সেখানেও মালা-ফুল, ধূপ-সুরভির সুবাস ভরে ওঠে। বেদীর ওপর আচার্য বসেন ধর্মপ্রবক্তা—ব্যাখ্যাকর্তা। দেবতা নন। কিন্তু যেন দেবত্বেরই অংশ, রূপ! দেবতার মতই বিশেষ সম্ভ্রম, পূজা-প্রণামের অধিকারী তিনিও তো সেসময় সেদিনের মত!

কোথায় ঈশ্বর? কোথায় দেবতা? তাঁরা আচার্যরা বাণীময় বাণীরূপ ঈশ্বরকে অনুভব করছেন। তাঁরই বাণীময় প্রকাশ সকলে শুনছেন।

যে ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না, যিনি সর্বব্যাপী তাই অনধিগম্য; যিনি সর্বময় কোনো এক জায়গায় তাঁকে পাই না। তাঁর বাণীময় স্তব করি। আর তাতেই তাঁকে আমাদের সীমার মধ্যে চাই, রূপে-রসে-আনন্দের মাঝে চাই। তাই তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট ফুলে ফলে রংএ রূপে সাজাতে চাই অনুষ্ঠান করে। 'তিনি আছেন' জেনেও জানাতে চাই বার বার—তিনি 'রূপে' আছেন; 'অরূপে' আছেন; 'সীমায়' আছেন, 'অসীমে'ও আছেন। ঠাকুরের উক্তিতে, তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি আরো কি যে কে বলতে পারবে। "একসেরী ঘটীতে কি পাঁচসের দুধ ধরে?" (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে) "মানুষ তাঁকে কি করে বুঝবে?"

রবীন্দ্র-সাহিত্যেও শিব-অন্নপূর্ণা হর-গৌরীর ভাবের কত ভাবে যে কত ব্যাখ্যা পাই! সরস্বতী বাণী বীণাপাণির লক্ষ্মী কমলাসনার রূপক ব্যাখ্যাও কম নেই। আনুষ্ঠানিকতা না মানা হোক, কিন্তু আনুষ্ঠানিক যুগযুগান্তের পৌরাণিক রূপ কবির কবিমানস কতরূপে 'রূপায়িত' করেছে, উপমায় তুলনায় নব নব ভঙ্গীতে রূপেতে। কবি পৃথিবীর বিচিত্র রূপের সঙ্গে পুরাণ-ইতিহাসের ও বিচিত্র দেবদেবীর

'রূপক' রূপ দেখেছেন। পরম শ্রদ্ধায় যে কল্পনা বা আদর্শকে সাহিত্যে গ্রহণ করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন। হরগৌরী লক্ষ্মী সরস্বতী থেকে শ্রীরাধাও ভানু সিংহের পদাবলী 'বৈষ্ণব কবিতাতে,' তাঁর সাহিত্যে নানা জায়গায় সব দেবদেবীই প্রবন্ধ-কাব্যে কত ভাবের উপমা-ঐশ্বর্যে ছড়িয়ে আছেন।

যদিও অনেক সময়ে তাঁর লেখায় পড়ি, অনুষ্ঠানের আচারের প্রাণহীনতার কথা। আবার দেখি, আনুষ্ঠানিকতার রূপও তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তাও বড় কম নয়। 'জাভাযাত্রী'তে কবি এক জায়গায় বলেছেন, 'উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনই সমস্ত জাতের লোককে আপনিই সংযত করে রেখেছে' ওতেই অন্যত্র দেখি 'এই রকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দ-মিলনটি কি কল্যাণময়।...' এই মিলনের বিচিত্র অবয়ব। বহু লোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে তো সেইখানেই আসীন দেখি।... 'আনন্দকে সুন্দরকে নানা অনুষ্ঠানে নানা মূর্তিতে প্রকাশ করা চাই।· এবারে যাঁর শ্রাদ্ধে আমরা এসেছি তাঁরা দেবত্ব পেয়েছেন বলে আত্মীয়েরা স্থির করেছে তাই এত ঘটা...। কেননা আধুনিক কাল তার কাটারী হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব করার জন্য; তার একমাত্র উৎসাহ-উপকরণ বাহুল্যের দিকে।' (জাভাযাত্রী)

আচার-অনুষ্ঠান মনকে নিয়ে যায় তাঁর দিকে। কোন্ পথ দিয়ে, কিসের ভেতর দিয়ে তিনি টেনে নিয়ে যান আমাদের তাঁর কাছে, তা তিনিই জানেন। যা কিছু মনকে তাঁর দিকে টানে, তাই-ই শুভকর।

"ওঁ অব্যাবৃত-ভজনাৎ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার ভবন-দ্বারে মোর মন করী
বাঁধা থাক, হে ঈশ্বর, দিবস শর্বরী
অনুক্ষণ ভাবনার ভজনা-রজ্জুতে!
আমার হৃদয়-পাত্র ভক্তির মধুতে
তবে তো ভরিবে, প্রভু, কানায় কানায়
তুমি যদি নিশিদিন থাকো চেতনায়।
প্রেমের কাঙাল আমি; সে প্রেম পরম—
যে-প্রেমে রয়েছে পরিতৃপ্তি অনুপম।
আছে সিদ্ধি, অমৃতত্ব! সে-ভালোবাসায়
ধনী হ'লে মন আর কিছু নাহি চায়।
বাতাসেরই মতো চিত্ত কারও বশ নয়।
কৃপা হ'লে তবে তাঁতে সব মন হয়!
তাই তো চরণে তব নিয়েছি শরণ!
এ মন তোমাতে রাখো পতিতপাবন!

মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী সন্তোষানন্দ

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। পূজ্যপাদ ধীরানন্দ স্বামী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে একদিন বললেন পরমারাধ্য রাজা মহারাজের নিকট দীক্ষার প্রার্থনা জানাতে। আমি বললাম যে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণই আমার অভিপ্রায়। তাতে তিনি আর কালবিলম্ব না করে শীঘ্র শীঘ্র দীক্ষা নেবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের দেশে যাবার উপদেশ দিলেন। বললেন—আমতা পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে যেন তাঁর দেশ জয়রামবাটীতে যাই। প্রস্তাবটি আমার খুবই ভাল লাগলো। আমতা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের দেশ ২৪।২৫ মাইল রাস্তা। এই দীর্ঘ ও অজানা পথ অপরিচিত লোকের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়ার অভিনবত্ব আমাকে খুবই উৎসাহিত করলো। কবে যাবো তার দিন তখনও স্থির হয়নি, এমন সময় একদিন মঠে গেছি। ইতিমধ্যে রায়পুর থেকে এসে এক ভদ্রলোক বোধ হয় মঠেই ছিলেন। তিনি সেখানে সরকারী চাকরি করতেন, জেলার (jailor) ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছিল ষাটের কাছাকাছি। তিনি সরকারী চাকরির নির্দিষ্ট সময় শেষ করে ১০০৲ টাকা মাসিক পেন্সনসহ কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীপুত্র সবই ছিল। ছেলেরাও সব তখন নানা কাজে নিযুক্ত। ভদ্রলোকের সঙ্কল্প—তিনি শেষ জীবন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিরূপে কাটাবেন। যা হোক, তিনি মঠে আসায় কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, তাকে দীক্ষার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠাবেন। কিন্তু এক অসুবিধা হলো, ভদ্রলোক বাংলা জানেন না। এই রকম যখন অবস্থা তখন পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ পরমারাধ্য মহাপুরুষজীকে আমার জয়রামবাটী যাবার অভিপ্রায় জানিয়ে দিলেন। পূর্বেই বলেছি, আমি সেদিন মঠে গিয়েছিলাম। তখন বিকেল হয়ে গেছে। সহসা একজন এসে আমাকে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর আদেশ জানালেন যে, তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। শুনেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন স্বামীজীর ঘরের ঠিক পশ্চিমের ঘরে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি জয়রামবাটী যাবে ?" আমি সম্মতি জানাতে বললেন, "বেশ হয়েছে। ঐ রায়পুরীও যাবে। ও তো বাংলা বোঝে না, তুমি সঙ্গে থাকলে কোন অসুবিধা হবে না। তুমি দোভাষীর কাজ করবে।" কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ, ভদ্রলোক কোন্ রাস্তায় যাবেন ?" শুনেই মহাপুরুষজী হেসে বললেন, "ওকে বিষ্ণুপুর দিয়ে যেতে হবে।" আমি তো প্রমাদ গুণলাম। কারণ ও-রাস্তায় যেতে হলে যত খরচ লাগবে, তত টাকা আমার ছিল না। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ নিজেই আমার চিন্তাগুলি দেখতে পেলেন. বলে উঠলেন, "আরে, তাতো বটেই। তুমি স্টুডেণ্ট। কোথায় পাবে টাকা ? তোমার খরচা তাকে দিতে হবে। ও এমন সুবিধা কোথায় পাবে ? তুমি তাকে বলগে যে তোমার খরচা তাকেই দিতে হবে।" আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহাপুরুষ মহারাজ সন্ন্যাসী; তিনি যে কথা নির্বিকারে বলতে পারেন, আমি তা কি করে বলি ? আমি তখন যুবক, পড়ি। আমার আত্মসম্মান,

চক্ষুলজ্জা সবই যে আছে। পুনরায় তিনি বলে উঠলেন, "তুমি যাও, তাকে গিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" তাই করা গেল। নীচে গিয়ে সে ভদ্রলোককে বলতেই তিনি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট চলে গেলেন, এবং অল্প পরেই ফিরে এসে জানালেন যে, আমি তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের দেশে গেলে তিনি আনন্দের সঙ্গে আমার খরচ দেবেন; যাবার দিন ঠিক হয়ে গেল, এবং গোমো প্যাসেঞ্জারে যথাসময়ে রওনা হওয়া গেল।

কোয়ালপাড়া পৌছে শুনলাম শ্রীশ্রীমা সেখানেই আছেন। শুনে খুবই আনন্দ হলো। কিন্তু পরেই শুনলাম, তাঁর জ্বর। একটু পরেই আমাদের ডাক পড়লো মাকে প্রণাম করবার জন্য। গিয়ে দেখলাম তিনি একটি তক্তাপোশের উপরে শুয়ে আছেন। ঘরে ঢোকা নিষেধ, তাই বারান্দা থেকে চৌকাঠে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। তারপর পূজনীয় বরদা মহারাজের (স্বামী ঈশানানন্দের) সঙ্গে মায়ের বাড়ি জয়রামবাটী থেকে ঘুরে আসা গেল। এসেই কিন্তু শুনলাম, মা আদেশ করেছেন, 'কলকাতা থেকে যে-সব ছেলেরা এসেছে, তারা যেন প্রসাদ পেয়ে সেই দিনই ফিরে যায়।' এদিকে পূজনীয় বরদা মহারাজ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানকার মোহন্ত কেশব মহারাজকে বলতে যে আমি ওখানে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করব ও পাড়ায় ভিক্ষে করে খাবো। কেশব মহারাজ (স্বামী কেশবানন্দ) বললেন যে, ওখানে থাকলে মায়ের দয়ায় দুটি ভাতের জন্য ভিক্ষে করার দরকার হবে না। কিন্তু মা যে আদেশ করেছেন সকলকে সেইদিনেই ফিরে যেতে। কাজেই ফিরে আসতে হলো, আমারও অবশ্য ফিরে আসাই ছিল অভিপ্রায়, কেবল বরদা মহারাজের কথা রক্ষা করার জন্যই ঐরূপ বলেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে খুব শীঘ্রই একদিন মঠে গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজ পূর্বেই আমাদের ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসার সংবাদ শুনেছিলেন। এখন আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমিও যতটা জানতাম সব তাঁকে নিবেদন করে সেইদিনই যে ফিরে এলাম, তাও তাঁকে জানালাম। সব শুনে তিনি বললেন, "আরে, বেশ করেছ, বেশ করেছ।" তাঁর ঐরূপ কথায় উৎসাহিত হয়ে বলতে আরম্ভ করলাম, "মহারাজ, দেখলাম সে-দেশে পুকুরগুলি সব পানায় ভর্তি, লোকগুলো ময়লা-রং, পেটফোলা, মাটি পর্যন্ত কালো ফাটল-ধরা।" আর যায় কোথা। সহসা ধমক দিয়ে উঠলেন, "তুমি কোন্ বিলেত থেকে এসেছ হে? আমাদের বাংলাদেশে সবই এই রকম। লোকগুলো কালো, মাটি কালো! তোমার দেশ কোথায় হে? ছেলের রমক দেখ না, যেন বিলেত থেকে এলেন।" আমি তো ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলাম। আর কিছু করারও উপায় নাই। লোকের বা স্থানের দোষ দেখা বা নিন্দা করা, এই তো লাগে ভাল। সে যে অদোষদর্শী মহর্ষিদের দৃষ্টিতে দোষাবহ, তা জানবো কেমন করে? যা হোক, কিছু পরে তিনি থামলেন; আমি তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবতে লাগলাম, এঁরা যে কি দেখেন, কি ভাবেন, তা আমাদের বুদ্ধির একেবারেই অগম্য।...

বোধ হয় এর একদিন কি দুদিন পরেই মঠে গেছি। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "মহারাজ মায়ের খবর সব শুনতে চাচ্ছেন। তাঁকে গিয়ে সব বল।" একথা হচ্ছিল দ্বিতলে তাঁর ঘরে বসে। পূর্বোক্ত কথা

কটি বলেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন যেখানে পরমারাধ্য রাজা মহারাজ দ্বিতলের পূর্ব দিকের বারান্দায় একটি আরাম কেদারায় বসেছিলেন, সেইখানে। এর দু-এক দিন আগেই যে আমার কোয়ালপাড়া সম্বন্ধে নিন্দাবাদ শুনে আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তা এঁর মন থেকে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে, তার চিহ্নমাত্রও নাই। যা হোক, ঐ বারান্দায় উপস্থিত হয়েই বললেন, "রাজা, এই ছেলেটি গিয়েছিল মায়ের দেশে, এর কাছে সব শুনতে পার।" তিনি একবার আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, "আপনিই তো শুনেছেন, ওতেই হবে।" মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে ফিরে গেলেন, আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এইবার রাজা মহারাজ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলেন, "মায়ের ওখানে গিয়েছিলি?" আমি বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" "তবে চলে এলি কেন? সেখানে থেকে তাঁর সেবা করতে হয়। এমন opportunity কখনও ছাড়ে? ত্যাখ্, দেখি কি করলি? জয়রামবাটী গিয়েছিলি?" বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" "কামারপুকুর গিয়েছিলি?"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন শ্রীশ্রীপ্রভুর মানসপুত্র। উপায় নেই, বলতে হলো, "আজ্ঞে, না।" আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, "অত দূরে গিয়ে ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন না করে ফিরে এলি? এমনও কখনও করে?" মাথাটি হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না। বুঝতে বাকি রইল না যে কোয়ালপাড়ায় যখন পূজনীয় কেশব মহারাজকে বলেছিলাম যে, আমি ওখানে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করতে চাই, সেকথা যে আন্তরিক ছিল না, আমার মনের এই জুয়োচুরি যুগাবতারের মানসপুত্র শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের দৃষ্টিতে স্পষ্ট ধরা পড়ে গেছে!

আর একদিনের কথা। কোন্ সাল ঠিক মনে নাই। হয়তো ১৯১৮-১৯ হবে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পায়ের কাছে বসে আছি; এমন সময় আর একটি ছেলে তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলো, 'মহারাজ, আমার রাগ হলে একেবারে জ্ঞানহারা হয়ে যাই। তখন আমার মাকে অতি কঠোর ভাষায় গালমন্দ করি। পরে আমার অনুতাপ হয়। কি করি, মহারাজ?' অতি সহানুভূতির সুরে মহাপুরুষজী বলছেন, "মাকে কটূক্তি করা তো ভাল নয়। তবে এটা যে দোষ, তা তুমি যখন বুঝতে পেরেছ, তখন ওটা কেটে যাবে। মনে মনে খুব দৃঢ় সঙ্কল্প করবে যে আর কখনও অমন করবে না। আর যদি না সামলাতে পেরে ঐ রকম করেই ফেল, তবে রাগ থেমে যাবার পর মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। বলবে, 'মা, আমি রাগের মাথায় সামলাতে না পেরে তোমাকে কটুকথা বলেছি, আমায় ক্ষমা কর।'" ছেলেটি তারপর এক মজার প্রশ্ন করে বসলো, "মহারাজ, শুনেছি স্বামীজী ঠাকুরকে দেখতে পেতেন, আপনারা কি দেখতে পান?" অহংবুদ্ধিশূন্য মহাপুরুষজী জবাব দিচ্ছেন, "হ্যাঁ, স্বামীজী দেখতে পেতেন। আমরা তা · অবশ্য আমরা সে আমরা দেখ এসব প্রশ্ন করতে নেই।" ছেলেটি আবার প্রশ্ন করলো, "মহারাজ, গুরু তো একজনই থাকবেন, তাঁকে তো আর বদলাতে নেই?" "না গুরু বদলাতে নেই"—বললেন মহাপুরুষজী। ছেলেটি তখন বললো, "মহারাজ, এ জন্মে যিনি আমার গুরু হবেন, জন্মান্তরে তাঁকে আবার চিনবো কি করে?" প্রথম জবাব এলো, "সচ্চিদানন্দই একমাত্র গুরু, আবার কে গুরু?" এ কথা বলেই বললেন, "গুরুকরণ হয়ে গেলে আবার জন্মাবে কেন?" সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করে ছেলেটি বিদায় গ্রহণ করলো।

১৯১৮ সালের ঘটনা; শুনেছি পূজনীয় স্বামী নির্বেদানন্দজীর মুখে। তখন বর্তমান স্টুডেন্টস্ হোমের নাম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। এর আগে পূজনীয় মহাপুরুষজী অনাদি মহারাজকে বলেছিলেন, তিনি যে কাজটি আরম্ভ করেছেন অর্থাৎ ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, তাতে লেগে থাকতে। কিন্তু অনাদি মহারাজের (স্বামী নির্বেদানন্দজীর) প্রায়ই মনে হতো ঐ আশ্রম ত্যাগ করে গিয়ে মঠে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। আর ঐ আশ্রমে ফিরবেন না, এই রকম দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে একদিন সকালে তিনি মঠে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর প্রথমেই দেখা হলো শ্রীশ্রীরাজা মহারাজজীর সঙ্গে। তিনি বসেছিলেন মঠবাড়ীর নীচু তলায়, খুব সম্ভবতঃ উঠোনে আমগাছতলায় একটি চেয়ারের উপর। তাঁকে প্রণাম করেই অনাদি মহারাজ বললেন, "আমি মঠে থাকবো।" নিতান্তই অসহায় বালকের মতো যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র বললেন, "বাবা, আমি তো এখানকার কেউ নই।" হাতজোড় করে উপরের দিকে দেখিয়ে বললেন, "ঐ ওখানে মহাপুরুষ বসে আছেন, তাঁকে গিয়ে বল।" শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের অতি সরল অতুলনীয় বালকভাব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! তাঁকে স্থূল শরীরে দর্শন করার সৌভাগ্য যাঁদের ঘটেছে তাঁরাই এই ব্রজগোপালের বাল-মধুর ভাবের কিছু কিছু আস্বাদ লাভ করেছেন। যা হোক, অনাদি মহারাজ (তখন সুরেন বাবু) তাঁর এই উক্তিকে অলঙ্ঘনীয় আদেশরূপে গ্রহণ করে বিনা বাক্যব্যয়ে উপরে গেলেন পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। সেখানে তাঁকে প্রণাম করেই নিবেদন করলেন নিজের অভিপ্রায়। শুনেই মহাপুরুষজী অতি স্নেহপূর্ণ বাক্যে বোঝাতে আরম্ভ করলেন অধুনা-সুপরিচিত স্টুডেন্টস্ হোমের স্থাপয়িতা ও বাহককে। তিনি বললেন, "যে কাজ আরম্ভ করেছ, তাতেই লেগে থাক। এতে বহুর কল্যাণ হবে, তোমারও মঙ্গল। এটি স্বামীজীর খুবই অভিপ্রেত কাজ। এতদিন লোকাভাবে আরম্ভ করা যায়নি। এখন যখন ঠাকুরের ইচ্ছায় তুমি এ কাজটি আরম্ভ করেছ, তখন ওতেই লেগে থাক। আর ওটি তোমারও ধাতের উপযোগী কাজ; এতে তোমারও কল্যাণ হবে। তুমি তো আমাদেরই আছ! বেলুড় মঠ কি এই মঠের চতুঃসীমানার মধ্যে আবদ্ধ? তুমি এখানে এলে যে এখানেই থাকতে পারবে তার কি মানে আছে? তোমাকে মাদ্রাজ পাঠাতে পারি, আমেরিকায় পাঠাতে পারি, বা আর কোথায়ও পাঠাতে পারি। এ তো মঠের অতি কাছে কলকাতায় আছ, যখন খুশি আসতে পার। আর মঠে এলে তোমাকে যে কাজ দেওয়া হবে সেটি তোমার উপযোগী নাও হতে পারে। তার চেয়ে নিজের ধাত-মতো একটি কাজ বেছে নিয়েছ, এতে তোমার কল্যাণই হবে। আর আমি বলছি, এ কাজে তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের কখনও বাধা ঘটবে না। আর ধর, যদিই বা এতে তোমার spiritual progress (আধ্যাত্মিক উন্নতি) কিছুটা hamper করে (বাধাপ্রাপ্ত হয়), আমি বলছি করবে না, তবুও যদিই বা কিছুটা hamper করে, আমি বলছি করবে না, তবুও স্বামীজীর জন্য কি একটা life sacrifice (জীবন উৎসর্গ) করতে পারবে না?" আবেগ-ভরা কণ্ঠের এই উক্তিতে ভবিষ্যৎ স্বামী নির্বেদানন্দজীর সকল সঙ্কল্প ভেসে গেল; বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, "পারবো, মহারাজ।" ইতিমধ্যে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজজী এসে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকে বলতে আরম্ভ

করলেন, "টেনে নিন না, মশায়, টেনে নিন না! ওর তো সময় হয়েছে।" মৃদুহাস্যে মহাপুরুষজী জবাব দিলেন, "ও একটা ভাল কাজ করছে, অনেক ছেলে মানুষ হবে।" "ও একা মানুষ হলে লাখ মানুষ হবে",—বললেন মঠ ও মিশনের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী। বলেই আবার বললেন, "ওর তো দেখছি দীক্ষা হয় নাই, দীক্ষাটা দিয়ে দিন না।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "আমি তো দেই না, তুমি দিয়ে থাক, তুমিই দাও।" রাজা মহারাজ বললেন, "দেন না বলেই তো বলছি, অনেক জমিয়েছেন, কিছু খরচ করুন।" এবারও পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "না, ও তুমিই দিয়ে থাক; তুমিই দেবে।" "তা আপনার আদেশ হলেই আমি লেগে যেতে পারি।"—করজোড়ে হাসতে হাসতে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন পরমারাধ্য রাজা মহারাজ। তাঁর কাছ থেকে এর কয়েক দিন পরেই মন্ত্রদীক্ষা লাভ করলেন অনাদি মহারাজ।...

১৯১৮ র বোধ হয় আগস্ট মাসে আমি ছাত্র হিসাবে যোগ দেই এই স্টুডেণ্টস্ হোমে। আগেই বলেছি তখন এর নাম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। আর এটি ছিল একটি দ্বিতল ভাড়া বাড়ীতে, ঠিকানা ১১৯।১, কর্পোরেশন স্ট্রীট (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড)। তখন আমি ছাত্র পড়াতাম। আর আশ্রম চলতো অনাদি মহারাজ যে কোচিং ক্লাস করতেন, তার আয়ে। পূজনীয় ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজের আদেশে আমি ছাত্র পড়িয়ে যে টাকা পেতাম, তা আশ্রমে জমা না দিয়ে জমিয়ে রাখতাম অন্যত্র। সব শুনে পূজনীয় অনাদি মহারাজ (তখনও সুরেনবাবু) বললেন—সব কথা পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে জানিয়ে এ বিষয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করাই শ্রেয়। এর পরে যেদিন মঠে যাই সেদিন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে সব কথা বলে কি করা কর্তব্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "না, ভরত, জ্ঞান তো ঠিক বলে নাই। ও তো গেরস্তদের কথা। তুমি আশ্রমে আছ। যা পেলে এসে আশ্রমে দিয়ে দিলে। তারপরে যা হবার হবে। জ্ঞানের ও-কথা ঠিক না। জ্ঞান ঠিক বলে নাই। না, ও-ঠিক না; তুমি যা পাবে সব আশ্রমে দিয়ে দেবে। জমাতে যাবে কেন? ও-কথা ঠিক না।"

আর একটি ঘটনা; খুব সম্ভবতঃ ১৯২৮ সাল। পরমারাধ্য বাবুরাম মহারাজের ভাণ্ডারার দিন বিকেল। গঙ্গার ধারে লন্-এ একটি ছোট সভাও হয়ে গেছে। অন্যান্য বক্তার মধ্যে স্বামী কমলেশ্বরানন্দও কিছু বললেন। বলতে বলতে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "ললিত বাবুরাম মহারাজের কথা বলতে আরম্ভ করলে আর নিজেকে সামলাতে পারে না।" তারপরেই বলতে আরম্ভ করলেন—বাম হাতটি মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূ সঙ্কুচিত, যেন প্রত্যেকটি কথার উপর জোর দিতে চাচ্ছেন—"গাজীপুরে স্বামীজীর ভেতর তখন দারুণ বিরহ চলছে। ঠাকুরের অদর্শনে বিরহের জ্বালায় তাঁর ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে! ঠাকুরের অদর্শন তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। বাবুরামদা গিয়ে তাঁকে ওখান থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। স্বামীজীর ভেতরে সেই দারুণ বিরহ চলছে। তিনি বলছেন, 'তুই যা এখান থেকে। তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর নাই। তিনি নির্বাণ নিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে নিয়েই তো

তোদের সঙ্গে সম্পর্ক। তিনি তো আর নাই। তোদের সকলের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। তুই চলে যা।' বাবুরামদা ভাবছেন যে, পওহারী বাবার পাল্লায় পড়েই স্বামীজী ঐ রকম বলছেন। তাঁকে একবার কোন গতিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারলেই তাঁর এ ভাবটা কেটে যাবে। তাঁকে ওখান থেকে নিয়ে আসবার জন্য তিনি তাই প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্বামীজীর ভেতর তখন সেই দারুণ বিরহ চলছে। তাই তিনি বলছেন, 'ঠাকুর আর নাই, তিনি নির্বাণ নিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে নিয়েই তোদের সঙ্গে সম্পর্ক। তিনি তো আর নাই। তোদের সঙ্গেও আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। তুই চলে যা।' কিছুতে স্বামীজীকে টলাতে না পেরে বাবুরামদা কাঁদতে কাঁদতে চলে এলেন। আর সেইদিন রাত্রেই ঠাকুর স্বামীজীকে দর্শন দিলেন, আর তাঁর ভেতরটা শান্তিতে ভরপুর হয়ে গেল। তার পরেই তিনি গাজীপুর থেকে চলে এলেন।" সব শুনে ললিত মহারাজ বললেন, "তবে তো প্রেমেরই জয় হোল।" একটু হেসে মহাপুরুষজী বললেন, "তা তো বটেই।"

*

খুব সম্ভবতঃ ১৯১৯ র স্বামীজীর তিথিপূজা। সকালেই মঠে গেছি। সেদিন স্বামীজীর ঘরের সামনে একজন পাহারায় থাকতে হয়। ঐ কাজের ভার পড়লো আমার ওপরে। স্বামীজীর ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, একটু পরে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ দয়াঘন-মূর্তি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই হাত নেড়ে নেড়ে হাসিমুখে বলতে আরম্ভ করলেন, "এ রামজীকা মন্দির হ্যায়, আউর ভরত পাহারা হ্যায়। রামজীকা মন্দির হ্যায়, আউর ভরত পাহারা হ্যায়।" বারে বারেই কথাটি বলতে লাগলেন, কত কথাই বলতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বেরুল না। তাঁর প্রতিটি কথায় অহেতুক করুণা বর্ষার বারিধারার মতো ঝরে পড়ছিল নিতান্তই অযাচিত ভাবে আমার শিরে। বাক্‌শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজ ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

খানিক পরে প্রসাদের ঘণ্টা পড়লো। তখন সকাল ন'টা—সাড়ে ন'টা হবে। এ প্রসাদের অর্থ সকলের জলখাবার। একটু পরেই পূজনীয় মহাপুরুষজী তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বললেন—"প্রসাদের ঘণ্টা পড়লো। তুমি গেলে না?" বললাম, "যাব'খন।" মনে মনে জানি আমার একজন বদলী না এলে যাব না। যা হোক, একটু পরে তিনি আবার এসে হাজির—"কই, তুমি প্রসাদ পেতে গেলে না?" এবার উত্তর দিলাম, "মহারাজ, সে যাওয়া যাবে এখন।" তিনি চলে গেলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন, হাতে একটি বাটি, আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও। স্বামীজীর প্রসাদ।" একটু সঙ্কোচমিশ্রিত হাসিমুখে বললেন, "আমি একটু খেয়েছি, তা স্বামীজীর প্রসাদ, ওতে দোষ হবে না।" দুই হাত পেতে পাত্রটি নিলাম, মনে হোল—'স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানি না, তবে প্রত্যক্ষ পাচ্ছি আপনার প্রসাদ।' এরপর আরও একদিন প্রসাদ দিয়েছিলেন। কোন্ বছর মনে নেই। তিনি পরমারাধ্য রাজা মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ করে ফিরেছেন। একদিন সকালে মঠে গেছি। তাঁকে প্রণাম করতেই বললেন, "দেখ তো, ঐখানে একটা কাপের মধ্যে কি আছে? আমি খানিকটা খেয়েছি, বাকিটা খেয়ে ফেল।" দেখলাম এক

বড় কাপের প্রায় তিনভাগ ভর্তি দুধ আর ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট। বললেন, "এইখানে দাঁড়িয়েই খাও।" আমি একটু ইতস্ততঃ করছিলাম, তাঁর ব্যবহারের জিনিস। কিন্তু কিছুই উপায় রইল না, আবার বললেন, "খাও, খেয়ে কাপ ধুয়ে রেখে যাও।" তাই করলাম। কি যে সুস্বাদ লাগলো, তা আর কি বলবো।

১৯২০ সাল, বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষায় কিন্তু হলাম অকৃতকার্য। পাস ফেল যাই হোক, আর যে পড়বো না তা আগেই ঠিক করেছিলাম। মঠে তো গেছি। সেখানে গিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে জিজ্ঞাসা করলেন, "পরীক্ষায় ফেল করেছ?" আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "কিসে ফেল করলে?"—তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন। বললাম, "আজ্ঞে, অঙ্কে।" "তা ওতে আর কি হয়েছে? ওর জন্য মন খারাপ কোরো না, আর একটা বছর তো। এক বছর পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। ও পাস করে যাবে'খন। পরীক্ষায় পাস ফেল, ও সামান্য একটুতেই হয়ে যায়। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না, আর একটা বছর পড়। ও সামান্য পরীক্ষা, পাস করে যাবে'খন।" আমি তো পড়লাম মহামুশকিলে, মনে মনে ঠিক করেছি আর পড়বো না। এদিকে এঁর এই দ্বিধাহীন আদেশ। কি করা যায়? সহসা প্রশ্ন করলেন, "কি, পড়বে তো?" "আজ্ঞে, আমার আর পড়ার ইচ্ছা নেই"—জানালাম অবনত মস্তকে। "বেশ, সেই ভাল"—এলো সোৎসাহ উত্তর। "ও যারা চাকরি-বাকরি করবে তাদের জন্য একটা ডিগ্রীর প্রয়োজন। আমাদের একটু ইংরেজী আর একটু সংস্কৃত জানলেই হলো। তাতে তো তুমি পাস করেছ। অঙ্কে আমাদের কি প্রয়োজন? সেই ভাল।" হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল।

এই বছরই একদিন পূজনীয় অনাদি মহারাজ এসে জানালেন যে, সেবার মঠের দুর্গাপূজায় আমি হয়েছি নির্বাচিত পূজক। প্রথমটা তো ভয়ই লাগলো। যা হোক, আর যখন উপায় নেই তখন পুজোর কয়েকদিন আগেই মঠে চলে গেলাম। মঠে প্রচলিত পূজাপদ্ধতি যদ্দূর সম্ভব আয়ত্ত করবার জন্য। একদিন প্রায় সন্ধ্যেবেলা, স্বামীজীর একখানা চটি ইংরেজী বই, বোধ হয় চিকাগো বক্তৃতা, মঠের সামনের পোস্তার উপর পায়চারি করতে করতে পড়ছিলাম। গঙ্গার দিকের বেঞ্চিতেই বসেছিলেন মহাপুরুষ মহারাজ। তিনি একজনকে বললেন, "ও ছোকরাকে ডাকো তো।" কাছে আসতেই বললেন, "এবার কি দুর্গাপূজা হবে ইংরেজীতে?" লজ্জায় মরে গেলাম। যা হোক পূজা আরম্ভ হচ্ছে। আমি বিলক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম; একে মঠের দুর্গাপূজা, তায় সন্ধিপূজা ছিল প্রায় শেষ রাত্রে। শেষ পর্যন্ত পারবো কি না কে জানে? বোধনের জন্য আগে থেকেই একটি বেলের ডাল এনে মঠের ঠাকুরঘরের সামনের বারাণ্ডায় রাখা হয়েছিল। সন্ধ্যারতির পরে সেইখানে যখন চলেছি অধিবাসের জন্য, ঠাকুরের ঘরের দরজায় সিঁড়ির মুখে দেখা হলো মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে। অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি করলেন আশীর্বাদ। আমারও সকল সঙ্কোচ ঘুচে গেল। তাঁরই অমোঘ আশীর্বাদে পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। মহানবমীর দিন হোম ও দক্ষিণান্ত হবার পর গিয়ে খেতে বসা গেল। ক'দিন হবিষ্যির পর আজ সবই খাওয়া যায়। ভাণ্ডারী প্রভৃতি সকলেই, বিশেষ করে দেবেন দা, আমাকে ভাল করে খাওয়াবার জন্যে খুবই ব্যস্ত। খাইয়ে হিসেবে কোনকালেই আমার নাম ছিল না। কাজেই প্রথম থেকেই তাঁদের যতই অনুরোধ

জানাই তাঁরাও ততই আমাকে আরও বেশী করে দিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ ও দেবীর ভোগে যা কিছু উঠেছিল সবই তাঁরা চাচ্ছিলেন আমাকে খাওয়াতে। ক্রমে মাছ ভাজা এলো। সহসা দেবেনদা একটা বেশ বড পোনামাছ ভাজা এনে ফেলে দিলেন আমার থালার উপর। আমি একেবারে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছি। এত খাওয়া যায় কি করে। তখন জানি ঠাকুরের প্রসাদ কিছু ফেলতে নাই। কিন্তু ও আমার সাধ্যির অতীত। এমন সময় লাঠিটি হাতে করে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে মহাপুরুষজী। বললেন, "খাচ্ছিস্?" পরে তাঁর নজর পড়লো থালার উপরে—"অত ভাজা।" অসহায়ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "মহারাজ, বারণ সত্ত্বেও এরা সব দিয়ে দিলেন। এতো তো খেতে পারবো না।" অভয় দিয়ে বললেন, "তুই যা পারিস খা, আর সব পড়ে থাক।" আমিও যেন একটা মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম।

দশমীর দিন সকালে দর্পণ-বিসর্জনের পরেই প্রণাম করলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে। তিনি বসেছিলেন মঠের বারাণ্ডায় পশ্চিম দিকের ছোট বেঞ্চিখানার ওপর। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ মণ্ডপস্থ দেবীর মুখের ওপরে। একটু হাসিভরা মুখে বললেন, "মন্তরটি পড়া হলো, আর দেবীর মুখের ভাবও বদলে গেল।" এই ঋষির দৃষ্টি আমরা কোথায় পাবো? আমাদের দৃষ্টিতে ছিল প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে এবং দর্পণ-বিসর্জনের অন্তে একই মূর্তি। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর বলার পরেও কোন তফাত দেখতে পাওয়া গেল না। যাই হোক, আশীর্বাদ করলেন খুবই। [ক্রমশঃ]

'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'

শ্রীগুরুদাস দাশ

বিশ্বের ঈশ্বরী যিনি, যিনি মহামায়া,
যিনি সর্ব মনোবৃত্তি, যিনি স্নেহ দয়া,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁরে সদা করে ধ্যান,
সেই মাতৃশক্তি করে সবা'র কল্যাণ।

নানা রূপে নানা ভাবে সবে পূজে যাঁরে,
তাঁর কৃপা বিনা মুক্তি নাহিক সংসারে।
সে-মায়েরই পূজা মোরা করি প্রতিমায়,
হের তাঁরে সর্বভূতে, হের প্রতি মায়।

দক্ষিণেশ্বরে*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদক : অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

'যাদের অন্তর তোমাতে সমাহিত, তুমি তাদের পরিপূর্ণ শান্তিতে ঘিরে থাকো।'—ঈশা।

তিনি তো সেই বিরাট শূন্যতায় নেই। এই পৃথিবীর একটি বাড়ীর ছাদে বসে হৃদয় সেই অনন্ত আকাশের বুকের গহনে চেয়ে দেখেছিল, আর মহামৌনের উপলব্ধিতে শিহরিত হয়ে উঠেছিল।

তারপর তিনি এলেন, অন্তরের মধ্য থেকে যাঁর বাণী মৃদুমাধুর্যে ধ্বনিত হ'লো, 'সেই নির্জনে চলে এসো, শান্ত হয়ে ব'সো। হয়তো সেইখানেই তুমি তাঁর বাণী শুনতে পাবে।' সেই প্রত্যক্ষ দেবদূত আমার,—যাঁর হাতে রয়েছে শুভ্র লিলির স্তবক, যাঁর চরণতলে বিসর্পিত অগ্নিশিখা. যাঁর দুই চোখে চোখ রাখলে মনে হয় ঝরে পড়ছে এক দুরন্ত জলপ্রপাত—তাঁর অনুসরণ করে এ হৃদয় নানা বিচিত্র পথ পেরিয়ে প্রভুর উদ্যানে এসে পৌছুল। সব শ্রান্তি জুড়িয়ে গেল।

সেই উদ্যানের মাঝখানটিতে জেগে আছে আছে পঞ্চবটী—যার তলায় ঠাকুর ধ্যানে বসতেন, প্রার্থনা করতেন, আর সমাধির আনন্দে ডুবে যেতেন। বিক্ষোভে বেদনায় প্রশ্নসঙ্কুল হৃদয় সেইখানটিতে এসে নৈঃশব্দ্যের সাদর আহ্বান শুনতে পেয়ে অপেক্ষারত।

পাশে কলবাহিনী গঙ্গা। ভরা পালে বিরাট বিরাট নৌকা ছুটে চলেছে। নীচে হাওয়ায় খেলা করছে শুকনো পাতা, ইঁদুরের পায়ের শব্দ হচ্ছে পাতার মর্মরধ্বনিতে। আর উর্ধ্বে পঞ্চবটীর শাখায় পাতায় ঝরে পড়ছে চাঁদের আলোর বন্যা, কম্পমান পত্রপল্লব ও শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে বিন্দু বিন্দু চন্দ্রালোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে বেদীর উপরে।

শুধু কেবল গাছের আর নদীর আর নিঃসঙ্গ নিশাচরদের মৃদুভাষণ শোনা যায়…'ঠাকুর। যাদের সঙ্গে আমি এইখানটিতে আসতাম, তারা আজ অনুপস্থিত। অনেক দূর দেশ থেকে তা'রা এই স্থানটির কথা মনে করে। আজ আমি তোমার চরণে তাদের স্মৃতি নিবেদন করবো।'

তিনি বললেন, 'বেশ তো। যারা আমার, তারা তো চিরকালই আমার। তাদের সব ভার আমি বহন করি, প্রতিটি পদক্ষেপ আমিই পরিচালিত করি, সবশেষে তাদের বাঞ্ছিত লোকে এনে উপনীত করি। সন্তান আমার। আজ তো একজন নয়, তিনজনই উপস্থিত। একথা নিশ্চিত জেনো।'

'ঠাকুর। যাদের আমি ভালবাসি তারা আজ বেদনার শৃঙ্খলে বন্দী। শঙ্কিত হৃদয়ে তারা পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে। জীবনের স্বাদ একেবারে তিক্ত, তাই একজনের আকাঙ্ক্ষা—মৃত্যু। আর একজনের পক্ষে জীবন এত দুর্বহ যে আমরাই তার সব যন্ত্রণার অবসান

* Kali The Mother গ্রন্থের 'A Visit to Dakshineswar' রচনার অনুবাদ। দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে নিবেদিতার হৃদয়-সম্বন্ধের এক অপূর্ব কাব্যরূপ এই মানস-ভ্রমাকাহিনী।

চাই। ঠাকুর! তোমার কাছে প্রার্থনা, এদের একটু স্বস্তি তুমি অনুভব করতে দাও, নয়তো সেই আলো দাও যে আলোর কাছে কোনো সুখের কামনাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।'

স্মিতহাস্যে তিনি সব শুনছিলেন।

'এমন তো হতে পারে না, ঠাকুর, যে মানুষের জন্য আমরা কিছুই করতে পারবো না। ওরা যারা প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি, মৃত্যুর করাল দৃষ্টির সামনে কম্পমান, আসন্ন প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনায় বিদীর্ণহৃদয়, ওরা যারা বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন পঙ্কশয্যায় শুয়ে থাকে, নিরন্ন, নিরক্ষর, নিপীড়িত—তাদের দুঃখের কোন অংশই আমরা গ্রহণ করতে পারবো না—এ তো হতেই পারে না, ঠাকুর! তুমি তো কখনো একথা বলতে পারো না যে, সংগ্রামের প্রচেষ্টার কোন মূল্যই নেই!'

'কী তোমার প্রয়োজন?'

'যদি কিছুই নাও করতে পারি, তাহলে শুধু ওদের বিপদের অংশভাগী হওয়া। শুধু ওদের ললাটে সান্ত্বনার স্পর্শটুকু রাখা—ওদের দাসী হ'বার অধিকারটুকু পাওয়া, ওরা যখন যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত, তখন ওদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে না করা—শুধু এইটুকুই আমার প্রার্থনা।'

'এই কী সব?'

না।—সত্যিকার সেবার অধিকার যদি পাই সেই তো পরম আশীর্বাদ। যদি সত্যই কারো সহায়তা করতে পারি, তবে তো পেয়ালা ভরে উঠবে কানায় কানায়। তবু যদি এ অধিকার নাও মেলে, আমাদের সেই নিঃস্বার্থ কর্মের স্বাধীনতা দাও। দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজনের গণ্ডী থেকে আমাদের মুক্ত ক'রো। যেন সর্বস্ব দিতে পারি, উৎসর্গ করতে পারি, আর জীবন-মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন চিত্তে তোমাতেই মগ্ন হয়ে থাকতে পারি।'

দীর্ঘ নীরবতা।

অবশেষে প্রশান্ত অথচ মৃদু ভর্ৎসনায় সেই দিব্যকণ্ঠ ধ্বনিত হ'লো—'ওরে আমার অবুঝ সন্তানেরা! তোদের কী এখনও একথা বলে দিতে হ'বে যে তোদের অন্তরের এই যে ভালো-বাসা সেও আমারই ভালোবাসা? যা একান্ত আমারই দান তাই নিয়ে কী তোরা আমারই সাথে দাবীদাওয়ার পালায় নামবি? দুঃখ-বেদনার বন্ধুর পথে আমিই তো সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করি। অভীঃ! অভীঃ। এগিয়ে যা। পথ আপনি দেখা দেবে। আমার ভালোবাসা কী কখনো বিফল হ'তে পারে?···তোর এই ভালোবাসা কী সেই অনন্ত প্রেমেরই মৃদুতম কম্পনমাত্র নয়? মনে রাখিস, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। এ সংগ্রাম হয়তো তোরই কর্মফল। কেমন করে এর শেষ হবে, সেকথা জিজ্ঞাসার তোর কোন অধিকার নেই। তোর ভালোবাসা তো আমার ভালোবাসার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। আসলে এরা একই সত্য।' কথাগুলি যখন মিলিয়ে গেল, তখন শ্রোতৃহৃদয়ের সামনে মাতৃময় এক মহাবিশ্ব দেখা দিল,—সে এমন এক ভালোবাসা, মানবীমায়েদের ভালোবাসা যার মৃদুতম আভাসমাত্র,—দুঃখী অথবা সুখী সব জীবনই তখন বিশ্বজননীর সন্তানদের নিয়ে চিরন্তন খেলার লীলা।

*   *   *

সেইখানটিতে হাত রেখে প্রভু তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

শ্রীশ্রীমহারাজকে কবে যে প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম তাহা সঠিক মনে নাই। মনে হয় ১৯১৮ সনে। কিছুকাল রাজনৈতিক নির্যাতন ভোগ করিবার পর অসমাপ্ত পাঠ সমাপ্ত করিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। নিকটে বরাহনগরে এক ভগ্নী থাকিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইতাম ও গঙ্গা পার হইয়া মধ্যে মধ্যে মঠে গিয়া প্রাচীন সাধুগণকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। ইহারই মধ্যে এক দিন বোধ হয় শ্রীশ্রীমহারাজের প্রথম পুণ্য দর্শন পাইযাছিলাম। সেই দিন আমার সঙ্গে আমার সমবয়সী একটি আত্মীয় বন্ধুও ছিলেন। প্রাচীন সাধুগণকে দিবার জন্য সঙ্গে সামান্য কিছু ফলও লইয়া গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ মঠের গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় একটি বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন। পাশে যতদূর মনে পড়ে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও নিকটে কয়েকজন অল্পবয়স্ক সাধু—সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীমহারাজের সেবক। আমরা শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া ফলগুলি তাঁহার নিকট রাখিবামাত্র তিনি জনৈক সেবককে ঐসকল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য লইয়া যাইতে বলিলেন। আমরা একটু অবাক হইলাম, কেননা পূর্বে কোন প্রাচীন সাধুকে এইরূপ কিছু দিলে তিনি উহা পৃথক করিয়া রাখিয়া দিতে বলিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে উহা আর পাঠাইতেন না। শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট উহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। তখন কারণ কিছু বুঝি নাই। পরে শুনিযাছিলাম তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র। পিতাপুত্রের অভেদজ্ঞানে হয়ত তিনি এইরূপ আচরণ করিয়া থাকিবেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীমহারাজের আর একটি আচরণে আমি আরও বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি আমার সঙ্গী যুবক বন্ধুটিকে তাহার নাম, ধাম ও অন্যান্য পরিচয় অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আমার দিকে তাকাইযাই 'তোকে তো চিনি' বলিলেন, অন্য কথা জিজ্ঞাসাই করিলেন না। অবাক হইলাম, কেননা ঐদিনই তো আমি প্রথম আসিয়াছি! পরে শুনিয়াছি, ভবিষ্যতে তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন এরূপ অপর কাহাকেও কাহাকেও তিনি এইভাবেই সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে শরীর সারাইবার জন্য আমায় ৺কাশী যাইতে হইল। সেখানে হঠাৎ আমার পুরানো দুইটি বন্ধুর সহিত দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখা। তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে সেখানের রামকৃষ্ণ মিশনে যাইতে হইল ও তাঁহাদেরই আগ্রহে সেখানে পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর (হরি মহারাজের) দর্শন পাইলাম।

ধর্মবিষয়ে আমি তখন অতিশয় অজ্ঞ ও সংশয়-বাদী। ধর্মের তত্ত্বাদি জানিবার জন্যই দর্শন-শাস্ত্র লইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু কলেজাদিতে পাশ্চাত্য দর্শন যতই পড়িতে লাগিলাম ততই মনে হইল, ভগবান শুধু তর্কযুক্তির বিষয়, তাঁহাকে কেহ কখনও দর্শন করেন নাই, দেখিতাম, কোন দার্শনিক সুচিন্তিত যুক্তিবলে ভগবানের অস্তিত্ব স্থাপন করিতেছেন, আবার অপর একজন দার্শনিক অনুরূপ যুক্তি দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়া দিতেছেন। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইত ভগবান কখনই দর্শনগম্য নহেন, তিনি তর্কযুক্তিরই বিষয়। তবে

তাঁহাকে চিন্তা করিলে মনে কিছু নৈতিক শক্তি আসিতে পারে, এই মাত্র।

মনের এইরূপ সংশয়াকুল অবস্থায় পূজ্যপাদ হরি মহারাজের দর্শন পাইলাম। তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে মনের সংশয় ধীরে ধীরে দূর হইতে লাগিল। এখন মনে হইতে লাগিল ভগবান শুধু তর্কযুক্তির বিষয় নন। উপযুক্ত সাধনভজনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করাও সম্ভব। তাঁহাকে অনেকে দর্শন করিয়াছেন। সাধন-ভজন ও সদ্গুরুর কৃপা হইলে আমরাও তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব। পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে একদিন উহা নিবেদন করিলাম, এবং দীক্ষা দিয়া তিনি যাহাতে আমাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন তজ্জন্য মনের আকূতি জানাইলাম। কিন্তু তিনি গম্ভীর হইয়া স্মিত-হাস্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আমরা তো কাহাকেও দীক্ষা দিই না।" অত্যন্ত বিষণ্ণ ও হতচিত্ত হইয়া সেখানেই বসিয়া রহিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি পরক্ষণেই কৃপাপূর্বক বলিলেন, "তোমাকে আমরা এমন একজনের নিকট পাঠাইব, যিনি আধ্যাত্মিকতায় আমাদের সকলের অপেক্ষা অনেক উচ্চে।"

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। পাঠ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা মন হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তবুও পূজ্যপাদ হরি মহারাজের আদেশে পাঠ সমাপ্ত করিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহারই নির্দেশে একদিন সকালে বাগবাজার বলরাম-মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিলাম। দেখিলাম সিঁড়ির পাশে একটি ছোট ঘরে একটি ক্ষুদ্র তক্তাপোশের উপর শ্রীশ্রীমহারাজ বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে অল্প কয়েকজন ভক্ত। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া আমিও তাঁহাদের পাশে বসিলাম। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। অবাক হইয়া শুনিলাম উঁহাদেরই দু'জন ভক্ত শ্রীশ্রীমহারাজের সামনেই উত্তেজিতভাবে যুদ্ধের অগ্রগতির সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। একজন জার্মানদের পক্ষ লইয়াছেন, অপরজন ইংরেজদের। মহারাজ স্মিতহাস্যে তাঁহার গড়গড়ায় টান দিতে দিতে মাঝে মাঝে তাঁহাদের আলোচনায় যোগ দিতেছেন।

প্রায় আধঘণ্টা সময় এইরূপে কাটিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, "এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি? ইঁহার কাছেই কি পূজনীয় হরি মহারাজ আমাকে পাঠাইয়াছেন? ইনি কি করিয়া তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতায় বড় হইলেন!" জানি না আমার মনের কথা শ্রীশ্রীমহারাজ বুঝিলেন কি না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম সেই ক্ষুদ্র ঘরের আবহাওয়া ইতোমধ্যেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণও আর কোন বাক্যালাপ না করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের কথা নিবেদন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িয়া রাস্তার দিকের সরু বারাণ্ডায় গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্বের মূর্তি আর নাই। আমি চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, কোন্ এক অজ্ঞাত ভয় ও বিস্ময় যেন আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে! এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ বোধহয় কৃপা করিয়াই মহারাজ আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। আমিও ভয়-মিশ্রিত বিস্ময়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মহারাজ! পূজনীয় হরি মহারাজ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

আর কোন কথাই আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। মহারাজ সস্নেহে আমার দিকে তাকাইয়া শুধু বলিলেন, "বাবা, ভগবানই একমাত্র সত্য।" জানি না কি ভাবে তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মনে অনেক শান্তি লইয়া আমার পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠ আর সমাপ্ত হইল না। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরম কৃপায় কয়েকমাস পরে মঠে যোগদান করিলাম। আমার ন্যায় আরও কয়েকজন যুবক সেই সময় মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরম স্নেহে আমরা বর্ধিত হইতে লাগিলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) মাঝে মাঝে মঠে আসিতেন। পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজও দীর্ঘ ২৫ বৎসর আমেরিকা-প্রবাসের পর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ইঁহাদের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মঠ তখন ভরপুর। আমাদের আর কিছু চাহিবার আছে বলিয়া তখন মনে হইত না। ইঁহাদের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া যথাসাধ্য আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একদিন একজন সাধু ত্রস্তব্যস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, "ওহে, শুনেছ মহারাজ আসছেন? এইবার তোমরা মঠের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্কের দর্শন পাইবে।" তাঁহার কথার অর্থ তখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। মহারাজকে ইতঃপূর্বে দুইবার তো দেখিয়াছি। সুতরাং তাঁহা হইতে আর নূতন কি পাইব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখিলাম নানাদিক হইতে সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া মঠে সমাগত হইতেছেন। তাঁহাদের সকলের মুখেই এক কথা—'মহারাজ আসিতেছেন।' তাঁহার নিকট হইতে না জানি তাঁহারা কি মহারত্নের সন্ধান পাইবেন।

যথাসময়ে মহারাজ আসিয়া পৌঁছিলেন। সত্যসত্যই দেখিলাম মঠের আবহাওয়া একেবারে বদলাইয়া গেল। পূর্বে উহা স্বর্গীয় ছিল, এখন উহা অধিকতর দিব্যভাবপূর্ণ হইল। কতক্ষণে মহারাজের দর্শন পাইবেন, কতক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে দুই-একটি কথা শুনিতে পাইবেন, ইহার জন্য সকলেই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। শুধু সাধু বা ভক্ত নন, নানা দিক হইতে শিল্পী, গুণিগণও মঠে সমবেত হইতে লাগিলেন। আমরা নবাগত ব্রহ্মচারীরা তখনও ইহার অর্থ সম্যক বুঝিতে পারি নাই।

এই সময়ে দেখিতাম অতি প্রত্যূষে মহারাজ শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহার নিত্যকর্মাদি সমাপন করিয়া মঠের দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় একটি easy chair এ (আরাম কেদারায়) আসিয়া বসিতেন। আমরা নবাগত ব্রহ্মচারীরা তৎপূর্বেই সেখানে আসিয়া দুই শ্রেণীতে বসিয়া জপ-ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম। তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না। তবুও তাঁহার উপস্থিতিতেই আমাদের ধ্যান-জপ জমিয়া যাইত। অধিকাংশ সময় তিনি তাঁহার সেই 'পাখীর ডিমে-তা-দেওয়া' আনমনা দৃষ্টি লইয়া স্থিরভাবে চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন, কখনো কখনো বা আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে আমাদের উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে পাদচারণা করিতেন। দীর্ঘসময় এইভাবে কাটিয়া যাইত। সূর্যোদয় হইলে প্রথমে শ্রীশ্রীমহারাজের গুরুভ্রাতাগণ ও পরে মঠের অন্যান্য প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের জপধ্যানাদি সারিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে আসিতেন। দেখিতাম পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও অভেদানন্দ মহারাজ ভূমিষ্ঠ হইয়া 'সুপ্রভাত' বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ সাষ্টাঙ্গ হইয়া ও পূজনীয় মহা-

•পুরুষ মহারাজ তাঁহার সদ্যধ্যানোত্থিত উন্মনা চক্ষু দুইটি লইয়া হাতজোড় করিয়া 'সুপ্রভাত মহারাজ, সুপ্রভাত' বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। মহারাজ প্রত্যেককেই 'সুপ্রভাত' বলিয়া প্রণামের প্রত্যুত্তর দিতেছেন। শুধু মহাপুরুষ মহারাজের বেলায় 'সুপ্রভাত তারকদা, সুপ্রভাত' ইত্যাদি বলিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ১০।১২ বৎসরের বড় বলিয়াই বোধহয় এইরূপ করিতেন।

ইহার পর অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও সহিত দু'একটি কথা বলিয়া, কাহারও সহিত বা একটু ফষ্টিনষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন। কিন্তু দেখিতাম সকলের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইতেছে।

সকালে কাজের ঘণ্টা পড়িলে আমরা সকলে নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাইতাম। মহারাজও সামান্য কিছু জলখাবার খাইয়া মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহাকে এ সময় যে মূর্তিতে দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিবার নয়। দেখিতাম মহারাজ ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহার সেবক তাঁহার মাথায় একটি ছাতা ধরিয়া অতি দ্রুতপদে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। কেন জানিনা, তখন মনে হইত মহারাজের শরীর যেন দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, চলিবার সময় তাঁহার চরণ যেন ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। তাঁহার এ মূর্তি যখনই দেখিবার সৌভাগ্য হইত তখনই একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতাম।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর আবার আমরা মহারাজের নিকট মিলিত হইতাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি মহারাজের গুরুভ্রাতাগণ, সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) প্রভৃতি স্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্যগণ ও অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ যাঁহারাই তখন মঠে থাকিতেন সকলেই আসিয়া মহারাজের নিকট আমাদের সহিত মিলিত হইতেন। কেহ বা চেয়ারে বসিতেন, কেহ বা আমাদের সহিতই মেঝেতে বসিয়া যাইতেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া থাকিবার পর, মহারাজ আমাদের বলিতেন, "তোদের কার কি প্রশ্ন আছে কর্, না হয় পেসনকেই (হরিপ্রসন্ন মহারাজ বা বিজ্ঞান মহারাজ—মহারাজ তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন) কর্।" আমাদের মুখে প্রায়ই কোন প্রশ্ন জোগাইত না, তখন মহারাজ নিজেই আমাদের হইয়া বিজ্ঞান মহারাজকে প্রশ্ন করিতেন। দেখিতাম ছোটছেলে মাষ্টারের নিকট পড়া দিবার সময় যেমন ভয়ে জড়সড় হয়, বিজ্ঞান মহারাজও সেইরূপ অতি সংকোচের সহিত মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। পরে এই প্রশ্নই আবার অন্যান্য মহারাজগণকে করা হইত। তাঁহারাও নিজ নিজ ভাবানুযায়ী উহার যথাযথ উত্তর দিতেন। প্রত্যেকেরই উত্তর অতি সুন্দর বলিয়া মনে হইত এবং আমাদের নিকট একটি নূতন আলোকপাত করিত। কিন্তু সবশেষে মহারাজ যখন উহার উত্তর দিতেন, তখন মনে হইত ইহাই তো উহার শেষ উত্তর—ইহা না হইলে উহা তো অপূর্ণ থাকিয়া যাইত।

এইরূপে একদিন মহারাজ বলিলেন, "তোরা প্রশ্ন কর্ তো, ভগবানকে দর্শন করিলে তাহার অবস্থা কিরূপ হয়।" ঐভাবে প্রশ্নটি সকলের নিকট ঘুরিল। সকলেই অতি চমৎকার উত্তর দিলেন। কিন্তু পরিশেষে মহারাজ যখন বলিলেন, "কেন, উপনিষদের সেই শ্লোকটি বল্ না—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"—তাঁহাকে দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া যায়, সর্বসংশয় দূর হয়, সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন মনে হইল—ইহাই তো ঠিক উত্তর, ভগবদ্দর্শন হইলে এইরূপই তো হইবার কথা।

(ক্রমশঃ)

বস্তুকণা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর বিশ্বরঞ্জন নাগ

বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা পরমাণুর কেন্দ্রীন-গুলির নিজস্বতার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারের পরে এই নিজস্বতার গণ্ডী ভেঙ্গে যায়। কতগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হয় যাদের কেন্দ্রীনগুলি নিজে নিজেই রূপ পরিবর্তন ক'রে এক পদার্থের কেন্দ্রীন থেকে অন্য পদার্থের কেন্দ্রীনে পরিণত হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রেডিয়াম। তেজস্ক্রিয-পরিবর্তনের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই ধরনের পদার্থের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ও আলফা-কণা, যা মূলতঃ হিলীয়ামের কেন্দ্রীন, স্বাভাবিকভাবেই বিকীর্ণ হয় এবং এই বিকিরণের ফলে পরমাণুগুলির কেন্দ্রীনের রূপ পরিবর্তিত হয়। স্বভাবতই মনে হয় পদার্থগুলির কেন্দ্রীনেরও বিশেষ গঠন আছে। বিরানব্বইটি কেন্দ্রীন সম্পূর্ণভাবে আলাদা নয়, বরং ভাবা উচিত কোন সাধারণ কণার সমন্বয়েই বিভিন্ন কেন্দ্রীন গঠিত। মনে করা যেতে পারে যে, সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হাইড্রোজেনের পরমাণুর কেন্দ্রীন বা প্রোটন এই সাধারণ কণা। বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটনের সমন্বয়েই বিভিন্ন কেন্দ্রীন গঠিত। কিন্তু তড়িতের পরিমাণ ও ভরের সামঞ্জস্য বুঝতে হলে এ সিদ্ধান্তও করতে হয় যে, কেন্দ্রীনে প্রোটনের সঙ্গে কিছু ইলেকট্রনও যুক্ত থাকে। যেমন ধরা যাক হিলীয়ামের কেন্দ্রীন-এর ভর প্রায় চারটি প্রোটনের সমান, কিন্তু তড়িতের পরিমাণ দুটি প্রোটনের তড়িতের পরিমাণের সমান। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, হিলীয়ামের কেন্দ্রে চারটি প্রোটনের সঙ্গে দুটি ইলেকট্রনও আছে তাহলে এই ভর ও তড়িতের পরিমাণের সামঞ্জস্য হয়। তেজস্ক্রিয়-পদার্থ নিয়ে পরীক্ষার পরে তাই সিদ্ধান্ত হয় যে, পদার্থের মূল স্বরূপ হ'ল দুটি বস্তুকণা—ইলেকট্রন ও প্রোটন। বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিলনে বিভিন্ন কেন্দ্রীন ও বিভিন্ন পরমাণু গঠিত। তাই বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতে যে-ঐক্যের সন্ধান করছিলেন, ইলেকট্রন ও প্রোটনে সেই ঐক্যের সাক্ষাৎ মিলল। অতি বিচিত্র বস্তুজগতের মূল স্বরূপ হ'ল ইলেকট্রন ও প্রোটন। এদেরই বিভিন্ন সংখ্যার মিলনে বস্তুজগতের এই বৈচিত্র্য।

কালক্রমে কেন্দ্রীনের গুণাগুণ নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীনকে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমষ্টি ধরে নিলে তড়িতের পরিমাণ ও ভরের বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু অন্যান্য কতগুলি গুণের ব্যাখ্যা হয় না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য হাইসেনবার্গ অনুমান করেন যে, কেন্দ্রীনে কোন ইলেকট্রন নেই, আছে তৃতীয় এক ধরনের কণা, যার ভর প্রোটনের কাছাকাছি, কিন্তু এই কণাটিতে কোন তড়িৎ নেই। এভাবে কেন্দ্রীনের সব গুণাগুণ বুঝতে গিয়ে কণাতত্ত্বে জটিলতাকে প্রশ্রয় দিতে হ'ল এবং এই নূতন কণাটির নাম দেওয়া হ'ল নিউট্রন। অল্পকালের মধ্যেই হাইসেনবার্গের অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। চাডউইক বেরিলিয়ামের তেজস্ক্রিয়-রশ্মির বিশ্লেষণ করে নিউট্রনের অস্তিত্বের সন্ধান পান। নিউট্রন আবিষ্কৃত হ'লে বিজ্ঞানীদের কাছে পদার্থের মূল স্বরূপ সম্পর্কে যে

ধারণাটি স্বীকৃত হয় তা হ'ল এই যে—বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তুর গঠনের মূলে আছে তিন ধরনের বস্তুকণা। বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন ও নিউট্রনের মিলনে বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর কেন্দ্রীন তৈরী হয়। কোন কেন্দ্রীনের রাসায়নিক স্বকীয়তা আসে প্রোটনের সংখ্যা থেকে। যেমন কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন থাকলে পদার্থটির রাসায়নিক গুণাগুণ হবে হাইড্রোজেনের মত, দুটি থাকলে হিলীয়ামের মত, ছটি থাকলে কার্বনের মত। সাধারণতঃ কোন কেন্দ্রীনে প্রোটনগুলির সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যার নিউট্রন যুক্ত থাকে। দুটি প্রোটনের সঙ্গে দুটি, যেমন হিলীয়ামের কেন্দ্রীনে, বা ছটির সঙ্গে ছটি, যেমন কার্বনের কেন্দ্রীনে। কিন্তু কোন কোন পদার্থের কেন্দ্রীনে বিভিন্ন সংখ্যার নিউট্রন থাকতে পারে। এই রকম কার্বন, নিয়ন, ক্লোরিন, ইউরেনিয়াম এমনি অনেক পদার্থেই হতে দেখা যায়। নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্যে এই পদার্থগুলির পারমাণবিক ভরের তারতম্য হয়, কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা এক থাকায় রাসায়নিক গুণ একই থাকে। একই রাসায়নিক গুণযুক্ত ভিন্ন পারমাণবিক ভরের পদার্থ বা আইসোটোপ (Isotope) এভাবেই উদ্ভূত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীনের প্রোটনের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে ততক্ষণ পদার্থটি তার স্বকীয় সত্তা বজায় রাখে, কিন্তু কোনভাবে প্রোটনের সংখ্যার পরিবর্তন হলে পদার্থটির স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে অন্য পদার্থের রূপ নেয়। তেজস্ক্রিয়ায় এমনি ধরনের পরিবর্তন হয়। প্রোটন ও নিউট্রনের সম্মিলনে তৈরী কেন্দ্রীনের চারপাশে প্রোটনের সমানসংখ্যক ছড়িয়ে-থাকা ইলেকট্রন নিয়েই পদার্থগুলির পরমাণু সম্পূর্ণ হয়। বিচিত্র বিশ্বের বৈচিত্র্য যেমন আসে বিরানব্বইটি পরমাণুর মিলনের বিভিন্নতা থেকে, তেমনি বিভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি হয় কেন্দ্রীনে বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটনের সমাবেশ থেকে। নিউট্রনগুলি দেয় কেন্দ্রীনের স্থায়িত্ব আর ইলেকট্রনগুলি দেয় পরমাণুগুলির বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষতা ও অন্য পরমাণুর সঙ্গে মিলনক্ষমতা।

কণাতত্ত্বে পরমাণুর এই সরল চিত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রথম সমস্যা দাঁড়ালো কেন্দ্রীনের স্থায়িত্ব নিয়ে। কেন্দ্রীনে যদি শুধুমাত্র প্রোটন ও নিউট্রনই থাকে তাহলে কেন্দ্রীনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয় আসে, কেননা প্রোটনের একই ধরনের তড়িৎজনিত বিকর্ষণীশক্তির ফলে ছড়িয়ে পড়ার কথা। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য এলো নূতন অনুমান। অনুমানটি করেন ইউকাওয়া। তিনি বলেন প্রোটন ও নিউট্রন সম্পূর্ণভাবে আলাদা দুটি কণা নয়। তৃতীয় একটি কণার মাধ্যমে এরা রূপ পালটিয়ে প্রোটন থেকে নিউট্রনে বা নিউট্রন থেকে প্রোটনে পরিবর্তিত হতে পারে। কেন্দ্রীনের নিউট্রন ও প্রোটনকে তাই ভাবা উচিত নিউক্লিয়ন বলে। নিউক্লিয়ন এই নূতন কণাটির অবস্থানভেদে কখনও প্রোটন, কখনও নিউট্রন রূপে দেখা দেয়। অবশ্য কেন্দ্রীনের বাইরে যদি কোন নিউক্লিয়ন প্রোটনরূপে বেরিয়ে আসে তাহলে তার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু যদি নিউট্রনরূপে বেরিয়ে আসে তাহলে স্বল্পকালের মধ্যেই প্রোটন ও এই তৃতীয় কণায় পরিণত হয়ে যায়। কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও প্রোটনের স্বতঃ রূপ-পরিবর্তন থেকেই স্থায়িত্ব আসে। তৃতীয় কণাটি যেন হাইফেনের মত নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে কেন্দ্রীনে ধরে রাখে। ইউকাওয়া হিসাব করে তৃতীয় কণাটির ভর ও তড়িৎগুণ নির্ধারণ করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই কণাটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং এর

নাম হয় মেসন। কেন্দ্রীনের এই মেসন ছাড়াও আরও কয়েক রকমের মেসন পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কণাতত্ত্বে কণার সংখ্যা তিন থেকে অনেক বেড়ে যায়।

বস্তুকণার স্বরূপ অনুধাবনের পথে আর একটি জটিলতার সৃষ্টি হয় গাণিতিক পর্যালোচনা থেকে। ইলেকট্রনের স্বরূপ নিয়ে বিশেষ গবেষণা করে ডিরাক সিদ্ধান্ত করেন যে, ইলেকট্রনের সমান ভরের কিন্তু বিপরীতধর্মী তড়িৎযুক্ত আর একটি কণা থাকা উচিত। সিদ্ধান্তটি ছিল নিতান্তই গাণিতিক। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মিতে এই কণাটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং কণাটির নাম হয় পজিট্রন। পজিট্রনের আবিষ্কার বস্তুকণার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করে। পজিট্রন শুধুমাত্র একটি নূতন কণা নয়, এটি হ'ল সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কণা। একে ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কণা বলে ভাবা উচিত বা একে ইলেকট্রনের প্রতিকণা বলা যেতে পারে। পজিট্রন ও ইলেকট্রনের বিপরীতধর্মিতার ফলে যদি কখনও একটি পজিট্রন ও ইলেকট্রন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন এদের বস্তুস্বরূপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এদের মধ্যে যে শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে তা আবার শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আবার শক্তিকণা খুব জোরালো হলেও তা থেকে একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন জন্ম নিতে পারে। পজিট্রনের আবিষ্কারে তাই বস্তুজগৎ ও শক্তির স্বরূপের সমাত্মকতা অতি পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দেখা গেল যে কণাগুলি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অন্য কোন প্রকৃতির বিকাশ বস্তুকণারূপে প্রতিভাত হলেও আসলে তারাও শক্তিকণা থেকে উদ্ভূত।

পজিট্রন যেমন ইলেকট্রনের প্রতিকণা, তেমনি সব কণারই প্রতিকণা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রোটনের প্রতিকণা হ'ল অ্যান্টি-প্রোটন, যার গুণাগুণ সব দিক দিয়ে প্রোটনের মত, কিন্তু এর তড়িৎগুণ ঋণাত্মক। নিউট্রনের প্রতিকণা হ'ল অ্যান্টি-নিউট্রন। এদের মধ্যে আছে একটি যুক্তগুণের বৈপরীত্য। যতরকমের কণা আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সবারই প্রতিকণাও আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই প্রতিকণা দিয়ে তৈরী জগৎও কল্পনা করেছেন, যাকে বলা হয় প্রতিজগৎ। আমাদের জগৎ যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন দিয়ে তৈরী, প্রতিজগৎ তেমনি পজিট্রন অ্যান্টি প্রোটন ও অ্যান্টি-নিউট্রন দিয়ে তৈরী। যদি এমনি প্রতিজগতের অস্তিত্ব কোথাও থাকে এবং আমাদের জগতের সঙ্গে কখনও তার সংঘর্ষ হয়, তাহলে এই বস্তুজগৎ সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়বে। আবার প্রতিকণার অস্তিত্ব থেকে এই জগতের মূল স্বরূপের একটি সহজ চিত্রও দাঁড় করানো যায়। ভাবা যেতে পারে কোনও আদিকালে এই বিশ্বের প্রকাশ ছিল শুধুমাত্র শক্তিরূপে। কোন এক সময়ে এই শক্তি নিজের খেয়ালে পরিবর্তিত হয়ে কণা ও প্রতিকণায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিকণাগুলির স্থায়িত্ব কম বলে কালের গতিতে তারা হারিয়ে গেছে, রয়ে গেছে কণাগুলি। সেই কণাগুলি বিভিন্নভাবে মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে দৃশ্যমান জগৎ।

বস্তুকণার মাধ্যমে বিশ্বকে বুঝতে হলে আজ অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যে বিভিন্ন রকমের বস্তুকণা আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের গুণাগুণ বাহ্য জগতের সঙ্গে আপাতবিরোধী। যদিও সাধারণ বস্তুকণার মত গতিহীন অবস্থায়ও এদের ভর আছে, কিন্তু এদের আয়তন ও অবস্থান কখনও নির্দিষ্ট করা যায় না। অসংখ্য এদের স্বরূপ, বৈচিত্র্যেরও শেষ নেই। এক

স্বরূপ থেকে প্রতিনিয়ত অন্য স্বরূপে এরা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনগুলিও নির্ধারিত হয় এদের নানা রকম অদ্ভুত গুণ দ্বারা, যার সঙ্গে বস্তুজগতের সাধারণ গুণাগুণের কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুকণার বিজ্ঞানীরা যে ভাষায় এদের স্বরূপ নিয়ে পর্যালোচনা করেন, আমাদের পরিচিত ধ্যানধারণার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। যে সরলতার আশায় বিজ্ঞানীরা বস্তুকণার স্বরূপ নিয়ে পর্যালোচনা আরম্ভ করেন, সে-সরলতা ক্রমান্বয়েই নূতন জটিলতায় হারিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা এখনও আশা ছাড়েননি এবং প্রচেষ্টা চলছে বস্তুকণার আপাত-বৈচিত্র্যের জট ছাড়িয়ে ঐক্যসূত্রটি খুঁজে বার করার।

কণাতত্ত্ব খুব জটিল অবস্থায় থাকলেও একটি পরম সত্য কিন্তু আজ বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে এসেছে। "বস্তুজগতের মূল স্বরূপ কি?"—এর উত্তরে আজ এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এর মূল স্বরূপ হ'ল শক্তি। শক্তিই কণা ও প্রতিকণায় রূপান্তরিত হয়ে কণার মাধ্যমে বস্তুজগৎ সৃষ্টি করছে। শক্তি যেমন আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত, তেমনি আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনরূপেও প্রকাশিত। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত দার্শনিকদের সিদ্ধান্তের মতই। দার্শনিকরা যাকে সৃষ্টিকর্তা বলেন, তাঁকে শক্তির ঘনীভূত রূপ ধরে নিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে কোন সাধারণ বিভেদ থাকে না। অবশ্য দার্শনিকরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, এই ঘনীভূত শক্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক চেতন সত্তা. চেতন ঘনীভূত শক্তিই সৃষ্টির আদি এবং সূক্ষ্মভাবে চরাচরে ছড়িয়ে আছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চৈতন্যকে জানবার কোন উপায় বিজ্ঞানীদের জানা না থাকায় দর্শনের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিজ্ঞানের কোন বক্তব্য নেই।

ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকী

(গান)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

কে তুমি আসিলে প্রতীচ্য হইতে পূজিতে ভারত আজ।
করিলে মায়ের সেবা (তব) জীবনের একমাত্র কাজ॥
গুরুপদে করি আত্মসমর্পণ
(ত্যাগ-) তিতিক্ষার ব্রত করিলে বরণ
দেখালে অপূর্ব আদর্শ জগতে ধরি সন্ন্যাসিনী-সাজ॥
জাগাতে সুপ্ত ভারতে তখন করেছিলে আত্মজীবন পণ।
এনেছিলে এক অতুল শক্তি জাগায়ে ভারত-সমাজ॥
বিবেকানন্দের মানস-কন্যা
আনিলে দেশে সেবার বন্যা
সার্থক করিলে নাম নিবেদিতা পরিহরি ভয় মান লাজ॥

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ

ডক্টর দীপককুমার বড়ুয়া

গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর যে অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। সেই মহান্ পুরুষের ব্যক্তিত্বে এবং সমুন্নত মহিমায় গান্ধীজী অভিভূত হয়েছিলেন। বুদ্ধপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "পৃথিবীতে যদি এমন কোন আদর্শবাদী শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা বা ধর্মপ্রচারক থেকে থাকেন, যে উপদেষ্টা কার্যকারণসম্বন্ধ ও কর্মফলের চিরন্তনী নিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তবে তিনি হলেন গৌতম বুদ্ধ।" ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি নিঃশেষে বর্জন করে বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সাথে শান্তি ও সুখের অংশ ভাগ করে নিতে। পৃথিবীর যে সব মানুষ সত্যের সন্ধানে যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে এসেছেন, যাঁরা সত্য আবিষ্কারের জন্য এবং সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিমেয় দুঃখ ভোগ করেছেন, ভগবান বুদ্ধ ছিলেন তাদেরই একজন। আর তাঁর অহিংসা-নীতির যে প্রতিক্রিয়া তা যুগ যুগ ধরে প্রবহমাণ এবং যতদিন কেটে যাবে ততই তার প্রভাব অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠবে। গান্ধীজী তাই-ই বিশ্বাস করতেন। বুদ্ধদেবের ধর্মীয় আদর্শ শুধুমাত্র এশিয়ার নিজের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য। তাই মহাত্মাজী এশিয়ার জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় বাণী পুনরায় নতুন করে উপলব্ধি করে সমগ্র পৃথিবীর উদ্দেশ্যে প্রচার করতে অনুরোধ করেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শ তাঁকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। বুদ্ধদেবের ভাবধারা-সম্পর্কীয় যে উচ্চাঙ্গের অনুভূতি তা তিনি কেবলমাত্র অনুধ্যান করেই ক্ষান্ত থাকেননি—তাকে বাস্তবায়িত করতে সব সময় প্রস্তুত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতো গান্ধীজীও মনে করেন যে, বুদ্ধদেব কোন নূতন ধর্মমত প্রচার করতে আসেননি। গৌতম ছিলেন হিন্দু-ধর্মের একজন অতি উঁচুদরের সংস্কারক যাঁর সংস্কারকার্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁর সমসাময়িক জনসাধারণের উপর এবং অনাগত-কালের সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর তিনি সেই সংস্কারকার্যের প্রচণ্ড প্রভাব কার্যকরী ভাবে রেখে গেছেন। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে "বুদ্ধদেব নিজে ছিলেন একজন আদর্শ ভারতবাসী আর শুধু ভারতবাসীই নন, তিনি ছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন পরম ধর্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী হিন্দু।" তাঁর সমগ্র জীবনের কার্য-ধারা পর্যালোচনা করে মহাত্মাজী দেখেছেন বুদ্ধদেবের জীবনে এমন কিছু হয়নি যাতে মনে হয় তিনি হিন্দুত্বকে পরিত্যাগ করে নূতন ধর্মমত গ্রহণ করেছেন। কারণ বুদ্ধের উপদেশাবলীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং উল্লেখযোগ্য অংশ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের প্রাণবস্তু। সেজন্য গান্ধীজী মনে করেন: "ভগবান বুদ্ধ অসাধারণ ত্যাগের দ্বারা, অসামান্য বৈরাগ্য-সাধনের দ্বারা এবং জীবনের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার দ্বারা হিন্দুধর্মের উপরে এমন এক ছাপ রেখে গিয়েছেন, হিন্দুধর্মকে এমন-ভাবে প্রভাবিত করেছেন যে, হিন্দুধর্ম এই

মহান্ শিক্ষকের নিকট অপরিসীম ঋণী থাকবে।" প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের যা শ্রেষ্ঠতম, বুদ্ধদেব তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু আদর্শের যে-সব মহৎ ভাবধারা বেদ ও পুরাণের মধ্যে গুপ্ত ছিল তিনি তা সমসাময়িক জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের মতো তাঁর বাণীও ছিল বহুবিস্তৃত, বহুব্যাপক ও পরমত-সহিষ্ণুতার প্রতীক এবং তাই তাঁর ধর্মমত এত সহজে পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধীজী বলেছেন: "আমি নিজেকে যদি বুদ্ধদেবের অনুসরণকারী বলে অভিহিত করি এবং তাতে যদি আমি কোনরকম অশোভন আখ্যাও প্রাপ্ত হই, তবু আমি দাবী করবো, আমি বলবো যে, বুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করে আমি হিন্দু হিসাবে জয়লাভ করেছি। ভগবান বুদ্ধদেব কখনও হিন্দুধর্মকে পরিহার করেননি, উপরন্তু তিনি হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তিকে প্রসারিত করেছিলেন।"

বুদ্ধদেবের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী মনে করেন যে, ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থার ভাব বুদ্ধদেবের মূল আদর্শবাদের যে ভাবধারা তার সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থাৎ তিনি যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না, একথা ঠিক নয়। গৌতম নিঃসন্দেহে প্রচলিত ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। নাম-রূপ-গুণ-মণ্ডিত ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি সাধারণভাবে নৈতিক বিধানে আস্থাবান ছিলেন।

গান্ধীজী মনে করতেন, বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ অবদান হল মানব-সমাজের প্রতি তাঁর প্রেম ও ভালবাসার এক মহান নীতি। মানুষ যত হীন, নীচ, পাপী, ঘৃণ্য হোক, তিনি সকলের প্রতি সমানভাবে ভালবাসার এই উচ্চ আদর্শ প্রচার করে গেছেন। পরমকারুণিক বুদ্ধ করুণার বাণী প্রচার করে ধরণীতলকে কলঙ্কশূন্য করেছেন। তাঁর প্রেম, অপরিমেয় মৈত্রী মানব-সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের মানুষের প্রতি, এমনকি নিম্নতম জীবদের প্রতিও সমানভাবে প্রসারিত ছিল, তাই তিনি মহান করুণাঘন।

জাতিবিভাগ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উল্লেখ করে গান্ধীজী বলেছেন, গৌতম সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে-ধরনের জাতি-বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল তা একেবারে ভুল এবং ঐ রকম বিভেদের সকল শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তথাপি তিনি মনে করেন বুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্মকে পরিত্যাগ করেননি। কেবল জন্মের ভিত্তিতে তিনি শ্রেণীবিভাগ মেনে নেন নি, কারণ তিনি জানতেন বর্ণ যখন জীবন দান করে, জাতিভেদ তাকে হত্যা করে এবং অস্পৃশ্যতা হল জাতিবিভাগের ঘৃণ্যতম অবদান।

বুদ্ধভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত মহাত্মা গান্ধী চিরদিনই ছিলেন ভগবান তথাগতের একজন দীনতম সেবক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হিংসা ও নীচতার মধ্যেও প্রেমের অমৃতবাণীর এক শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। তাই বর্তমান কালে বুদ্ধোপাসনার একান্ত প্রয়োজন। গান্ধীজী নিজের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই দেখিয়েছেন কিভাবে বুদ্ধের উচ্চতম নৈতিক আদর্শ পালন করে জীবনকে সুন্দর এবং মহিমান্বিত করা যায়। এদিক থেকে তাঁকে বুদ্ধের একজন আধুনিক শিষ্য বলে অভিহিত করা যায়।

জৈন সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে পশ্চিমভারত

শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম পূর্বভারতে মগধে একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। দীর্ঘ পরিক্রমায় বৌদ্ধধর্ম সারা ভারতবর্ষ তথা বহির্বিশ্বে প্রসার লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে মাতৃভূমি হইতে বিদায় লয়, প্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যে শুধু সিংহল, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া ও তৎসংলগ্ন স্থানে উহা সীমাবদ্ধপ্রায়। অনুরূপভাবে জৈনধর্ম যদিও ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায় নাই—তবে জন্মস্থান হইতে বিলুপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতিভূ হিসাবে ক্ষীণধারা বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া জৈনধর্ম ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে কি বিরাট ও ব্যাপকভাবে রাজনীতি, সামাজিক জীবন, ধর্ম, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ক্ষুদ্র পরিসরে অতীতের সেই কয়েকটি পৃষ্ঠা স্মরণ করিবার প্রচেষ্টাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষদিকে জৈনধর্ম সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসভূমি মগধ হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমে মালব, উত্তরে মথুরা, এবং দাক্ষিণাত্যে তামিলদেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার ভৌগোলিক পরিধি। যদিও ধীরে ধীরে জন্মভূমি মগধে তাহার গৌরব ক্ষীণ হইয়া আসে, কিন্তু অপরপক্ষে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে তাহার বিস্তার ঘটে অত্যন্ত দৃঢ় ও ব্যাপকভাবে। এই দ্রুত উন্নতির মূলে কিছুটা রাজদাক্ষিণ্য ছিল, সে কথা অবিসংবাদিত। কিন্তু বিশেষ করিয়া বণিক ও শ্রেষ্ঠীদের অকৃপণ সাহায্যে ও মধ্যবিত্ত সরলচেতা উপাসকমণ্ডলীর একাগ্রতায় তাহা হইয়াছে পুষ্ট ও সক্ষম।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, জৈনধর্ম তাহার কেন্দ্রবিন্দু হইতে সরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় আসিয়াছে বিরাট পরিবর্তন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন; শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক শ্রেণী বিভাগ বা পুরোহিতমণ্ডলীর মধ্যেই নয়, উপাসকদের মধ্যেও এই শ্রেণী-বিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ব্যাপারে আলোচনীয় শ্রেণীর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই; কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক বিভাগেই নয়, পরোক্ষে কয়েকটি শাখারও উদ্ভব হইয়াছিল। তাই দেখি, দক্ষিণভারতে সংঘ ও গণ। উত্তরভারতে কুল, শাখা ও গচ্ছ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরলচেতা সাধারণ উপাসকদের মনে এই শাখাবিভাগ যে সময়বিশেষে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

গুপ্তযুগ ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ অধ্যায়। গুপ্তসম্রাটগণ পরমবৈষ্ণব ভাগবত-মতাবলম্বী হইয়াও অন্য ধর্মের ব্যাপারে তাহাদের উদারতা প্রকাশ করিতে কোনভাবেই কুণ্ঠিত হন নাই। তাই একদিকে যখন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিরাট প্রসার হইতে দেখা যায়, অন্যদিকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপ্তিও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।

শুধুমাত্র রাজানুকুল্যেই যে জৈন সংস্কৃতি পুষ্ট নয়, পরন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছ হইতেও যে বিশেষ আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তকালীন কয়েকটি লিপি হইতে। ৪৩২ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত মথুরা লিপিতে ধর্মপ্রাণা উপাসিকা কর্তৃক জৈনমূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ। স্কন্দগুপ্তের সমকালীন ৪২৬ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরি শিলালেখে জৈন উপাসক কর্তৃক পার্শ্বনাথের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা অথবা ৪৬১ খৃষ্টাব্দের কাহমলিপিতে পাঁচটি জৈনমূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। উল্লিখিত লিপিগুলি সার্থকভাবে প্রমাণ করে যে, সুদূর মথুরা, উদয়গিরি ও পাওয়াতে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতি তাহার প্রাণশক্তি লইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত।

মাতৃভূমি বিহার (মগধ) ও পূর্বে বঙ্গদেশ তাহাদের পূর্ব গৌরব ধরিয়া রাখিতে না পারিলেও একই সময়ে যে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল, ইহার পরিচয় পাওয়া যায় ৪৭৮ খৃঃ-র পাহাড়পুর লিপিতে। জৈনবিহার-রক্ষাকল্পে এক উপাসক দম্পতি কয়েকটি গ্রাম দান করেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের এই বিহার খুব সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক পাহাড়পুর (বর্তমান রাজসাহী জেলা, পূর্ব পাকিস্তান) স্তূপের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, এই 'বিহার' একদিন বারাণসীর নীরগ্রন্থ গুরু গুহান্দিন ও তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তিনি বারাণসী হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। গুপ্তোত্তর বাংলাদেশে জৈনধর্ম ও সংস্কৃতির বহুল প্রসার ও প্রচার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নিহিত আছে সমসাময়িক সাহিত্যে, শিল্পে ও মননে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিশিষ্ট চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ঃ পশ্চিমে তক্ষশীলা হইতে পূর্বে বিপুল পর্যন্ত তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাহা ছাড়া পূর্বে পুণ্ড্রবর্ধন ও সমতটে দিগম্বর সম্প্রদায়ের নীরগ্রন্থের বহুল প্রচার হয়।

একে অন্যকে লইয়া যে ধর্মনিরপেক্ষ লঘু আলাপ-আলোচনা হইত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বাণের হর্ষচরিতে, 'উলঙ্গ ক্ষপণকে'র উল্লেখে বা দণ্ডির দশকুমারচরিতে অনুরূপ আলোচনায়।

মধ্যযুগের প্রথম পর্বে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমভারতে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে যে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরাট প্লাবন দেখা দেয়, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সমকালীন প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষে, শিলালেখে, সাহিত্যে ও শিল্পে। বস্তুতঃ ইহা আগামী গৌরবময় দিনের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

সপ্তম অষ্টম শতকে দিগম্বর সম্প্রদায় গুজরাটের কয়েকটি স্থানে ধীরে ধীরে আধিপত্য-বিস্তারে প্রয়াসী। জিনসেন তাঁহার হরিবংশ পুরাণে (৭৮৩ খৃঃ) শান্তিনাথ মন্দির স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। অষ্টম শতকের শেষদিকে দিগম্বর সম্প্রদায় প্রভাসে তাঁহাদের প্রভাব-বিস্তারে সাফল্য লাভ করেন। জিন চন্দ্রপ্রভার মন্দির বা তাহার কিছু পরে উন্নতপুরে পার্শ্বনাথের মন্দির স্থাপনা সেই সাফল্যের কয়েকটি বিশেষ নিদর্শন।

বলভীর (বর্তমান সৌরাষ্ট্র) ন্যায় রাজস্থানে সেই সময় কোন উন্নত কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও বুন্দির নিকট কেশর-পুরে পঞ্চম শতকের এক জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া (৬৮৮ খৃঃ) কায়োৎসর্গ-ভঙ্গিমায় দুইটি ধাতু-নির্মিত তীর্থঙ্কর-মূর্তি পাওয়া যায়। সমসাময়িক

সাহিত্যে ও সন্দর্ভে পশ্চিমভারতে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। উদ্দ্যোত্ত সূরী তাঁহার কুবলয়মালায় (৭৭৯ খৃঃ) সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে ভিল্লমল্লে এক জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। হরিভদ্র সূরী (অষ্টম শতাব্দীতে) চিত্রকূট মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করেন।

অষ্টম শতাব্দী হইতে রাজন্যবর্গ তথা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিকর্তারা জৈনধর্মের প্রতি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন নৃপতি স্বেচ্ছায় জৈনধর্ম গ্রহণ করিলেন। চাপোৎকটের অধিপতি বলরাজ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। দশম শতকে এক অজ্ঞাত রাজবংশের পুরোধা কর্তৃক রাজসিন্ধুপুরে 'জিন ভবন'-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। চালুক্য রাজবংশের অধিপতি প্রথম মূলরাজ (৯৪২—৯৫) দিগম্বর সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর নিমিত্ত 'মূলবসতিকা-প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য বংশধর চামুণ্ডরাজ ও দুর্লভরাজ জৈনধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং প্রথম ভীমদেব (১০২২—৬৪) জৈনধর্মে অটুট বিশ্বাসী ছিলেন।

কেবলমাত্র রাজদাক্ষিণ্যেই নয়, সময়বিশেষে মন্ত্রিবর্গ তথা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দ্বারা জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। তাহার ইতিহাস নিহিত আছে দিলওয়ারায় আবু পাহাড়ের উপর আদিনাথের মন্দির-পরিকল্পনায় —নিঃসন্দেহে ইহা ভারতীয় স্থাপত্য-শৈলীর এক নূতন দিগ্‌দর্শন। ইহার স্থাপনকর্তা দণ্ডনায়ক বিমলা কেবলমাত্র একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীই ছিলেন না—ধর্মের প্রতি ছিল তাঁহার অটুট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সরল। মন্দিরগাত্রের স্ফটিকের স্বচ্ছতায় সেই সরল মন আজও যেন উদ্ভাসিত। ইতিহাস একদিকে যেমন বিমলা বাসাহীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে তাঁহার বিরাট কীর্তির জন্য, অনুরূপভাবে বাস্তুপাল ও তেজপাল ভ্রাতৃদ্বয় সেই তালিকায় পরবর্তী মূল্যবান সংযোজন। বাঘেলা রাজবংশের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বাস্তুপাল একদিকে যেমন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্, অন্যদিকে কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু শিল্পরসিক হিসাবে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের যুগ্মপ্রচেষ্টায় প্রায় অর্ধশতাধিক জৈন মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। বাস্তুপাল বিহার (১২৩১), গির্নার (গিরিনগর) পর্বতের উপর পার্শ্বনাথের মন্দির, বা প্রভাসের অষ্টাপদ প্রাসাদ সেই তালিকার বিশেষ মূল্যায়ন করে।

একাদশ শতাব্দীতে জৈন সম্প্রদায় শক্তিশালী সংঘে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের আত্মপ্রচেষ্টায় যথেষ্ট সচেতন। রাজকোষের দাক্ষিণ্য বা বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও বণিক বা শ্রেষ্ঠী-গোষ্ঠীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে এবং সর্বোপরি সহস্র উপাসকবৃন্দের সামান্যতম অর্থসাহায্যেও সেই ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছিল পূর্ণ। রাজকোষ অপেক্ষা সাধারণ উপাসক-গোষ্ঠীর তথা বণিক ও শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সে তখন পরিপূর্ণ, তাই তাহাদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ বা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে গমনাগমন জৈন ধর্ম বা সংস্কৃতিকে কোন এক ভৌগোলিক পরিসীমায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় নাই।

ফলে স্বভাবতই ঘটিয়াছে তাহার প্রসার ও ব্যাপ্তি। সময়বিশেষে কখনও বা পশ্চিম-ভারতে, কোন সময় মধ্যভারতে আবার কখনও বা পূর্বভারতে সে তাহার আধিপত্য-বিস্তারে প্রয়াসী। ঐতিহাসিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে

প্রায় আনুমানিক তিনশতাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পশ্চিমভারতে, বিশেষ করিয়া গুজরাটে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি কি পরিকল্পনায়, মন্দির-গাত্রের ও ভিতরের সূক্ষ্ম কারুকার্যের অলংকরণে ও ব্যঞ্জনায়, শিখরের সু-উন্নত ও বলিষ্ঠ গঠনভঙ্গিমায় শুধু পশ্চিম-ভারতীয় মন্দির-শৈলীর এক বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবেই নয়, পরন্তু ভারতীয় স্থাপত্যকলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসাবেই স্বীকৃত।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাক্-গুপ্ত ভারতবর্ষে সৌরসেনীয় রাজ্য মথুরা জৈন সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। সেখান হইতেই ধীরে ধীরে পশ্চিম তথা মধ্য, পরে পূর্বভারতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু একথা সকল সময়েই স্মরণযোগ্য যে, যখন শিল্পকলা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিয়াছে, তখনই তাহা স্থানীয় ভাবধারায় তথা পারিপার্শ্বিক সামাজিক বা ধর্মীয় ভাবধারায় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত বা কিছুটা পরিবর্তিত। খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস —সেই একস্থান হইতে অন্যস্থানের রীতিগত তথা সামাজিক অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিপুষ্ট শিল্পচর্চার ইতিহাস। সেখানে গুপ্ত বা প্রাক্‌গুপ্ত ধারা অনুসৃত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা নিজস্ব শৈলীর দ্বারা একে অন্যের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছে—আবার অপর পক্ষে একে অন্যকে প্রভাবিত করিয়াছে।

মূর্তির গঠনভঙ্গিতে গুপ্তযুগের যে সমস্ত লক্ষণ বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেইগুলির মধ্যে আছে পূর্ণ মুখমণ্ডল, স্থূল নিম্নোষ্ঠ, গড়ানো স্কন্ধ, প্রশস্ত বক্ষদেশ ও দেহের মাংসলতা। সেই লক্ষণগুলি পরবর্তীকালে স্থানবিশেষে কখনও ঋজু, কঠিন বা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আবার সময়বিশেষে সহচরী বা অলংকৃত মূর্তিগুলির মধ্যে শিল্পী-মানসকে কখনও বা প্রচণ্ড আবেগে, সূক্ষ্ম কোমলতায়, কখনও বা ঐশ্বরিক প্রাসাদের দাক্ষিণ্যে পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যায়।

ভারতশিল্পে মূর্তিকলার ক্রমবিকাশ সেই সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমসাময়িক হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকলার ন্যায় জৈন শিল্পেও মূর্তিতত্ত্বের চর্চা সমানভাবে হইতে থাকে। তাই দেখা যায় তীর্থঙ্কর হিসাবে চব্বিশজন জিনের মূর্তি পরিকল্পনায় বা শুভমঙ্গল চিহ্নের রূপায়ণে তাহারা তৃপ্ত নয়। বিদ্যাদেবী বা শক্তিস্বরূপিণী মাতৃকাগণ আবির্ভূত হইলেন—শিল্পীর তুলিকায় বা ছেদনীতে মূর্ত হইয়া উঠিল—পার্শ্বদেবতা বা সহচরী মূর্তিগুলি, যক্ষ ও যক্ষিণীদের বিভিন্ন ভঙ্গিমা। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে জৈন চিত্রশিল্পের অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। রেখা ও রংয়ের সুষম ব্যবহারের বা আঙ্গিকের বিশিষ্টতার স্বাক্ষর নিহিত আছে পশ্চিমভারতে সৃষ্ট জৈনকল্পসূত্র পুস্তকমালায়। শিল্পধারার মান অনুসারে পশ্চিমভারতে সৃষ্ট জৈনশিল্পের সহিত সমসাময়িক মধ্যভারত বা পূর্বভারতে রূপায়িত একই মূর্তির পার্থক্য শিল্পরসিক বা সমালোচকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না।

পট্টাবল্লী, প্রবন্ধ ও লেখমালার মাধ্যমে তৎকালীন জৈনধর্মের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, তাহার ক্রমিক শাখাবিভাগ তথা অন্তর্নিহিত সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক চিন্তাধারণার নয়, পরোক্ষে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ কবিত্ব ও সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা শুধু সমসাময়িক কালকেই তৃপ্ত করেন নাই, পরন্তু বর্তমান-কালের ভাবধারাকেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত

করিয়াছেন। বিদ্যাধরকুলের হরিভদ্র সূরী, সিলাংক ও সিদ্ধর্ষি (নিবৃত্তিকুল), নান্ন সূরী, প্রদ্যুম্ন সূরী, অভয়দেব ও ধনেশ্বর সূরী (রাজগচ্ছ), জিনেশ্বর সূরী, জিনবল্লভ ও জিতেন্দ্র সূরী (খরতর গচ্ছ), হেমচন্দ্র (পূর্ণতল গচ্ছ) প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষী শুধুমাত্র জৈনধর্মের ধারক ও বাহক হিসাবেই প্রখ্যাত ছিলেন না, পরন্তু তাঁহাদের মানব-হিতকর কার্যকলাপ ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাজগতে যুগান্তর-আনয়নে সক্ষম হইয়াছিল।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে উন্নত আদর্শ-স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। ধর্ম-মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, পার্থক্য কেবল উপস্থাপনায়—এই তত্ত্বের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হরিভদ্র সূরী (অষ্টম শতকে)। পরবর্তীকালে সেই উদার মতবাদের ধারক ও বাহক হিসাবে হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২) কেবলমাত্র সোমনাথ মন্দির পরিদর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে শিবমহাদেবের সুমধুর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় তাহার পরিপূর্ণতা-লাভের পূর্বে দুইটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়—শাসনব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যদিও তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় রাজ্য ও সমাজের প্রতি প্রভাব বিস্তার ও তাহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কঠোর অনুশাসন-অনুধাবনকারী বনবাসী গচ্ছের উপাসকমণ্ডলীর প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার হইতে পারে নাই। যাহা হউক জিনেশ্বর সূরীর (১০১৭ খৃঃ) তৎপরতায় পশ্চিমভারতে, বিশেষ করিয়া গুজরাট অঞ্চলে সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। সৎপথে ও সত্যবিশ্বাসে যাহারা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীন মতবাদে বিশ্বাসী, সেই ধর্মপ্রাণ জৈন উপাসক-গোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের বাধা অন্তর্হিত হইয়াছিল।

দিগম্বর সম্প্রদায় প্রতিপক্ষ শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সহিত পশ্চিমভারতে সহাবস্থানের সুযোগ পায় নাই। ইহারা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়কে অস্বীকার করিয়া সময়বিশেষে তাহাদের অস্তিত্বের অবলুপ্তি-সাধনের চেষ্টায় প্রয়াসী হইয়াছিল, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। যাহা হউক, পশ্চিমভারতের গুজরাট অঞ্চলে তাহাদের আধিপত্য যে ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে রাজস্থানের পূর্বাঞ্চলে তাহাদের অবস্থিতি যে বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিহার শিল্পকলার মাধ্যমে। তাহা ছাড়া মালবদেশে মথুরায়, মধ্যভারতের কয়েকটি স্থানে বা পূর্বভারতের বঙ্গদেশ ও বিহারে পরিভ্রমণের ইতিহাস—জৈনধর্মের ব্যাপক পরিক্রমার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পর্যালোচনা বর্তমান আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরের বাহিরে।

ইতিহাসের নিয়ম পরিবর্তনশীলতা। কালের পটপরিবর্তনে বর্তমান রাজনীতিক অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে পরিবেশে ও ভাবধারায় জৈনধর্ম ধীরে ধীরে পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং একটি বিশিষ্ট ধর্মের পরিচায়ক হইয়াছিল, আজ তাহা বিলুপ্ত। রাজন্য- ও নৃপতিবর্গের উপস্থিতি যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ মাত্র- মন্ত্রিবর্গ বা বণিক ও শ্রেষ্ঠী-গোষ্ঠীর সেই রূপ যখন স্মৃতিপটে ও কাহিনীর আবরণে ধূসরিত, সেই পরিপ্রেক্ষিতে জৈনধর্ম আজিও ভারতের কয়েকটি স্থানে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমভারতের গুজরাট ও রাজস্থান অঞ্চলে ফল্গুধারার ন্যায় নীরবে প্রবাহিত -নিষ্ঠাবান সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় ও বর্তমান শ্রেষ্ঠী-গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে।

সমালোচনা

Complete Works of Sister Nivedita: Vol. I [ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলী: প্রথম খণ্ড: মূল ইংরেজী সংস্করণ] প্রকাশক: রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল। ৫, নিবেদিতা লেন, কলকাতা ৩। পরিবেশক: আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা-সম্পাদিত। পৃষ্ঠা ৫১২, মূল্য—১২৲।

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যশতবর্ষ-উদ্‌যাপনের শুভসূচনা তাঁর সমগ্র রচনাবলী-প্রকাশের সার্থক প্রচেষ্টায়। প্রথম খণ্ডটি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিপূত প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা ও সাধনার যোগ্য প্রতীক। বাগবাজারের ছোট্ট গলি বোসপাড়া লেন আজ 'নিবেদিতা লেনে' নামান্তরিত। আর সেই 'লেন' বা 'গলি' থেকেই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তার ফসল মানবজাতির উদ্দেশে যে চিরন্তন সম্পদ উপহারস্বরূপ তুলে ধরেছে, পৃথিবীর যে-কোন মহানগরের যে কোন প্রশস্ততম রাজপথও সেই মহত্তম সাধনার চরণ-ধূলি বক্ষে ধারণের গৌরবে ধন্য হতে পারে। অথচ একথা কি আশ্চর্য নয়, এই কলকাতা শহরে আজও নিবেদিতার নাম শুধু একটি লেন বা ছোট্ট গলির সঙ্গেই জড়িত, নিবেদিতা-শতবর্ষ-উৎসব সমগ্র জাতির স্মরণীয় মহোৎসবে পরিণত না হয়ে প্রতিষ্ঠানবিশেষেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। হয়তো নিবেদিতার ইতিহাস-চেতনায় একশো বছর মহাকালের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র —নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী এই মহিমময়ী ভারতপ্রাণার হৃদয় ও মনীষার আলোকে জীবনের পরমমূল্য উপলব্ধি করবে বলেই প্রথম শতবর্ষ-উদ্‌যাপনের অপ্রতুল আয়োজনও তাঁর কল্যাণদৃষ্টির আশীর্বাদ অবশ্যই পাবে। তবু জাতি হিসেবে তাঁর কাছে আমাদের ঋণশোধের কোন সামগ্রিক প্রচেষ্টা দেখা দিলেও বর্তমান ভারত ভবিষ্যৎ ভারতের উদাহরণস্থল হয়ে থাকতো।

অথচ নিবেদিতার এই রচনাবলীর আদি থেকে অন্ত শুধু একটি শব্দই জপমন্ত্রের মতো ঘুরে ফিরে এসেছে—তাঁর India, তাঁর 'ভারতবর্ষ'। সে ভারত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক মানচিত্রে বিধৃত এবং তারো বাইরে মানবাত্মার শাশ্বত সত্যানুসন্ধানের প্রতীক এক ভাবময় মন্ত্রবীজ। গুরু তাঁকে ভারতের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে বলেছিলেন, সে আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয়েছে ভারতাত্মার প্রাণপরিচয়ে। নিবেদিতা-সাহিত্য নবযুগের এই ভারতোপলব্ধির সাহিত্য।

পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্মাশ্রিত জীবনধারায় লালিত নিবেদিতা যেদিন স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে 'লোকে যেমন করে নতুন কোন ভাষা শেখে, অথবা হয়তো বা স্বেচ্ছায় নতুন কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে'[১]—ঠিক তেমনি ভাবে কালী-উপাসনার গভীরে প্রবেশ করতে চাইলেন, সেদিন থেকে ভারতীয় মনন ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীরতম সংযোগ সাধিত। সেদিক থেকে তাঁর প্রকাশিত রচনাবলীর (এ পর্যন্ত যার সন্ধান পাওয়া গেছে) সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া উচিত Kali the Mother[২] নামে অপূর্ব কবিত্বময় গ্রন্থটির। যদিচ অজ্ঞাত কোন কারণে এ

---

১ The Master As I Saw Him: The Swami and Mother Worship অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ২ প্রকাশ—১৯০০।

গ্রন্থের মূল উৎসর্গপত্রটি (To Vireswar—Lord of Heroes)[৩] আলোচ্য গ্রন্থে বর্জিত এবং তার দ্বারা এ গ্রন্থটির তাৎপর্যও অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ, তবু নিবেদিতা-সাহিত্যের 'ভারতবর্ষ' অধ্যায়ের প্রথম সূচনা কালী-অবলম্বনে, একথা সানন্দবিস্ময়ে বারংবার স্মরণীয়। রচনাবলীর সূচনায় যে বহুমূল্য তথ্যপঞ্জী দেওয়া আছে, প্রথম খণ্ডের গ্রন্থবিন্যাস তার সময় অনুসারী হলেই ভালো ছিল।

নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর আচার্যদেবের জীবনবেদ—'The Master As I Saw Him'[৪] নিজস্ব বিষয়-গৌরবেই হয়তো এ খণ্ডে প্রথম স্থান লাভ করেছে। এমন একটি গ্রন্থ সাধারণ ভাষায় যাকে 'লেখা' বলে, তার চেয়ে অনেক বড়ো, এ অনেকটা ঔপনিষদিক 'মন্ত্রদর্শন'—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতো গুরুপরম্পরাসূত্রেই সে দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত এ গ্রন্থের প্রাথমিক খসড়া থেকে গ্রন্থরচনার যে পটভূমিগত ইতিহাস পাওয়া গেছে, তা নিবেদিতা-মানসের বিনীতনম্র উপাসিকাসত্তার উন্মোচন—'Should I tell the story of your life, beloved Master? Alas, I cannot. You satisfied so many, widely diverse, in such widely diverse ways. Who am I, that I should understand it all?...Therefore, I have given up the idea of attempting to write your life, and am content to record the story of my own vision and understanding only. ...yet do I pray that through this broken utterance some word of yours may here and there be heard—some glimpse caught of the greatness of your Heart.' [Comp. Works of Nivedita: Vol. I: পৃঃ ২৭০ দ্রষ্টব্য।]

সময়বিশেষে গ্রন্থরচনাই যে সাধনা হয়ে ওঠে তার দুর্লভ উদাহরণের অন্যতম এই নিবেদিতার স্মৃতিচারণ কোথাও মূল বিষয়কে অতিক্রম করে আত্মপ্রাধান্যে মুখর নয়। একমাত্র তাঁকে জানা, তাঁর কথা মনে করা, তাঁরই কথা বলা—'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ', এমনই এক একাগ্র তন্ময়তায় সমগ্র গ্রন্থটি এক নিঃশ্বাসে অনুধাবনযোগ্য।

গুরু-সান্নিধ্যে তাঁর জীবনে আর এক *প্রেরণা-উৎস হয়ে উঠেছিল দেবতাত্মা হিমালয়।* Notes of Some Wanderings With The Swami Vivekananda[৫] গ্রন্থে স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে] একাধারে হিমালয় ও হিমালয়োপম বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলির চিরকালীন দিনলিপি। আর এ দুই গ্রন্থে মিলে (যতদিন না নিবেদিতার দিনপঞ্জীর সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব) বিবেকানন্দ-জীবনের যে অমূল্য উপকরণ আমরা পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞতার ঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারব না।

তারপর থেকে হিমালয় তাঁর এই মহাশ্বেতা কন্যাকে বারংবার আপনকক্ষে আহ্বান করেছেন। Kedar Nath and Badri Narayan. A Pilgrim's Diary[৬] গ্রন্থাকারে সেই আহ্বানেরই উত্তর। নিবেদিতার তীর্থ-পরিক্রমা ভারততীর্থের প্রাণলোকে যাত্রা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ভ্রমণের চেয়ে জীবনবোধের দীপ্তিই তাঁর এজাতীয় রচনাকে মহিমান্বিত করে।

৩ Kali The Mother: লণ্ডনের Swan Sonnenchein & Co প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৪ প্রথম প্রকাশ—১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১০।

৫, ৬ ১৯১১ ও ১৯১৩

নিবেদিতা-গ্রন্থাবলীর চারটি অমূল্য উপহারের সঙ্গে বক্তৃতা ও নিবন্ধে মিলিয়ে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দ-বিষয়ক রচনাও এ খণ্ডে সংকলিত। এর মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় বিবেকানন্দ-রচনাবলীর ভূমিকারূপে লেখা Our Master and His Message প্রবন্ধটি বিবেকানন্দ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, 'Studies from An Eastern Home' নামে নিবেদিতার যে গ্রন্থটি তাঁর দেহাবসানের পরে প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় তদানীন্তন 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীরাটক্লিফ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন যে, বাগ্মী হিসেবেও নিবেদিতা ছিলেন অসাধারণ। সে অসাধারণত্বের কিছু আভাস এ রচনাগুলিতে মিললেও তাঁর কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্বের মন্ত্র-বিদ্যুৎ এঁদের কী অপরিসীম প্রাণশক্তিতে ভরে তুলতো, সেকথা সহজেই অনুমেয়। লেখিকারূপে নিবেদিতার কিছু প্রসঙ্গ আমাদের জানা থাকলেও, তাঁর বাগ্মিতার কথা আমরা সবসময় মনে রাখি না।

মুদ্রণ-সৌকর্যে নিবেদিতা-রচনাবলী ক্রেতা ও পাঠকের নয়নানন্দকর। দুর্লভ কয়েকটি চিত্রে সমৃদ্ধ সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা এই শতবার্ষিকী-সংস্করণটির একটি শোভন বহিরাবরণ স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়। আর জাতীয় প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ভগিনী নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণ-প্রকাশের দায়িত্বও বর্তমান প্রকাশকদের —কৃতজ্ঞ অন্তরে সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। —প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ছোটদের নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৮৬; মূল্য : ২·০০।

ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণ্য জীবনী রচনা করে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বাংলা সাহিত্যের জীবনীশাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সেই বৃহত্তর জীবনী-অবলম্বনে এই সরল স্বল্পায়তম জীবনীগ্রন্থটি ছোটদের উপযোগী করে লেখা। অবশ্য এখানে 'ছোট' কথাটি আপেক্ষিক। বড়োরাও অনায়াসে এই সংহত জীবনীর দর্পণেই নিবেদিতার বিশাল ব্যক্তিত্বের আভাসিত প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে আনন্দিত হবেন। আবার কিশোর-কিশোরীরা পাবে জীবন-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে জীবনগঠনের অমোঘ ও অনিবার্য প্রেরণা।

আত্মপরিচয়ে নিজেকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'-রূপে প্রকাশ করলেও বিশেষভাবে যে নারীজাতির সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করতে এসেছিলেন, ভারতের সেই নারীসমাজের আদর্শ সম্বন্ধে 'শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকথা' শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী নিবেদিতাজীবনের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। তাই শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে লেখা নিবেদিতার অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত পত্রটি এবং তাঁর সামনে উপবিষ্টা নিবেদিতার ছবিটিতে মিলে এ বইটির সূচনা থেকেই যে সশ্রদ্ধ সুশোভন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা লক্ষণীয়। পরবর্তী জীবনে নিবেদিতার শিখাময়ী ব্যক্তিত্ব স্বামীজীর সযত্ন দিকনির্দেশে কেমন করে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে কল্যাণদীপে রূপান্তরিত হলো, তার বিভিন্ন পর্ব থেকে পর্বান্তরে সঞ্চরণে এই ছোট্ট জীবনীটির কৃতিত্ব আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য। পরিশেষে হিমালয়ের বিশাল স্নেহবক্ষে এ যুগের 'উমা হৈমবতী'র পরিনির্বাণ লাভের বর্ণনাটিও স্নিগ্ধ ভাবগাম্ভীর্যে গ্রন্থসমাপ্তির মহৎ অতৃপ্তি মনে জাগিয়ে রাখে।

নিবেদিতা-শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অন্যতম আন্তরিক প্রয়াসরূপে 'ছোটদের নিবেদিতা' ছোটদের এবং বড়োদের সকলের সানন্দ অভিনন্দন লাভ করবে। —প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠে (১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ১০২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দজীর গত এক বৎসরব্যাপী জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ এটি।

এই উপলক্ষ্যে পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা-পাঠাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময়ে মঠ-প্রাঙ্গণে একটি সাধারণসভা আয়োজিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী। সভার প্রধান অতিথি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ স্বামী অভেদানন্দজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের সুগভীরতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ভক্তি-সমন্বিত কবি প্রতিভা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিবার পর সভাপতি মহারাজ বলেন :

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর রচনাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, স্বামীজীর জীবনের ভিত্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ, হিন্দুশাস্ত্র ও ভারত। আমরা জানি স্বামী অভেদানন্দের জীবনেরও মূলে ছিল এই তিনটি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভাবধারা প্রচারের জন্য যে কয়জন লীলাসহচরকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অভেদানন্দজীর জীবনে এই বৈশিষ্ট্য হইল দর্শনের ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করা। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন অদ্বৈতভূমিতে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর জগন্মাতার নিকট হইতে 'ভাবমুখে থাক' এই আদেশ পাইয়া যুগপ্রয়োজন সাধনের জন্য সে ভূমি হইতে অবতরণপূর্বক জগতের সঙ্গে একটি নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক রাখিয়া দিয়াছিলেন, স্বামী অভেদানন্দও তেমনি আত্মজ্ঞ হইয়াও জগৎকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন, ভালবাসিয়াছিলেন, 'মিথ্যা' বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। ইহার একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে। বেদান্তের ভিত্তিতে তিনি মায়াবাদকে আপেক্ষিক সত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। চরম সত্তাই সব হইয়া রহিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—ছাদে উঠার পর দেখা যায় যাহা দিয়া ছাদ তৈয়ারী, সিঁড়িও তাহা দিয়াই তৈয়ারী। স্বামী অভেদানন্দ চাহিয়াছিলেন ভাবী সমাজের ভিত্তি হইবে এই অদ্বৈতজ্ঞান ভিত্তিক সাম্যবাদ—বৈচিত্র্যের মধ্যে অভেদ দর্শন।

শাস্ত্রের কথাগুলি লইয়া 'কালীতপস্বী' ধ্যান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের সঙ্গে সেগুলি মিলাইয়া লইয়াছিলেন। সেগুলিই তিনি প্রচার করিয়াছেন আধুনিক মনের উপযোগী করিয়া। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের উন্নতির ভিত্তি হইবে ভারতের নিজস্ব বাণী। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই তিনি সত্যলাভেচ্ছাকে আঁকড়াইয়া চলিতে বলিয়াছেন।

আবেদন

মেদিনীপুর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্তসেবা

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মালদহ জেলার লোক খরা জনিত দুর্ভোগ কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই মেদিনীপুর জেলার লোক গত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে প্রবল বৃষ্টিপাত হেতু দারুণ বন্যার কবলে পড়িয়াছে, জেলার একটি বিরাট অংশ জলপ্লাবিত হওয়ায় হাজার হাজার লোক গৃহহীন ও প্রায় অনশনের সম্মুখীন হইয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন এখানে সেবাকার্য সুরু করিয়াছে—স্থানীয় সহৃদয় জনগণের সহায়তায় কাঁথির একটি স্কুল-গৃহে এক হাজার গৃহহীনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া চারিদিন তাহাদের খাওয়াইবারও ব্যবস্থা করা হয়। পরে ১নং ব্লকের ৩নং ও ৪নং অঞ্চলে, ২নং ব্লকের আলাদারপুর অঞ্চলে, পিংলা থানার বামনগর ২নং অঞ্চলে এবং ৯নং অঞ্চলে এই সেবাকার্য বিস্তৃত হইয়াছে। সদ্য সাহায্যের জন্য 'ক্যাশ ডোল' দিয়া কার্য আরম্ভ করা হয়, পরে সব অঞ্চলেই চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইতেছে। বহুসংখ্যক ধুতি এবং শাড়ীও বিতরণের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

এই আরব্ধ সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মিশন এই অঞ্চলে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। সেবাকার্যটি সুসম্পন্ন করিতে ইহার অনেকগুণ অধিক অর্থের প্রয়োজন।

আর্ত জনগণের সাহায্যার্থে আমরা সহৃদয় জনগণের অকুণ্ঠ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, পরিস্থিতির গুরুত্বানুসারে অবিলম্বেই এই সাহায্য প্রয়োজন।

এই সেবাকার্যের জন্য প্রেরিত সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (RAMAKRISHNA MISSION) এই নামে লিখিবেন।

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫নং ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯
৫। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মেদিনীপুর
৬। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাঁথি, মেদিনীপুর
৭। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, লাইতুমখ্রা, শিলং-৩, আসাম
৮। রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লী-১
৯। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বে-৫২
১০। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট
১১। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ময়লাপুর, মাদ্রাজ-৪

বেলুড় মঠ, হাওড়া — স্বামী গম্ভীরানন্দ

২৬ ৯ ১৯৬১ — সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্যে গত আগস্ট মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়ঃ

১। **বিহারে** ক) হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরী, চম্পারণ ও প্রতাপপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ১,২২,১৮৩ কেজি, গুঁড়া দুধ ৯,৪৯৩ পাউণ্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ২,১০০টি, লংক্লথ ৮৫ গজ, ধুতি ১,৮৪৬ খানি, শাড়ী ১,৮৯৬ খানি এবং ৭,১৫১টি শিশুদের পোশাক বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৩০,০৩৯।

(খ) সাঁওতাল পরগণা জেলায় বিখিয়া সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৬২,২৬০ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮,৯৭৮ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ৩,৮১৯ খানি, কম্বল ও চাদর ৯০১ খানি এবং ৩,০৪২টি শিশুদের পোশাক বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১২,২৫৬।

২। **উত্তরপ্রদেশে** মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ২৭,৮৬৩ কেজি, গুঁড়া দুধ ১,৩২৫ কেজি, বিস্কুট ২৯৩ কেজি এবং ৩০,০০০টি ভিটামিন ট্যাবলেট বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৫,১৮৪।

৩। **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) পুরুলিয়া জেলায় পাবা, হুড়া, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালিতোড়া এবং নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৩৭,০৭৬ কেজি এবং ধুতি একখানি, শাড়ী একখানি ও ৭১টি শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৪,৮৪১।

(খ) বাঁকুড়া জেলায় হাট-আশুরিয়া, দধিমুখা, খাণ্ডারী, রামহরিপুর এবং জয়রামবাটী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭২,২৪৯ কেজি গম ও ৮,৮২৭ কেজি জোয়ার বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৩,৪৫৩।

(গ) মালদহ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬,৯৬৮ কেজি গম ও ৪৮৯ কেজি বার্লি বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৩,৩৮৪।

সাম্প্রতিক বন্যায় নানা স্থানের জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্তদের জন্য সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কাঁথি শহরের চারটি বিদ্যালয় ভবনে সমবেত প্রায় এক সহস্র বন্যাপীড়িত নরনারীকে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে চারদিন খাওয়ানো হয়। এই কার্য দিয়া বন্যা-সেবা শুরু করিয়া ক্রমশঃ ২নং ব্লকে ৩ ও ৪ নম্বর অঞ্চলে, ৩নং ব্লকে আলাদারপুট অঞ্চলে এবং পিংলা থানায় রামনগর-২ অঞ্চলে ও ৯ নম্বর অঞ্চলে সেবাকার্যের পরিধি বিস্তৃত করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্য-বিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৬—মার্চ ১৯৬৭) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পাটনায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে উহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্তি লাভ করে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এই কেন্দ্রে অনুসৃত কার্যাবলী

প্রধানতঃ ত্রিধারায় পরিচালিত হয়ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্ম।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ছাত্রাবাসে (কেবলমাত্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য) ২৯ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৬ জন বিনা-খরচে এবং ৩ জন আংশিক ব্যয় বহন করিয়া থাকিবার সুযোগ লাভ করে। আশ্রমের ৮ জন পরীক্ষার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত পুস্তকসংখ্যা ৭,৮৬৬, আলোচ্য বর্ষে ১৬৭ খানি পুস্তক নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ৯টি দৈনিক এবং ৭০ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১০,৮৮৩, গড়ে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি ৬৪'২। গ্রন্থাগারটি জনসাধারণ ও কলেজ-ছাত্রগণের বিশেষ কাজে লাগিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকাবলী আশ্রম হইতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

আশ্রম কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬৬,৫৮২ (নূতন ৭,১৩০) জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। গত বৎসর চিকিৎসা লাভ করিয়াছিল ৫৮,০৩০ জন রোগী।

এলোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৭৯,৮৬৪, তন্মধ্যে নূতন রোগী ১০,৫০৩। গত বৎসর চিকিৎসিত হইয়াছিল ৪৬,৪৯৮ জন রোগী।

আলোচ্য বর্ষে উভয় বিভাগেই রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতেও উপযুক্ত চিকিৎসালাভের জন্য দরিদ্র রোগীরা এখানে সমবেত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নানাস্থানে ও আশ্রমে ধর্মালোচনার জন্য মোট ২১৭টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি আলোচনা করা হয়। আশ্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উৎসব যথা শিবরাত্রি, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, খৃষ্টজন্মদিন, শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মতিথি প্রভৃতি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে স্থানীয় অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে, আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিশুগণকে এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে ফল মিষ্টি প্রভৃতি খাওয়ানো হইয়াছিল।

বিহারে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষে মুঙ্গের, হাজারীবাগ ও সাঁওতালপরগণা জেলায় মিশনের আর্তসেবাকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (ময়লাপুর) দাতব্য চিকিৎসালয়ের (এপ্রিল, ১৯৬৬—মার্চ, ১৯৬৭) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় বিভাগে মোট ১,৫৯,৯০১ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এলোপ্যাথি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৫৮,১০২, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৫৬,৫৭৯ এবং পুরাতন রোগী ১,০১,৫২৩; হোমিওপ্যাথি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৭৯৯, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৭৮১ এবং পুরাতন রোগী ১,০১৮।

চক্ষুবিভাগে ২০,১০৮, চক্ষু কর্ণ গল-রোগের চিকিৎসা-বিভাগে ১১,০০২ এবং দন্ত-বিভাগে ৪,১৭৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এক্স-রে বিভাগে ৫০৩ জনের এক্স রে করা হয়। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ৬১২। শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুষ্টির অভাবগ্রস্ত ২১,৪৩১টি শিশুকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। সহৃদয় ও বদান্য জনগণের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যে দরিদ্র আর্ত জনসাধারণ অধিকতর সেবালাভে সমর্থ হইবে।

দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

গত ৪ঠা আগস্ট, ১৯৬৭ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথিতে দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় হলিউডে ২০২৭ নর্থ ভাইন স্ট্রীটে নূতন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে হলিউড মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাবুকো শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসিগণ এবং সান্টা বারবারা কেন্দ্র হইতে প্রব্রাজিকাবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন।

অনুষ্ঠানসমূহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ এবং স্বামী অসক্তানন্দ। পূজা ও যজ্ঞাদির কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন স্বামী বন্দনানন্দ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল সন্ন্যাসী-সন্তানের উদ্দেশে পুজার্ঘ্য প্রদত্ত হয়। পূজান্তে বিরজা-হোমও অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় কেবলমাত্র সন্ন্যাসিগণই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান-শেষে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বিশাল ভবনটিকে মঠ-বাড়ীতে রূপান্তরিত করিতে সাধুগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, জলের পাইপ, ইলেকট্রিক-লাইন বসানো, কাঠের কাজ প্রভৃতি সবই তাঁহারা নিজেরাই করিয়াছেন।

সিয়েটেল বেদান্ত কেন্দ্রে 'ব্রহ্মানন্দ-হলের' উদ্বোধন

সিয়েটল বেদান্ত কেন্দ্রের ধ্যান-ভবনটি সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই 'ব্রহ্মানন্দ-হল'-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই হইতে ৯ই জুলাই পর্যন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ধ্যান ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশুখৃষ্টের প্রতিকৃতি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'ওঁকার' প্রতীকটিও আকর্ষণীয়ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে। মূল বেদীর নিম্নে একটি পৃথক বেদীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ধ্যানমূর্তি সংস্থাপিত।

৭ই জুলাই সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে উদ্বোধন-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ব্রহ্মানন্দ হল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বামী বিবিদিষানন্দ অতিথি অভ্যাগতগণকে স্বাগত জানান এবং অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক স্বস্তিবাচন আবৃত্তি ও সমবেত-কণ্ঠে ভজনের পর পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ ও স্বামী বিবিদিষানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর বিষয়ে প্রাণস্পর্শী আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানগুলিও

অতি মনোজ্ঞভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৃতীয় দিন, ৯ই জুলাই, বেলা ১১টার সময় একটি সাধারণ সভা আহূত হয়। এই সভায় স্বামী অশেষানন্দ 'আধ্যাত্মিক বোধের উদ্বোধন' বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ও ভাবোদ্দীপক ভাষণ দেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটি : স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র : অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বিভিন্ন আলোচিত বিষয় :

জুন, ১৯৬৬ : মানুষই সব জিনিসের পরিমাপক, কাল হইতে কালাতীত, ধর্মের জন্য মানবের অনুসন্ধান, ঈশ্বরের সঙ্গে চলা।

জুলাই, ৬৬ : মুক্তির অনুসন্ধানে মানুষ, প্রেম—মানবীয় ও ঐশ্বরিক।

সেপ্টেম্বর, ৬৬ : ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ; ভক্তির সাধন, আমাদের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক ভিত্তি।

অক্টোবর, ৬৬ : যোগের মাধ্যমে শান্তি, চিন্তার সীমান্তের বাহিরে, প্রেম ও জ্ঞান, মাতৃভাবে ঈশ্বরচিন্তা, ব্যক্তিগত ধর্ম।

নভেম্বর, ৬৬ : মানবীয় ও ঐশ্বরিক ভাব; দেবতা, ঈশ্বর ও আত্মা, বেদান্ত ও বিশ্বশান্তি, মানুষের বন্ধন ও মুক্তি।

ডিসেম্বর, ৬৬ : মনের সহিত সংগ্রাম, কুসংস্কারমুক্ত ধর্ম, স্বর্গ—এখানে এবং এখনই, বেদান্ত ও যীশুখৃষ্ট।

জানুয়ারি, ৬৭ : ধর্মের নব দিগন্ত; ঈশ্বরানুভূতি; বেদান্ত ও রহস্যবিদ্যা; নিজেকে জানো এবং দুঃখের পারে যাও।

ফেব্রুআরি, ৬৭ : স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার অধ্যাত্ম-বাণী, সার্থক জীবন যাপন, অনন্তের বাণী; আমার সংস্পর্শে তোমরা পবিত্র হইবে।

মার্চ, ৬৭ : জীবনটি উপাসনায় পরিণত কর; সাকার হইতে নিরাকারে; মহান ধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ; আলোর পথে আরোহণ।

এপ্রিল, ৬৭ : অতীন্দ্রিয় রাজ্যে সুস্থ অগ্রগতি, ঈশ্বররূপে মানব ও মানবরূপে ঈশ্বর, বিশ্বতত্ত্বানুভূতি, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে আধ্যাত্মিক জীবন, মৌনাভ্যাসের আরোগ্যকারিণী শক্তি।

মে, ৬৭ : আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের জন্য কর্ম; বিদ্বেষ-জয়, প্রেম ও স্বাধীনতা, বুদ্ধের শান্তিপথ।

জুন, ৬৭ : প্রাত্যহিক জীবনে যোগ; ধর্মানুভূতি, ভগবৎসান্নিধ্যে, ব্যক্তি সত্তার আধ্যাত্মিক উন্নতি।

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। এই কেন্দ্রে রবিবারের সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দেওয়া হইয়াছিল :

অক্টোবর, ১৯৬৬ : মহাচার্য শ্রীকৃষ্ণ, দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বর-সচেতনতার অভ্যাস, 'যত মত তত পথ', ঈশ্বর আমাদের শাশ্বত জননী, আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান।

নভেম্বর, '৬৬ : অসত্য হইতে সত্যে; মনের প্রকৃতি ও কার্য; জীবন প্রাচুর্য; জীবন—ইহলোকে এবং পরলোকে।

এপ্রিল, '৬৭ : আধ্যাত্মিক জীবনের তিনটি স্তম্ভ, নিজের সহিত মানুষের সংগ্রাম, পথ ও পূর্ণতা, অবচেতনকে আয়ত্তে রাখা, অন্ধকার রাত্রি তমসাচ্ছন্ন নয়।

মে, '৬৭ : বেদে সোমযজ্ঞ, শাঙ্কর-বেদান্তে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির স্থান; নির্বাণে পুরস্কারের স্থান, বুদ্ধ-মতে প্রবর্তকের ধ্যান।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে বৃহদারণ্যক ও প্রশ্নোপনিষৎ এবং শুক্রবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আলোচিত হয়।

বিবিধ-সংবাদ

নব ব্যারাকপুর: গত ১৬ই জুলাই রবিবার স্থানীয় শক্তিসঙ্ঘে বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক অধিবেশনে বেলুড় মঠের স্বামী জয়ানন্দ মহারাজ বর্তমান ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন।

২০শে আগস্ট রবিবার স্থানীয় জাগৃতি সঙ্ঘে উক্ত পরিষদের মাসিক অধিবেশনে স্বামী অমৃতত্বানন্দ মহারাজ (বেলুড় মঠ) স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় অবদান সম্বন্ধে এক ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত করেন। এই দিনের ভাষণে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় মতামত বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। উভয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকর।

পাঁচ গ্রাম: ২৮৮৬৭ তারিখ পাচগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গীতাপাঠ ও কৃষ্ণমঙ্গল সঙ্গীত-বিচিত্রাদির মাধ্যমে জন্মাষ্টমী-তিথি প্রতিপালিত হইয়াছে।

সভান্তে সমাগত প্রায় ৩।৪ শত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া বসুর দেহত্যাগ

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া বসু, ৭৪ বৎসর বয়সে গত ২১শে ভাদ্র, ১৩৭৪ সন, ইং ৭ই সেপ্টেম্বর, সকাল ১০ ঘটিকার সময় তাঁহার পুত্রের বাগুইহাটি-স্থিত নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত ৭ বৎসর যাবৎ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের পূত সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।। ওঁ শান্তিঃ।।।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥৪।২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ভগবানই হয়েছেন এ-বিশ্বের সবকিছু—কর্তা, কর্ম, কর্মোপকরণ
ইহা জানি তাঁর তরে যাহা কিছু করা যায়, সবই যজ্ঞ, সকলই পূজন।)
অনাসক্ত মন যার, অভিমানশূন্য যেই, জ্ঞানে যার চিত্ত সদা স্থিত,
কর্ম যার ঈশ্বরার্থে—যজ্ঞতরে—কর্মফল হতে মুক্ত থাকে সে সতত ॥২৩
যজ্ঞকালে আহুতির পাত্রটিকে—অর্পণেরে—ব্রহ্ম বলি জানে সে সদাই,
জানে সে ঘৃত-ও ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, সে-ও ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ছাড়া কিছু আর নাই।
ব্রহ্মময় সব হেরি—কর্মে ব্রহ্ম জ্ঞান করি—ব্রহ্মত্ব সে লাভ করে তাই ॥২৪
ঈশ্বরার্থে কত জন করে কর্ম কত ভাবে, কেহ করে দেব-আরাধন,
জীব-ব্রহ্ম এক ভাবি কেহ করে ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মদানে জ্ঞানের সাধন ॥২৫
কর্ণ আদি ইন্দ্রিয়েরে বিষয় হইতে টানি কেহ করে ইন্দ্রিয়দমন,
শব্দাদি গ্রহণকালে অন্যে ভাবে এ-ও পূজা—ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে হবি-দান ॥২৬
সকল ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া, সর্ব প্রাণ-ক্রিয়া কেহ নিরোধ করিয়া স্থির চিতে
আপনার সব কিছু আহুতি প্রদান করে জ্ঞানদীপ্ত সমাধি-অগ্নিতে।
সবই যজ্ঞ; (সবই টানে তাঁরি পানে, মুক্ত করে, দহি পাপ জ্ঞানের বহ্নিতে) ॥২৭

কথাপ্রসঙ্গে

আত্ম-নিবেদন

দেহমনের সীমার পারে আমাদের অস্তিত্বের যে মহিমান্বিত প্রকাশ রহিয়াছে তাহার প্রশান্তিতে অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও অবগাহন না করিলে, তাহাকে অবলম্বন না করিলে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন যে কি জিনিস, তাহা ধারণাই করা যায় না, নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিবেদিত করা তো দূরের কথা।

এই সত্যটি সুপরিস্ফুট ভগিনী নিবেদিতার জীবনে। তাঁহার আত্মনিবেদন বাহ্যতঃ গুরুর ইচ্ছার নিকট বা ভারতমাতার চরণে হইলেও মূলতঃ উহা বিশ্বমানবকল্যাণেচ্ছার মাধ্যমে শ্রীভগবানে বা পরমজ্ঞানেই সমর্পিত।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ নিবেদিতার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা—উহাই তাঁহার তৎকালীন অস্পষ্ট জীবনাদর্শের পথে শুভ্র আলোক-বর্ষণ করে। স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার ভারতের সেবাকার্যে আত্ম-নিয়োগের সঙ্কল্প এবং আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতে আগমন ও স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা-লাভ তাঁহাকে জীবনের চরমাদর্শ-লাভের জন্য আত্মনিবেদনের পথে ক্রমশঃ আগাইয়া দিতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনো তাহা ছিল আংশিক মাত্র, সম্পূর্ণ হয় নাই। এই মহাযজ্ঞশিখায় তাঁহার আমিত্বের পূর্ণাহুতি-প্রদানের সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল আরো কিছুদিন পরে, যখন তিনি স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, আলমোড়ায় বাস করিতেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের আদর্শ ছিল ভগবানলাভ। এই আদর্শলাভের নূতন পথ তখন প্রস্তুত করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাবের অনুসরণে—ভগবানই সব হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', কর্মকে পূজায় পরিণত করা; ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, "বহু এবং এক যদি যথার্থই সত্য হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি, সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। ...তাঁহার (স্বামীজীর) নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই।" ভগবানলাভের জন্য এই পথেরই নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে, ভারতকে কর্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া, ভারতকে কায়মনোবাক্যে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার সেবায় আত্মনিবেদন করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতেই গুরুর সব চেয়ে প্রিয় কার্য করা হইবে, ভগবানলাভেরও সাধনা ইহা।

পরবর্তীকালের নিবেদিতার জীবন আত্ম-সমর্পণের পরিপূর্ণ বিভায় সমুজ্জ্বল দেখি আমরা—তাঁহার ভারতপ্রেম স্বদেশপ্রেম, উহার বিভা ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশসেবকদের স্বদেশপ্রেমের বিভাকেও যেন ম্লান করিয়া দিতে চায়। ভারতবাসী তাঁহার নিকট স্বদেশবাসী, অতি আপনজন; তিনি তাদেরই একজন হইয়া গিয়া-

ছিলেন শুধু আচরণে নয়, চিন্তায়, সংস্কারে পর্যন্ত। ভারতের সেবায় তিনি জীবনপাত করিয়াছেন ভারতের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য, ভারতের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের জন্য। রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের নবজাগরণের জন্য তিনি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়াছিলেন ভারতবাসীরূপে।

কিন্তু কাজটি কি এতই সহজ ছিল? তাঁহারই সমপর্যায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, তেজস্বিতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং হৃদয়বত্তা সম্পন্ন হইয়া কোন ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ করা যতটা সহজ, কোন বিদেশীর পক্ষে অপর দেশের সেবার জন্য পরোপকারের মনোভাব লইয়া ইহা করা (যদি এতটা কেহ করিতে পারেনও) যতটা সহজ, একজন বিদেশিনীর পক্ষে ভারতকে কায়মনোবাক্যে স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া ইহা করা তদপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিন—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অসম্ভব। কিন্তু নিবেদিতার ক্ষেত্রে আত্মনিবেদন পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই ইহাও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

এই আত্মনিবেদন কেবল বুদ্ধির সহায়তা লইয়া করা যায় না। পাশ্চাত্যে এতদিন নিবেদিতা যে দৃষ্টিতে জীবনকে, ভালমন্দকে দেখিতে শিখিয়াছেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া নূতন দৃষ্টিতে সবকিছু দেখিতে হইবে। জন্মগত যে স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি, স্বসমাজপ্রীতি তাহাও ভুলিয়া যাইয়া নূতন দেশকে, নূতন জাতিকে, নূতন সমাজকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এক কথায় এতদিনকার 'জীবন'কে নির্মম হইয়া ত্যাগ করিয়া নবজন্ম লাভ হইবে এই দেহেই। কেবল বুদ্ধি একাজ করাইতে অপারগ। বুদ্ধি যতটা আগাইয়া লইতে পারে, ততদূর তো তিনি আসিয়াছেনই —গুরুর আদেশ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া সব ছাড়িয়া ভারতে আসিয়াছেন ভারতের সেবা করিতে। কিন্তু স্বামীজী যাহা চাহিয়াছিলেন, সে আত্মনিবেদনের পথে কতখানি তিনি আগাইয়াছিলেন তখন? ব্রহ্মচর্যদীক্ষাদানের পরদিবস "স্বামীজী তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'এখন তুমি কোন্ জাতিভুক্তা?' উত্তর শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে, একজন ভারতীয় রমণীর তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে ভাব ইহারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব।" ইহা খুবই স্বাভাবিক, ইহা দূষণীয় তো নয়ই, বরং সাধারণ অবস্থায় গুণপদবাচ্য। কিন্তু স্বামীজী যাঁহাকে 'ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের একাধারে সেবিকা, বান্ধবী ও মাতা' হইবার জন্য আনিয়াছেন তাঁহাকে মানবতার এই স্তর হইতেও বহু উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। স্বামীজী ভারতকে এত ভালবাসিতেন শুধু জন্মভূমি বলিয়া নয়, পুণ্যভূমি বলিয়া। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সেদিক দিয়া তাঁহার কাছে ভারতও যা, ইংলণ্ডও তাই, আমেরিকাও তাই। ভারতকে তাঁহার এত ভালবাসিবার কারণ, ভারতকে না বাঁচাইয়া রাখিলে আর কোন দেশই জগতে মানবতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না, ভারত যদি মরিয়া যায় "তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে, সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে—অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি" (স্বামী বিবেকানন্দ)। তাই

ভারতের উন্নতির জন্য স্বামীজীর এত প্রচেষ্টা। জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণরূপ যে স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র, সেখান হইতে মনকে ঊর্ধ্বে উন্নীত না করিলে এরূপ পক্ষপাতিত্বহীন দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখা, তাহার কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার করা যায় না, এভাব লইয়া ভারতের সেবা করা যায় না। কিন্তু এই স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনা কি এতই সহজ? কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে আচার্য, আত্মীয় প্রভৃতির প্রতি মমতাবোধ—মনের আর একটি স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র—বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল উচ্চতর আদর্শের আলোকে অর্জুনের কর্মপথ-নির্বাচনের সময়। সেখানেও দেখা যায় যুদ্ধারম্ভের বহু পূর্ব হইতে এই যুদ্ধ লইয়া যুক্তির বহু আদানপ্রদান হইয়াছে কৃষ্ণার্জুনের মধ্যে, যাহার ফল অর্জুনকে রণক্ষেত্র পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, কার্যকালে দেখা গেল এই স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। রণক্ষেত্রেও বহু যুক্তি দেখানো হইল, তাহাতেও হয় নাই। ইহা বুদ্ধির কাজ নহে। ইহার জন্য সেখানেই শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের অনুভূতিকে উন্নীত করিতে হইয়াছিল মনবুদ্ধির সীমানার পারে—অতীন্দ্রিয় রাজ্যে, তবেই অর্জুন সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'করিষ্যে বচনং তব'। নিবেদিতার বেলাও দেখা যায়, একটি ভারকেন্দ্র হইতে মনকে সরাইয়া আনিবার জন্য হিমাচলের কোলে বসিয়া স্বামীজী বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। পরে, এক শুভক্ষণে নিবেদিতার মাথায় হাত রাখিয়া স্বামীজী আশীর্বাদ করিলেন। সেই স্পর্শেই নিবেদিতার অনুভূতি উন্নীত হইয়াছিল মনবুদ্ধির অতীত সত্যের রাজ্যে, আর তাহার পর হইতেই নিবেদিতার বুদ্ধি করজোড়ে বলিয়াছিল, 'করিষ্যে বচনং তব।'

এই দিন সত্যানুভূতির কোন্ স্তরে স্বামীজীর কৃপায় নিবেদিতা উন্নীত হইয়াছিলেন, সঠিকভাবে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়, পূর্ণ আত্মনিবেদন কাহাকে বলে নিবেদিতা এই দিন নিঃসংশয়ে তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইহার স্বল্প কয়েকদিন পরে একটি পত্রে (মিসেস হ্যামণ্ডকে) তিনি লিখিয়াছেন, "এতদিন ধরিয়া যাহা মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, প্রকৃত অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র শুভ্র জ্যোতির তুলনায় তাহা নিতান্তই হাল্কা ও শুষ্ক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ সবই আমি উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আশ্চর্য! প্রাথমিক সত্যগুলিকে পরিষ্কাররূপে দেখিতে এত সময় লাগিল!... একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন।"

স্বামীজী নিবেদিতাকে যথার্থ 'নিবেদিতায়' পরিণত করিলেন এই আলমোড়ায়। কাজটি আর কিছুই নহে, নিবেদিতার ভাষায়, "একটি মনকে তাহার স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র হইতে সরাইতে হইবে। এর চেয়ে বেশী আর কিছু করা হয় নাই, কখনো কোন ধারণা বা মত জোর করিয়া চাপানো হয় নাই, শুধু একদেশিতা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র।" যেদিন স্বামীজীর স্পর্শে নিবেদিতার হৃদয় 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতির' সন্ধান পাইল, তাহার পর হইতেই একদেশিতা শূন্যলীন হইয়াছিল—"এখন হইতে উক্ত শিষ্যা বরাবর স্বামীজীর সর্ববিধ মতামত আপাতদৃষ্টিতে হাজার অসম্ভব বা অপ্রিয় বোধ হইলেও অবাধে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন" (স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে)।

' এই 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতি', 'অহং'-এর পূর্ণাহুতিপ্রদানের পর হোমানলের জ্যোতি—'যে অনল জলে অবন্ধন শিখা মেলি আর্যবেদীতলে' তাহার জ্যোতি, গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'আত্মসংযম-যোগাগ্নি' তাহার দীপ্তি—চির-উদ্ভাসিত ছিল নিবেদিতার চিত্তে। আলমোড়ায় বাসকালে ধ্যানাভ্যাস সহায়ে ইহার শিখাকে উজ্জ্বলতর করিয়া অনির্বাণ রাখিয়াছিলেন তিনি চিরদিন। ইহাই নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' করিয়াছিল, ইহাই তাঁহাকে 'মহাশ্বেতা'র পুণ্যকান্তি দিয়াছিল, ইহাই 'নিবেদিতা'র সর্ববিধ কর্মতৎপরতার, বিপুল বীর্যের, অসীম সাহসিকতা প্রকাশের পটভূমি। ইহাই ভারতীয়তার, ইহাই বিশ্বজনীনতার প্রাণ। ইহাকে বাদ দিয়া দেখিলে নিবেদিতার কোন ক্ষেত্রের কর্মপ্রচেষ্টার মূল্যায়ন যথাযথ হইবে না, এই হোমানলের দীপ্তিতেই তাঁহার কর্মপ্রেরণা প্রদীপ্ত, ভারতের শিক্ষা, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প সব কিছুকেই তিনি উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন ইহারই পুণ্য দীপ্তিতে। অহমিকাশূন্যতার, পরিপূর্ণ স্বার্থত্যাগের এই দীপ্তি ছাড়া ভারতীয়তার, বিশ্বজনীনতারও সর্ববিধ মূর্তিই প্রাণহীন প্রতিমামাত্র, যত নিপুণভাবেই আমরা সেগুলির কাঠামো গড়িয়া তুলি না কেন, যত গঠননিপুণতা ও বর্ণবিন্যাসদক্ষতাই দেখাই না কেন।

নিঃশেষে আত্মাহুতির এই যজ্ঞানলশিখাই, জ্ঞানালোকই নিবেদিতার চোখের সামনে উদ্ভাসিত করিয়াছিল ভারতমাতার মন্দিরদ্বার, যেখানকার পূজারিণী হইবার জন্য স্বামীজী তাঁহাকে ভারতে আনিয়াছিলেন। দেশ সেখানে গুরুর জন্মভূমি মাত্র নয়, ভগবানের মন্দির; ভারতবর্ষ সেখানে মা, বিশ্বজননী—" 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য' বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান,—এমন একটি মন্দির গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আর একটি বিরাট মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, যে-মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা এই দেশমাতৃকা স্বয়ং—এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে, সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে।" এই ভারতমাতার পূজাই নিবেদিতা করিয়াছেন বিবিধ কর্মোপচারে, ইহারই মন্ত্র জপ করিয়াছেন ও তাঁহার বিদ্যালয়ের বালিকাদের জপ করিতে শিখাইয়াছেন—"ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ। —মা, মা, মা।" আলমোড়ায় 'অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র জ্যোতিতে' তিনি যে 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্' সত্তার সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই 'শব্দাতীত' সত্তাকেই দেখিয়াছেন ভারতমাতার মধ্যে, ইহাতে আত্মনিবেদনই ভারতে নিবেদিতার জীবনেতিহাস। এখানে স্বামীজীর ভারতপ্রেম আর নিবেদিতার ভারতপ্রেম একই-জাতীয় জিনিস—উহা বিশ্বপ্রেম, উহা ভগবৎপ্রেম, আপাতদৃষ্টিতে সীমিত মনে হইলেও কোন সীমারেখায় উহা আবদ্ধ নহে।

বিশ্বপ্রেম আত্মনিবেদনেরই প্রেমময় রূপ।

ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আজ আমরা এখানে যাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবানুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি, সেই ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও ভারতকে তাঁর স্বদেশ করে নিয়েছিলেন, ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যেখানে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই হিমাচলের কোলে তাঁর সমাধিক্ষেত্রের উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে যে কথা কয়টি উৎকীর্ণ রয়েছে, আক্ষরিক অর্থেই তা অতি সত্য—"এখানে বিশ্রাম করছেন ভগিনী নিবেদিতা যিনি তাঁর সর্বস্ব ভারতকে অর্পণ করেছেন।"

আয়ার্ল্যাণ্ডে তিনি জন্মেছিলেন, ইংলণ্ডে তিনি প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ, কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম সারা বিশ্বেরই। তাঁর আদর্শ ও আত্মনিবেদনের ভাব তাঁকে অনন্তের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। তাঁর পিতা-মাতা নিষ্ঠাবান খৃষ্টানদম্পতি ছিলেন, নিবেদিতার জন্মকালেই তাঁর মা তাঁকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। নিবেদিতাও এসেছিলেন স্বার্থত্যাগ- ও সত্যলাভেচ্ছা-গুণভূষিত হয়ে। তাঁর অন্তরে আত্মাহুতির প্রচ্ছন্ন অনল একটি প্রদীপ্ত জীবন শিখার স্পর্শে প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় ছিল। আর ঠিক এই জিনিসই ঘটেছিল যখন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতার প্রচণ্ড স্বাধীন প্রকৃতি এবং এই 'হিন্দু যোগীর' ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য সতর্কতা-অবলম্বন সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর মহত্ত্ব ও গরিমায় তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। এর ফল যা হল, পরবর্তীকালে নিজেই তা ব্যক্ত করেছেন তিনি—"এই ব্যক্তির বীর-সত্তার সন্ধান আমি পেয়েছি। স্বদেশবাসীর প্রতি এঁর যে ভালবাসা তার দাস ক'রে রাখতে চাই আমি নিজেকে।"

ভগিনী নিবেদিতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভারতকে প্রদত্ত একটি অতুলনীয় উপহার। এই মনীষিণীকে ভারতে এনে তাঁর মনের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে তাঁকে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করে তুলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—যেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভূমিতে দৃঢ়বদ্ধমূল একটি বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভূমিতে সেটিকে রোপণ করেছিলেন। এই ক্ষেত্র-পরিবর্তন নিবেদিতার মত বীর-হৃদয়ার পক্ষেও বড় বেদনাদায়ক হয়েছিল, কিন্তু পরিণামে তিনি নিজেকে রূপান্তরিতা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই 'গুরুর' শিষ্যা হয়ে এবং তিনি যেমন চান ঠিক সেইভাবে ভারতের সেবিকা হয়ে চলা—কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু নিবেদিতার মত নারীর কাছে কতখানি আশা করা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ তা জানতেন বলে মোটেই হতাশ হননি তিনি। গুরুর তত্ত্বাবধানে

---

* গত ২৮শে অক্টোবর, মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত—ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি-প্রদান-সভায় প্রদত্ত মূল ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ। —সঃ

থেকে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রতি গুরুর যে অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং যিনি তাঁকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ ও তাঁর সঙ্গে তদনুরূপ আচরণ করতেন সেই শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ—এ সব কিছু মিলে আপাত-প্রতীত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। সেই থেকে বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে তিনি নিজেকে ভারতের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতের যুবকগণের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছেন তিনি, ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তাদের আহ্বান করেছেন। ভারতীয় নারীর শিক্ষা- ও উন্নতি-কল্পে তিনি কর্মরত হয়েছেন, চারুশিল্প, শিক্ষা, সমাজ-জীবন, ধর্ম, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শকে পাশ্চাত্যের নিকট সহজবোধ্য করবার জন্য তিনি বহু বক্তৃতা দিয়েছেন এবং Religion and Dharma, Web of Indian Life, Footfalls of Indian History, Siva and Buddha, Kali the Mother প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারতের তৎকালীন বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিদের উপরও তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

শিক্ষাকার্যে নিবেদিতার জন্মগত অধিকার ছিল, তার জন্য প্রয়োজনীয় কল্পনাশক্তি ও অন্যান্য গুণে ভূষিত ছিলেন তিনি। ভারতে বালিকাদের শিক্ষার জন্য তিনি একটি স্কুল খুলেছিলেন; তারই সমৃদ্ধরূপ বর্তমান 'ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'। তাছাড়া ভারতে 'জাতীয় শিক্ষা' গড়ে তোলার কাজে ভিত্তিস্থাপনে তাঁর সক্রিয় অবদান অনেকখানি।

তাঁর হৃদয় ও বুদ্ধির মহৎ গুণাবলী এবং তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভা তাঁর কাছে টেনে এনেছিল সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি ক্ষেত্রের সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের। তাঁদের ভেতর অনেককেই তাঁদের নিজস্ব কর্মে উদ্বুদ্ধ এবং সাহায্যও করেছিলেন তিনি। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তায়, তাঁর অভিনবত্বে, তাঁর করুণায়, তাঁর অভিমানরাহিত্যে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাছে স্নেহবদ্ধ হয়েছেন, তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়েছেন, তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেছেন অনেকেই। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্যটি হ'ল 'জ্যোতির্ময়ী দেবকন্যা' সহজাত পবিত্রতা এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত গুরুর ও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদই মার্গারেট নোবলকে জ্যোতির্ময়ী দেবকন্যায় পরিণত করেছিল।

ভারতকে যথাসাধ্য সেবা করতে গিয়ে নিবেদিতার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, জাতিকে গড়ে তুলতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সঙ্গে কোনরূপ আপস করা তাঁর মনঃপূত হল না, কারণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে রাজনীতির কোন স্থান ছিল না। কাজেই নিজের এবং সঙ্ঘের উভয়েরই প্রতি সুবিচার হবে জেনে তিনি সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এলেন, ভাবলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারবেন এখন। সঙ্ঘের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কিন্তু রেখেই দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতাগণ নিবেদিতাকে আগে যেমন স্নেহ যত্ন করতেন, তাঁর সঙ্ঘত্যাগের পরও সমভাবেই তা করতে লাগলেন, আগের মতোই তাঁদের আপনজন হয়ে রইলেন তিনি। সঙ্ঘের নিরাপত্তার জন্য, শুধু কাজকর্মের দিক থেকে প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, অন্য আর কোন দিক থেকেই নয়। তাঁর এই সঙ্ঘত্যাগের সিদ্ধান্তের পিছনের যথার্থ সংবাদ কিছু রাখতেন না এমন একদল লোক কিন্তু এ বিষয়ে ভুল বুঝেছিলেন। কাজটি তাঁর কাছে অতীব বেদনাদায়ক ছিল

নিঃসন্দেহ, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, নিজের কাছে এবং যে দেশকে তিনি এত ভালবাসেন তার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হলে অবলম্বন করার দ্বিতীয় কোন পথ আর নাই।

তাঁর রাজনীতি ছিল জবরদস্ত ধরনের, আবেদন-মূলক নরমপন্থী রাজনীতির পথে চলার মত ধৈর্য তাঁর ছিল না, সেজন্য স্বদেশী-আন্দোলন তাঁর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। রাজনীতি বিষয়ে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও বিভিন্নপন্থী রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ভারতকে সংহত হতেই হবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল সেই ভারত, যে ভারতে "ধর্মের মহান পুনঃ-সংস্থাপন হয়েছে—যখন সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হবে সাধারণ দুর্বলতায় নয়, সাধারণ দুর্ভাগ্য বা দুঃখের কারণে নয়, একতাবদ্ধ হবে একটি মহান· চিরজাগ্রত সাধারণ জাতীয়তাবোধে, সাধারণ পৈতৃক সম্পদে।"

অশেষ দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে নিবেদিতাকে, কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন তিনি। স্বামীজী তাঁর সামনে ত্যাগের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন এই ব'লে, "অতীতে ত্যাগই ছিল নিয়ম, আর ভবিষ্যতেও যে তাই-ই থাকবে।" গুরু তাঁর সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, নিবেদিতা তাই গ্রহণ করেছিলেন, 'Kali the Mother' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "নিজের জন্য কোন করুণার প্রত্যাশা রেখো না, আমি তোমায় সর্বজীবে করুণার আধার করে তুলবো। নিজের অন্ধকারকে তুমি সাহসের সঙ্গে বরণ করে নাও, তাহলে তোমার আলো বহুজনের সুখের কারণ হয়ে উঠবে। তুচ্ছতম কাজটি সযত্নে সম্পন্ন কর, মুছে ফেলো উচ্চমঞ্চের বাসনা।"

ভারতমাতার পূজাবেদীতলে নিবেদিতা যে বিবেকানন্দের অনবদ্য অর্ঘ্য, সেই বিবেকানন্দের নিকট প্রার্থনা করি—এই মহাজীবন যেন দেশের যুবকগণকে দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধ করে।

ভগবৎপ্রসঙ্গ*

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, রবিবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৩)

জগতে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই আছে। এই সুখ-দুঃখ আছে একরকম ভালর জন্যই। ভগবানকে মানুষ ভুলে যাবে না। আর স্বর্গের মতো শুধু সুখই থাকলে মানুষ তাঁকে মনে রাখত না।

ভগবান ইচ্ছা করলে একসঙ্গে সকল মানুষকে মুক্ত করে দিতে পারেন। তাঁর এত শক্তি। কিন্তু খেলা করার জন্যই হোক আর যেজন্যই হোক তিনি তা করছেন না। এই মহামায়ার খেলা। ঠাকুর বলতেন, তিনি সব ভাবে খেলা করছেন। তিনি সবই দেখছেন। তাঁর অত্যন্ত দয়া। তিনি যেন দয়া করবার জন্যই হাত বাড়িয়ে আছেন। আমাদের দেরী হয় বলে বলি ভগবান কি নিষ্ঠুর। কিন্তু তা নয়। আমাদের মনই ব্যাকুল নয়। সূর্য ওঠার আগে পুব দিকের আকাশ লাল হয়ে ওঠে, তেমনি আমাদের মনে ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা জাগলে তাঁর কৃপা পেতে আর দেরী হয় না। কিন্তু নোঙর ফেলে দাঁড় টানলে কি হবে। সেই গল্প জান তো? এক রাত্রে কতকগুলি লোক খুব নেশা করেছে। তাদের খেয়াল হয়েছে—রাত্রে নৌকা করে বেড়াতে যাবে। ভরা নদী। গভীর রাত। আকাশে তারাগুলি মিট্ মিট্ করছে। তারা প্রাণ খুলে গান ধরেছে—আর দাঁড়ও টানছে খুব জোর। ক্রমশঃ রাত শেষ হয়ে এল। ভোরের আলো একটু একটু দেখা দিয়েছে। আরও পরিষ্কার হলে দেখে তাদের নৌকা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। কেন এমন হল? নেশার ঘোরও তখন কেটে গেছে। দেখে যে নোঙরটি তোলা হয়নি।

তেমনি আমাদের অহঙ্কারই হল যত অনর্থের মূল। ঠাকুর তাই বললেন, অহঙ্কার ত্যাগ করতে না পারলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না, তিনি ভার লন না। এই 'আমি' 'আমার' জন্য আরও অনেক জাগতিক কামনা-বাসনা এসে পড়ে। তাই তাঁকে পাই না। আর এই কামনা-বাসনাগুলি পূরণ করার জন্য আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। তিনি যেগুলি পূরণ করা প্রয়োজন মনে করেন, সেগুলিই দেন। ছেলে আবদার করে বিষ চাইলে মা কি দেবেন? কখনই না। সেজন্য তাঁর কাছে বড় জিনিস চাইতে হয়। ভক্তি বিশ্বাসই হল আসল। আর 'অহং' তো সহজে যাবে না—কাজেই তাঁরই দাস হয়ে থাকুক। ঠাকুর এই 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি'র কথাই বার বার বলে গেলেন।

তাঁর কাছেই বলতে হয়—প্রভু, তুমি তো আমাদের মন দেখছো, তুমি দয়া করে আমাদের হাত ধরে টেনে নাও। এভাবে কাজ কর, কাজ ছেড় না। তাঁর কাজ তিনি করবেন। এটি বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও।

(বেলুড় মঠ, সোমবার, ২২শে এপ্রিল ১৯৬৩)

পাহাড় চড়াই করতে গেলে লাঠির সাহায্য নিতে হয়। তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে গেলে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া চাই। সে সাহায্য আসবে কিছু সাধনভজন

* প্রসঙ্গের অনুলিখন

করার পর। পাঁচ হাজার দশ হাজার জপ করলেই হল না। শিশুর মতো সরল হওয়া চাই, আন্তরিক হওয়া চাই। একটু টান থাকা দরকার। হরি মহারাজ বলতেন, সাধন ভজন তপস্যা যা কিছু ডানায় ব্যথা হওয়ার জন্য। ঠাকুর সেই মাস্তুলের পাখীর উদাহরণ দিয়েছেন। একটি পাখী জাহাজের মাস্তুলের উপর বসেছিল। জাহাজ কখন ছেড়ে গেছে সে খেয়াল করেনি। সমুদ্রের ভেতর বহুদূর আসার পর তার মনে হল—কোথায় আমি এলাম। তখন সে তীরের দিকে উড়ে গেল। কিন্তু কূল-কিনারা কিছু না পেয়ে ফিরে এল। কিছু পরে আবার অন্য দিকে উড়ে গিয়েও কিছু দেখতে না পেয়ে মাস্তুলে ফিরে এল। এমনি ভাবে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারদিকে ঘুরে কোথাও এতটুকু আশ্রয় না পেয়ে শেষে মাস্তুলেই আশ্রয় নিল।

তেমনি সাধন-ভজন ঠিক ঠিক করলে আমরা বুঝতে পারব—তাঁর সাহায্য বা কৃপা ছাড়া কোন উপায় নেই। জগতে দুঃখ কষ্ট থাকবেই। এই দুঃখ-কষ্টের অনলে তিনি পুড়িয়ে তোমাদের মনকে খাঁটি করে নেবেন। সময় সময় মনে হয়—এত অশান্তি, মনের এত আবর্জনা কেমন করে দূর হবে? তা নয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যেমন একটি দেশলাই-এর কাঠিতে মুহূর্তমধ্যে সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনি তাঁর কৃপা হলে মনের সকল আবর্জনা, জঞ্জাল, অশান্তি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে।

সংসার বড় পিচ্ছিল জায়গা। সংসারে থাকতে হবে, কিন্তু সংসার যেন ভেতরে না ঢোকে। পদ্মপাতা জলে থাকে, কিন্তু জল তার ওপরে থাকতে পারে না। নৌকা জলের ওপরেই চলে, কিন্তু নৌকার ভেতরে জল ঢুকলেই বিপদ। সংসারের এই সুখ দুঃখ সবই ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র তিনিই সত্য। এটি মনে রেখে সংসার করলে, কর্তব্য বুদ্ধিতে সব কাজ করে গেলে সাংসারিকতা বা আসক্তি ঢুকতে পারবে না। মনের প্রশান্তি নষ্ট হবে না।

তিনি আমাদের নিয়ে খেলা করছেন কেন জানি না। ধৈর্য ধরে ডেকে যাও। তাঁকে যে যত আপনার করে নিতে পারবে তার তত শীঘ্র হবে। সংসারে নানা কাজে তোমাদের রেখেছেন—যেন পরীক্ষা নিচ্ছেন। হতাশ হবে না। পথ চলতে সুরু কর। দূরত্ব ক্রমেই কমে আসবে। উই পোকা কত ছোট, কিন্তু তিলে তিলে বাড়িয়ে কত বড় উইটিপি তৈরী করে ফেলে।

(বেলুড় মঠ, মে, ১৯৬৩)

বিষয়ভোগের ইচ্ছা যাদের আছে তারাই বলে ভগবান নেই। মায়া দুরকম—একটিতে বাঁধন কাটে, অপরটিতে বাঁধন খোলে। ঠাকুর বললেন, বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। এতে সংসারের বন্ধন ক্ষয় হয়ে যায়। আর অবিদ্যামায়া আশ্রয় করলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ও যত সব ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস উপস্থিত হয়, এতে ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারের বন্ধনও ক্রমশঃ দৃঢ় হয়ে উঠে।

এই মায়াতে আবদ্ধ হয়ে মানুষ মনে করে বিষয়েই আসল সুখ বা আনন্দ। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে, তবু খেতে ছাড়ে না। পুকুরে জাল ফেললে কিছু মাছ লাফিয়ে পালিয়ে যায় আর কিছু মাছ পাঁকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। জেলে তাদেরই হিড় হিড় করে টেনে তোলে। শেষে মৃত্যু। তেমনি মানুষেরও অবস্থা।

তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। গাছের পাতাটি পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ছাড়া নড়ে না। ঠাকুর মানুষের রূপ ধরে ভক্ত সেজে কত তপস্যা করে গেলেন। এ শুধু আমাদের জন্য। সবই তাঁর পরীক্ষিত জিনিস। ধর্মের কথা তিনি এত সহজ করে বুঝিয়ে গেলেন যে, ছোট্ট ছেলেও বুঝতে পারে। এ রকম আর কোথাও দেখা যায় না। এক Christ-এর কাছে কিছু পাওয়া যায়। ঠাকুর আন্তরিক ব্যাকুলতা ও বিশ্বাসের উপর খুব জোর দিয়েছেন। সরল বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়। ছোটছেলের সরল বিশ্বাসে ভগবান তার হাতে খেয়ে গেলেন—এ কাহিনী শোনা যায়।

সমুদ্রে স্নান করতে গেলে জানতে হয় কিভাবে ঢেউয়ের মধ্যে ডুব দিতে হয়। জোয়ারের সময় সাঁতার দেওয়া শক্ত। ভাঁটার সময়ও উলটো দিকে সাঁতারকাটা শক্ত। যারা ভাল সাঁতার জানে তারা কিন্তু সবই পারে। তাদের কাছে শিখে নিতে হয়। আর জান তো? নদীর এপার থেকে ওপারে যেতে হলে সাঁতরে বা নৌকা করে যেতে হয়—একেবারে সোজা যাওয়া যায় না, angle করে (বাঁকা ভাবে) যেতে হয়। তেমনি ভগবানকে আশ্রয় করে, কিরূপ কৌশল করে সংসার করতে হয়, ঠাকুর কত সহজ সরল ভাবে তা বলে গেলেন! চোখে আঙ্গুল দিয়ে কত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিলেন। ভগবানকে আশ্রয় করে চললে বিপদের সম্ভাবনা কম সংসারে দুঃখ-কষ্ট দেখে মানুষের মনে বৈরাগ্য আসে।

নিজেকে কখনও ছোট বা দুর্বল মনে করো না। ছোটছেলের আবদার করার মতো তাঁকেই সব জানাও। দেরী হলে হতাশ হবে না, ভয় পাবে না। মা বলেছেন, আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, তা হলে আমাকেই তো তুলে পরিষ্কার করতে হবে। ভগবানকে আশ্রয় করে থাকলে তলিয়ে যায় না। একদিন না একদিন দর্শন লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আন্তরিক টান হলে তিনি দেখা দেবেনই, দেখা না দিয়ে পারবেন না। যেমন জলে চুবিয়ে ধরলে একটু বাতাস পাবার জন্য মানুষ অস্থির হয়ে উঠে, তেমনি আগ্রহ ও ব্যাকুলতা হলে তাঁর দর্শন মিলবেই।

পার ক'রে দাও

শ্রীসুকুমার মণ্ডল

এ দ্বীপেতে বেচাকেনা শেষ।
সর্বস্বান্ত আমি এক বিদেশী বণিক
শূন্যহাতে আসিয়াছি তোমার বন্দরে,
পারানি কিছুই নাই,
কৃপা ক'রে মাঝি তুমি দাও পার ক'রে।

পণ্যের সম্ভার নিয়ে একদিন এই ঘাটে
বেঁধেছিনু তরী,
আশা ছিল বেসাতির শেষে
আবার ভাসিয়া যাব অন্য কোন দেশে

হীরা মুক্তা মানিকেতে নৌকাখানি ভরি
গর্বভরে,
সে তো স্বপ্ন আজ,—
আমার সোনার তরী লুটেছে তস্করে।

ধনমদে মত্ত হয়ে কোনদিন খুঁজিনি তোমারে।
আজ আমি কৃপাপ্রার্থী মুমূর্ষু নাবিক;
ক্ষমা কি পাবো না?—
যেতে কি পাবো না সেই অজানা বন্দরে?

শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

এইরূপ সকালে বিকালে শ্রীশ্রীমহারাজের চরণপ্রান্তে বসিয়া আনন্দে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন একটি বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। স্বামী শুদ্ধানন্দজী তখন মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক, বেলুড় মঠের কিছু কিছু কাজও তিনি দেখিতেন। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত, নিরভিমান ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং আমাদের সকল কাজে আন্তরিক উৎসাহ দিতেন। কিন্তু কেন জানি না সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমরা সকলে মহারাজের অমৃতোপম কথা শুনিতেছি, তিনি মঠের কর্মপবিচালক আর একজন সাধুকে লইয়া হঠাৎ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, "মহারাজ, আপনার নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে।" মহারাজ অন্তর্দ্রষ্টা, তাঁহার ভাব দেখিয়া তিনি সবই বুঝিতে পারিলেন ও বলিলেন, "বল সুধীর (শুদ্ধানন্দ মঃ), তোমার কি বলবার আছে?" তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এই সকল ছেলেরা আপনার নিকট সকালে বিকালে বসিয়া আপনার উপদেশ শুনিতেছে। অথচ মঠের কাজকর্ম করিতে বলিলে ইহারা প্রায় কেহই কিছু করে না। এইভাবে চলিলে আমাদের পক্ষে মঠের কাজ চালানো মুশকিল হইবে। মহারাজ, তাই আমাদিগকে অনুমতি দিন যে, যাহারা এইরূপ কাজ করিতে চাহে না, তাহাদিগকে আমরা মঠ হইতে বাহির করিয়া দিব।" মহারাজ এতক্ষণ কোন উত্তর দেন নাই। কিছু পরে তিনি (সুধীর মঃ) যখন বলিলেন, "আর মহারাজ, আমরা বাহির করিয়া দিলে উহারা যেন আপনার এখানেও কোন স্থান না পায়", তখন মহারাজের যেন ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনি একটু উত্তেজিতভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি বলছো, সুধীর? তোমাদের কেবল কাজ আর কাজ, এইসব ছেলে যাহার জন্য ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, যাহার জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার কতদূর কি হইল—তোমরা কি কখনো ইহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা কর? কখনো কি খোঁজ লও, ইহারা কে কতটুকু বসে, কতটুকু ধ্যানজপ করে? আমি তো দেখিতেছি ইহারা প্রায় কেহই কিছুই করে না। কেহ বা একটু আরাত্রিকে যায়, আবার কেহ বা তাহাও যায় না। এজন্যই তো আমি ইহাদিগকে লইয়া বসি। কোথায় তোমরা তোমাদের পূর্ব সাধন-ভজনের অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহাদিগকে এ বিষয়ে একটু সাহায্য করিবে, না কেবল কাজ আর কাজ।" এমন সময়ে একজন প্রাচীনতম মহারাজ একটু ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "ইহারা তো সবই জানে, আমাদের নিকট কি আর শিখিবে?" শুনিয়া মহারাজ আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'কি বল,—ভাই, ইহারা কতটুকু জানে? এই তো সবে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসিল। তোমরা যদি ইহাদিগকে কিছু না দাও, উহারা কোথা হইতে শিখিবে? দেখ —ভাই, কিছু পাইতে গেলে কিছু দিতে হয়। এই দেখ না, দলে দলে ছেলেরা হরি ভাই এর (তুরীয়ানন্দজীর) সেবার জন্য কাশী ছুটিতেছে, আর এখানে আমরা একটি সেবক পাইতেছি না। তাহারা সেখানে

কিছু পায়, তাই যাইতেছে। আর আমরা এখানে তাহাদিগকে কিছুই দিতে পারিতেছি না।"

পরে সুধীর মহারাজের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আর সুধীর, তুমি ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছ, তাহা তোমরা করিতে পার। কিন্তু আমার দরজা ইহাদের জন্য সর্বদা খোলা থাকিবে, আমি কাহাকেও তাড়াইয়া দিতে পারিব না। তোমরা কেবল কাজ কাজ বল, কিন্তু আমি তো দেখিতেছি এখন আমাদের এমন কয়েকজন সাধুর প্রয়োজন, যাহারা শুধু ধ্যান-জপ লইযাই থাকিবে।"

*   *   *

আমরা মহারাজের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তাঁহার অপরিসীম দয়া, আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও আনন্দে আপ্লুত হইলাম।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাদিগকে পিতার অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি নবাগত আমাদিগের কয়েকজনকে একদিন মহারাজের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই ছেলেরা নূতন আসিয়াছে। ইহারা তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইতে চায়, ইহারা সকলেই ভাল ছেলে। তুমি দীক্ষা দিলে ইহারা কৃতার্থ হইবে।" কিন্তু মহারাজ তখন সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না। পরে অন্য সময়ে যখন আমরা তাঁহার কাছে বসিয়া আছি তখন হঠাৎ বলিলেন, "তোরা দীক্ষা চাস্। তা বাবা, আগে জঙ্গল পরিষ্কার কর্। শম, দম, উপরতি আদি শিক্ষা কর্। তারপর দীক্ষার কথা বলিস্। জঙ্গলে বীজ ফেলিয়া কি হইবে!"

কিন্তু মহারাজ অতি কৃপাপরবশ হইয়া এ-যাত্রা আমাদের কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্য দিলেন। ব্রহ্মচর্যের পরের দিন যখন আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, তখন অতি স্নেহপূর্ণ চক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্, কালী (কালী মহারাজ, স্বামী অভেদানন্দ) বলছে যে, তোদের ব্রহ্মচর্যের পর তিন দিন তোরা ভিক্ষা করে খা। এ তো ভাল কথা, কি বলিস্?" আমরা মহারাজের অন্তরের কোমলতার কথা বুঝিতে পারিলাম ও বলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, নিশ্চয়ই আমরা তিনদিন ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

কালী মহারাজ দীর্ঘ ২৫ বৎসর পর দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের সাধন-ভজনের সময় তাঁহারা কত কঠোরতা করিয়াছেন। কতদিন অর্ধাশনে, অনশনে বা সামান্য ভিক্ষায় তাঁহাদের দিন কাটাইতে হইয়াছে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া এ কথা আমাদিগকে ও পূজনীয় মহারাজদিগকে প্রায়ই বলিতেন এবং আমরাও আমাদের বর্তমান সাধন-ভজনের সময় ঐরূপ কিছু কঠোরতা কেন করিব না—ইহা লইয়া পূজনীয় মহারাজের সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। কিন্তু আমাদের শরীর ও মন যে উহার অনুকূলে নহে, দেশের হাওয়াও যে বর্তমানে অনেক বদলাইয়াছে—বহুদিন প্রবাসে থাকায় এ কথা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না। অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ ইহা বুঝিতেন এবং আমাদিগকে ঐরূপ কঠোরতা করিতে নিষেধ করিতেন।

যাহা হউক, যথাসময়ে আমরা ভিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে যাইতেছি, এমন সময়ে পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের একজন সেবক আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ এখনই তোমাদের সকলকে (নূতন ব্রহ্মচারীদের) ডাকিতেছেন।"

আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি পূর্ববৎ সস্নেহে বলিলেন, "তোরা ভিক্ষা করতে যাচ্ছিস্ তো?" আমরা বলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ।" তদুত্তরে তিনি কোমল হইতে আরও কোমল হইয়া বলিলেন, "দেখ্, তোদের ভিক্ষার জন্য সূর্যি (সূর্য মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দ, মহারাজের সেবক) আজ এই পাঁচ টাকা দিয়েছে। তোরা এই দিয়েই আজ বাজার হতে চাল প্রভৃতি কিনে নিয়ে আয় এবং মঠে এক গাছের নীচে বসে রান্না করে খা। তা হলেই তোদের ভিক্ষার কাজ হবে।"

আমরা মহারাজের অন্তরের কথা বুঝিলাম এবং সেইরূপ বাজার হইতে চাউল প্রভৃতি আনিয়া সেইদিন ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করিয়া খাইলাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও সেইদিন আমাদের নিকট আসিয়া 'ভিক্ষান্ন পবিত্রান্ন' বলিয়া আমাদের নিকট হইতে উহার কিছু চাহিয়া খাইলেন। পরের দুই দিন, যতদূর মনে পড়ে, আমাদের ভিক্ষার ব্যাপার ঐরূপেই সমাধা হইয়াছিল। বাহিরে একদিনও যাইতে হয় নাই।

এরূপ মাতৃবৎ কোমল অন্তঃকরণ লইয়া মহারাজ আমাদিগকে পরিচালিত করিতেন।

এ বৎসর আমাদিগের কাহারও আর দীক্ষা হইল না। পর বৎসর ১৯২১ সালে মহারাজ ৺কাশী যাইবার পথে কয়েকদিনের জন্য মঠে আসিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কাশীর উভয় আশ্রমের মধ্যে কি লইয়া বহুদিন হইল একটা গোলমাল চলিতেছে, মঠ মিশনের সেক্রেটারী পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) বহু চেষ্টা করিয়াও উহা মিটাইতে পারেন নাই। তাই তিনি ভুবনেশ্বরে গিয়া শ্রীশ্রীমহারাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ঐ কাজের জন্য ৺কাশী লইয়া যাইতেছেন।

যথাসময়ে মহারাজ ৺কাশী রওনা হইয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম, ঐ বিষয়ে তিনি কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, শুধু তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভায় সেখানকার উভয় আশ্রম আলোকিত করিয়া বসিলেন। সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সকালে বিকালে এবং সময় পাইলেই অন্য সময়েও তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক সঙ্গ ও আলাপনে নিজ-দিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সকল গোলমাল, ভেদ-বিবাদ মিটিয়া গেল। সেখানে যাঁহারা কর্মযোগী—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বামীজীর শিষ্যও ছিলেন—যাঁহারা কখনও সন্ন্যাস লইবেন না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একে একে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। আর যাঁহারা কর্মকে সাধন-ভজনের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও স্বামীজীর প্রবর্তিত নিষ্কাম কর্মের মর্ম বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে আপনা-দিগকে তাহাতে নিবেদিত করিলেন। মহারাজের আধ্যাত্মিক প্রভাবে শুধু আমাদের আশ্রম-দুটি নয়, সমগ্র কাশীধাম আনন্দে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এই সময়ে ৺কাশী অদ্বৈত আশ্রম হইতে জনৈক সাধু তাঁহার এক গুরুভ্রাতাকে ঐ বিষয় লিখিয়া জানাইলেন। তিনি আনন্দে ভরপুর হইয়া ঐ চিঠিখানি লইয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে উহার মর্ম নিবেদন করিলেন। আমরা দেখিলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ঐ চিঠিখানি তাঁহার হাত হইতে চাহিয়া লইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাহা হইবে না? তাহা হইবে না? যাঁহাকে চকিতে দর্শন করিলে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়, তাঁহাকে যিনি সতত দর্শন করিতেছেন, তাঁহার উপস্থিতিতে ঐরূপ হইবে না! ঐরূপ হইবে

না। লিখিয়া দাও শ্রীশ্রীমহারাজের ঐ পুণ্যসঙ্গ হইতে কেহ যেন বিচ্যুত না হয়। সকলকে প্রাণভরিয়া তাঁহার এই পুণ্যসঙ্গ উপভোগ করিতে বল।"

আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলাম। বুঝিলাম ইঁহারাই ইঁহাদের পরস্পরকে বুঝিতে সক্ষম। আমরা আর কতটুকু বুঝিতে পারি।

যথাসময়ে ৺কাশীকে আনন্দরসে ভরপুর করিয়া মহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি খুবই উদার। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "তারকদা, এবার আমি ইহাদের (আমাদের দেখাইয়া) দীক্ষা দিব ঠিক করিয়াছি। তবে এবার আর খালিহাতে হইবে না। প্রত্যেককে ১০১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতে হইবে। কি বলেন?" মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের রহস্য বুঝিতেন। তিনিও মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠিকই তো। খালিহাতে কেন দিবে? উহারা ঐ ১০১৲ টাকা জোগাড় করুক।" তাঁহারা উভয়েই জানিতেন, আমারাও জানিতাম, উহা জোগাড করা আমাদের কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

যথাসময়ে আমাদের দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষান্তে আমরা মহারাজকে প্রণাম করিলাম। কিন্তু ১০১৲ টাকা প্রণামী দিয়া নহে, সামান্য কিছু ফুল ফল দিয়া, যাহা শ্রীশ্রীমহারাজই নিজ হাতে আমাদের তুলিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলাম। তাঁহার স্নেহময় দৃষ্টিতে, তাঁহার দিব্য স্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। কিন্তু তখন আমরা ভাবিতে পারি নাই যে, এই আনন্দ এক ভবিষ্যৎ মহানিরানন্দের সূচনা করিতেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। নির্বিচারে তাঁহার শেষ স্নেহকণাটুকু দিয়া তিনি আমাদের সকলকে ধন্য করিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পর ব্যক্তিগত কাজে আমাকে একটু পূর্বাশ্রমে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে একদিন একাকী বসিয়া আছি, হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীমুখখানি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল ইনিই আমার সর্বাপেক্ষা আপন, আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আমার গুরু, আমার ইষ্ট, আমার জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক। খুবসম্ভব ইহারই পরদিন মঠ হইতে আমার এক বন্ধুর চিঠি পাইলাম—'মহারাজ কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শীঘ্র চলিয়া আইস।' আমি কিছু-মাত্র বিলম্ব না করিয়া তার পরদিনই চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম সমস্ত মঠ নীরব, নিথর। সকলেই যেন কি এক মহা অশুভের আশঙ্কা করিতেছেন। বাগবাজার বলরাম মন্দিরে মহারাজ অসুস্থ হইয়া আছেন। আর দলে দলে সাধুগণ সেখানে তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিতে ছুটিতেছেন। আমরাও সেখানে গিয়া তাঁহার পুণ্য দর্শন পাইলাম। ইহার দু-এক দিন পরে শুনিলাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত সকল সাধুকে পূর্বরাত্রে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া দিব্য আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি যে সেই ব্রজের রাখাল, যাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর দিব্যচক্ষে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা করিতে দেখিয়াছিলেন, ভাবমুখে এইকথা তিনি পুনঃ পুনঃ সেদিন সকলকে শুনাইয়াছেন। মহারাজ বুঝিলেন, আমরাও বুঝিলাম—এইবার তাঁহার লীলাসংবরণের দিন আসিয়াছে।

ইহার দুই দিন পরেই ১৯২২-এর ১০ই এপ্রিল তিনি লীলাসংবরণ করিয়া দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে মঠে আমরা

কয়েকটি অল্পবয়স্ক সাধু বসিয়া আছি। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "ভাই, মহারাজ চলিয়া গেলেন। আমার কিন্তু, ভাই, মনে হইত তিনি আমাকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন।" তখন আর একজন বলিলেন, "আমারও, ভাই, ঐরূপই মনে হইত (অর্থাৎ তাঁহাকেও মহারাজ সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন)।" আর একজনও অনুরূপ কথা বলিলেন। তখন আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিকবয়স্ক একজন সাধু বলিলেন, "দেখ, মহারাজের ভালবাসা ছিল অগাধ সমুদ্রের মতো। উহারই ২।১ বিন্দু জল ছিটাইয়া তিনি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। আর আমরা ভাবিতাম - গোটা সমুদ্রটাই বুঝি আমরা পাইয়া বসিয়াছি। কিন্তু সমুদ্র যে-সমুদ্র সে-সমুদ্রই রহিয়া গিয়াছে।" এইরূপই ছিল তাঁহার কামগন্ধহীন সর্বকল্যাণকারী অফুরন্ত অপূর্ব ভালবাসা।

ইহার বহু বৎসর পরে আমরা কনখলে (হরিদ্বারে) গিয়াছিলাম। সেখানে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় কল্যাণ মহারাজ, আমরা যাহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মতিথিদিবসে কিছু কিছু বলিতে বলিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ৺কাশী প্রভৃতির কথা উঠিলে আমি একটু হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ খুব চালাক ছিলেন।" ইহাতে কল্যাণ মহারাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি তাঁকে কি বুঝেছ, ছোকরা? তিনি চালাক ছিলেন? স্বামীজী ছিলেন সূর্যের মতো। তাঁর কাছে আমরা কেহই ঘেঁষতে পারতাম না। আর মহারাজ ছিলেন চন্দ্রের মতো। তাঁর স্নিগ্ধ ছায়ায় আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে যেতাম। তাঁর কথা আমরা সকলেই শুনতাম। তিনি শুধু সঙ্ঘকর্তা বলে নন, আমরা প্রত্যেকেই জানতাম তিনি আমাদের যা বলেছেন তা আমাদেরই পরম কল্যাণের জন্য। এজন্যই নির্বিচারে আমরা সকলে তাঁর কথা শুনতাম। তিনি বুদ্ধিমান বা চালাক ব'লে নয়।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া সেদিন আমরা অন্তরের অন্তরে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, ইহাই হইল মহারাজের যথার্থ পরিচয়।

শ্রীশ্রীমহারাজের স্নেহের অভিব্যক্তির কথা এখানে একটু লিখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—উহা ছিল সাধারণ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, আমরা দেখিযাছি, তাহার প্রতি একেবারে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতেন। সে হয়ত দিনের পর দিন অন্যের সহিত তাহার সামনে বসিয়া আছে। তিনি সেই সকল ব্যক্তির সহিত হয়ত কথা কহিতেছেন বা তাহাদের লইয়া অন্য নানা প্রকারের আনন্দ করিতেছেন, কিন্তু সেই স্নেহ-ভাজনের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইতেছেন না। হঠাৎ একদিন তাঁহার সেই দিব্য অমৃতবর্ষী চক্ষু লইয়া তিনি তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল আর দিনভর সেই আনন্দের রেশ তাহার হৃদয়ে রহিয়া গেল। আর যদি কৃপা করিয়া তিনি তাহাকে একবার স্পর্শ করিতেন তো সে আনন্দ অন্ততঃ তিনদিন তাহার মনে স্থায়ী হইয়া রহিল। ইহা কোন অতিরঞ্জন বা কল্পনার কথা নয়। উপভোক্তাগণের নিজ মুখে আমরা ইহা শুনিয়াছি এবং উহার দুই-একটু ছিটেফোঁটা আমাদেরও সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

এইরূপই ছিল এ অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক ভালবাসা, যাহার কণা পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের অনুধ্যান

স্বামী সন্তোষানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ক্রমে লক্ষ্মীপূজা এলো। পূজক স্বামী রামেশ্বরানন্দ (ভাব মহারাজ), আমি তন্ত্রধারক। আমিও অবশ্য উপবাসী ছিলাম। ঐ দিন সন্ধ্যার পরেই ছিল চন্দ্রগ্রহণ। তাই পূজা খুব শীঘ্র শীঘ্র সেরে নিতে হলো। পূজা শেষ হতে হতেই গ্রহণ লেগে গেল। তাই তখন আর কিছু খাওয়া হলো না। ঐ সময় আমি নিত্যই পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পা একটু টিপে দিতাম সন্ধ্যার পর। সেদিনও তাই তার কাছে যেতেই বললেন, "আজ পারবে?" আমি বললাম, "পারবো।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আমি কিন্তু না খেয়ে থাকতে পারবো না। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।" বলেই একজনকে আদেশ করলেন তাঁকে কিছু খেতে দেবার জন্যে। সে দিল একটি রাজভোগ। সেটি খেয়েই বললেন, "Superstition! একটা গ্রহের ছায়া পড়েছে আর একটা গ্রহের উপরে। এই তো ব্যাপার। হ্যাঁ, তবে nature এ এত বড় একটা পরিবর্তন! এতে সহজেই লোকের মন একাগ্র হয়। এ সময় যদি ধ্যান-জপ করে, সে খুব ভাল। যারা পুরশ্চরণ করবে তাদের আজ খুব জুত।" শেষের কথা কটি বলার কারণ যে, সেদিন গ্রহণ একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

বছরখানেক হল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হয়ে গেছে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা। নাম হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম্। নামটি দিয়েছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ নিজে। আর স্বামী নির্বেদানন্দও তখন হয়েছেন ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য। খুব সম্ভবতঃ ১৯১৯ সালের স্বামীজীর তিথিপূজার সময় তাঁরা কয়েকজন ভুবনেশ্বরে গিয়ে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে পান ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা। ১৯২০-র ২৪শে ডিসেম্বর এই ছাত্রাবাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। কারণ ঐদিন শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ এসেছিলেন এই আশ্রমে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রামলালদা, ৺ক্ষীরোদ বিদ্যাভূষণ, শৌর্যেনবাবু ও পূজনীয় সূর্য মহারাজ। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ সকাল দশটা আন্দাজ আশ্রমে এসে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরে গেলেন আলিপুরে কোচবিহারের রাজবাটী বেলভেডিয়ার-এ। সেখানে ছিলেন তিনি শৌর্যেনবাবুর অতিথি।

যা হোক, ১৯২১ সালের প্রথমেই এই শিশু-আশ্রমকে হতে হলো এক মহাবিপদের সম্মুখীন। অনাদি মহারাজের হলো জ্বর। ক্রমে ঐ জ্বর পরিণত হলো ভয়ঙ্কর টাইফয়েড এ। পূজনীয় অনাদি মহারাজ যে ছাত্র পড়াতেন প্রধানতঃ তারই আয়ে আশ্রম চলতো। এর কিছুদিন আগে আর একটি কর্মী আশ্রমে যোগ দিয়ে সাধারণের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে অবশ্য আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তাতে সামান্যই টাকা আসতো। পূজনীয় অনাদি মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর ছাত্র পড়ানো হলো বন্ধ। কাজেই তাঁর পড়ানোতে যে টাকা আসতো, তাও বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে ক্রমে তাঁর অসুখ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। ডাক্তার ৺দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিকিৎসা করতেন। তিনি ছিলেন আমেরিকা-ফেরত হোমিওপ্যাথি-

চিকিৎসক। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার ৺দুর্গাপদ ঘোষ এম. বি.।

পূজনীয় অনাদি মহারাজের অসুখ কিন্তু ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগলো। এক সময় তিনি শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "এটা কার?" এরকম সময় একদিন পরম পূজনীয় মহাপুরুষজী এলেন তাঁকে দেখতে। এসেই গিয়ে বিছানার উপরে তাঁর মাথার কাছটিতে বসলেন। জিহ্বায় অত্যন্ত ঘা হওয়ায় অনাদি মহারাজের কথা তখন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "উঁচু চিন্তা মাথা থেকে সলাতে (সবাতে) পাচ্ছি না। বল (বড) কষ্ট হচ্ছে।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী তাঁর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, "উঁচু চিন্তা এখন থাক্। ও পরে আবার হবে।" পরে এসে বারান্দায় উপবেশন করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো একটু কিছু প্রসাদ তাঁকে দেব কি না। বেশ জোর দিয়েই বললেন, "হ্যাঁ, দাও।" শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদিত ফলমিষ্টি তাঁকে দেওয়া হলো। তিনি সামান্যই গ্রহণ করলেন এবং অল্প পরেই চলে গেলেন।

এর পর থেকেই পূজনীয় অনাদি মহারাজ আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগলেন। তিনি পরে বলেওছিলেন যে, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পূর্বের কথার পর থেকেই অসুখের ভেতর 'উঁচু চিন্তা' চলে যায়। তারপর আর কখনও আগের মতো নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করে 'এটা কার?'—এরূপ প্রশ্ন করেননি।

এরও কয়েক বছর আগের দুটি-একটি কথা বলছি। শুনেছি পূজনীয় অনাদি মহারাজের কাছে। বোধ হয় ১৯১৫ কি ১৯১৬ সালে তিনি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ করেন। ঐ-সময় অবশ্য তিনি ছিলেন সুরেনবাবু এবং কোচিং ক্লাস করতেন বলে মঠে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁকে ডাকতেন 'মাষ্টার' বলে। যা হোক, প্রথম দর্শনের দিনই পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে প্রণাম করামাত্র তিনি তাঁকে বললেন, "দেখ, স্বামীজীর 'রাজযোগে'র Introductionটা পড়ে দেখো। খুব rational লেখা।" তখনকার আশ্রমে অবশ্য দু'চারখানা বই ছিল, কিন্তু 'রাজযোগ' ছিল না। আর আশ্রমের খুবই সামান্য আয়ে বই কেনা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু সিদ্ধসংকল্প ঋষির ইচ্ছা অমোঘ সেদিন অযাচিতভাবে অনাদি মহারাজ কয়েকখানা বই পেলেন, তন্মধ্যে ছিল একখানা 'রাজযোগ'। বইগুলি এঁরই ছাত্রদের মারফত পাঠিয়েছিলেন পূজনীয় ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ।

আশ্রমে ফিরে এসে রাজযোগের ভূমিকা শুধু নয়, সমগ্র বইখানাই পড়ে ফেললেন। রাজযোগের ইঙ্গিত অনুসারে সাধন করবার প্রবল আগ্রহও তাঁকে পেয়ে বসলো। সেই থেকে কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের উপদেশ অনুসারে সাধনে রত থাকেন। অনাদি মহারাজ যে কেবল নিজের সাধন-ভজন সম্বন্ধেই শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের উপদেশ গ্রহণ করতেন, তা নয়। আশ্রমের অভ্যন্তরীণ জীবন সম্বন্ধেও সময় সময় তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি অনাদি মহারাজকে বললেন, "দেখ, ছেলেদের একটু পুষ্টিকর খাবার ব্যবস্থা কোরো।" শুনেই পূজনীয় অনাদি মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ মহারাজ, সপ্তাহে একদিন ডিম দেওয়া হয়।" শুনেই তিনি কিন্তু বললেন, "ডাল ভাত হজম করতে পারলেই শরীর গড়ে উঠবে। ডিমটা না দেওয়াই ভাল।"

খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের মতামত পূর্বের উক্তি থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। একদিন ১৯২৩-র গোড়ার দিকে মঠে রাত্রে লুচি-মাংসের ভাণ্ডারা। ভাণ্ডারা দিচ্ছেন পূজনীয় স্বামী প্রকাশানন্দ। কলকাতারও সব আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিমন্ত্রণ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদও পাওয়া যাবে, রাত্রে মঠেও বাস হবে। বেশ আনন্দের সঙ্গে মঠে গেলাম আমি ও স্বামী নির্বেদানন্দ। এবারই শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজায় অনাদি মহারাজের সন্ন্যাস হয়, নাম হয় স্বামী নির্বেদানন্দ। মঠে গিয়ে কিন্তু যা শুনলাম তাতে তো আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। আমাদের গিয়ে পৌঁছবার একটু আগেই এসেছিলেন স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ। তিনি ছিলেন তখন গদাধর আশ্রমের মোহন্ত। মঠে পৌঁছে তিনি গিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করা-মাত্রই মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করলেন, "আজ যে এলে?" চন্দ্রেশ্বরানন্দ স্বামী জবাবে বললেন, "এমনি এসেছি।" "কোনো কাজ আছে?" "আজ্ঞে না।" "তবে যে আশ্রম ছেড়ে এলে?" "সেখানে আজ বিশেষ কাজ নেই।" "কোন আগন্তুক যদি আসে?" 'যারা আছে তারা দেখবে'খন।" এরপরে মহাপুরুষজী বললেন, "লুচি মাংসের জন্য বুঝি এলে?" স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ ক্রোধভরে উত্তর দিলেন, "আমি লুচি-মাংসের জন্য এসেছি, একথা আমাকে কেউ বলতে পারবে না। আমি এখুনি চলে যেতে পারি।" মহাপুরুষজী বললেন, "যাও, চলে যাও।" আমরা গিয়ে দেখি স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ রাগ করে চলে যাচ্ছেন। শুনলামও সব। কাজেই ভয় হলো খুবই। পূজনীয় মহাপুরুষজীকে প্রণামও করতে হবে এবং মঠে রাত্রিবাসের জন্য তাঁর অনুমতিও চাইতে হবে। যা হোক, খানিক বাদে পূজনীয় অনাদি মহারাজের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বললাম, "মহারাজ, আজ মঠে লুচি-মাংসের ভাণ্ডারা। খবর দিয়েছিলেন, তাই এসেছি। এমনিতে তো আমাদের মঠবাস হয়ই না, এ উপলক্ষে মঠে রাত্রিবাসও হবে।" শুনে বললেন, "তা বেশ। এক রাত্তির তো? ওঁদের কি? আমেরিকা থেকে এলেন, একদিন লুচি-পাঁঠা খাইয়ে চলে গেলেন। তোমাদের এ দেশে পড়ে থাকতে হবে। ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়ে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুঝতে হবে আর কাজ করতে হবে। রাত্রে বেশী খায় গেরস্তরা। তারা রাত্রে বেশী করে খাবে, । ও-সব তোমাদের জন্য নয়। তবে একরাত একটু বেশী খেলে কিছু যাবে আসবে না।" দয়াময় মহাপুরুষ মহারাজের আদেশ ও উপদেশ পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের খাওয়ারও এক বৈশিষ্ট্য ছিল। দুপুরে সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে একত্র পঙ্গতে বসে খেতেন। ঠাকুরদের ভোগে যা কিছু উঠতো, সবই তাঁকে সাজিয়ে দেওয়া হতো। পূজার সময় ঠাকুরদের যে ফল মিষ্টি নিবেদন করা হতো, তারও কিছু কিছু একটি রেকাবিতে সাজিয়ে তাঁকে দেওয়া হতো। আর দেওয়া হতো একটা বাটিতে খানিকটা নালতে পাতার ঝোল। তিনি কিন্তু সবই একটু একটু চেখে দেখতেন। আলাদা একটা বাটিতে ঠাকুরদের প্রসাদী পায়েসও তাঁকে দেওয়া হতো। তিনি যে কটি ভাত খাবার তা ঐ নালতে পাতার ঝোল দিয়েই খেতেন। আর সবই একটু একটু চেখে দেখতেন মাত্র। বলতেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে।" কিন্তু কোন ব্যঞ্জনে যদি তরকারির বিসদৃশ সংযোগ ঘটতো, তা মোটেই

তাঁর নজর এড়াতো না। বলে উঠতেন, "এ কি combination হয়েছে? যা তা একটা মিলিয়ে দিলেই হলো?" পরে বাটি থেকে একটু পায়েস নিয়ে দুটি ভাতের সঙ্গে মেখে একটু খেতেন। তারপর সবটুকু পায়েস পাতে ঢেলে যে ভাত থাকতো তার সঙ্গে মেখে ফেলতেন, প্রসাদী ফলমিষ্টির থালা থেকে সন্দেশটি তুলে তাও ঐ ভাতের সঙ্গে মেখে বেশ একটি বড় ডেলা প্রস্তুত করে বলতেন, "বড়দা, এই রইল।" তারপর যখন জয় দিয়ে সাধু-ব্রহ্মচারীরা উঠে পড়তেন তখন বড়দা ঐ ভাতের ডেলাটি নিয়ে দিতেন একটি কুকুরকে। আর কুকুরটা সারাক্ষণ উঠোনে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো, বোধ হয় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের দিকে তাকিয়ে।

গ্রীষ্মকাল। সেদিন বেশ গরম। সকলের সঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীও এসে খেতে বসলেন। পূজনীয় ভাব মহারাজ (স্বামী রামেশ্বরানন্দ) নিজে খেতে না বসে একটি হাত পাখা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে হাওয়া করতে লাগলেন। ক্রমে খাওয়া শেষ হলো। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ প্রসাদী ফলমিষ্টির রেকাবিতে কিছু ফলমিষ্টি সাজিয়ে রেখে হাসতে হাসতে বললেন, "ভাব, এই যে এতক্ষণ হাওয়া করলে, তার মজুরী।" হাসিমুখে ভাব মহারাজ জবাব দিলেন, "অন্য মজুরী চাই না মহারাজ, চাই একটু আশীর্বাদ।" "আরে আশীর্বাদ তো আছেই, এটা নগদ বিদায়।"—বললেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ।

১৯২৩-র ৺বাসন্তীপূজা। হবে ভুবনেশ্বর মঠে। পূজনীয় ভবানী মহারাজ (স্বামী বরদানন্দ) একদিন এসে অনুরোধ জানালেন, ভুবনেশ্বর যেতে হবে ৺বাসন্তীপূজা করবার জন্যে। এই বছরই শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজায় সন্ন্যাস চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয়নি। পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, "এ ambition." কথা একেবারে ঠিক। কিন্তু তখন তা বোঝে কে? যা হোক, আমার অভিমানেও লেগেছিল দারুণ আঘাত। যদিও তিথিপূজার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, তবুও আমার সেই ঘা তখনও শুকোয়নি। তাই ভবানী মহারাজ যখন এসে অনুরোধ জানালেন ৺বাসন্তীপূজা করতে ভুবনেশ্বর যাবার জন্যে, তখন বেশ ক্রুদ্ধভাবেই সে অনুরোধ উপেক্ষা করলাম। ভবানী মহারাজ অনেক বোঝালেন, কিছুই ফল হলো না, আমি তাঁর কোন কথাই শুনলাম না। তিনি ফিরে গেলেন। দু'-এক দিনের মধ্যেই খবর এলো, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন। মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই হাসতে হাসতে তিনি বলে উঠলেন, "আরে, ভরত নাকি আমাদের উপর রাগ করেছ? আরে ভরত আমাদের ছেলে, আমাদের সন্তান, আমরাই তার আপনার জন, আমরা যা বলবো, তাই করবে। আমাদের কথা শুনবে না তো আর কার কথা শুনবে? আমরা যা বলবো তাই করবে।"—ইত্যাদি অনেক কথা বলতে লাগলেন। এত মিষ্টি কথা তো কখন শুনিনি। যেন মধুবর্ষণ হলো। সব রাগ অভিমান কোথায় চলে গেল। কে জানে, তিনিই হয়তো আমার অন্তরের ময়লা-মাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। কি বলবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আস্তে আস্তে বললাম, "মহারাজ, শুনেছি ঐ সময় জয়রামবাটীতে মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা হবে, সেখানে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে; আবার রাজা মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর মঠ, সেখানে ৺বাসন্তীপূজা, সেখানেও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এ দোটানায় পড়ে গেছি। এখন কি করবো, আপনি বলে দিন। বেশ প্রসন্নচিত্তে মহাপুরুষজী বললেন, "শরৎ মহারাজ আমাকে বলেছেন মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা পেছিয়ে দেবেন। যদি তা না হয়, তবে তুমি জয়রামবাটী যাবে। তা না হলে তোমাকে ছাড়বো না ভুবনেশ্বর যেতে হবে।" আমিও মহানন্দে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে ফিরে এলাম।

৺বাসন্তীপূজা উপলক্ষে মহাপুরুষজীর সঙ্গে একই ট্রেনে ভুবনেশ্বর যাওয়া গেল। ঐ ট্রেনে আরও অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূজনীয় স্বামী শঙ্করানন্দ ও অম্বিকানন্দ। মঠে পৌঁছেই গেলাম মূর্তি দেখতে। স্থানীয় কারিগরের প্রস্তুত মূল মূর্তিটি আমার মোটেই ভাল লাগলো না। পূজনীয় স্বামী অম্বিকানন্দ প্রভৃতিও মূর্তি অপছন্দ করলেন। কিন্তু নানাকলাবিদ্যা-বিশারদ স্বামী অম্বিকানন্দ লেগে গেলেন সেই মূর্তিটি শোধরাতে। আমি কিন্তু আর দ্বিতীয়বার মূর্তি দেখতে যাইনি। আমাদের যাবার আগে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল উঠোনে, এজন্যেই তোলা একটি একচালার তলায়। আমাদের যাবার পরে সবাই পরামর্শ করে স্থির করলেন, মঠবাটীর মধ্যের প্রশস্ত হলঘরে পূজা হবে। যা হোক, প্রতিমা অতি সন্তর্পণে তুলে এনে স্থাপন করা হলো হলঘরে। তারপর ষষ্ঠীর দিন সকালে দ্বিতীয়বার সেই মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজের সুদক্ষ হস্তের স্পর্শে এ কী অদ্ভুত পরিবর্তন! সত্যিই এখন মূর্তিটি হয়েছে অতি সুন্দর।

পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল। পূজার মধ্যে একদিন স্থানীয় একজন পণ্ডিত তাঁর স্বরচিত একটি সংস্কৃত-শ্লোক এনে দিলেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। স্বামী প্রশান্তানন্দ শ্লোকটি পড়ে বললেন যে, পণ্ডিতজীর প্রার্থনা হচ্ছে, তাঁকে একখানা পট্টবস্ত্র প্রদান করা হোক। বলা বাহুল্য, পূজনীয় মহাপুরুষজী পণ্ডিতজীর সেই প্রার্থনা তখনই পূর্ণ করে দিলেন। বোধ হয় একাদশীর দিন রাত্রে তাঁর কাছে কয়েকটি ভক্ত বসেছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "এ খুব কঠোর করতে পারে।" শুনেই মহাপুরুষজী বলে উঠলেন, "কি এমন কঠোর করেছে? আমরা এখনও যা করতে পারি, ও কি তা পারবে?"

ভুবনেশ্বর থেকে পুরী হয়ে ফিরে আসা গেল কলকাতায়। সেখান থেকে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা দর্শন করতে গেলাম জয়রামবাটী। মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। মহা-মহোৎসব লেগে গিয়েছিল, যেন আনন্দের বান ডেকেছিল। এই উপলক্ষে পরমারাধ্য স্বামী সারদানন্দজী কয়েকজনকে সন্ন্যাস দেন, আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। সন্ন্যাসের পরে ফিরে এসেছি স্টুডেন্টস্ হোমে।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আরও কিছু-কাল পরে ফিরলেন মঠে। মঠে গেছি তাঁকে দর্শন করতে। তিনি বসেছিলেন দোতলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি আরাম কেদারায়। আর তাঁর ডানদিকে আর একটি চেয়ারে বসেছিলেন পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজী। আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এই দেখ, ভরত পুজোর ভয়ে আমাদের ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিল।" আমি তৎক্ষণে তাঁকে প্রণাম করে পূজ্যপাদ অভেদানন্দজীকে প্রণাম করলাম। তিনিও হাসতে হাসতে বললেন, "কি রে, পুজোর ভয়ে

সন্ন্যাস নিলি ?" আমি তখন পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজকে বললাম, "না মহারাজ, আপনি বললেই আমি পূজা করবো।" শুনেই সোৎসাহে বলে উঠলেন, "এই তো চাই। মায়ের পূজো করবে না ? ভারি তো সন্ন্যাস। এই তো চাই। তখন তাঁরা বলেছিলেন বিধান নেই, ছিল না বিধান"—একথা বলেই নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, "এখন আমরা বলছি বিধান, হয়ে গেল বিধান।" এ পর্বের শেষ এখানেই হলো না।

সেবারে ৺দুর্গাপূজার সময় পূজনীয় স্বামী ধীরানন্দ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার পূজো কে করবে ?" "কেন, ভরত করবে।"—অকুণ্ঠস্বরে উত্তর দিলেন মাতৃগতপ্রাণ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ। পূজনীয় ধীরানন্দজী পড়লেন মহামুশকিলে। সন্ন্যাসী ৺দুর্গাপূজা কি করে করবে ? অথচ পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর এরকম সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কথা বলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি উদ্বোধন বাটীতে এসে সবই নিবেদন করলেন পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর কাছে। তিনি একদিন মঠে এসে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন, "এ আশ্রমেই আর একটি ছেলে আছে ক্ষুদিরাম বলে। সেটিও তো বামুনের ছেলে, তারও দীক্ষা হয়ে গেছে। সেও তো পূজো করতে পারে।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, তা ক্ষুদিরামও পারে। তা তাই হবে।"

স্বামী অম্বিকানন্দ ছিলেন সাধনভজনশীল কঠোরী সন্ন্যাসী। মনে হয়, সে সময় তাঁর একটা অবস্থা হয়েছিল, যেন মনটাকে একটু বহির্মুখ করতে পারলেই ভাল হয়। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি এসব কথা বলছিলেন, এমন সময় আমিও সে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। স্বামী অম্বিকানন্দজী বললেন, "একজন বলেছে একদিন গাড়ী করে আমাকে 'জু' গার্ডেনে নিয়ে যাবে। ভাবছি একদিন 'জু' দেখে আসবো।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "আমি কখনও 'জু' দেখিনি।" "যাবেন, মহারাজ ?" সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন স্বামী অম্বিকানন্দ। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "নাঃ, কি হবে। তুমিও যেমন। আমি তো কলকাতায় থাকতাম, কোনো দিন গড়ের মাঠ দেখিনি। সেদিন গদাধর আশ্রম থেকে গাড়ী করে ফিরছি, একজন বললে—এই গড়ের মাঠ। আমি চেয়ে দেখলাম। এই যে এতদিন গড়ের মাঠ দেখিনি, তাতেও কোন অভাববোধ ছিল না, আর এখন যে দেখলাম, তাতেও কিছু হলো না। এই তো চাই। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' ব্যস্, এই তো চাই। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।" কয়েকবার কথাটি বলে নিজের ঘরের যে দরজাটি দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়, সেই দরজাটি দেখিয়ে বলছেন, "ঐটি হলো বেশ জায়গা। ঐখানে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটাও দেখা যায়, আবার বাইরটাও দেখা যায়।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "একদিন ঠাকুর বললেন, 'দেখ, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কারুর বেলা তো এরকম হয় না ; তোমার বেলাই এমনটা কেন হলো ?' আমি বললাম, 'তা কি জিজ্ঞেস করবেন করুন না।' তিনি বললেন, 'তোমার বাবার নামটি কি ?' নামটি বলতেই বলে উঠলেন, 'ও তাই। তুমি তাঁর ছেলে ? তিনি এখানে আসতেন গো। আমাকে একটি কবচ দিয়েছিলেন। দেখ তো ঐ তাকের উপরে হাত দিয়ে।' তাকের উপরে হাত দিয়ে একটি কবচ এনে তাঁকে দেখালাম।

বললেন, 'হ্যাঁ, ঐ কবচটি তিনি আমায় দিয়েছিলেন। তাই তো, তাহলে তুমি তো একরকম গুরুপুত্র হোলে। তোমার সেবাটা নেয়া যাবে কি করে?' আমি বললুম, 'তা তিনি যাই হোন্, আমার তো আপনিই সব ' তারপর থেকে তাঁর জন্যে গাড়ু করে জল নিয়ে গেলে বলতেন, 'তাই তো, তুমি নিয়ে এলে? আচ্ছা, আগে একটু হাতে দাও।' তাঁর হাতে একটু জল দিলে সেটুকুও নিজের মাথায় দিয়ে তবে আমাকে ঢেলে দিতে বলতেন।"

আর একদিন, স্বামীজীর সঙ্গে তিনি যে মায়াবতী গিয়েছিলেন, সেই ঘটনার বর্ণনা করেছিলেন—"সে শীতকাল। পাহাড়ের রাস্তা সব বরফে ঢাকা। আমার ঘোড়াটা গেল পালিয়ে। আমাকে সেই বরফের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হলো। অনেক জায়গায় এতখানি করে পা দেবে যাচ্ছিল। সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। স্বামীজী বললেন, 'গুপ্ত আগে চলে যাক্। ওখানে খবর দিক্ যে আমরা আসছি, যেন গরম জল-টল সব ready করে রাখে।' তাই হলো, গুপ্ত চলে গেল। স্বামীজী আবার ছিলেন nervous। গুপ্ত চলে যাবার পরই ভাবতে আরম্ভ করলেন, 'ওকে এই পাহাড়ের রাস্তায় একা একা পাঠালাম। ও যদি রাস্তা ভুল করে বা ওর যদি অন্য কোন বিপদ হয়, তাহলে কি হবে?' স্বামীজীর এই রকম ভাবনা দেখে ঠিক হলো একজন পাহাড়ীকে পাঠানো হবে গুপ্তের খবর আনতে। একজন পাহাড়ীকে পাওয়াও গেল। স্বামীজী তখন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, সে লোকটা যদি দশ টাকা চায়, তাই দিতাম। লোকটা বললে, 'হাম্ এক রুপেয়া লেগা।' আমি কথা শুনে বললাম, 'এক রুপেয়া? থোরা কম্‌তি কর।' স্বামীজী বলে উঠলেন, 'ওদের সঙ্গে আবার দরাদরি কি? ও যা চেয়েছে, তাই দাও।' তাই ঠিক হলো, বললাম, 'আচ্ছা যাও, খবর নিয়ে এসো।' সে বলে, 'রুপেয়া দাও।' আমি বললাম, 'আগে খবর আন, তবে টাকা দেব।' সে বলে, 'এ্যায়সা জারা হায়, জায়েগা কেইছে। ঐ রুপেয়াটো (ট্যাঁক দেখিয়ে) হিয়া রাখ লেগা। ওছিকা গরমছে চলা জায়েগা।' তাকে একটি টাকা দিলাম, সেও রওনা হয়ে গেল। পরদিন সকালে তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, হাসতে হাসতে বলল, 'ও স্বামীজী হুঁয়া পৌছ গিয়া। আউর সব আচ্ছা হায়।'" তারপরে হাসতে হাসতে বললেন, "মায়াবতী পৌঁছে সেই বুড়ীকে (অর্থাৎ মিসেস সেভিয়ারকে) বিধবা দেখে আমি ভ্যাক করে কেঁদে ফেলেছিলাম।" শ্রোতাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আর স্বামীজী?" "স্বামীজী গম্ভীর"—জবাব দিলেন মহাপুরুষজী। * * *

আর এক দিনের ঘটনা। রামকৃষ্ণপুরের ৺নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ছেলে শ্যামবাবু ছিলেন পরমারাধ্য রাজা মহারাজজীর শিষ্য। তিনি কয়লার ব্যবসা করতেন। আর কোষ্ঠী দেখানো তাঁর একটা বাই ছিল। ৺ললিত 'মত্র ছিলেন তাঁর খুব সুহৃদ। তিনি আবার কোষ্ঠীও দেখতেন। ললিতবাবু বললেন যে কোষ্ঠীতে আছে, শ্যামবাবুর ঐ সময় কলেরা হবে, জীবন-সংশয়। শ্যামবাবু খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। যা হোক, তাঁর কোনো অসুখই হলো না। কিন্তু কথা চারদিকে খুব ছড়িয়ে গেল। তিনি একদিন মঠে এসেছেন সকালের দিকে। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আসতে দু'-এক কথার পর মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "আরে শ্যাম, তুমি মহারাজের সন্তান। তোমার ভয় কি? তুমি ঐ সব কোষ্ঠী-ফোষ্ঠী দেখে অত ভয় কর কেন? তুমিও যেমন! তুমি মহারাজের

শিষ্য। তোমার ওসবের দরকার কি? তুমি ও-কোষ্ঠী ফেলে দাও গে যাও।" তারপর নিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছেন, "এটা বাপের বড ছেলে ছিল কিনা, তাই এক কোষ্ঠী করিয়েছিলেন। খুব বড় কোষ্ঠী। আমি ঠাকুরের সন্তান। আমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? দিলাম একদিন গঙ্গায় ফেলে, গঙ্গার উপর দিয়ে পাক খুলতে খুলতে গেল, অনেক লম্বা। গিরিশবাবু এক সময় কোষ্ঠী নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করতেন। তিনি শুনে বললেন, 'অমন কোষ্ঠীখানা ফেলে দিলেন?' তুমিও ও-কোষ্ঠী ফেলে দাও। কি বল, ফেলে দেবে তো?" শ্যামবাবু আস্তে আস্তে জবাব দিলেন, "আমাদের insurance প্রভৃতি করতে হয়। তাই কোষ্ঠীর দরকার হয়।" তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তবে থাক্।"

৺মন্মথনাথ দত্ত ছিলেন আলিপুরের Deputy Superintendent of Police। তিনি এবং তাঁর পত্নী ছিলেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের খুব ভক্ত। তিনিও তাঁদের স্নেহ করতেন খুবই। তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। মঠের সব সাধুদেরই তাঁরা ছিলেন কাকাবাবু, কাকীমা। একদিন কাকীমা তাঁর এক বিধবা বান্ধবীকে নিয়ে গেছেন মঠে, সেখানে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে নিজের বান্ধবীর পরিচয় দিয়ে বললেন, "ইনি বিধবা।" শুনেই মহাপুরুষ মহারাজ বলতে আরম্ভ করলেন, 'বেশ, বেশ, বিধবাই ভাল। বেশ, বেশ, বিধবাই ভাল।" তিনি যত এই কথা বলছেন, ততই কাকীমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, কারণ তিনি ছিলেন সধবা। সহসা তাঁর উপর নজর পড়ায় বললেন, "সধবাও ভাল, বিধবাও ভাল।"

এর অল্প কয়েকদিন পরে পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ মঠে এসে এই কথা শুনে একদিন দুপুরে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে হাসতে হাসতে ঢুকে বললেন, "দাদা নাকি বলেছেন—সধবাও ভাল, বিধবাও ভাল।" তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'হাঁা, বিধবারা ভাল। তারাই তো ধর্মটা রেখেছে। পূজার্চনা, বার-ব্রত সব তো তারাই রেখেছে। আর সধবারাও ভাল। তারাই এই মহামায়ার সংসারে জীবদের আনে।" পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ আবার বললেন, "আমি শুনে বললাম, তা দাদার মতোই কথা হয়েছে।' এই সেদিন যখন জিজ্ঞেস করলাম—শরীরটা কি রকম আছে, তা বললেন, 'এই এখানে বাত, এখানে সর্দি, এই তো। তবে আত্মা ভাল আছে।'" শুনেই পরমানন্দময় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বলতে আরম্ভ করলেন, "হ্যাঁ, তাই তো. এই দেখ না (হাঁটুতে হাত দিয়ে) এখানে ব্যথা, ও সর্দি, এই সব।" (তারপর যেরকম করে জন্তু-জানোয়ারকে আদর করে, সেই রকম নিজের দক্ষিণ উরুদেশে চাপর মারতে মারতে) বলতে লাগলেন, "তবে এই শরীরে ভগবানলাভ হয়। ধন্য মানব-শরীর, এই শরীরে ঈশ্বরদর্শন হয়, ধন্য মানব-শরীর।" সমস্ত স্থানটি এক গম্ভীর আবেশে ভরপুর হয়ে গেল। কারুর মুখে কোন কথা নেই। নিজের আনন্দে নিজে বিভোর হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "ধন্য মানব-শরীর, ধন্য মানব-শরীর, এই শরীরে ভগবানলাভ হয়।"

ভগিনী নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

জাতি-তত্ত্ব : নিবেদিতার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পরিমাণ কম নয়। তাঁর এই সুবিপুল আলোচনায় মুখ্যস্থান পেয়েছে তাঁর 'জাতি-তত্ত্ব' বা Theory of Nationality। নিপুণ রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞের মতো তিনি জাতি, জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন তাঁর 'Civic And National Ideals'-নামক গ্রন্থে। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার মৌলিকতা আমাদের চমকিত করে, গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের দেশ বলেই 'Civic And National Ideals'-এর মতো উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক রচনা অনাদৃত, অন্য কোন দেশ হলে হয়ত এ গ্রন্থখানি রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মস্ত বড় ত্রুটি, দৃষ্টির বিভ্রম এবং চিন্তার নৈরাজ্য এখানে সবচেয়ে সুস্পষ্ট। তাই রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের এই অপূর্ব রচনাটির নামও এখনকার ছাত্রছাত্রী কেউ জানে না।

উপরোক্ত গ্রন্থে 'জাতি ও জাতীয়তা'—রাজনীতিশাস্ত্রের এই বহু-আলোচিত বিষয়টির ওপর ভগিনী নিবেদিতা অনেক নূতন আলোকপাত করেছেন। যে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশ-প্রেম তাঁর চিত্তলোকে এক বিশেষ আসন অধিকার করেছিল, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান করে দেখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সত্যানুসন্ধী ভগিনী নিবেদিতা। জাতীয়তাবাদের গুণাগুণ নিয়ে যে বিভ্রান্তি দেশের সর্বত্র আজ বিরাজ করছে, ভগিনী নিবেদিতার এই বৈজ্ঞানিক আলোচনা তার নিরসনে বহুল পরিমাণে সহায় হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আজ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকেও এরূপ কথা বলতে শোনা যায় যে, জাতীয়তাবাদ আমাদের অনেক অনিষ্ট করেছে। জাতীয়তাবাদ আমাদের অনেক অনিষ্ট করেনি, করেছে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার—একথা অনেকেই ভুলে যান। জাতীয়তাবাদ যে সঙ্কীর্ণতার জনক নয়, বিশ্বের সকল মানুষের সঙ্গে ঐক্যবোধ-জাগরণের পথে যে পরিপন্থী নয়, তা নিবেদিতার আলোচনায় অতি সুস্পষ্ট।

জাতি বা 'নেশন' সম্পর্কে নিবেদিতার গবেষণার ক্ষেত্র হয়েছে 'ভারত', যেখানে বহু বিচিত্র গোষ্ঠীর বহু বিচিত্র বর্ণের ও ধর্মের এবং বহু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমাজের সমাবেশ ঘটেছে। ভারতের মত জাতিগঠনে উপাদান-বৈচিত্র্য অন্য কোন দেশে অন্য কোন জাতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। সেজন্য নিবেদিতার জাতি সম্বন্ধে ধারণা পাশ্চাত্য ধারণাসকল হতে পৃথক হয়েছে।

জাতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ধারণায়ও বহুল মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Burgess-নামক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের সিদ্ধান্তানুসারে একটি জাতি বা 'নেশন' হল "a population of an ethnic unity, inhabiting a territory of a geographic unity." একটি জনসমাজের মধ্যে যদি বংশগত ঐক্য থাকে এবং ভৌগোলিক ঐক্যের পটভূমিকায় যদি এই ঐক্য সংস্থাপিত

হয়, তাহলেই তাকে একটি 'নেশন' বলা যেতে পারে। Ethnic unity বা বংশগত ঐক্য বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করে Burgess বলেছেন যে, এ বিষয়ে ঐক্য বলতে তিনি বুঝেছেন, "a population having a common language and literature, a common tradition or history, a common custom and a common consciousness of rights and wrongs." কিন্তু তাঁর ভাষার ঐক্যের উপর জোর দেওয়ায় অনেকে আপত্তি তুলে বলেছেন যে, ভাষার ঐক্য না থাকলেও একটি জনসমাজ 'জাতি' হয়ে উঠতে পারে, যেমন সুইস্ জাতি। সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের তিনটি ভাষা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের একজাতি বলে বিবেচনা করে। এ বিষয়ে সুবিখ্যাত ফরাসী রাজনীতিশাস্ত্রবিৎ রেনানের (Renan) মত অন্যপ্রকার, তাঁর মতে "·it was not community of language and race which makes a people a nation, but the sentiment of a common heritage of memories, whether of achievement and glory or of suffering and sacrifice, together with a desire to live together in the same state and to transmit their heritage to their posterity." সমাজশাস্ত্রবিৎ Novico-এর মতে: "it (a nation) is a cultural and spiritual unity and is the highest product of social evolution." [১] সমাজবিজ্ঞানীদের মতে একটি নেশন গঠনের মূলে দু'রকম প্রভাব আছে—একটি স্থানগত, অপরটি ঐতিহ্যগত। এই উভয়প্রকার উপাদানের মধ্যে প্রধান বংশগত ঐক্য (racial unity), ভাষাগত ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ঐক্য এবং স্থানগত ঐক্য। কিন্তু দেখা গেছে ভাষাগত, বংশগত ও ধর্মীয় ঐক্যের অভাবেও একটি জাতি গড়ে উঠতে কোন বাধা নেই। ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি কোন জাতিরও বংশগত ঐক্য নেই। ভাষার ঐক্য সুইটজারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে নেই। ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান—এই তিন ভাষায় কথা বলেও সুইটজারল্যাণ্ডের সকল অধিবাসীই সুইস্। ধর্মীয় ঐক্য ইংলণ্ড, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি কোন দেশেই নেই। এদের সকলেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হলেও এদের মধ্যে প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতবিরোধ সামান্য নয়। সেজন্য বংশগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় ঐক্য সত্ত্ব জাতিগঠনে সহায়তা করলেও এসবলের কোন একটি ক্ষেত্রে অনৈক্য জাতিগঠনে বাধা হয় না। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল জনসাধারণের একত্র বাসের ইচ্ছা। M. Hauser তাই বলেছেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা—"It is the will of a people to live together and not race or language, which makes a nation" এই একত্র বাসের ইচ্ছার সহায়ক অতীত ঐতিহ্য, অতীত ইতিহাস, একত্র সুখদুঃখ ভোগের স্মৃতি। অর্থাৎ একই সৌভাগ্য, গৌরব মহিমা বা দুর্ভাগ্য-ভোগের অংশীদার যারা, তারা ভাষাগত, বর্ণগত বা ধর্মগত ঐক্য না থাকলেও একজাতিত্ববোধের বন্ধন অনুভব করতে পারেন। এজন্য Burns অতি সুন্দর করে বলেছেন, "A common memory and a common ideal—these more than a common blood—make a nation." [২]

কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞাও খাটে না। ভারতে ধর্মবৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিত্র্য অন্যান্য

[১] পাশ্চাত্য মতের আলোচনায় Garner-এর Political Science and Government-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

[২] Burns : Political Ideals—p 178

অনেক দেশের চেয়ে অনেক বেশী। এ বিষয়ে অনৈক্যই চোখে পড়ে, ঐক্য নয়। এমনকি ঐতিহাসিক স্মৃতিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এক নয়। যথা মুসলমানগণ একদা ছিলেন বিজেতা, হিন্দুগণ বিজিত। বিজেতা ও বিজিতের সুখদুঃখভোগ কখনও এক প্রকার হতে পারে না। রাজা প্রজার ভাগ্যও এক নয়, তারা একই গৌরবমহিমার অংশীদার নয়, একের পক্ষে যা গৌরবের, অপরের পক্ষে তা মর্মান্তিক লজ্জার বিষয়। অভিজ্ঞতার বিভিন্নতায় ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্মৃতিও বিভিন্ন, ইতিহাসও বিভিন্ন। কিন্তু নিবেদিতা তার 'নেশন' সম্পর্কে ধারণা গড়েছেন ভারতকে সম্মুখে রেখে। সেজন্য প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে তাঁর 'নেশন' সম্পর্কে ধারণা মেলে না। এ বিষয়ে তাই নিবেদিতার নিজস্ব সংজ্ঞা হল—"Those who having a common region of birth, connect the work, the institution, the ideals, and the purposes of their lives with that region and with their fellows, and those who, doing this, undergo a common economic experience, form a nation."[৩] নিবেদিতার এই সংজ্ঞানুসারে যদি জাতীয় স্মৃতিও এক না হয়, এমনকি জীবনাদর্শের ঐক্যও যদি না থাকে, তা হলেও কিছু এসে যায় না। এ পার্থক্যও প্রথা, আচার, আচরণ, ভাষা, বর্ণ ও ধর্মের পার্থক্যের ন্যায় জাতিগঠনের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। শুধু যদি সকল বৈচিত্র্য সুনিয়ত ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠে থাকে, এবং সকল বিচিত্র প্রথা প্রতিষ্ঠান আদর্শকে সে-স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়, আর যদি বিচিত্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ভাগ্য একই হয়ে থাকে তাহলে সকল বিচিত্রতা সত্ত্বেও একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে।

আমরা প্রায়শই দেখি ভারতের এই বৈচিত্র্য বিদেশীরা বুঝে উঠতে পারেন না। ভারতকে অনেকে সেজন্য প্রায়ই এক নানাজাতির সমাবেশে গঠিত এক উপমহাদেশ বলে বর্ণনা করে থাকেন। Garner প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশীয় রাজনীতিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতারা ভারতের জাতিভেদ, বর্ণবৈচিত্র্য, ধর্মীয় অনৈক্য ভারতের জাতীয়ত্বের পথে বাধা বলে বিবেচনা করেছেন।[৪] এমনকি বহু ভারতীয়ও এ বিষয়ে বিভ্রান্তি অনুভব করেছেন, দেখা যায়, এক ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যাধিকার (Right of self-determination) সমর্থন করেছেন এ কথা ধরে নিয়ে যে, এসকল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এক ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থান করলেও তারা এক একটি বিভিন্ন জাতি (nationality), রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করলে তারা এক একটি স্বতন্ত্র নেশন হবে।[৫] এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার স্বচ্ছ ও সত্য দৃষ্টি ও মৌলিক বিচার বিশেষ লক্ষণীয়। তাঁর মতে ভারতীয় জাতির বৈচিত্র্যই তার ঐক্যের প্রমাণ বহন করছে, বৈচিত্র্য ছাড়া ঐক্য তো অর্থহীন—"for the fact that we are all different is, in its way, a proof of our unity!"[৬] ভারতের বিচিত্র বিশাল ভাবসম্পদ দেখে তিনি আরও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, বৈচিত্র্যই একটি জাতির শক্তির উৎস। অথচ পাশ্চাত্য মতের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয়েরাও একথা প্রায়ই বলেন, ভারতের এই বৈচিত্র্য

৩ Civic And National Ideals—p. 57

৪ Garner A Political Science and Govt, p. 117 and 120 and Muir Nationalism And Internationalism, p. 39.

৫ Dr. Dhirendra Nath Sen: Revolution by Consent.

৬ Civic And National Ideals—p. 47

সংহতির পক্ষে বাধা, তার জাতীয় দৌর্বল্যের কারণ। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার মতে সংহতি-সাধক স্থানের প্রভাবের ফলে এই বৈচিত্র্যই একটি জাতির শক্তির পরিমাণ নিরূপণ করে। তিনি সুস্পষ্ট বলেছেন—"Complexity of elements, when duly subordinated to the nationalising influence of place, is a source of strength, and not weakness to a nation." সুতরাং তাঁর মতে যে জাতির বৈচিত্র্য যত বেশী সে তত নানা সম্পদের অধিকারী, সে তত ঐশ্বর্যবান, জাতিপুঞ্জের মধ্যে তার স্থান তত উচ্চে—"The rank of a nation in humanity is determined by the complexity and potentiality of its component parts."[৭]

সুতরাং নিবেদিতার মতে বৈচিত্র্যেই একটি জাতির শক্তি ও সংহতি নিহিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও অঞ্চলের মধ্যে এক অভিনব ঐক্য দেখতে পেয়েছেন তিনি—"I find an overwhelming aspect of Indian unity in the fact that no single member or province repeats the function of any other"[৮] একটি জাতি তো একটি যন্ত্র নয়, বরং একটি জাতির সংহতি অনেকটা জৈবিক সংহতির মতো (organic unity)। একটি জীব-দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, একটির কর্ম যেমন অপরের কর্মের পুনরাবৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ পৃথক সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রত্যেকের কর্ম, একটি জাতির জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর কর্মও সেইরূপ পৃথক ও স্বতন্ত্র ধরনের। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যকলাপই জীবদেহের ঐক্য সম্পাদিত করে। ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অঙ্গীভূত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিচিত্র কর্ম ও প্রথাসকল, আচার ও আচরণ একটি জাতীয় জীবনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এক অপূর্ব সমন্বয়-প্রতিভা। যুগে যুগে বহু বিভিন্ন বহিরাগত জনগোষ্ঠীকে তাদের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, ধর্ম, দেবদেবী, প্রথা, প্রতিষ্ঠান আপনার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে এবং এভাবে সে তার শক্তি বৃদ্ধিই করেছে। ভারত এই সমন্বয়-প্রতিভায় পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়—বিজিত ভারত বারংবার বিজেতা জাতির ধর্ম, ভাষা প্রভৃতিকে আত্মসাৎ করে নিজ জাতীয় দেহে বিলীন করেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছিলেন, "শক-হুণদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

একটি জাতিগঠনের ব্যাপারে নিবেদিতার মতে তাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এই সমন্বয়-প্রতিভার। তাঁর পূর্বোক্ত 'Civic And National Ideals'-শীর্ষক গ্রন্থে তিনি নিজেই তাই প্রশ্ন তুলেছেন, "What is required for the manifestation of a strong concious national life? Is love of place, pride of birth or confidence in past culture all sufficient?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—"Neither any, nor yet all of these can ever be enough. In addition there must be the irresistible mind of co-ordination, the instinct of co-operation, the tight-knit discipline of a great brotherhood." এ বিষয়ে ভারতের অদ্বিতীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, " One of the master-facts in Indian history, a fact borne in upon us more deeply with every hour of study, is that India is and always has been a synthesis"[৯] এই

৭।৮ Ibid p. 47

৯ Footfalls of Indian History—P. 16.

অদ্বিতীয় সমন্বয়-প্রতিভাবলেই আমরা দেখতে পাই ভারতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভাবাদর্শের দৃঢ় ঐক্য সারা ভারতময় প্রতিযুগেই দেখা গেছে। অথচ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, প্রতিটি অঞ্চল স্বকীয় বিকাশের পথ কখনও পরিত্যাগ করেনি। তথাপি যুগে যুগে দেখা গেছে যে, একই ভাবের বন্যা সারা দেশে এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্ত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে—" the same tides have swept the land from end to end. A single impulse has bound province to province at the same period, in architecture, in religion, in ethical striving". ভারতের এই অপূর্ব সুরসংগতিই তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের, জাতীয় শক্তির পরিচয় বহন করছে, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক দৃঢ় ঐক্য সারা দেশের এক লক্ষ্যপথকে নির্দেশ করেছে: "The provincial life has been rich and individual, yet over and above it all India has known how to constitute herself a unity consciously possessed of common hopes and common loves". (ক্রমশঃ)

নিবেদিতা

শ্রীশান্তশীল দাশ

অশিক্ষা কুশিক্ষা আর নানা কুসংস্কার-
জর্জরিত এ ভূমির নিলে সেবাভার
গুরুর আদেশে; চিত্ত দ্বিধাশঙ্কাহীন,
এলে চলে এ ভূমিতে; ব্রত কী কঠিন
পালন করেছ তুমি সারাটি জীবন—
সেবার পরমা মূর্তি, গুরুর চরণ
স্মরণ করেছ নিত্য আর নিরলস
আপন কর্তব্যপথে চলেছ, মানস-
ভূমিতে জাগ্রত মন্ত্র—সর্ব-সেবা-সার
জীব-সেবা—সেই সেবা সাধনা তোমার।

প্রতীচ্য-নন্দিনী তুমি, কার ইচ্ছা বলে
প্রাচ্য-জননীর বুকে এলে তুমি চলে;
সেই জননীর পদে আত্মসমর্পিতা
হলে তুমি, কী সার্থক নাম নিবেদিতা।

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া'

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ছুটির পালা ফুরোলো। এবার কাজ, কেবল কাজ—যতদিন না আবার আনন্দময়ীর আগমনের আভাসে নীল আকাশে সাদা মেঘের পরিতৃপ্তি বর্ষাশেষের বিজয়কেতন উড়িয়ে দেখা দেবে। আকাশে সাদা মেঘ, মাটিতে শুভ্র কাশ। মনে পড়ে, পূজোর ছুটিতে আসানসোল যাবার পথে এক রাতে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত কাশের বন দেখেছিলুম। মাইলের পর মাইল সেই নীলাভ শুভ্রতার অফুরন্ত মেলা ওই ট্রেনকে কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নসমুদ্রের তরণী করে তুলেছিল। তারপর আবার দিগন্তবিস্তৃত নীলিমার রাজ্যে আমরা হারিয়ে গেলুম।

আসলে ছুটি মানেই তো হারিয়ে যাওয়া। সেকথা কাজের ভীড়ে মনে থাকে না। ব্যষ্টি বা সমষ্টির প্রয়োজনে আমরা সবাই কর্মরত। এমন কি নতুন নতুন কাজ আমরা সৃষ্টি করে থাকি। উপমা দিয়ে বলতে গেলে, এ দুনিয়ার কর্মী মৌমাছিরা অহর্নিশি এক সংসার-মৌচাক রচনার জন্য খেটে চলেছি। ছুটির শেষের এই কলকাতার দিকে চেয়ে দেখুন। দিনে রাতে কোথাও এর জনতার স্বল্পতা নেই। এর চেয়ে বড় শহরও আছে, সেখানে এর চেয়ে বেশী ভীড়। আর কে না জানে, কাজের যত রকমারি, যত বৈচিত্র্য, ততই সভ্যতার সমৃদ্ধি। সভ্যতা কেবল দিনকেই মুখর করে না, তার রাত্রিও সমান বিনিদ্র।

ওদেশে শুনি সপ্তাহের শনি রবি দুটি দিনই ছুটি। পাঁচদিনের প্রচণ্ড কর্মস্রোতের চেয়ে দুদিনের বিশ্রামের উল্লাস প্রচণ্ডতর হয়ে ওঠে। আর সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহব্যাপী ছুটি যদি থাকে, তাহলে সংবাদপত্রে দুর্ঘটনার খবর বিশেষ স্তম্ভে সগৌরবে স্থান পায়। আমেরিকার ৪ঠা জুলাইয়ের স্বাধীনতা-দিবস সে দিক থেকে পৃথিবীর সেরা আনন্দের ও অপমৃত্যুর দিন। ভারতবর্ষে ১৫ই আগস্ট সে তুলনায় এখনো সাবালকত্ব অর্জন করেনি। এদেশে জেট এসেছে, কিন্তু গোরুর গাড়ী এখনো প্রধান বাহন। সুতরাং গতির সঙ্গে দুর্গতির অচ্ছেদ্য যোগাযোগ এখনো বহুদূর। তবু যদি শহর-পিছু দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান নেওয়া যায়, তার অঙ্ক কম বেদনা-দায়ক হবে না। তবে, তা ছুটির আনন্দের মাতামাতি নয় নিছক প্রাত্যহিক ঘটনার অঙ্গস্বরূপ।

কেউ কেউ বলবেন, অস্যার্থ আমরা জীবনকে উপভোগ করতে জানি না। আমাদের জীবনে সে দুরন্ত গতির অভাব, যার ছোঁয়ায় দেশময় বিরাট কলকারখানার উৎপাদন যেমন তীব্রবেগে এগিয়ে যায়, মানুষের জীবনও তেমনি বিপুল উল্লাসে সব কিছু জয় করে নিতে ছোটে। এই ছুটেচলার নেশাই জীবন, মৃত্যু বা দুর্ঘটনা তার ছন্দরক্ষা করে মাত্র। মৃত্যু নয় জীবনই এই দ্রুত ধাবমান সভ্যতার লক্ষ্য। হয়তো তাই।

এদেশেও পূজোর ছুটি আমাদের, বিশেষ করে বাঙালীদের, ঘর ছেড়ে বাইরে টানে। সামান্য সঙ্গতি থাকলেই কাছের সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম, মাইথন, আর একটু দূরভি-লাষীর জন্য দিল্লী, হরিদ্বার, অজন্তা, কন্যা-কুমারিকা। পর্বতপ্রেমিকেরা গরমের দিনেই বেশী উতলা হ'ন, তবু দেবতাত্মা হিমালয় পূজোর ছুটিতেও সমান আকর্ষণীয়।

ছুটির একমাস আগে থেকেই পথে ঘাটে বন্ধুজনের সস্মিত জিজ্ঞাসা—এবারে কোথায়? প্রতিপ্রশ্নও স্বাভাবিক। কাছের কলকাতা মনের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। দূরের নদী, পর্বত, অরণ্য, নগর, জনতা এক রহস্যময় আহ্বান জাগিয়ে তুলছে রক্তের স্রোতে। কোথায় যাব?

পূর্বে চেরাপুঞ্জী, পশ্চিমে দ্বারকা উত্তরে শ্রীনগর, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা—সমস্ত ভারতবর্ষ নানা প্রান্ত থেকে নিঃশব্দ আহ্বান জানায়—বেরিয়ে এসো, ঘরের কোণ থেকে সমস্ত বিশ্বের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়াও। দেখো, জগৎ কত বড়ো মানুষ কত আপন, পৃথিবী কেমন সুন্দর।

ঘরে আমি অতিপরিচয়ের দ্বারাই আচ্ছন্ন, ঠিক চোখের উপরেই যা, তাকে দেখতে পাই না, বরং দেখায় সে বিঘ্ন ঘটায়। একটু দূর থেকে দেখায় সমগ্রতা আর সামঞ্জস্য। আবার অতিদূরত্বে অস্পষ্টতা। রোজকার দেখা রাস্তাঘাট, মানুষজন আমাদের মনের আড়ালেই পড়ে থাকে। তাদের জানি বলেই পরিচয়ের আগ্রহ আমাদের সবচেয়ে কম। অথচ আসলে হয়তো খুব কমই জানি।

দূর প্রবাসে মধুসূদন বাংলাদেশ, আশ্বিন মাস, বউকথাকও পাখী, নদীতীরে দ্বাদশ শিবমন্দির, কপোতাক্ষ নদকে যেমন করে স্মৃতির চোখে দেখতে পেয়েছিলেন, তেমন করে কি এদেশে দেখতে পেয়েছেন কোনদিন? কাজকে ফিরে পাবো বলেই দূরে যাওয়া। কাজের চলমানতার জন্যই ছুটির খেয়ালখুশি।

কিন্তু ছুটির অর্থ যদি ছোটাছুটি হয়ে দাঁড়ায়! পশ্চিমদেশের ছুটি তো হৈ-হুল্লোড়ের চরম। আমাদের এ দেশের ছুটিও কি তাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে না! ছুটির পক্ষে পুরীর সমুদ্রতীর, কাশীর বিশ্বনাথমন্দির অথবা কলকাতার বোটানিকাল গার্ডেন—কোন্‌টি আপনি বেছে নেবেন?

অবশ্য প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যেও কেউ কেউ গণতান্ত্রিক আনন্দ পান, জনতা না থাকলে তাঁদের কাছে একঘেয়ে প্রকৃতি-সৌন্দর্য দু'দিনেই দুঃসহ, তৃতীয় দিবসে হাওড়া বা শিয়ালদা'র নিত্যকার হাটবাজারে পৌঁছে তাঁরা নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচেন। আবার এমন লোকও আছেন, জনারণ্যের মাঝখানে থেকেও যাঁরা একলামনের ভুবনটি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। বিহারীলাল তেমনি এক কবি, যিনি অনায়াসে একথা বলতে পারতেন, 'তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে।'

ওই দুই শ্রেণীর বাইরের লোক যারা, অর্থাৎ আমরা—ভীড় যাদের ভীড় বলেই মনে হয়, অথচ নিজনে বেশীদিন কাটানো যাদের সাধ বা সাধ্যে কুলোয় না—তাদের জন্য স্বল্পসাধ্য ভ্রমণকেন্দ্রের আয়োজন এদেশে আজও অপ্রচুর! আসলে স্বাদ বদলাবার জন্য আমরা কলকাতার ভীড় থেকে ভ্রমণকারীদের ভীড়ে গিয়ে পড়ি, এখানকার দ্রুতগতি জীবনযাত্রার চেয়েও দ্রুতছন্দে স্বল্পতম সময়ের দেখার তালিকাটি সুবৃহৎ করে ঘরে ফিরে আসি। মনে রাখি না, একঘণ্টা বা একদিন বা দিন তিনেকের চক্কর খাওয়ায় পৃথিবীর কোন জায়গার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তাতে ভ্রমণতালিকাটি দীর্ঘতর হয় মাত্র, ভ্রাম্যমানের সঙ্গে সেই ভ্রমণকেন্দ্রটির প্রাণের যোগ ঘটে না।

য়ুরোপ-আমেরিকার বিত্তবানদের ভ্রমণপঞ্জী তাই পক্ষিদৃষ্টি হিসাবে গ্রহণীয়, প্রাণদৃষ্টি হিসাবে একান্ত পরিহার্য। প্রতিদিনের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার, মাটির

গন্ধ, জোনাকির বাতি, মন্দিরের ঘণ্টা, রিক্সার ঠুনঠুন, পুকুরের ধারে কলমিলতা, প্রজাপতির উড়ে যাওয়া, ভেসে-আসা গানের কলি, ভাঙা মন্দিরের একপাশে পোড়ামাটির কারুকার্য, যাত্রিবাহী বাসের ভেঁপু, এক ঝাঁক বালিহাঁস, পথ-চলতি একদল সাঁওতাল, দূর থেকে মিনারের চূড়া, এঁকে বেঁকে ছুটেচলা পাহাড়ী পথে ঘন হয়ে নেমে-আসা কুয়াশা—কোথায় কখন কেমন করে এক একটি গ্রাম, শহর, তীর্থ বা পাহাড়ী স্টেশন আপনাকে আপন হৃদয়ের কাছে টেনে নেবে, কেউ বলতে পারে না। যেমন কেউ বলতে পারে না কবে কাঞ্চনজঙ্ঘা তার মেঘাবগুণ্ঠন খুলে যোগমূর্তি গিরিশের শুভ্র শুভ্র রূপ আপনার চোখের সামনে তুলে ধরবে। কেউ বলতে পারবে না, তার নিজের গ্রাম, নিজের বাড়ী, তার আপনজনদের সে কখনো তেমন করে চোখ মেলে চেয়ে দেখেছে কি না। শুধু তো দূরই নিকট হয় না, আমাদের নিকটতম যা, তাও অনেকসময় সবচেয়ে দূরের হয়ে থাকে।

তাই এবারের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছি আমারই ঘরের বারান্দায়। সামনের বরুণ গাছটির পাতা পড়ছে। আগত অঘ্রাণ। দিগ্বিজয়ীরা এখন ঘরে ফিরবে।

"হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা ফের জাগিয়ে তুলুন। এ ছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্য লাভ করা সম্ভব নয়। ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান আদর্শ নাই; যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আর কোথায় তাকে রক্ষা করার আশা করা যেতে পারে? ব্রহ্মচর্যের মধ্যে সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে।"

—ভগিনী নিবেদিতা

পঞ্চবটীমূলে

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

ধর্মপ্রবণ হিন্দুজাতি প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ হতেই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণকে পূজায় পরিণত করে। গাছপালার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। অশ্বত্থগাছও এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে উপাসনার বস্তু হিসাবে পূজিত হয়ে আসছে। বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, বিল্ব, অশোক, আমলকী, বকুল, কিংশুক, অর্জুন প্রভৃতি যেগুলি মানবের নানাভাবে উপকারিতা সাধন করে, সেগুলি ধীরে ধীরে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে বিশেষ স্থান অধিকার করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছে। এভাবে পঞ্চবটী বা পঞ্চবট হিন্দুজীবনে এক বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করে আছে।

ভারতের জ্ঞানগরিমা আশ্রমবাসী আরণ্যকদের করতলগত হয়েছিল। কিন্তু সে অরণ্য গহন বন ছিল না, ছিল ঋষির আশ্রম-তপোবন। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটীবনে, বিভিন্ন ঋষির তপোবন-আশ্রমে পরিভ্রমণ করছেন দেখা যায়। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের উল্লেখ অতি অল্প। অধুনালুপ্ত বহুনদনদীতীরে বৃক্ষলতাগুল্মে আচ্ছাদিত কোমল শষ্পাস্তীর্ণ শ্যামশোভায়, মনোরম পরিবেশযুক্ত তপোবনে, গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন কুটীরপ্রাঙ্গণে, শান্ত আবেষ্টনীতে মুমুক্ষু যোগী ধ্যানসমাহিত হয়ে থাকতেন। কেউ বা ছায়াবহুল পাদপমূলে ব্রহ্মচারিপরিবৃত হয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যা করতেন, হোমধেনু ও বৎস অলসনেত্রে একপ্রান্তে রোমন্থনে রত। অগ্নিগৃহে যজ্ঞকুণ্ডে সদাপ্রজ্বলিত অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করা হত। আশ্রমপালিত মৃগশাবক তৃণাঙ্কুরের আশায় ইতস্ততঃ সঞ্চরমান। উষা-ও সন্ধ্যা-কালীন বেদপাঠ এবং সামগানে গম্ভীর ও উদাত্ত কণ্ঠের আরাবে দিগ্-বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তরুশাখাপল্লব পবিত্র ওঙ্কারধ্বনিতে অনুরণিত। প্রাঙ্গণের বিটপীশাখা ও বল্লীবিতানগুলি প্রদীপ্ত যজ্ঞানলের ধূমে চিহ্নিত। এ সকল তপোবনে পবিত্র সুন্দর পরিবেশে বহু শাস্ত্র এবং ধর্মের বিভিন্ন পথ ও তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সকল বিদ্যার অধিকারিভেদে ঋষিকুল শিষ্যসম্প্রদায়কে উপদেশ প্রদান করেছেন। বহু বিদ্যা লুপ্ত হলেও চরম এবং পরম জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা শিষ্যপরম্পরায় আজও হিন্দুজাতির তথা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর পথ নির্দেশ করে চলেছে।

এমনি এক পরিবেশে চঞ্চলা তটিনী তমসার তীরে বটবৃক্ষের ছায়ায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ঋষি-প্রবর বাল্মীকি শ্রীভগবানকে লাভ করেছেন। শ্রীঠাকুরের কথা—"তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।" মহাভারতে পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রাপর্বে এবং বনবাসপর্বে দেখা যায়—যোগপরায়ণ ধ্যানসমাহিত ব্রহ্মজ্ঞ বনবাসী মুনি-ঋষিদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ হচ্ছে। জ্ঞান-বিদ্যা-তত্ত্ব আলোচনা ও সাক্ষাৎকার সকলই তপোবন-আশ্রমে সাধিত হত।

পুত্রৈষণা, রাজ্যৈষণা ইত্যাদি সকল এষণা ত্যাগ করে রাজকুমার সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু হতে গভীর নিশীথে বহুযোজন পথ অতিক্রম করে

অরণ্যে এসে উপনীত হলেন। "প্রত্যূষে তাঁহার দেহকান্তির দ্বারা আশ্রম অভিভূত করিয়া সিদ্ধের ন্যায় সেখানে প্রবেশ করিলেন। সস্ত্রীক তপস্বিগণ যিনি যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই ইন্দ্রপ্রতিম রাজকুমারকে দেখিতে লাগিলেন। কাষ্ঠসংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত বিপ্রগণ সমিধ-পুষ্প ও কুশহস্তে প্রত্যাগত হইয়া তপঃপ্রধান ও বিজ্ঞ হইয়াও তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন, মঠে ফিরিলেন না।

"আশ্রমবাসিগণের বিচিত্র তপশ্চর্যা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কুমার স্বর্গাকাঙ্ক্ষী পুণ্যকৃৎ জনপূর্ণ সেই আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সৌম্যমূর্তি কুমার তপোবনে তপোধনগণের নানারূপ তপস্যা নিরীক্ষণ করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অনুগমনকারী এক তপস্বীকে প্রশ্ন করিলেন। তপোরত সেই দ্বিজ তপোবিশেষ ও বিভিন্ন তপস্যার ফল ক্রমে ক্রমে কহিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জটাবল্কল-চীরবাসযুত তাঁহার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত আশ্রম-বাসী তপোধনগণকে দর্শন করিয়া মার্গাস্থিত এক মনোরম মাঙ্গলিক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।"

অতঃপর বৈশালী হযে উরুবিল্ব নামক গ্রামে তিনি উপনীত হলেন। পূত নৈরঞ্জনানদীর তীরে কিছুদিন অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করায় দেহ অতি দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়ে। এরকম অনুষ্ঠানে বোধিলাভ হয় না দেখে শরীরকে কিছু আহার-দানে সুস্থ করে "বোধির নিমিত্ত দৃঢ়সংকল্প সেই মুনি কেবলমাত্র স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে সাক্ষী করিয়া শাদ্বলাস্তীর্ণ ভূতলবিশিষ্ট এক অশ্বত্থমূলে গমন করেন। অনন্তর ধৈর্য ও শমগুণের দ্বারা 'মার'-বল জয় করিয়া সেই ধ্যানকোবিদ পরমার্থবিজিজ্ঞাসু হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। সর্বপ্রকার ধ্যানবিধিতে সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিলেন। অতঃপর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা তিনি সম্যকভাবে অবগত হইয়া জগতের সম্মুখে বুদ্ধরূপে বিরাজ-মান হইলেন। তখন দগ্ধ ইন্ধন অনলের ন্যায় তাঁহার পরম শান্তি লাভ হইয়াছে। তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। শোনা যায় সাত সপ্তাহ তিনি ঐস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।' —('অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত': অনুবাদ—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

বুদ্ধত্বলাভ করার স্থান সেই বোধিবৃক্ষমূল তিনি জীবিত থাকতে কেমন অবস্থায় ছিল তা জানা যায় না। তবে সম্রাট অশোক তথাগতের অর্হত্বলাভের স্থান সন্ধানপূর্বক অশ্বত্থমূল শিলা-নির্মিত করে সংলগ্নস্থানে এক বিরাট মন্দির স্থাপন করেন বোধিবৃক্ষের মূলে যে প্রজ্ঞা-লাভ হয়েছিল, ধর্মাশোকের প্রচারগুণে সারা-ভারত, মধ্যএশিয়া ও সিংহলে তার প্রসার হয়। সিংহলে শ্রীবুদ্ধের দন্তমন্দির স্থাপিত আছে। সম্রাট অশোক পুত্র বা প্রচারক মহেন্দ্রের দ্বারা মূল বোধিবৃক্ষের যে একটি নবকিশলয় প্রেরণ করেছিলেন সেটি দু'হাজার বছর ধরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিশাল এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের যে বটগাছ তা ৩০০।৪০০ বছরেই যা বিস্তৃতি লাভ করেছে তাতে সিংহলে বোধিবৃক্ষ দু'হাজার বছরে কি বিশালতা লাভ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তবে তাকে নানাভাবে কর্তন করে মূল কাণ্ডকে যথাযথভাবে রাখার চেষ্টা আছে। বোধগয়ার বোধিবৃক্ষকে গৌড়-বঙ্গাধিপ মহারাজ শশাঙ্ক শাখাপ্রশাখা সহ ছেদন করে তার মূলোচ্ছেদ করেন। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ অনুযায়ী হিন্দুরাজার এই কাহিনী জানা যায়। বৌদ্ধ হিউয়েন সাঙ-এর বিবৃতি কতখানি প্রামাণ্য তা ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসুর বিবেচ্য।

ভগবান শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাখ্যা বদরিকাশ্রমের বদরীবৃক্ষের নিম্নে বসে করেছিলেন কি না জানা যায় না। তবে তাঁর আশ্রম তো ঋষিরই তপোবন। ব্রহ্মবিদ্ মনীষিগণ বৃক্ষমূলে বসে জ্ঞানলাভ করেছেন এবং দানও করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যগুলির মধ্যেও দেখা যায় গ্রাম্য-আলাপ-আলোচনাদি নদীতীরে বা পুষ্করিণীঘাটে মনোরম পরিবেশে বৃক্ষবাটিকায় তরুমূলে বসেই হত।

নবদ্বীপচন্দ্র নদীয়ায় গঙ্গাতীরে বসে বা বর্তমানে 'পোড়ামা-তলা' বলে বিখ্যাত অশ্বত্থমূলে বসে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে পাণিহাটীতে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে বৈষ্ণব-সম্মিলন করেছিলেন। শান্তপরিবেশযুক্ত সে স্থান আজও ভক্তমাত্রেরই চিত্ত হরণ করে। হালিসহরে ভক্ত রামপ্রসাদ যেস্থানে সিদ্ধ হলেন, সেও এক পঞ্চবটী। দর্শনমাত্রে অনাবিল শান্তিদান পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা—পরম জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধি প্রভৃতি যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক—যুগ যুগ ধরে অব্যাহতভাবে চলেছে। কখন কখন মানবের অজ্ঞানপ্রসূত মোহ তাকে পেয়ে বসে, তাতে সে সাময়িকভাবে নিজস্বরূপ মহিমা বিস্মৃত হয় যখন, তখন মানবপ্রেমিক মহান আত্মা দেহধারণ করে তার চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে আসেন। গৌরবোজ্জ্বল উনিশ শতকের যিনি শ্রেষ্ঠ মহামানব, ভক্তদের নিকট যিনি অবতারবরিষ্ঠ বলে প্রসিদ্ধ, তিনিও পঞ্চবটীতেই তাঁর উপাস্যের সাক্ষাৎ বহু রূপে পান বলে জানা যায়।

'বোধিবৃক্ষ' অতীতেও চৈতন্য-সম্পাদনে সাহায্য করেছে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও করবে, যেমন তথাগতের বোধিবৃক্ষ এখনও মানবপ্রেমিক সেই মহাপুরুষের প্রেম, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি স্মরণ করিয়ে উৎসাহিত করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বোধগয়া গিয়ে ভগবান শ্রীবুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে লিখছেন—"দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনও দুষ্কাতের অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল, নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল—আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপশিখার সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে, যিনি নরোত্তম। ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের।"

দক্ষিণেশ্বরের বোধিদ্রুম শত বৎসরের অধিক হল মানুষের প্রেরণালাভে সাহায্য করে চলেছে। এখনও কত শত বৎসর করবে। পঞ্চবটীতরুতলে দাঁড়িয়ে সে কথা মনে হচ্ছিল। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়ে এক এক করে সকল ঘটনা মনের মধ্যে ভেসে চলেছে। "এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া ঠাকুর অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণা করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্বগায়ে একখানি কুটীর নির্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

পঞ্চবটীমধ্যে সাবেককালের একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থ গাছ। দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানা-পক্ষিসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদপমূল ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদী-সুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন। আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুলা হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আর সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।"

মনে পড়ল 'কথামৃতে' আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে বলছেন—"পঞ্চবটীর ঘরে শোবে? পঞ্চ-বটীর ঘর বলছি এই জন্য, ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বরচিন্তা হয়েছে।" "যখন পঞ্চ বটীতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে।' আরও কত কি তা বলবো।" প্রকৃতি-সৌন্দর্য-প্রিয় গদাধর যে কুলুকুলুনাদিত গঙ্গাতীরবর্তী বটগাছ ও অন্যান্য তরুরাজি-শোভিত মনোহর ভূমিখণ্ডের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হবেন, একথা বলাই বাহুল্য। বিশাল ভারতের ঋষি-সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম তপস্যা হতে আধুনিকতম তপস্যা যুগে যুগে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার মূর্ত বিগ্রহ অনুকূল স্থান নির্বাচন করার জন্যই যেন পঞ্চবটীতে উপনীত হলেন।

এই সেই পঞ্চবটী, যেখানে তিনি কালীমন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন প্রথম আগমন করেন। অগ্রজের অনুরোধে একমাসকাল দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। হৃদয় মুখোপাধ্যায় বলেন—"ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন।"

"মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটী-শোভিত উদ্যান, সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তি মানসাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামার-পুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও সানন্দচিত্তে বাস করিয়া মনের পূর্বোক্ত কিংকর্তব্যভাব দূরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন।"

পূতসলিলা জাহ্নবীতীরে ছায়াসমন্বিত পঞ্চবটী—স্মরণাতীত কালের পবিত্র আশ্রমকাননের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। বালক গদাধর ঋষিকুমারের মতো পঞ্চবটীস্থিত সকল বৃক্ষলতাগুল্মের মধ্যে কী অজানা আকর্ষণে আপন মনে বিচরণ করেন। কালীমন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় গদাধরের বয়স উনিশ-কুড়ি বৎসর। তৎকালের তাঁর সঙ্গী হৃদয় মুখোপাধ্যায় বলেন—ঠাকুর যে তাকে বিশেষ ভালবাসেন একথা সে বেশ বুঝত, কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝতে পারত না, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর ও সায়াহ্নে সন্ধ্যারতির সময় গদাধর কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হতেন, অনেক খুঁজেও সে তাঁর সন্ধান পেত না। দু এক ঘণ্টা পর তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—এখানেই ছিলাম। কোন দিন তাঁর সন্ধান করতে করতে তাঁকে পঞ্চবটীর দিক হতে ফিরতে দেখে ভাবত তিনি শৌচাদি করতে গিয়েছিলেন সম্ভবতঃ। পঞ্চবটীতলই যে তাঁর সবসময়ের বিচরণস্থান, ক্রীড়াস্থান এবং

ধ্যান ও উপাসনার স্থান, তা সহজেই অনুমেয়। মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে লোকচক্ষুর অগোচরে জগজ্জননীর উপাসনায় পঞ্চবটীতে ধ্যানস্থ হতেন। মথুরবাবু পঞ্চবটীর নিকট একদিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে দেখেন গদাধর স্বহস্তগঠিত সুন্দর এক দেবভাবসমন্বিত শিবমূর্তির পূজায় তন্ময় হয়ে আছেন। অনুসন্ধানে জানলেন মূর্তিশিল্পে পারদর্শী গদাধর গঙ্গাগর্ভ থেকে মাটি সংগ্রহ করে বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত এই সুন্দর মূর্তি গড়েছেন। সেকাজ যে তিনি তাঁর অতিপ্রিয় পঞ্চবটীতলেই করেছিলেন, তা অনুমান করা যায়।　　(ক্রমশঃ)

নিবেদন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এনেছ　আমায় তুমি তোমার প্রেমের বৃন্দাবনে,
দিয়েছ　মন্ত্র তোমার সান্দ্র বাঁশির উচ্ছলনে।
এ-ব্রজের　আলোকলোকে
জেগেছে　কান্ত কত স্বপ্ন এ-অশান্ত চোখে!—
দুরাশার　সেই পুলকে ঠাঁই পেয়েছে প্রাণ চরণে॥

যখনি　অশ্রুমেঘে চন্দ্র তারা মিলিয়ে গেছে,
বাদলের　মায়ায় ছায়ার ছল দূতেরা দল বেঁধেছে,
সে-ব্যথার　দুর্লগনে
নিরাশার　কাঁটাবনে
ফুটেছে　ফুল অরূপের রূপমৃণালে ক্ষণে ক্ষণে:
দেখেছি　অভয় তোমার মূর্তি হৃদয়-সিংহাসনে॥

যখনি　সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নাথ কালো নিশা,
দিয়েছে　তোমার ভালোবাসাই পথে আলোর দিশা।
তাই সুর　এ-প্রার্থনার
বিদলি'　বেসুর আঁধার
উঠেছে　ঝঙ্কারি' আজ অনিন্দিতের আবাহনে:
তোমাকে　চাই এ-তনুর প্রতি অণুর নিবেদনে॥

দক্ষিণের দাক্ষিণ্য

অধ্যাপক অমিয় দত্ত

কলকাতার অসহ্য গরমের হাত এড়ানোর জন্যেই যেন শেষ পর্যন্ত আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তিন জনের দল আমাদের, সকলেই পুরুষ। ৬ই জুন রাত্রি দশটা নাগাদ হাওড়া-মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। রাত্রের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটতে লাগলো। অন্ধকারের বুকে পরিচিত স্টেশনগুলোর আলোর চমকানি মনে একটা তুলনা এনে দিচ্ছিল: যেন ঘনকালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। পরিচিত জায়গার ওপর দিয়ে যাচ্ছি বলে কৌতূহলটা এখন তেমন উগ্র নয়। ঘুমিয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যেই।···

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ধড়-মড় করে উঠে বসলাম। মাথার কাছের অল্প পাওয়ারের নীল রঙের বাল্‌বটা যেন অনেকটা ম্রিয়মাণ। গাড়ীর ভেতরের সব কিছুই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক বেলা হয়ে গেছে মনে করে আক্ষেপের সঙ্গে বার্থ (borth) থেকে নিচে নেমে এলাম তাড়াতাড়ি। জানালার ধারের সিটে বসে প্রথমেই ঘড়ি দেখলাম। ও হরি! এইমাত্র পাঁচটা বেজেছে!! অথচ কী আলো! কত আলো!! অবাক-বিস্ময়ে জানালার মধ্য দিয়ে মাঠে প্রান্তরে আমার মুগ্ধ দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিলাম। একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। মাঠ-গাছপালা ঘরের ছবি ছোট ছোট পাহাড়ের ছবি—ঢেউ-খেলানো রঙীন ভাসন্ত মেঘ-বুকে নীল আকাশের ছবি। বিশেষ করে পূব আকাশ তখন খুশির আলোর রক্তিম উচ্ছ্বাসে টলমল। প্রভাতের গায়ে মাথায় বুকে সে আবির আলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণে গাড়ীর গতি, হু-হু করে জানালা দিয়ে মিষ্টি বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে। ভারী ভালো লাগছিল। সময় হিসেব করে বুঝলাম এখন আমরা উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে ছুটছি। ঠিক এই সময়েই কানের ভেতর দিয়ে প্রাণের তারে ঘা দিল "আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে"—রবীন্দ্র-সংগীতের দু'টো কলি। আগারে! সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে কে গাইছে এই প্রকৃতির গান—আলোর গান—মুক্তির গান। স্বরের অনুসরণ করে দেখলাম কিছু দূরে জানালার ধারেরই একটা আসনে বসে বাইরে-হারিয়ে-যাওয়া ভাসা-ভাসা দৃষ্টির একটা ছেলে গান ধরেছে। তারপর আলাপ জমতে দেরী হ'ল না। বয়স ওর কুড়ি-একুশ। পড়ছে ইঞ্জিনিয়ারিং। যাচ্ছে একটা ট্রেনিংয়ে। আপাততঃ যাবে মাদ্রাজ। সুতরাং হ'য়ে পড়ল আমাদের সঙ্গী। অন্য বন্ধু দুজনের ঘুমও এতক্ষণে ভেঙেছে। আমরা চারজনের একটা 'ফুল টীম' হ'য়ে গেলাম।

উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে ছুটছে গাড়ী। প্রাকৃতিক দৃশ্যের গঠনে অনেকটা বাংলার ছাপ। তবে উড়িষ্যার প্রকৃতিতে স্বাতন্ত্র্য এনেছে ছোট খাট পাহাড়গুলো। পাথুরে পাহাড়, তাই বেশীর ভাগই ন্যাড়া। কাছে-দূরের পাহাড়গুলোর সঙ্গে আলো ছায়ার খেলা চলছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বর্ণ বৈচিত্র্যের। দিগন্তরেখায় বক্রতা-সৃষ্টিকারী দূরের এক-একটা পাহাড় তাই কখনো ধূসর, কখনো ঘনকৃষ্ণ, কখনো বা নীলাভ।

ভুবনেশ্বর পেরিয়ে আমরা খুরদা রোড জংশনও ছাড়িয়ে এলাম। খুরদা রোড থেকেই

পুরীর লাইন আলাদা হয়ে গেছে। পুরী নীল সমুদ্রের দেশ—জগন্নাথদেবের লীলাক্ষেত্র। আমাদের গাড়ী ভিন্ন লাইন ধরলো। বাঁদিকে পড়ে রইলো পুরীর পথ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়ছে বেশ। সকালের মধুর আবহাওয়া কর্পূরের মত উবে গেছে। উত্তপ্ত ঝাঁঝালো বাতাস। গাড়ীর কামরায় ব্লাস্ট ফার্নেসের আভাস। এ গরম কলকাতার ভ্যাপসা পচা ঘাম বার করা গরম নয়। এ গরম জ্বালাময়। পাখার হাওয়া তো দূরের কথা, মুক্ত প্রকৃতির বাতাস পর্যন্ত গা জ্বালায়। গাড়ীর ভেতর বসে আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা ঝলসে যাচ্ছি। এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। কলকাতার গরমের হাত থেকে নিস্তার পেতে গিয়ে আরো ভয়ঙ্কর গরমের পাল্লায় পড়তে হ'লো বলে ভাগ্যকে দোষারোপ করলাম। এক বন্ধু রসিকতা করে বললো—'ভাইরে, চোরের হাত এড়াতে গিয়ে পড়ে গেলাম কিনা ডাকাতের হাতে?' এরই মধ্যে গাড়ী থামছিল কোন কোন স্টেশনে। 'চা-গরমের' উদাত্ত আমন্ত্রণ কানে বাজছিল আমাদের। অনেকেই সাড়া দিচ্ছিল এই আমন্ত্রণে। আমার বন্ধু দুজনও দিল। আমি বললাম—'করছিস কিরে? এই গরমে—'। আমায় থামিয়ে দিয়ে তারা যুগপৎ বললো—'এ বিষে বিষে বিষক্ষয়।' কিন্তু সহ্য হ'লনা তাদের। মুখে দিয়েই থু-থু করে উঠলো। বিস্বাদ, ধোঁয়া গন্ধ এবং একেবারে বাজে। জানতাম এটা হবে। কারণ কয়েক বছর আগে পুরী থাকার সময় আমারও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখনই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, উড়িষ্যার সব কিছু ভালো হলেও চা কিন্তু নয়। আর এই গরম!

উষ্ণতার দাপটে সুস্থির থাকতে পারছিলাম না বলে আমরা চারজনে তাস খেলতে বসে গেলাম। দু-একদান খেলা হয়েছে,—এমন সময়েই ঘটল অভাবিত কাণ্ডটা। হঠাৎ কোথা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো আমাদের গায়ে-মাথায়-ক্লান্তির ওপরে। আহা! আহা! একই সঙ্গে চমকে উঠলাম সকলে। তাসগুলো ফর্‌ফর্‌ করে উড়তে লাগলো, যেন তাদেরও আনন্দ! কিন্তু কি আশ্চর্য! বাইরে যে এখনো ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। তাহ'লে বাতাস এমন ঠাণ্ডা ও মধুর কেন? একই সঙ্গে চারজনে ছুটে গেলাম। টেনে খুলে দিলাম সম্পূর্ণ দরজাটা। ঝলকে ঝলকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঠাণ্ডা বাতাস। আমাদের সমস্ত ক্লান্তি গুঁড়ো হ'য়ে হ'য়ে ঝরে পড়তে লাগলো। কিন্তু আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তন কেন? গাড়ীর কণ্ডাকটার বললেন,—'আমরা এখন সমুদ্রের কাছ দিয়ে যাচ্ছি।' কিছুক্ষণ বাদে আমি চীৎকার করে উঠলাম,—'সমুদ্র। সমুদ্র।' কারণ নীল জলের রেখা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু না, ও সমুদ্র নয়—চিল্কা। ভুল ভাঙিয়ে দিলেন এক সহযাত্রী। চিল্কা আগে দেখিনি। এখন দেখলাম! ছোট ছোট পাহাড়গুলোকে বেড় দিয়ে নীলজল ছল্‌ছল্‌ করছে। সমুদ্রের উদ্দামতা তার নেই। কিন্তু কেমন যেন একপ্রকারের পরিপূর্ণতা আছে। তাই টলটল লাবণ্য নিয়েও স্থির। আলতো ভাবে চিল্কাহ্রদ পাহাড় ও মাটিকে ছুঁয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। অনেকক্ষণ ধরে বাঁদিকে চিল্কাকে রেখে আমাদের গাড়ী ছুটেছিল। আর ঐ চিল্কারই বুক-ছুঁয়ে-আসা স্নিগ্ধ হাওয়া অনেকক্ষণ ধরে আমাদের তাপ-দগ্ধ দেহে-মনে তার মোলায়েম আঙুলের সাহায্যে যেন শান্তি-সুখের বিলি কেটে দিয়েছিল।

দিনের আলো নিবে যাবার আগেই আমরা অন্ধ্রে প্রবেশ করেছিলাম। অন্ধ্রের ভাষা

তেলেগু। উড়িষ্যার প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্র। অথচ প্রকৃতিতে ওড়িয়ার সঙ্গে তেলেগুর দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু আকৃতি? আকৃতিতে ওড়িয়া ভাষা তেলেগু ভাষার লিপি বা হরফের রূপ পেয়েছে। শুধু তেলেগুই বা কেন? সমস্ত দক্ষিণী ভাষালিপির আদল সম্ভবতঃ ওড়িয়া হরফের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও মহীশূরে বেড়িয়ে আমাদের তাই মনে হ'য়েছে। এই আকৃতিগত মিলের জন্যেই আমরা কখন যে উড়িষ্যা পেরিয়ে অন্ধ্রের মাটি ছুঁয়েছিলাম তা স্টেশনের নামচিহ্নিত বোর্ডগুলো দেখেও বুঝতে পারিনি। অন্ধ্রের দু-চারটে স্টেশন ছাড়িয়ে যাবার পর কণ্ডাকটারের কাছ থেকেই জানতে পারলাম যে, এখন আমরা অন্ধ্রের বুকে।

গাড়ী ছুটছে। দুদিকে ধু-ধু ফাঁকা মাঠ। একেবারে ফাঁকা বলা ভুল, কারণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে মাথা-ছেঁটে-নেওয়া তালের গাছ। পড়ন্ত রোদের আলো তাদের মাথায় সোনার রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। দূরের কোন কোন মাঠও শেষ আলোর অকৃপণ দান বুকে ধরেছে। সেখানেও সোনালী আভা। জনবসতি প্রায় চোখে পড়ছে না। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, এসব মাঠে ধান চাষ হয়। পরে বুঝতে পেরেছি, ধানচালের ক্ষেত্রে এই জন্যেই অন্ধ্র একটি উদ্বৃত্ত প্রদেশ। এই মাঠ আর তালগাছ, তালগাছ আর মাঠ দেখতে দেখতে সন্ধ্যে এসে হাজির হোল। সব রঙ নিভে গেল। সন্ধ্যে তার ঝাঁপি খুলে অন্ধকারের কালো কাপড়খানা রাত্রিকে উপহার দিয়ে বিদায় নিল। আবছা অন্ধকারে দূরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, বাতাস লেগে তালগাছের পাতাগুলো দুলছে, নাকি গাড়ির ঝক্‌ঝক্ আওয়াজের তালে তাল মিলিয়ে মাথা নাড়ছে?

সমস্ত রাত অন্ধ্রের মাটি-ছুঁয়ে-থাকা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটেছে। পরদিন সকালবেলা আগের দিনের মতই কৌতুহল নিয়ে ছুটে গেছি জানালার ধারে। সেই একই ছবি—মাঠ আর তালগাছের। উঃ! বিস্ময়ের আর অন্ত মিলছিল না,—এত তালগাছ আছে অন্ধ্রে! অন্য গাছ আর তেমন চোখে পড়ছে না। বাংলাদেশের মত অন্ধ্রের মাটি বোধ হয় তেমন উদার-প্রকৃতির নয়, কারণ বাংলাদেশের মাটির বুক জুড়ে হাজারো গাছের মেলা। অথচ অন্ধ্রে গাছ বলতে তো কেবল দেখছি এই তাল। লাইনের ধারে, মাঠের মধ্যে, স্টেশন এলাকার আশে-পাশে যত মাটির ঘরবাড়ী দেখলাম তাদের সবগুলো প্রায় তালপাতায় ছাওয়া। বাংলাদেশের খড়ের ছাউনীগুলো ঘরের শিল্পশ্রী কিন্তু এসব ঘরে নেই।

সকাল থেকে মেঘ-মেঘ-ভাব। গতকালের থেকে গরমের জ্বালা তাই কিছু কম। উড়িষ্যা ছাড়ার পর থেকেই চা বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় এসেছে কফি। দক্ষিণ-ভারতের বৈশিষ্ট্য এটা। দক্ষিণীরা কফিপ্রিয়,—আমাদের মত চা-চাতক নয়।

দুপুরের দিকে আমরা অন্ধ্র ছাড়িয়ে মাদ্রাজ ছুঁলাম। তার আগে অন্ধ্র প্রদেশের দুটো বড় শহর-স্টেশন ছাড়িয়ে এসেছি—একটা ওয়ালটেয়ার, অন্যটি বিজয়ওয়াদা। শেষের শহরটি অনেক আধুনিক কেতা দুরস্ত বলে মনে হয়েছে। বিজয়ওয়াদা অন্ধ্রের বড় একটি শহর এবং শিল্পাঞ্চলও বটে। পাহাড় আছে—নদী আছে। দূর থেকে চোখের দেখায় নয়নাভিরাম বলেই মনে হয়েছে বিজয়-

ওয়াঁদাকে। ওয়ালটেয়ার সেই তুলনায় পুরনো ও মলিন।

এখন আমরা মাদ্রাজের মধ্যে। অন্ধ্রের সঙ্গে এর যে নিকট সম্পর্ক তা এর প্রকৃতিই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই একই ধরনের মাঠ আর তালগাছ। তবে আরো যত এগোতে লাগলাম ততই দেখতে পেলাম তালের সঙ্গে নারকেলগাছেরও ছড়াছড়ি। কলা এবং কাজু-বাদামের বনও দু-চারটে চোখে পড়লো।

সন্ধ্যের পর রাত্রি সাড়ে-সাতটা নাগাদ আমাদের গাড়ী আলোঝলমল মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে এসে পৌছালো। রাত্রের আলো-ছায়ার মধ্যে মাদ্রাজ শহরের সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টি ঘটলো। একটা হোটেলে 'চারমূর্তি' গিয়ে উঠলাম। সেখানে শুধু থাকতে পারা যায়, খাবার ব্যবস্থা কিছু নেই। মাদ্রাজে এই ধরনের হোটেলের সংখ্যা অনেক। তাছাড়া যেসব সরাইখানায় খাবার পাওয়া যায়, তাদের সবগুলোই প্রায় নিরামিষ ভোজনালয়। তাই আমরা পেটুক বাঙালী চারজন খুঁজে-পেতে স্টেশনের কাছাকাছি 'হোটেল বুহারিয়া'তে সামুদ্রিক মৎস্য-সহযোগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম। তারপর রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে মাদ্রাজ শহর ঘুরে বেড়ালাম। আলোকময় পরিচ্ছন্ন মাদ্রাজ শহরকে মায়াপুরী বলে মনে হলো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে সকলেরই একটু দেরী হলো। বেলা আটটায় আমরা সবাই তৈরী হয়ে সরকারী বাসে চেপে ঐতিহাসিক স্থান মহাবলীপুরমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মাদ্রাজ শহর থেকে মহাবলীপুরমের দূরত্ব দক্ষিণ-পূর্বে মাইল চল্লিশেক হবে। বাস ছুটছে। গতি দ্রুত। প্রশস্ত রাস্তা। মাদ্রাজ শহরের ঘরবাড়ী দোকান বাজার পিছনে পড়ে যাচ্ছে। যতই দেখছি ভাল লাগছে মাদ্রাজকে। কেমন পরিচ্ছন্ন! কলকাতার মত ঘিঞ্জি নয়। বাস জনতার ভীড়ে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট নয়। আসনসংখ্যা অনুপাতে আরোহী তোলে। না, এর জন্যে অসুবিধেয় পড়তে হয় না মাদ্রাজবাসীকে। কারণ? বাসের প্রাচুর্য নয়, কলকাতার মত অগণিত আরোহী-জনতার অভাব। কলকাতার তুলনায় মাদ্রাজ শহরের জনসংখ্যা অনেক কম। সেইজন্যে পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা এখনো বজায় রেখে চলতে পারছে শহরটি।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[অনুবাদ : পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

শ্রেয়: আর প্রেয়ঃ—লোকে দ্বিবিধ আখ্যাত—
সদ্যঃ কাম্য আর যাহা পরম কল্যাণ,
ক্ষণেতে বিরল প্রেয়ঃ—দুঃখের কারণ—
তারি তরে মূঢ়জন সতত চেষ্টিত।
আত্যন্তিক প্রেয়: শ্রেয়ঃ ব্রহ্মই বস্তুতঃ—
চরম, নিরতিশয় সুখের নিদান,
সেবে তায় তত্ত্বজ্ঞানী—কঠোপনিষদে
ষষ্ঠবল্লী মাঝে আছে ইহাই বর্ণিত ॥ ১১

'আত্মা মহাসিন্ধু তার তরঙ্গ অহং'
ভাবে জ্ঞানী পথে যেতে, বসিয়া আসনে,
'সংবিদের সূত্রে গাঁথা মণি হেন আমি'
বিষয়ের অনুভবে ভাসে তার মনে,
'আত্মার দর্শনে হৃষ্ট আমি' বোধ তার,
'মগন হইনু চিৎসাগরে' শয়নে,
দেহী মাঝে তিনি অন্তর্নিষ্ঠ মুক্তিকামী
আয়ু যাঁর কাটে হেন ভাব-মগ্ন মনে ॥ ১২

নাম-রূপে বিশেষিত নিখিল জগৎ—
বিরাটের ব্যষ্টিরূপ বলিয়া প্রচার।
অন্তঃস্থিত মুখ্যপ্রাণবলে উহা চলে,
সকল পদার্থ হয় গোচর তাঁহার।
কর্তা নহে, ভোক্তা নহে, সর্ব-প্রকাশক
রবি-সম, জ্ঞান আর বিজ্ঞানে ভাস্বর।
প্রত্যক্ষতঃ যে পুরুষ ইহা জানে সদা,
বিশ্বে পরমাত্মা হেন তাঁর ব্যবহার ॥ ১৩

নির্বেদজ আর জ্ঞানগর্ভ— বলা হয়
বৈরাগ্য দ্বিবিধ—ইহা জানিবে প্রথম,
গৃহ-বন্ধু-পুত্র-ধন-স্পৃহা দুঃখময়
হেরি হয় চিত্তে তাঁর ইহার জনম।
এ সব বিষয়ে জ্ঞান হ'লে উপদেশে,
অন্যটি উদ্‌গীর্ণ অন্নে ঘৃণার সমান।
সংযমীর ত্যাগও দুটি—দেহে অভিমান-
ত্যাগ আর গৃহ হ'তে সুদূরে প্রয়াণ ॥ ১৪

সেবে সবে ত্রিজগতে, নহে দুঃখ তরে
সুখ লাগি করে চেষ্টা ইহ নিরন্তর,
দেহে তাই আমি-জ্ঞান, বিষয়-সমূহে
আর জন্মে মম-বোধ—দুই দুঃখকর।
জেনেও তা' দেহে সদা আত্মজ্ঞানবশে
রোগে বা আঘাতে হয় বেদনা-কাতর,
শত্রুনাশে জয়, ভার্যা-পুত্র-অর্থ-নাশে
পরম বিপদ গণে তাহার অন্তর। ১৫

উৎসুক অতিথি সম রহি নিজধামে
যাত্রা তরে সর্ববিধ মমতা পাশরি,
গৃহস্বামী মহাকাশে জলদের প্রায়
দেহগত সুখ-দুঃখ গণ্য নাহি করে,
আসিবার যাহা, তাহা আসিবে, যাইবে
চলি যাহা যাইবার বিষয়সকল—
এই দৃঢ় প্রত্যয়-আশ্রয়ে নিরুদ্যম
রন তিনি দেহাদিরে জানিয়া চঞ্চল ॥ ১৬

সর্প যথা বাহিরে খোলস ছাড়ি ফেলে,
দৃঢ়মনে গৃহ ত্যজি প্রব্রজিত জন
নিবাস ছাড়িয়া যথা পথিক আশ্রয়ে
পথিপার্শ্বে তরুছায়া দেহ-পরিমাণ,
ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্র চায় বৃক্ষচ্যুত ফল,
ভৈক্ষ্যোচিত সব তথা করে উপার্জন,
স্বাত্মারাম তত্ত্বে সুখভরে নিমজ্জিতে
অনায়াসে নিজকায় করে বিসর্জন ॥ ১৭

প্রথমে কামনা জন্মে বুদ্ধির আধারে,
পরে মন লক্ষ্য করে বিবিধ বিষয়,
ইন্দ্রিয়ের মুখে করে সকল গ্রহণ,
না পাইলে তায় ক্রোধ হৃদে উপজয়,
কাম্যবস্তু লাভ হলে রক্ষণ-বাসনা
লোভরূপ ধরে এই ত্রি-বৃত্তি আকার
বন্ধনের হেতু সবাকার, বুদ্ধিমান
অধ্যাত্ম-বিচারে তিনি করে পরিহার ॥ ১৮

ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিবশে মানবার্থে দান,
ক্ষমা হয় চিরদিন অক্রোধ কথিত,
আস্তিকতা শাস্ত্র আর শ্রদ্ধা ঈশপদে,
এক ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান, চারি বিপরীত
বন্ধনের সেতু। দান আদি এ উপায়-
চতুষ্টয়ে তরে জীব সংসার সাগর,
শ্রেয় ও অমৃত লভে, স্বর্গে গতি হয়,
জ্যোতির্ময় ব্রহ্মে হয় স্থিতি নিরন্তর ॥ ১৯

দেবতা অতিথিগণে করে অন্নদান—
অমৃত তাহাই, ব্যর্থ অন্ন অন্যথায়,
নিজ তরে করিলে প্রস্তুত -সংসারেতে
প্রসিদ্ধ একথা—উহা মৃত্যুরূপ হয়,
শরীরীর নিজ ভোগে অন্নের প্রয়োগ,
পাপমাত্র তাহে জীব করে উপার্জন,
বিধিমত পঞ্চপ্রাণে আহুতি বিহনে
ভোজন যে করে সেও মৃতের সমান ॥ ২০

ভোজ বলি লোকে সেই খ্যাত, বুভুক্ষিত
প্রাণী জনে গৃহাগতে যেবা অন্ন দেয়,
লৌকিক বৈদিক যজ্ঞে পূর্ণ অন্ন পায়,
সে মানব এ সংসারে বৈরিহীন হয়।
অন্নাকাঙ্ক্ষী মিত্র পরিজনে নাহি দেয়
সতত সেবকে, তারে সখা নাহি কয়।
কদর্য সে জন হতে মুখ ফিরাইয়া
নিরন্তর অন্ন তার দূরেতে পলায় ॥ ২১

সর্বজীবে হের ব্রহ্ম, শুদ্ধ হতে ব্রহ্মাবধি—
শ্রুতি-বাক্যে সিংহনাদে ইহাই ঘোষিত—
আত্মার অজ্ঞানে হয় জগৎ উদয়,
আত্মজ্ঞানে জগতের লয় সুবিদিত।
অজ্ঞানে আরোপ পরস্পরে—রৌপ্যে শুক্তি,
শুক্তিতে রজতজ্ঞান সদা প্রতিভাসে,
প্রমে লীন বিশ্বে ব্রহ্ম, জগৎ বিলীন
ব্রহ্মে তথা—একে অন্য বস্তুর অধ্যাসে ॥ ২২

আকাশ-কুসুম-প্রায় অসৎ অলীক
আদিতে না ছিল, ছিল ব্রহ্মভিন্ন সৎ?
ছিল বা এ-দুই হতে পৃথক বা কিছু?
ব্যবহার গত নাহি ছিল এ জগৎ।
পরে দেখা দিল যথা শুক্তিতে রজত,
বিরাট বা ব্যোম তার পূর্বে নাহি ছিল।
শুদ্ধ ব্রহ্মে সম্ভবে কি কোন আবরণ?
পৃথ্বী ছায় কভু মায়াসৃষ্ট কি সলিল? ২৩

জন্ম-মৃত্যু রূপ যদি বন্ধন না ছিল,
মোক্ষই বা সেইকালে সম্ভবে কেমনে?
রাত্রি আর দিবা নাহি ভাস্করে পরশে,
মর্ত্য জীব দুই হেরে দূষিত নয়নে।
প্রাণ-বিরহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম এক ছিল,
তারি মায়াবশে কর্তৃ নামে দেখা দিল,
তাহা ছাড়া অন্য কিছু নাহি ছিল আর,
অনাদি মায়ায় জীব আকার ধরিল ॥ ২৪

আদিতে বাস্তব ছিল তমঃ বা অজ্ঞান
ভাবরূপে—তাহে গূঢ়, তাই লক্ষ্যাতীত,
নামরূপে পরিচ্ছিন্ন জগতের মূল—
নীর যথা থাকে ক্ষীরে নহে প্রকাশিত।
সৃজনেচ্ছু বিধাতার সঙ্কল্প হইতে,
অনাদি কর্মের স্রোতে জগতে নিহিত
পূর্ব হ'তে অনুস্যূত সক্রিয় সতত,
মনোরূপ বীজ হ'তে হইল প্রতীত ॥ ২৫

এহেন মায়ার হয় বৈশিষ্ট্য চারিটি—
ইহা হয় তরুণ ও সদাই নূতন
অঘটন-ঘটনায় অতি সুচতুর,
ইহার দক্ষতা তাই হয় অনুপম,
আরম্ভে মসৃণ সূক্ষ্ম—শ্রুতিমাত্র লভ্য
আত্মজ্ঞান করে ইহা পরে আচ্ছাদন,
প্রকাশিছে ঈশ্বর ও জীব নিরন্তর—
এই তত্ত্ব—এক বৃক্ষে দুই বিহঙ্গম ॥ ২৬

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

গত ২১শে অক্টোবর রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের গত একবৎসরব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা আহূত হয়। সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ব্যবহৃত দ্রব্য ও তাঁহার জীবন ও আদর্শবিষয়ক চিত্রাদিসমন্বিত একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন এবং স্বামী অভেদানন্দজীর একটি আ-বক্ষ মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

সভাপতি মহারাজের ভাষণের পর সভার প্রধান অতিথি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, ডক্টর হীরালাল চোপরা ও ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী স্বামী অভেদানন্দজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার ভাষণে বলেন, 'স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে উন্নত করিয়াছেন, বিরোধী দলের বাধা সত্ত্বেও দৃঢ়হস্তে সে বাধা সরাইয়া পাশ্চাত্যে আমাদের দেশের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পাশ্চাত্যের বহু ব্যক্তিকে ভারত সম্বন্ধে প্রচারিত বিকৃত ধারণার কবল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া সর্ব-ধর্ম-বিশ্বাসের অবলম্বন-ভূমি বেদান্তের কথা তিনি অতি সহজবোধ্য করিয়া প্রচার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ-সমাজে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত বেদান্তোক্ত সত্যের কোন বিরোধ নাই এবং বেদান্তের আলোচনা মানুষকে নৈতিক শক্তিলাভে ও মার্জিত সমাজব্যবস্থা-সম্পাদনে প্রভূত প্রেরণাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষার উন্নয়নের এবং সমাজব্যবস্থায় মানুষের সমানাধিকারের জন্যও তাঁহার আগ্রহ ছিল প্রচুর।

'আজ সারা জগতে, বিশেষ করিয়া ভারতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। তাঁহার সংবৎসরব্যাপী শতবার্ষিকী-উৎসব-অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবালোকবর্তিকাধারী স্বামী অভেদানন্দজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি-অর্পণ উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন ভাবে মূলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণেরই উদার ভাবরাজি প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীর মাধ্যমে ভারতের অন্তর্গত বিভিন্নধর্মাবলম্বী জনগণ ধর্মমত-উদ্ভূত বিভেদ ভুলিয়া জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে পারিবেন। সকলেই ভগবদ্ভক্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তার বলে বলীয়ান হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ ও জনগণের সেবায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবেন।'

মহাজাতি সদনে ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন কর্তৃক গত ২৮শে অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা আহূত হয়।

সভার প্রধান অতিথি ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর রমা চৌধুরী, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণে বলেন, নিবেদিতা ভারতে দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিয়া যুবকদের স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মোৎসর্গের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অশেষ গুণ ও প্রতিভার অধিকারিণী, আজন্ম শিক্ষানুরাগিণী। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে চর্চার জন্য তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমাগম হইত তাঁহার গৃহে। স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ত্যাগ ও তপস্যা-ভিত্তিক জীবনকে তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন ভারতের কল্যাণে, এইসব বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে।

ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের সম্মিলিত স্তোত্র ও সঙ্গীতের পর প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার সময় বলেন যে, স্বামীজীর শিষ্যা, আত্মোৎসর্গের আদর্শে দীক্ষিতা নিবেদিতা ছিলেন নবভারতের সংগঠিকা—ভারতের নবজাগরণের সর্বক্ষেত্রে প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন তিনি। ভারতীয় নারীজাতির উন্নতিকল্পে স্বামীজীর ডাকে তিনিই প্রথম সাড়া দিয়াছিলেন। প্রধান অতিথি ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতের যথার্থ ইতিহাসকে দেখিতে শিখাইয়াছিলেন এবং স্বদেশের প্রতি দেশবাসীর চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। ভারতের জাতীয় সংহতির মূল সুরটিকে চিনিয়া আচার্য শঙ্কর, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতই নিবেদিতা জাতিকে সুসংহত করিতে সচেষ্ট ছিলেন সেই সুরেরই মাধ্যমে। ডক্টর রমা চৌধুরী বলেন, আমাদের জাতীয় শিক্ষাচিন্তায় নিবেদিতার দান অনবদ্য। নিবেদিতা বলিয়াছেন, শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বত্রপ্রসারী করিতে হইবে, পরা ও অপরা বিদ্যার সমন্বয় ঘটাইতে হইবে, শিক্ষার মাধ্যমে দেহ মন ও আত্মার বিকাশ সমভাবে হওয়া চাই, চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির সমভাবে বিকাশ চাই। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু কিছু নূতন তথ্য সহযোগে আলোচনা করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সহিত ভগিনী নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদ লইয়া সম্প্রতি বহু লেখক উভয়ের মধ্যে যে তিক্ততা বিবৃত করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘভুক্ত থাকিয়া রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া যায় না, শুধু এই কারণেই তিনি বাহ্যতঃ সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সহিত তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতির বা আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক উহাতে কখনও বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নাই। সভান্তে প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জনসমাগমে পরিপূর্ণ সভাগৃহে সারাক্ষণ একটি পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব বিরাজিত ছিল।

সমালোচনা

গাথা— যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশক: ভারত প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ৯। মূল্য ৪৲ টাকা। পৃষ্ঠা ২৬৭+৭২।

প্রাচীন যুগের ধর্মসাহিত্যের যেসকল বৃহৎ সঙ্কলন রহিয়াছে, আবেস্তার স্থান ইহাদের মধ্যে অন্যতম। Mazdayasna ধর্মাবলম্বী দেশগুলি ছাড়াও অন্যান্য দেশে আবেস্তা প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গ্রীক ঐতিহাসিক Hermippus ইরানদেশীয় ধর্ম সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে ইহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে রোমদেশীয় ঐতিহাসিক Pliny[1] (মৃত্যু খৃষ্টীয় ১ম শতক) তাঁহার 'Natural History'-নামক গ্রন্থে Hermippus-এর রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। Pliny বলিয়াছেন যে, Hermippus ইরানদেশীয় গ্রন্থ হইতে তাহাদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং জরথুস্ত্র রচিত দুই লক্ষ ধর্মগাথাও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। আরবদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Masudi (মৃত্যু ৩৪৬ হিজরী) বলিয়াছেন যে, জরথুস্ত্রীয় ধর্মপুস্তকগুলি ১২০০০ গোচর্মে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। পহ্লবী গ্রন্থে যেসকল প্রাচীন ইরানীয় ভাবধারার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আখামেনীয় (Achaemenian) যুগের আবেস্তা ৮১৫টি অধ্যায়ে সমন্বিত এবং ২১টি নস্ক (Nash) বা খণ্ডে বিভক্ত। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের (Alexander)-এর আক্রমণই মূলতঃ আবেস্তা ধর্মসাহিত্যের বিনষ্টির কারণ বলা যায়। আবেস্তার অবশিষ্ট অংশ-সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা হইয়াছিল পার্থীয় (Parthian) বা আশকানিয়ান্ (Ashkanian) সম্রাট বল্খাশের (Valkhash or Volagases) সমকালে। সাসানীয় (Sassanian) শাসকগণ ছিলেন গোড়া জরথুস্ত্রীয়ধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের শাসনকালেই বিশেষতঃ আরতখ্শীর পাপেকান্ (Artaxshir Papekan)-এর রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় ২২৬-২৪১) আবেস্তাকে বর্তমানরূপে রূপায়িত করা হয় এবং ইহা প্রাচীন ইরানের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে পুনরায় স্বীকৃত ও গ্রাহ্য হয়। সাসানীয় যুগের আবেস্তাও খৃষ্টীয় ৭ম শতকের আরব আক্রমণের ফলে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আরবগণের ধর্মান্ধতা এবং মুঘলদের আক্রমণে আবেস্তার অবশিষ্ট অংশটুকুও লুপ্ত হইয়া যায়। সাসানীয় যুগে যে ২১টি নস্ক (Nask) পরিচিত ছিল, তাহা মূল আবেস্তারই অংশবিশেষ এবং পরবর্তীকালে ইহাদের মধ্যে কেবল একটিমাত্র নস্ক (Nask) (Vendidad, Nask XIX) আমরা পূর্ণাঙ্গরূপে পাইয়াছি। বর্তমান আবেস্তা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত, যথা—ইয়াস্না (Yasna), ভিস্পেরেদ (Vispered), ইয়শ্ত (Yasht), মাইনর্ টেক্সট্ (Minor Text), ভেন্দিদাদ্ (Vendidad) এবং হাদোখ্ত নস্কের খণ্ডিত অংশবিশেষ (Fragments from Hadoxt Nask) প্রভৃতি। ইয়াস্নার (Yasna) স্তোত্রমালার বিষয়বস্তু হইতেছে পবিত্র ধর্মানুশাসন। ইহা স্তবগান, উপাসনা এবং জরথুস্ত্রের বাণী-সমন্বিত গাথায় পরিপূর্ণ। ভাষাতত্ত্বের বিচারে আবেস্তার অন্যান্য অংশ হইতে এই গাথাগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ভিন্নতর উপভাষা লইয়া গঠিত। ইয়াস্না আবার, 'হা' বা 'হাইতি'

---

1. Plinius—Historia Naturalis

(Hā or Hāiti) নামে ৭২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং 'ইজিস্নে' (Izashne) অনুষ্ঠানে (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) পুরোহিত-সম্প্রদায় বা 'মোবিদ'গণ (Mobid) এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিতেন। ইয়াস্না (Yasna) তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

(ক) ১-২৭ অধ্যায়, অহুর মজদার প্রার্থনা, পবিত্রবারি জওত্র (Zaodra) বা জওথ্ এর উৎসর্গ, 'বরেস্ম' (Baresma) অর্থাৎ সোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাষ্ঠের গুচ্ছ, পুরোহিতগণ তাঁহাদের ধর্মাচারের অঙ্গরূপে 'হওম' বা সোম (Haoma) পান করিতেন।

(খ) ২৮-৫৩ অধ্যায়—ইহা গাথা বা ছন্দোবদ্ধ রচনা, জরথুস্ত্রের বাণী এবং উপদেশ।

(গ) ৫২ এবং ৫৫-৭২ অধ্যায়—এইগুলি 'অপরো ইযস্নো' (Aparo Yasno) বা 'উত্তর ইয়স্না' নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে স্তব ও প্রার্থনা লইয়া গঠিত।

গাথাগুলি সংখ্যায় ৫টি এবং এইগুলি ছন্দানুসারে সজ্জিত এবং প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দ লইয়া ইহাদের প্রত্যেকটির নামকরণ হইয়াছে—যেমন, অহুনবইতি (Ahunavaiti), উশ্তবইতি (Ushtavaiti), স্পেন্তমইন্যু (Spentamainyu), বোহু ক্ষথ্র (Vohu Xsadra) এবং বহিস্ত-ইশ্তি (Vahishta-Ishti)। এইগুলি ১৭টি স্তোত্রে বিভক্ত (ইয়াস্না ২৮-৩৪, ৪৩-৪৬, ৪৭-৫০, ৫১ এবং ৫৩)। ইহাদের মধ্যে ৩৫-৪২ অধ্যায়গুলি ইযাস্না হপ্তঙ্ হাইতির (Yasna Haptanhaiti) অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, এই অংশটি গদ্যে রচিত। গাথাগুলিই আবেস্তার মধ্যে কঠিনতম অংশ। আবেস্তার মূল গ্রন্থটির নির্ভুল পাঠোদ্ধার অত্যন্ত কষ্টকর। কেবল বর্তমানেই গাথাগুলির মর্মোদ্ধার পণ্ডিতবর্গের নিকট যে দুঃসাধ্য কার্য তাহা নহে, ১৫০০ বৎসর পূর্বেও ইহা অনুরূপ সমস্যার বিষয় ছিল। সাসানীয় (Sassanian) যুগে যখন আবেস্তার অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা ও টীকা টিপ্পনী পহ্লবী ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তখনও আবেস্তার গাথাগুলির অনুবাদ সমানভাবে দুঃসাধ্য কার্য ছিল। ভাষা ও চিন্তাধারার দিক দিয়া প্রাচীন ভারতের বৈদিক সাহিত্যের সহিত গাথাগুলির তুলনা করা চলে। উপরন্তু আবেস্তা সাহিত্যের সহিত বৈদিক শব্দ, বাগ্ধারা এবং ভাবধারণার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ধর্ম- ও নীতি-শাস্ত্রের তুলনামূলক আলাপ-আলোচনার জন্য পণ্ডিত সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। উক্ত বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থাদিও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বর্তমান গ্রন্থটি গাথা বা জরথুস্ত্রের ধর্মীয় সঙ্গীত (Divine Songs of Zarathustra) অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

Bartholomae[2], Hertel[3], Meillet[4], Hartez[5], Haug[6], Spiegel[7], Lommel[8],

---

2. Bartholomae, C—Die Gathas und Heiligen Gebete des altiranischen Volkes—Halle—1879.

Zarathushtras Leben und—hehre-Heidelberg, 1924

3. Hertel, Johanes—Die Zeit Zoroaster, Leipzig, 1925.

4 Meillet, Antoine—Trois Conferences sur les Gathas de l' Avesta, Paris, 1925.

5 Harlez, Baron C.de—Livre sacre du Zoroastrisme, Paris, 1881.

6. Haug, Martin—Die funf Gathas des Zarathustras, Leipzig, 1858.

7 Spiegel, Friedrich—Avesta die Heiligen Schriften der Farsen, Leipzig, 1852—63.

8. Lommel, H.—Gathas des Zarathustra, 1934—35

Darmesteter[9], Mills[10], Kanga[11], Poure-Daud[12], Tarapcrewalla[13], Khabardar[14], প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত জরথুস্ত্রের গাথার একাধিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত Paul Horn[15], Roth, Geldner[16], Hubschmann[17], এবং Geiger[18] প্রভৃতি পণ্ডিতগণের রচনায় গাথাগুলির আংশিক অনুবাদও পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানের বিজ্ঞ লেখক অনুভব করিয়াছেন যে, গাথাগুলির ব্যাখ্যার মাধ্যমে জরথুস্ত্রের ভাবধারা-সমন্বিত প্রাচীন ধর্মসাহিত্য সম্পর্কে তিনি তাঁহার নিজস্ব মতামত প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিতে পারিবেন। গাথাগুলি সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক চেতনামণ্ডিত। সুতরাং এই ধর্মীয় বাণীগুলি অপার্থিব লোকের সামগ্রী, পার্থিব জগতের বস্তু নহে। গাথাগুলিকে নিজস্ব বিষয়বস্তু অনুসারে বিচার করিতে হইবে। ভারতীয়-ইরাণীয় ধর্মসংস্কৃতির অর্থাৎ নিরাকার-উপাসনার বিশেষ প্রতীক এই গাথাগুলি। আবেস্তার তথাকথিত 'দ্বৈতবাদ' একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর অহুরমজদা দুইটি আত্মা (spirit) সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সৎ এবং মন্দ আত্মা (good spirit and evil spirit, Spanta-mainyus and Ayro-mainyus)। এই আত্মাদ্বয় সমানশক্তিসম্পন্ন এবং চিরকালই বিরুদ্ধপ্রকৃতির। এই শাশ্বত বিরুদ্ধতাই সকল ক্রমবিকাশের মূল। জরথুস্ত্র এই তথাকথিত 'দ্বৈতবাদের'ই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্তমান অনুবাদ-গ্রন্থখানি পূর্ববর্তী সাহিত্যকর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রীয় এবং আমার ধারণা যে, তিনি গাথাদর্শনের একটি প্রাঞ্জল ও বিশ্বস্ত চিত্র-উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন।

ইতিপূর্বে অবিভক্ত বঙ্গদেশে জরথুস্ত্রের গাথাগুলি বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করে নাই। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কেবল এই দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন তাহা নহে, উপরন্তু তিনি ইহার সহিত সহজ সরল বঙ্গানুবাদ, অন্বয়, ব্যাকরণগত টীকা, শব্দগত টীকা, ব্যাখ্যামূলক পরিশিষ্টও সংযোজন করিয়াছেন। ইহার ফলে গ্রন্থখানি বাংলাদেশের পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সমাজের নিকটও বোধগম্য হইবে। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম-সাহিত্যের গবেষণায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য এবং বাংলার বিদগ্ধ-সমাজে তিনি একটি বিশেষ আসন লাভের যোগ্য। আমাদের বিশ্বাস, গাথাগুলির ইহাই প্রথম বঙ্গানুবাদ। মাননীয় লেখক ভারতের জরথুস্ত্রধর্মাবলম্বী সমাজের নিকট যে অবদান

9 Darmesteter, James—Le Zend Avesta Paris, 1892—93.

10. Mills, H—The Gathas of Zarathushtra Leipzig, 1900

11. Kanga, Ervad, K E.—Gatha ba maeni, Bombay, 1941.

12. Poure-Daud—Gatha Surudhai-Zartusht, Bombay, 1927

13. Taraporewalla, I J. S—The Divine Songs of Zarathushtra, Bombay, 1951.

14. Khabardar, A. F.—New Light on the Gathas of holy Zarathushtra, Bombay, 1951.

15. Horn, Paul—Neupersische Etymologie, Heidelberg.

16. Geldner, Karl F.—Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1885—86

Studien zum Avesta, Strassburg, 1882.

17. Hubschmann, H—Ein Zoroastrisches Lied, Munchen, 1872

Persische Studien, Strassburg, 1895

18 Geiger, Wilhelm—Zarathushtra in den Gatha; Vaterland und zeit alter des Avesta und seiner Kultur

রাখিলেন, তাহার মূল্য অপরিসীম। তাঁহার এই বৃহৎ এবং মহতী প্রচেষ্টা সকলের নিকট নিঃসন্দেহে প্রশংসিত হইবে।

—ডক্টর চিন্ময় দত্ত

অণ্ডাল ঃ শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য। আর. মাধবাচারী-লিখিত ভূমিকাসহ। প্রকাশক—মীরাবাণী প্রচারমন্দির, ডি ৩২।৮, এওরবটতলা, বাংগালীটোলা, বেনারস, ইউ পি। মূল্য : ২'০০ টাকা।

'মীরাবাঈ', 'মীরাকহানী' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য দক্ষিণ-ভারতের ভক্ত-সাধিকা অণ্ডালের যে জীবনকথা ও ভক্তিবাদ সম্পর্কে পুস্তক (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ), রচনা করিয়াছেন, বাংলাদেশের তত্ত্ববাদ ও ভক্তিসাহিত্যে তাহার স্থান বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে। বাংলাদেশের বাহিরে বাস করিয়া যিনি বাংলাভাষার সেবা করিতেছেন এবং দক্ষিণভারতের ভক্তিসাধনার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তিনি ভক্ত, সাধক ও ঐতিহ্যবাদী পাঠকের নিকট আন্তরিক সাধুবাদ লাভ করিবেন। বস্তুতঃ ভক্তিশাস্ত্রে ও ভক্তিসাধনায় যে তাঁহার নিগূঢ় অধিকার আছে, তাহা তাঁহার পুস্তিকাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। ভক্তির দুইটি দিক—একটি ইহার তত্ত্বের বা দর্শনের দিক—যাহা মূলতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, আর একটি দিক—উপলব্ধি, অনুধ্যান ও আত্মনিবেদন। লেখক এই দুই পদ্ধতি—দার্শনিক মননধর্ম ও আস্বাদ্যমান ভক্তিরস, অর্থাৎ intellect ও emotion-এর যুগপৎ সমন্বয় দেখাইয়াছেন তাঁহার এই পুস্তিকা 'অণ্ডাল' শীর্ষক ভক্তজীবনীগ্রন্থে। দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের নানা কারণে সাংস্কৃতিক সংযোগ নিবিড় হইতে পারে নাই। পথের বাধা ও দূরত্ব এবং দ্রাবিড়ভাষার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচয়ের জন্য আর্যসংস্কৃতি ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির আত্মীয়তার বন্ধন অদ্যাপি সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। ইহার ফলে শুধু রাজনৈতিক আকাশেই নহে, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষ ক্রমশই দলাদলির হানিকর প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক 'দেবতারা' এ কথাটায় ততটা গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন না। কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের ন্যায় প্রবীণ লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য গ্রন্থরচনার দ্বারা যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর নিকট বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইবেন।

এই পুস্তিকায় তামিলনাদের প্রসিদ্ধ ভক্ত-গোষ্ঠী 'আড়য়ার' (ইংরেজী উচ্চারণে Alwar, Arwar, Azhvar—বাংলায় আলোয়ার, আল্বার, আড়বার ইত্যাদি) এবং সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাধিকা এবং বিখ্যাত কৃষ্ণপ্রেমিকা অণ্ডাল বা গোদার প্রেমভক্তিপূর্ণ জীবন ও সাধনার ব্যাখ্যা- ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমগ্র তামিলনাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনধারার অতি চমৎকার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মাত্র ১৩৪ পৃষ্ঠার মধ্যে যে এরূপ একটা বিপুল ব্যাপার সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে, তাহা সহসা বিশ্বাস হয় না। পনেরটি অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তামিলনাদের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি, আড়য়ারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, অণ্ডালের জীবন ও ইতিহাস, তাঁহার গোপীভাবে শ্রীরঙ্গনাথের (শ্রীকৃষ্ণ) সেবা, তাঁহার দয়িতারূপে সাধনা এবং অণ্ডাল-রচিত 'তিরুপাবৈ' (অর্থাৎ ভক্তিপ্রেমপদাবলী)-সমূহের অনুবাদ প্রচার করিয়া বাংলা দেশের সহিত দক্ষিণ ভারতের,

শ্রীচৈতন্যের রাগানুগা ভক্তিসাধনার সঙ্গে আলোয়ার-সম্প্রদায়ের দয়িতাভাবের সাধনার একটি অবিনশ্বর অবিস্মরণীয় আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি গৌড়বঙ্গে প্রেম-ভক্তিসাধনা নূতন ব্যাপার নহে। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া প্রেম-রসাশ্রিত ভক্তিসাধনার এক নিগূঢ় পরিচয় পাইয়াছিলেন, রায় রামানন্দের সহিত তাঁহার আলাপাদি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। লেখক সেই সমস্ত ভক্তি-সাহিত্য ও ভক্তিধর্মের নিগূঢ় কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া অণ্ডাল-সুন্দরীর অপার্থিব প্রেমভক্তির নিঃশ্রেয়স্ গূঢ় রহস্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রেমভক্তির বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা, দ্বৈতাবাদী দর্শনের বিকাশ ও বিস্তার, কৃষ্ণকেন্দ্রিক দয়িতসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য এবং আড়যার-সম্প্রদায়ের সে-বিষয়ে অবদান সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অমূল্য বলিয়াই মনে হইবে। বিশেষতঃ তিনি অণ্ডাল, মীরাবাঈ ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসাধনার আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক নিগূঢ়তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সাধ্যসাধন-ব্যাপারে যাহার দিঙ্‌নির্দেশ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, চৈতন্যদেবের সহিত সম্পৃক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনা এবং আড়য়ার-সম্প্রদায় ও শ্রীমতী গোদা-অণ্ডালের ভক্তিসাধনার মূল পার্থক্যটি আরও একটু গভীরভাবে বিশ্লেষিত হইলে ভাল হইত। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় সখীসাধনা এবং দক্ষিণভারতীয় দয়িত-দয়িতা-সম্পর্কের প্রেম-সাধনা যে একবস্তু নয়, সে বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা থাকিলে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। সে যাহা হউক, যাঁহারা প্রেমরতিমূলক ভক্তিসাধনার নিগূঢ় পরিচয় পাইতে চান, দক্ষিণভারতের সহিত পূর্বভারতের মৈত্রীযোগ দেখিতে চান এবং মধ্যযুগের বাংলার ভক্তিসাধনার সহিত অণ্ডালের ভক্তিসাধনার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'অণ্ডাল'-শীর্ষক পুস্তিকা একটি অমূল্য উৎস বলিয়া মনে হইবে।

—ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে যথাযোগ্য ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগন্মাতা শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে (৯ই অক্টোবর সপ্তমী হইতে ১২ই অক্টোবর দশমী পর্যন্ত) চারদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৯ই ও ১০ই অক্টোবর সপ্তমী ও অষ্টমী পূজার দুই দিন আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ থাকায় এবং প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় পূজা ও প্রতিমা দর্শনের জন্য ভক্তসমাগম কম হইয়াছিল। নবমীর দিন দুর্যোগ কাটিয়া যাওয়ায় বহু ভক্ত মঠে আসেন ও জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গা-দেবীর উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। বর্তমান পরিস্থিতিজনিত খাদ্যাভাবের জন্য এবার অন্নপ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটী, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর. রহড়া, শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট, শেলা, (চেরাপুঞ্জী, খাসি হিল)।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২৯শে অক্টোবর ১৯৬৭, অপরাহ্নে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণী পাঠ ও সভার অন্যান্য অনুষ্ঠানান্তে শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ভাষণের পর সভা শেষ হয়। স্বামী ওঙ্কারানন্দজী প্রতিদিনের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া জীবনকে আধ্যাত্মিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার উপর বিশেষভাবে জোর দেন—এরূপ জীবনই মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের সহায়ক হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হয়, কিছুদিন হইতে দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফল সারা ভারতকেই স্পর্শ করিয়াছে, রামকৃষ্ণ মিশনও ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট থাকিতে পারে নাই। কাজেই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালকমণ্ডলীকে মিশনের কর্মক্ষেত্রের নূতন বিস্তৃতিবিষয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাঁহারা প্রধানতঃ আরব্ধ কর্মের সুপরিচালনার দিকেই, কর্মের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকর্ষের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছেন বেশী। অবশ্য কার্যতঃ পূর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের দিকে মিশনের সেবাহস্ত প্রসারিত হইয়াছে।

কার্যবিবরণীর সারানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৮জন সাধু সদস্য এবং ৩জন গৃহস্থ সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬৭, মার্চ মাসের শেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৬৮ (সাধু ৩৫২, ভক্ত ৩১৬)।

কর্মপ্রসার

বহু অসুবিধাসত্ত্বেও পাকিস্তানে মিশনের কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। বর্তমানে মিশনের কেবল চারজন সাধু-কর্মী (পাকিস্তানের নাগরিক) সেখানে আছেন। তাঁহারা স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় সেখানে মিশনের কর্ম ও সেবার দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। ভারত-পাকিস্তানের মৈত্রীবৃদ্ধির জন্য মিশন প্রার্থনা করে।

ব্রহ্মদেশের চিত্রও অনুরূপ। রেঙ্গুনে এখন মিশনের একটিমাত্র কেন্দ্রই রহিয়াছে এবং স্থানীয় বন্ধুবর্গ কর্তৃক কোনওপ্রকারে পরিচালিত হইতেছে। সিংহল ফিজি ও মরিশাসে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি স্থানীয় অর্ডিন্যান্সের শর্তাধীনেই পরিচালিত হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে নেফায় আলং-এ একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। খাসি পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী কেন্দ্রের উদ্যোগে আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উপজাতিদের মধ্যে মিশনের কাজ ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

স্থানীয় বালক-বালিকাগণের জন্য দেওঘর বিদ্যাপীঠ কর্তৃক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

জামসেদপুর সোসাইটিতে নির্মীয়মাণ নূতন বিজ্ঞানভবনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৃন্দাবন সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ-স্মৃতিভবনটি পূর্ব-পরিকল্পনানুসারে বিস্তৃতভাবে নির্মাণ করা হইয়াছে। রহড়া বালকাশ্রমে সিনিয়ার বেসিক স্কুল-গৃহের এবং পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে জুনিয়ার বেসিক স্কুল-গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে এবং রাঁচি টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে অতিথি-ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে।

সেবাকার্য

আসামে কাছাড় জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্য ১৯৬৬ খৃঃ ২৯শে জুন আরব্ধ হইয়া ডিসেম্বরে শেষ হইয়াছে। এই সেবাকার্যে ৭২,৬৩১'৮৮ টাকা ব্যয়িত হয়। ইহা ছাড়া দানস্বরূপে পাওয়া ৭৪,৫০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিতরিত হইয়াছে।

উত্তরপ্রদেশে বান্দা জেলায় এবং বিহারে মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা ও হাজারীবাগ জেলায় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে খরাত্রাণ-সেবাকার্য শুরু করা হয়। বান্দা ব্যতীত উপরি-উক্ত অন্যান্য জেলাগুলিতে আলোচ্য আর্থিক বৎসরের (financial year) পরও সেবাকার্য চালাইয়া যাওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশে বান্দা জেলায় অবস্থার উন্নতি ঘটিলে মার্চ মাসে সেবাকেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং মির্জাপুর জেলার একটি দুর্গম অঞ্চল কানহারায় নূতন কেন্দ্র খোলা হয়। উত্তরপ্রদেশে মার্চ, ১৯৬৭ পর্যন্ত সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭,৮১৭'১৩ টাকা, দানস্বরূপ-প্রাপ্ত জিনিসপত্রের মূল্য বাবদ ১৫,১০৫ টাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত। বিহারে এই সময় পর্যন্ত দুর্গত সেবাকার্যে ব্যয় করা হয় ২,৫৬,২৩৪'০৮ টাকা, ইহার মধ্যে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বাবদ ২৪,০১৪ টাকা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

উভয় সেবাকার্যেই সংসৃষ্ট বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দপ্তর হইতে এবং প্রধান মন্ত্রীর আর্তত্রাণ তহবিল হইতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যায়। অর্থ এবং স্বেচ্ছাসেবক উভয় বিষয়েই জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যবিভাগ

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ছাড়া ১৯৬৭, মার্চ মাসে মিশনের ৭১টি কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে পূর্ব-

পাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া, বাকী ৫৮টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রসংখ্যা রাজ্য হিসাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৮, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িষ্যায় ২, দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, নেফা ও কেরলে একটি করিয়া। নেফায় আলং-এ নূতন কেন্দ্রটি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে খোলা হইয়াছে।

মিশনের শাখা-কেন্দ্রগুলির কার্যধারার প্রধানতঃ চারটি বিভাগ: (১) চিকিৎসা, (২) শিক্ষা, (৩) সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার, (৪) গ্রামাঞ্চলে ও দরিদ্রগণের মধ্যে সেবাকার্য।

(১) চিকিৎসা: ভারত ও পাকিস্তানের বহু কেন্দ্রকর্তৃক জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে পীড়িত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারী পরিচালিত হয়।

বারাণসী, বৃন্দাবন ও কনখল সেবাশ্রম, রাঁচির নিকটবর্তী যক্ষ্মা-হাসপাতাল ও কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান—এইসব ইনডোর হাসপাতাল ছাড়াও বোম্বাই, কানপুর, সালেম ও নিউ দিল্লীর সেবাকেন্দ্রগুলিতে আপৎকালীন ব্যবস্থা ও পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকটি করিয়া শয্যার ব্যবস্থা আছে। নিউ দিল্লীস্থিত চিকিৎসালয়টি টি. বি. রোগীদের জন্য। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত নার্সিং-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ৯৬৯, এগুলিতে ১৮,২৪৬ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫০টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে পুরাতন রোগী-সহ ২৫,৫৪,২৮৫ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

(২) শিক্ষা: আলোচ্য বর্ষে মিশন-পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারা:

প্রতিষ্ঠান:	স্থান বা সংখ্যা:
মহাবিদ্যালয়	মাদ্রাজ
"	রহড়া
" (আংশিক)	বেলুড়
" "	নরেন্দ্রপুর
আর্টস্ কলেজ (প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়)	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
বি. টি. কলেজ	"
"	বেলুড়
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (পোস্টগ্রাজুয়েট)	রহড়া
" (সিনিয়র)	সরিষা
" (জুনিয়র)	রহড়া
" "	সরিষা
" "	সারগাছি
বেসিক ট্রেনিং স্কুল	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
"	মাদ্রাজ
শারীর শিক্ষা কলেজ	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
গ্রামীণ " "	"
কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়	"
সমাজশিক্ষাসংগঠক-শিক্ষণকেন্দ্র	বেলুড়
ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল (পলিটেকনিক)	"
"	বেলঘরিয়া
"	মাদ্রাজ
"	পেরিয়ানায়কেনপালয়ম
পরিষেবিকা শিক্ষণকেন্দ্র	কলিকাতা
	(সেবাপ্রতিষ্ঠান)
জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল	
অথবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল	১৪
ছাত্রাবাস (কয়েকটি অনাথাশ্রম-সহ)	৭৯
চতুষ্পাঠী	৩
বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫
উচ্চতর " "	৭
উচ্চ বা " "	১২
সিনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়	৩২
জুনিয়র বেসিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১
নিম্ন শ্রেণীর ও অন্যান্য বিদ্যালয়	৯৭
বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র অথবা কমিউনিটি সেণ্টার	৩২

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে পরিব্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত নরেন্দ্রপুর আশ্রমে অন্ধ ছাত্রদের জন্য একটি 'ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি' আছে। কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র (Institute of Culture) কর্তৃক পরিচালিত দিবাছাত্রাবাসে (Day Hostel) ৮০০ জন ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতেছে, এখানে সাহিত্যাদি ও সংস্কৃতি শিক্ষার এবং বিভিন্ন ভারতীয় ও বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০,১৭৬, তন্মধ্যে ছাত্র ৪৫,০৬১ এবং ছাত্রী ১৫,১১৫।

(৩) **সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার:** মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রতিফলিত ভারতের সমন্বয়মূলক প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। জনসভা, আলোচনাসভা, পুস্তক-প্রকাশন ও উৎসবাদির মাধ্যমেও ভাব-বিস্তার করা হইয়া থাকে।

(৪) **গ্রামাঞ্চলে কার্য ও দরিদ্রগণের মধ্যে সেবাকার্য:** রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি সবই শহরাঞ্চলে স্থাপিত এবং সেগুলি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদেরই জন্য—সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না।

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততঃ নয়টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত এবং এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনাধীন বহু উপকেন্দ্রও আছে। এগুলি জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া ১২৮টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছে, তন্মধ্যে ৬টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক, ৩৩টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী, ৪৯টি প্রাথমিক এবং ৩৭টি বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়। ১৩টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২,৩৯,৯৬৭ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে, ৩টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ২৪টি গ্রাম্য কেন্দ্রে কাজ করিয়াছে। ১০১টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র, ৫টি অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট, ৮টি কমিউনিটি সেণ্টার, ৪টি বৃত্তি-শিক্ষা কেন্দ্র, কৃষি-মেলা ইত্যাদি আছে।

ইহা ছাড়া শিলংকেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে খাসি পাহাড় এলাকায় নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ১৬,৫৭০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

কামারপুকুর মিশন-কেন্দ্র কর্তৃক একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে।

লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগ পাইতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থসাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণ-সেবাকার্য (Relief) করা হয় এবং এই সেবাকার্যের মাধ্যমে সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে।

প্রধান কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্র-গুলির পরিচালনা হইলেও এখান হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্যদানও করা হয়।

প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ২০২টি

দুঃস্থ পরিবারকে ও ২৬৭ জন ছাত্রকে (সিন্ধু উদ্বাস্তুদের লইয়া) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইটি বিদ্যালয়, ১৯০টি পরিবার ও ১৯ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। এই সাহায্যের মোট পরিমাণ ৬৩,৯১৮.৬৪ টাকা। কয়েকটি শাখা-কেন্দ্র হইতেও বহু দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দান করা হইয়াছে।

সেবাকার্য

১৯৬৭, সেপ্টেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়ঃ

খরাত্রাণ-সেবাকার্য

১। **বিহারে** হাজারীবাগ জেলায় ইটখোরী, চম্পারণ ও প্রতাপপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে, সাঁওতাল পরগণা জেলায় রিখিয়া এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ১,৬৫,১৫৮ কেজি, জোয়ার ৬,২৪৬ কেজি, চাল ৪৩৪ কেজি, গুঁড়া দুধ ২০,৬৪৭ পাউণ্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ৯,০০০টি, ধুতি ও শাড়ী ১২,৯৯৯ খানি, শিশুদের পোশাক ১২,৮৪৮টি, কম্বল ও চাদর ২৯৮টি, লেপ ৩৮টি, এবং ১৩ খণ্ড লংক্লথ বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৮২,১৯৫।

২। **উত্তর প্রদেশে**-মির্জাপুর জেলায় কানহারা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,৬৬৭ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪,৫৭৫।

৩। **পশ্চিমবঙ্গে**—পুরুলিয়া জেলায় পারা, হুড়া, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালিতোড়া ও নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে, বাঁকুড়া জেলায় হাট-আসুরিয়া, দধিমুখা, খাগুরী, রামহরিপুর ও জয়রামবাটী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মালদহ কেন্দ্রের মাধ্যমে গম ও জোয়ার ১,২৩,১৩৭ কেজি, চাল ৭,০২৩ কেজি, বার্লি ৩,৫৪৫ কেজি, গুঁড়া দুধ ১,৯১৫ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ৯,১৫৫ খানি, শিশুদের পোশাক ১,৯৩৭টি বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ২৩,৯৬৫।

বন্যার্ত-সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গে—মেদিনীপুর জেলায় পিংলা, রাইপুর মুকুন্দপুর, পিচাবনী, আলাদারপুট সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে বন্যার্তদের মধ্যে চাল ৩১,৫৭৭ কেজি, ডাল ৩০ কেজি, ধুতি ও শাড়ী ৬৫৪ খানি এবং নগদ ৩,৫০৫ টাকা বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১০,০১৪।

দাঙ্গাবিধ্বস্তদের সেবা

• **বিহারে**—রাঁচিতে দাঙ্গাবিধ্বস্তদের মধ্যে রাঁচি আশ্রমের উদ্যোগে সেবাকার্য করা হয়। বিতরিত দ্রব্যাদিঃ গম ২,০১০ কেজি, চাল ৮৪৫ কেজি, ডাল ১১৫ কেজি, গুঁড়া দুধ ৬৮৮ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ৪৪৬ ওবং শিশুদের পরিচ্ছদ ২৪৬টি। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১৭৯০।

ছাত্রের কৃতিত্ব

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠের জনৈক ছাত্র গত মে মাসে গৃহীত পশ্চিম বঙ্গের লাইসেনসিয়েট পরীক্ষায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিবিধ-সংবাদ

শুক্রগ্রহ থেকে পৃথিবীতে প্রথম বেতার-সঙ্কেত

গত ১৮ই অক্টোবর বেলা ১০টার সময় রাশিয়ার মহাকাশ-যান ভেনাস-৪ শুক্রগ্রহের উপর একটি যন্ত্র নামাইয়া দেয়, এবং উহার আট মিনিট পর যন্ত্রটি শুক্রগ্রহ হইতে পৃথিবীতে সংকেতে সংবাদ পাঠাইতে থাকে। মহাকাশ-অভিযানে রাশিয়ার এই সাফল্য আর একটি রেকর্ড সৃষ্টি করিল। এ সময় পৃথিবী হইতে শুক্রগ্রহের দূরত্ব ছিল ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ মাইল।

শুক্রগ্রহ পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হইলেও উহা মেঘাবরণে আবৃত থাকায় পৃথিবী থেকে এতদিন পর্যন্ত তাহার পৃষ্ঠদেশের কোন তথ্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ভেনাস-৪ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। জানা গিয়াছে, শুক্রের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে ১ থেকে ১৫ গুণ বেশী ঘন এবং তাহা প্রায় সবটাই কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়া গঠিত, শতকরা মাত্র এক থেকে দেড় ভাগ হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস। গ্রহ-পৃষ্ঠের উত্তাপও খুব বেশী, ৫৩০° ডিগ্রী ফারেনহিট পর্যন্ত উঠে। এই পরিবেশে সেখানে কোন জীবের (অন্ততঃ পৃথিবীতে যে ধরনের জীবনের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার) অস্তিত্ব সম্ভব বলে মনে হয় না।

মহাকাশ-অভিযান

মানুষের মহাকাশ-অভিযান সর্বপ্রথম সুরু হয় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর। এই দিন রাশিয়া মহাকাশে একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে, সেটি পৃথিবী থেকে ১৪০ হইতে ৫৬০ মাইল দূরে থাকিয়া সেদিন প্রতি ৯০ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছিল। আমেরিকা প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযাত্রী-প্রাণী সারমেয় লাইকা রাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহে চড়িয়া পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করে। প্রথম মহাকাশ-যাত্রী মানুষ ইউরী গাগারিন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে রাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত মহাকাশযানে পৃথিবী পরিক্রমা করেন। প্রথম মার্কিন মহাকাশযাত্রী লেঃ কর্ণেল জনগ্লেন মহাকাশে উঠেন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরের সৌরমণ্ডলে অভিযান সুরু হয় ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে—রাশিয়া হইতে 'লুনিক-১' উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার 'লুনিক-৩' চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে, অজানা চন্দ্রপৃষ্ঠের ফটো তোলে। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে লুনা-৯ চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণ করে। এই বৎসরই জুন মাসে আমেরিকার 'সার্ভেয়ার-১' চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া ১১,৫০০ খানি ছবি গ্রহণ করে।

—রয়টার

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৫তম শুভ-জন্মতিথি আগামী ৭ই পৌষ (২৩. ১২. ৬৭) শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৯
তীর্থযজ্ঞতপোদানযোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্বং সর্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১০
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১১
অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১২

—জগদ্ধাত্রীকল্প

•

বিজয়দায়িনী তুমি, আনন্দদায়িনী তুমি, চরাচর জগতের মাঝে
আনন্দ যেথায় ফোটে তোমারি প্রকাশ সেথা, আনন্দরূপিণি।
সব আরাধনা ধায় তোমারি চরণে, (সর্ব-দেবতা-রূপিণি)।
নমি সর্বগতে, দুর্গে, জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি।

তীর্থ যজ্ঞ তপ দান যোগ-আদি সবি তুমি—এ-সবের তুমি যে মা সার।
তুমিই হয়েছ সব, রয়েছ মা সব ঠাঁই, জগৎ-ব্যাপিনি।
নমি তব পদাম্বুজে জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি।

দয়ারূপা জননী গো, তোমার নয়নপাতে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে কৃপাকণা,
করুণাগলিত চিতে সবাকার দুখ হর, আপদ-তারিণি!
নমি দুর্গে, নমি দেবি, জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি।

মহাযোগী মহেশের গহন হৃদয়পুর নিত্যধাম, স্বধাম তোমার—
(মনের) অগম্য তাহা, অসীম অতুলনীয় ভাবান্তঃবাসিনি।
নমি তব পদাম্বুজে জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি।

কথাপ্রসঙ্গে

জননী সারদাদেবী

স্বামী বিবেকানন্দ জননী সারদাদেবীকে 'জ্যান্ত দুর্গা মা' বলিয়াছেন। সারদাদেবীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁহার চরণযুগলের তুলনা করা হইয়াছে স্থলপদ্মের সঙ্গে, "স্থলপদ্ম-প্রতীকাশ-পাদাম্ভোজসুশোভনাম্"। ইহাও উমার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কুমারসম্ভবে উমার চরণপাতের অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন কালিদাস—উমা যখন চলিতেন, শুভ্রতুষারমণ্ডিতশির হিমালয়ের বুকে যখন চরণপাত করিতেন, তখন মনে হইত মায়ের রাতুল চরণের স্পর্শে প্রতিপদক্ষেপে মা যেন "স্থলারবিন্দশ্রিয়ম্" ছড়াইয়া চলিয়াছেন।

কালিদাসের কথা কবিকল্পনা হইতে পারে, কিন্তু মহাশক্তির চরণস্পর্শে যে সত্যই পদ্ম ফুটিয়া উঠে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিয়া গিয়াছেন, কুণ্ডলিনীর জাগরণের বর্ণনায়।

লজ্জাপটাবৃতা জননী সারদাদেবীই সেই মহাশক্তি। তিনিই দুর্গা, তিনিই উমা, তিনিই কালী। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আবার 'জগন্ময়ী' 'সর্বস্থা', তাঁহার নিজেরই কথা: জ্ঞান হলে ·· শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে—এই তো সোজা কথাটা।

যিনি ব্রহ্ম, যিনি জগন্নিয়ামিকা শক্তি, জগদীশ্বরী, তিনিই কি করিয়া মানুষ হইয়া আসেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক উদ্ধৃত এই কথাই বোধ হয় শেষ কথা, "ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে।" কিন্তু একটি জিনিস আমরা দেখিতে পাই—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁহার চরণে নিজ সাধনার সমস্ত ফলের সহিত জপের মালা সমর্পণ করিয়া অঞ্জলি দিতেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া যাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার সময় গঙ্গাজল পান করিয়া শুদ্ধ হইতেছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোন দেবমন্দিরে যাইয়া যেমন ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন, যাঁহার গৃহে প্রবেশমাত্র সেরূপ হইতেছেন, তাঁহার শক্তির বিপুলতা আমরা কিছুটা অনুমান করিতে পারি।

কিন্তু আমাদের কাছে তাঁহার শক্তির সর্বোচ্চ পরিচয় তাঁহার স্নেহে, যে মাতৃস্নেহের শক্তিবলে তিনি এই বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানেই তিনি আমাদের সকলেরই মা—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মা কালী—'আনন্দময়ী মা', স্বামী বিবেকানন্দের কাছে 'জ্যান্ত দুর্গা মা', আবার ডাকাত আমজদের কাছেও আমাদের চির-পরিচিত মমতাময়ী মা। আমাদের অতি-পরিচিত মায়ের মতই তাঁহার আচরণ—জয়রাম-বাটীতে কোন ভাল খাবার তৈয়ারী করিয়া দিনের পর দিন রাখিয়া দিতেছেন, যদি ইতিমধ্যে কোন ছেলে আসিয়া পড়ে তো খাইবে, কলিকাতা হইতে কেহ আসিয়াছে, তাহার সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস, দেরী হইলে কষ্ট হইবে, ভোর বেলা মা পাড়ায় ঘুরিতেছেন চায়ের দুধের সন্ধানে, সন্তান মহা অপরাধ করিয়াছে, মায়ের কাছে নালিশ আসিলে বলিতেছেন, 'আমি মা, মায়ের কাছে কি ছেলের কোন অপরাধ হয়?'—শঙ্করাচার্য-কৃত জগজ্জননীর স্তবেরই সমর্থন করিতেছেন, 'যদি ভবতি পুনঃ সর্বদা স পরাধঃ, সর্বং তৎ কামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা।'

এখানেই তিনি আমাদের জন্য তাঁহার

চরণ স্পর্শ করিবার অধিকার দিয়া গিয়াছেন সকলকেই, অধিকার দিয়া গিয়াছেন পঙ্কিল হৃদয়েও তাঁহার চরণপদ্ম ছোঁয়াইয়া সেখানে 'হৃৎসারবিন্দ' ফোটাইয়া তুলিবার। হিমগিরি-সদৃশ শুভ্র শান্ত হৃদয়ের তো কথাই নাই, সেখানে তো তাহা ফুটিবেই।

শিক্ষার একটি অবহেলিত দিক

শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যকালে শিক্ষালাভ হইয়াছিল বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক সেখানে প্রবেশ করে নাই একেবারেই। ভারতের সমাজের প্রাচীনকাল হইতে আগত নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতিতেই তিনি শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি এখন, তাহার কিছুই তিনি পান নাই বলা চলে—রামায়ণ-মহাভারতাদি পড়িতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে, কিন্তু লিখিতে দেখা যায় নাই। একবার একটি বর্ণপরিচয় আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হৃদয় উহা দেখিতে পাইয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন: মেয়েমানুষ, লেখাপড়া শিখিয়া কি শেষে নাটক-নভেল পড়িবে? পরে লক্ষ্মীদি'র সহিত সামান্য কিছু লেখাপড়া তিনি শিখিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতে জনসাধারণের মধ্যে সমাজে যেভাবে শিশুদের শিখাইয়া তোলা হইত, যাহা শিখানো হইত, তাহারই মাধ্যমে তিনি এমন কিছু শিখিয়াছিলেন যাহা তাঁহাকে নারীত্বের আদর্শের সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়া করাইয়াছিল। ধর্মপ্রসঙ্গে তো কথাই নাই, জাগতিক বিষয়েও তাঁহার বুদ্ধির বিকাশ ও ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁহার বুদ্ধির এবং সময়োচিত কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দজী মঠ-মিশনের কার্যে বহুক্ষেত্রে যখন নিজের বিবেচনায় সঠিকভাবে কর্তব্য-নির্ণয়ে সমর্থ হইতেন না, তখন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতেন কি করিতে হইবে। রাধুদি ও তাঁহার মা প্রভৃতি পাগলদের এবং নিজের অবুঝ ভাইদের লইয়া যে সংসারটিতে তিনি সুদীর্ঘকাল কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাসে শুধু তাঁহার শক্তিশালী অথচ কোমল ব্যক্তিত্বই নয়, তাঁহার প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও জাগতিক জ্ঞানের বিকাশের স্বাক্ষরও বিদ্যমান।

সন্দেহ নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষালাভের এবং সর্বোপরি তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্বের অবদানই, তাঁহার অবতারত্বই ইহার মূল ভিত্তি। তবুও বলা যায়, অবতারত্ব অভিনয়মাত্র এবং সে অভিনয়ে মানুষের ভূমিকা নিখুঁতভাবেই অভিনীত হয়। সেদিক হইতে দেখিলেও অভিনয়ের যে পটভূমি এক্ষেত্রে নির্বাচিত এবং বাল্যশিক্ষারূপে যাহা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার গুরুত্ব কমিয়া যায় না একটুও।

কি এমন ছিল সে শিক্ষাপদ্ধতিতে যাহা যুগে যুগে ভারতে মহীয়সী নারী গড়িয়া তুলিয়াছে, সাধারণভাবেও বহু বাধাবিপত্তি, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা সহিয়াও ভারতের নারীত্বের আদর্শকে যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে?

পদ্ধতির মূলে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে ছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সমাজজীবনের সঙ্গে অতি সহজভাবে মিশিয়া যাওয়া কয়েকটি অভ্যাস—বারব্রত প্রভৃতি পালন, তুলসীতলা, দেবালয়াদিতে সকাল-সন্ধ্যায় প্রণাম, রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি। কখনো বা কথকতা ও যাত্রাদিতে যোগদান (যাহার মূল বিষয়বস্তু থাকিত কোন পৌরাণিক কাহিনী)।

সামান্য জিনিস, কিন্তু নরনারী নির্বিশেষে সকলেরই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার • মত

শিক্ষায় যাহা প্রাথমিক প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার এত সহজ পদ্ধতি আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। ভগিনী নিবেদিতা শিক্ষা-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশকে জীবনের আদর্শ বলিয়া জানিবার এবং উহাকে জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের পথ খুঁজিয়া পাইবার এত সহজ পন্থা আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। সামান্য উপবাস, সামান্য অনুষ্ঠান, নিত্য নিয়মিতভাবে ভগবানকে অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্য স্মরণ করা—এই সব নিয়মপালনের প্রভাব ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের, ভগবদ্-বিশ্বাস-বর্ধনের উপর অসীম, ধীর, অথচ ধ্রুব। শিশুমনের উপর প্রায় অলক্ষ্যে মুদ্রিত এই ছাপগুলিই তাহার পরিণত জীবনের চরিত্রের ভিত্তিভূমি হইয়া দাঁড়ায়। আর রামায়ণ-মহাভারতাদিতে গল্প-ইতিহাসাদির মাধ্যমে মানুষের সর্বোচ্চ চিন্তা ও আদর্শগুলি সর্বজন-বোধ্যভাবে পরিবেশনের প্রয়োজনের গুরুত্বও বোঝা যায় টয়েনবীর একটি কথায়: কোন সভ্যতা কত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে তাহা তাহার মধ্যে কতজন লোক চিন্তার কত উচ্চ শিখরে উঠিল তাহার উপর নির্ভর করে না, করে তাহাদের সেই উচ্চ চিন্তাগুলি সর্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থার উপর।

শিক্ষার উন্নয়ন-বিষয়ে আজ আমরা বহুভাবে চিন্তা করিতেছি কিন্তু শিক্ষার এই মূল কথাগুলি লইয়া বিশেষ কিছু ভাবিতেছি না। শিক্ষার্থীদের কি কর্তব্য, কিসে তাহাদের নিজের ও দেশের কল্যাণ, একথা শুধু পড়াইলেই বা শুনাইলেই যে মানুষ সেভাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে না, কার্যকালে স্থিরচিত্তে ভাবিয়া কোন নির্ভুল সিদ্ধান্তগ্রহণের মত মানসিক স্থৈর্যেরও অধিকারী হয় না, ইহা আমরা ভুলিয়াছি। বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি শিক্ষায় থিওরেটিক্যাল শিক্ষার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার মত মানসিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজন অনিবার্য। একথা বলা বাহুল্য, যাহা বুদ্ধিগত করিলাম জীবনে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে সে শিক্ষার কোন মূল্যই নাই, স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, একটি বড় লাইব্রেরীকে এরূপ ব্যক্তির চেয়ে অধিক শিক্ষিত বলা যায়। বিজ্ঞান-শিল্পাদি শিক্ষার মত 'মানুষ' করার শিক্ষাতেও এই হাতে হাতে করার দিকটিতে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবেই যদি আমরা 'মানুষ' চাই, শিক্ষাকে সফল করিতে চাই, বাহিরের মত শিক্ষার্থীর অন্তরটিকেও শিক্ষিত করিতে চাই, বুদ্ধিবৃত্তির সহিত হৃদয়বৃত্তিরও সমান উন্নতিলাভ চাই। অন্তরটি যদি সংস্কৃত না হয় স্বামীজী বলিয়াছেন, তবে শুধু বাহিরটিকে পালিশ করিয়া লাভ কি? লাভ যে নাই, বরং এদিকটিকে বাদ দিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেও তাহাতে দেশের এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদেরও অকল্যাণকে তাহারা কল্যাণ বলিয়া ভাবিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে, দেশের চিন্তাশীল কোন মনীষীর কথাই তাহাদের মনে রেখাপাত করে না, ইহাতো আমাদের গভীর বেদনার সহিত আজ অনুভব করিতে হইতেছে। বর্তমান যুগের অসংখ্য বিভ্রান্তিকর জীবনাদর্শের মধ্য হইতে জীবনের কল্যাণ-পথ নির্ভুলরূপে বাছিয়া লওয়ার এবং সাময়িক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত না হইয়া সে পথে চলার মত শক্তিমান হওয়ার জন্য সংযত, উদ্দেশ্য-নিঃসংশয় ও দৃঢ়ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের প্রয়োজন। আর তাহা একদিনে হয় না, প্রথম হইতেই তাহার জন্য প্রয়াসী হইতে হয়।

ভারতের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতিতে এই দিকটি ছিল। শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত শিক্ষার্থীর 'অন্তর'টির উপর (তাই বলিয়া যেন

না ভাবি যে, অন্যান্য শিক্ষা অবহেলিত হইত)। প্রাচীন গুরুকুল আশ্রমে তাই এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে—যে-বিদ্যার্থী বিদ্যালাভের জন্য গুরুসমীপে আসিয়াছে, তাহাকে প্রথমে বই পড়িতে শেখানো হইতেছে না, এমন কি ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী বিদ্যার্থীকেও ধ্যান-ধারণার উপদেশ দেওয়া হইতেছে না, তাহাকে বলা হইতেছে—'এই গরুগুলি বনে লইয়া যাও, চরাও, পালন কর' বা 'যাও, জমির আলি ভাঙিয়া যেন জল বাহির হইয়া না যায়, তাহা লক্ষ্য রাখ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কর', ইত্যাদি, যাহার সহিত সে যাহা শিখিতে আসিয়াছে আপাতদৃষ্টিতে তাহার কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু ইহাতেই শিক্ষার যাহা বনিয়াদ, 'মানুষে'র জীবনের যাহা বনিয়াদ তাহা প্রস্তুত হইয়া যাইত—শিক্ষার্থীর অন্তরটি গড়িয়া উঠিত, সেবানিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বা ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়া যাইত। ফলে, পরে যে যাহা শিখিত তাহার এবং তাহার জীবন-রূপায়ণের মধ্যকার বাধা ও ব্যবধান কমিয়া আসিত। ভাল-মন্দ-নির্ণয়ের নিজস্ব শক্তি এবং অপরের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকার শক্তি উভয়ই অর্জিত হইত।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা উভয়ই বাড়িয়াই চলে, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক সব কিছু ব্যবস্থারই পুনর্বিন্যাস হয় যুগে যুগে। জাগতিক বিষয়ে শিক্ষার পদ্ধতিও তাই কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত না করিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। উহা করিতেই হইবে, বিষয়গতভাবেও। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বাঞ্ছিত ফল-প্রসূতা না দেখিয়া শিক্ষার উন্নয়নের কথা ভাবিতে বসিয়া শুধু এই দিকটিতেই প্রায় সব মনোযোগ দিয়া থাকি আমরা। উহার প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু অন্তরের শিক্ষার দিকটিতে যে নজর দিতেছি না, বড়জোর পাঠ্যপুস্তকের তালিকার মধ্যে কয়েকখানি মহৎব্যক্তির জীবনী প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তিই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিতেছি, ইহা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকে অবহেলারই নামান্তর। কিন্তু কার্যতঃ তাহাও এখনো হইতেছে না। বিদেশ হইতে আমাদের ভাষায় লিখিত ও ও মুদ্রিত হইয়া শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক আসিয়া আমাদের শিশুদের মনে সেখানকার সংস্কৃতির ছাপ ফেলিতেছে, কিন্তু এদেশের সংস্কৃতির বাহক রামায়ণ মহাভারত-বেদান্তাদির গল্পের বই প্রচুর পরিমাণে শিশুদের হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি কতখানি? শিক্ষার এই অবহেলিত দিকটিতে, উচ্চ আদর্শে অনুরাগ এবং সেই সঙ্গে মনুষ্যত্ব-অর্জনের দিকটিতে নজর দেওয়ার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

এই দিকটিতে জ্ঞানের যতদূর উচ্চতায় ও গভীরতায় পৌঁছিয়া প্রাচীন ভারত যে রত্নভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছে, তাহাতে নূতন আর কিছু যোগ করিবার নাই। স্বামী বিবেকানন্দের লেখার মাধ্যমে (রাজযোগ) এই জ্ঞানের কিছু পরিচয় পাইয়া টলষ্টয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, "এই সত্য, মহোচ্চ, স্বচ্ছ জীবন-সত্য হইতে মানবজাতি বারবার বিপরীত মুখাভিমুখী হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনো উহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই।" মানুষের অন্তরকে, তাহার মনকে, সত্তাকে, প্রত্যক্ষ করিয়া (মনের বাহ্যক্রিয়া-মাত্র দেখিয়া অনুমান করিয়া নয়) এবং সেই স্বচ্ছ সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া ভারতের সত্যদ্রষ্টাগণ মানসিক উন্নতির পদ্ধতিগুলির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, যেভাবে

কোন বৈজ্ঞানিক জড়প্রকৃতির অন্তর্গত সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার পদ্ধতিগুলি বলিয়া দেন, প্রাথমিক হইতে সর্বোচ্চ পর্যন্ত সকল স্তরেই। সত্যদ্রষ্টাদের সেই নির্দেশকে ভিত্তি করিয়া ভারতের জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতিগুলি প্রবর্তিত। মূলগতভাবে সেগুলির পরিবর্তন করিবার কিছুই নাই, শুধু যুগোপযোগী পরিবেশে সেগুলিকে মানাইয়া লইতে হইবে এই পর্যন্ত। আধুনিক মনীষীদের শিক্ষা-চিন্তার স্বর্ণহারে সে রত্নগুলিকে খচিত করিয়া লইতে হইবে। সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া সাশ্রুনয়নে বিলাপ করিবার দুর্ভাগ্যক্ষণ যেন সৃষ্টি না করি আমরা, সোনার বাণিজ্যে যেন মণি ডালি না দিই। শিক্ষাক্ষেত্রে বাহ্য-পরিবেশ বদলাইলেও আন্তর পরিবেশটিকে আমাদের অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। নতুবা সবই অর্থহীন হইবে। যেমন প্রাচীন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের, তপোবনের বাহ্য পরিবেশটি গড়িয়া তুলিলেও সেখানে আন্তর পরিবেশের অভাবে উহা যে ফলপ্রসূ হয় না, আবার শহরের ঘিঞ্জির মধ্যেও এই আন্তর পরিবেশের প্রভাবেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে ঋষির আশ্রমে পরিণত করা যায়, আধুনিক কালে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে অন্তরের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও পদ্ধতি প্রচলিত করিতেই হইবে। প্রথম হইতেই ইহার প্রচলন প্রয়োজন। কিভাবে তাহা করা যায়, গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া সে পদ্ধতি নির্ণয় করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, আজিও শিক্ষার উন্নয়ন-বিষয়ে কার্যপদ্ধতি-নির্ণয়ের সময় আমরা বিদেশের দিকে তাকাইতেছি, অথচ এদেশের আধুনিক যুগের একজন মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ এবিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেছি না। সব দেশেরই চিন্তাধারা চাই, কিন্তু স্বদেশের চিন্তাধারাকে নিষ্ঠাসহকারে পরিত্যাগ করিয়া নহে নিশ্চয়ই।

মনে হয় এবিষয়ে কয়েকটি ব্যবস্থা আমরা এখনই করিতে পারি, যাহা শিক্ষাপদ্ধতিতে আবশ্যিক থাকা একান্ত প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের জন্য প্রতিটি শিক্ষায়তনে বয়সানুসারে সময়ের স্বল্পাধিক্য করিয়া নিয়মিত কিছুক্ষণ ভজন ও প্রার্থনার ব্যবস্থা। যুবকযুবতীদের জন্য ইহার সঙ্গে মানুষের সেবা এবং কিছু শ্রমসাধ্য কাজও যোগ করা প্রয়োজন। এককথায়, যুগোপযোগী পরিবেশে খাপ খাওয়াইয়া লইয়া ভারতের জাতীয় শিক্ষার নিজস্বতাকে, "পবিত্রতা, অনাড়ম্বর জীবন, সুনিয়ন্ত্রিত কর্মতৎপরতা ও শান্ত ধ্যান হতে যা কিছু পাওয়া যায় তার সবকিছু"-কে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবাসিক না হইলে হয়তো সব করা সম্ভব নহে, কিন্তু যতটা সম্ভব হয়, চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত ছাত্রাবাসগুলিকে এই-ভাবে এখনই গড়িয়া তোলা যায়।

উচ্চ আদর্শ পরিবেশনের ব্যাপারে স্বামীজী যাহা চাহিয়াছিলেন, সর্বাগ্রে শিশুদের নিকট তাঁহাদের উপযোগী করিয়া রামায়ণ-মহাভারত-বেদান্তাদির গল্পগুলি পরিবেশন করা, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে, পরে ধারণাশক্তির বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির অন্তর্গত উচ্চ, উচ্চতর ভাবগুলির পরিবেশনের ব্যবস্থার প্রতিও। স্বামীজীর কথায়, চারাগাছকে টানিয়া কেহ বাড়াইতে পারে না, তাহার বর্ধনের উপযোগী সার দিতে হইবে আর প্রথমাবস্থায় রক্ষার জন্য একটু বেড়া। মনে হয় চলচ্চিত্রকে এবিষয়ে কাজে লাগাইলে উভয়তঃ ফলপ্রসূ হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এদেশে চলচ্চিত্রকে কাজে লাগানোই

হয় না। অথচ মনের উপর ছাপ ফেলিবার কাজে ইহার ক্ষমতা অসীম।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই উচ্চ আদর্শকে গ্রহণ ও জীবনে রূপায়িত করিবার ইচ্ছার অভাব নাই। অভাব —উচ্চভাব পরিবেশনের, অভাব - তাহাদের অন্তরটিকে বিকশিত করিবার পরিবেশের।

ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক আন্দোলন

খুব বেশীদিন নয়, ছাত্র-আন্দোলনের ফলে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়াছিল। এবারেও ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে আবার যেন তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। যেটুকু ক্ষতি ইতিমধ্যে হইয়াছে, তাহা আর বাড়িতে না দিয়া উহা পূরণের জন্যই যেন সমবেতভাবে চেষ্টা করা হয়।

কলিকাতার বহু শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষগণ সমবেতভাবে এ বিষয়ে আবেদন জানাইয়াছেন —রাজনৈতিক কারণে শিক্ষাব্যবস্থা যেন ব্যাহত না হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে ছাত্রগণকে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দূরে রাখিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট, রাজনৈতিক নেতাদের নিকট, ছাত্রগণ ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। সরকারও এ বিষয়ে সজাগ। আমরা আশা করি, শিক্ষাব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার গুরুত্ব সকলেই অনুভব করিবেন এবং সকলের সমবেত চেষ্টা ও শুভেচ্ছায় বিদ্যায়তন-গুলিতে শান্ত পবিত্র পরিবেশ পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। আমরা যেন না ভুলি, দায়িত্ব আমাদের সকলেরই।

বিশেষ করিয়া ছাত্রগণ যেন কখনো না ভুলেন যে, ছাত্রজীবন প্রস্তুতির জীবন। রাজনীতি ও জনসেবা করিবার, এমনকি নিজেকে সর্বতোভাবে সে সেবায় উৎসর্গ করিবারও সুযোগ জীবনে বহু আসিবে। বরং যথার্থ দেশপ্রেমিকের, মানবপ্রেমিকের, পরার্থে স্বার্থত্যাগীরই অভাব এখন। এ গুণগুলি সাময়িক উত্তেজনামূলক কোন কার্যের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, সুদীর্ঘকাল নীরবে এ বৃত্তিগুলিকে লালিত ও বর্ধিত করিতে হয়, বিপরীত সহজাত বৃত্তিগুলির সহিত লড়াই করিয়া। তাছাড়া বর্তমান কালের বহুবিধ মতবাদের অরণ্যে যথার্থ কল্যাণকর জীবনপথ খুঁজিয়া বাহির করাও আজ স্থির মননসাপেক্ষ। ছাত্রজীবন তাই কেবল বিদ্যাভ্যাসে, স্বদেশের এবং বিদেশের আধুনিক ও প্রাচীন সর্ববিধ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদগুলির সহিত পরিচিতি ও সেগুলির তুলনামূলক গভীর মননে এবং যাহা কিছু দেহ ও মনকে দুর্বল করে তাহা হইতে দূরে থাকিয়া দেহের ও হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলির পুষ্টিসাধনে যদি ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে তাহাতেই নিজের কল্যাণ করার সঙ্গে দেশেরও শ্রেষ্ঠ সেবা করা হইবে। কারণ সুস্থ সবল দেহ, বজ্রদৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মন, সদসদ্‌নির্ণয়ের নিজস্ব উন্নত সুদূরপ্রসারী উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোক ও লোককল্যাণেচ্ছা লইয়া কৃতবিদ্য হইবার পর ছাত্রগণ যদি কর্মজীবনে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদের দ্বারাই দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। দেশ এখন এরূপ নাগরিকই, এরূপ নেতাই চায়, ছাত্রগণ এরূপ হইয়া উঠিবেন, ইহাই আশা করে। নিজে গভীর চিন্তার শক্তি হারাইয়া অপরের কথায় বিভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল হইলে এবং নিজের ও অপরের বিদ্যালাভের পথেও বাধা সৃষ্টি করিলে তাহাতে লাভ কাহারও হইবে না।

আশা করি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার উত্তর-বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রগণের উদ্দেশে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, ছাত্রগণ তাহা অনুধাবন করিবেন, "তোমরা নিজেদের পড়াশুনায় মনোনিবেশ কর, অন্য কোন কার্যকলাপ যেন তোমাদের অধ্যয়নে ব্যাঘাত না ঘটায়।… পুরাতনই হউক, নূতনই হউক, কোন অযৌক্তিক গোঁড়ামি যেন তোমাদের পথভ্রষ্ট না করে। তোমরা সব কিছু নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী জীবানন্দ

কলুষ-নাশিনী মাতা দেবী মন্দাকিনী তুমি
পরমপাবনী,
ছিলে স্থিরা শিবরূপী রামকৃষ্ণ-জটাজালে
ভুবনতারিণী,
জগৎ-কল্যাণে এলে সারদারূপিণী হয়ে
স্নেহ বিগলিত—
বিশ্বমাতৃহৃদয়ের শান্ত স্নেহ-পারাবার
মৃদু-উদ্বেলিত।
অমিয়নির্ঝররূপা, চিদানন্দময়ী সতী
করুণারূপিণী,
নিত্য প্রশান্তিতে পূর্ণ, করুণা-ক্ষরিত নেত্র,
জ্ঞানস্বরূপিণী
তব মূর্তি ধ্যানমাত্রে হৃদয়েতে মহাবীর্য
জাগে দুর্নিবার,
কণ্ঠে জাগে মাতৃনাম, জাগে চিত্তে সন্তানের
আনন্দ অপার।

'ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু মোর।
আমার আনন্দধাম ঐ তব ক্রোড়।
আমার পাণ্ডিত্য তুমি। আমার বৈভব।
তুমি মোর প্রিয়তম। তুমি মোর সব।
জীবন-যৌবন-খ্যাতি রূপ আর ধন—
জলের বুদ্বুদ সবই। এরা কতক্ষণ?
চিরন্তন তুমি শুধু। বুদ্বুদরাশির
ছলনা তোমারই মায়া। আছ চিরস্থির
চঞ্চলের মাঝখানে। অতিক্রমি তারে।
মানবীয় বাক্য-মন-বুদ্ধির ওপারে।
হৃদয়ের সিংহাসনে রয়েছো আসীন।
পাদপদ্মে লগ্ন রাখো চিত্ত নিশিদিন।
স্বর্ণ-খনি ছেড়ে কাচ খুঁজোনা রে মন।
তিনি সব আনন্দের চির-প্রস্রবণ।

স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

পুরী

৫. ৫. ১৯০৭

ভাই শশী,

তোমার কৃপাপত্র পাইয়া অতি আনন্দিত হইলাম। New York সহরে শ্রীশ্রীপ্রভুর পাকা স্থান হইল অবগত হইয়া আনন্দ হইল, তবে মানুষ—মানহুঁশ চাই ভাই, তা হলেই পাকা, নতুবা সব কাঁচা। আশীর্বাদ কর ভাই যেন শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে ভক্তি হয়, আমি-আমার ভাব যেন দূর হয়ে যায়, এই প্রার্থনা।

যদি ভক্ত আলাসিঙ্গাকে বলে আমার জন্য ২।৪ খানা স্বামীজীর বই পাঠাও পরম বাধিত হইব। একা আছি তাই পড়িতে ইচ্ছা হয়। ডেপুটী অটলবাবু কিছু ভাল বাঙ্গালোরের আঁব চেয়েছিলেন, যদি সুবিধা হয় পাঠাইও।

মহারাজ বোধ হয় আগামী কল্য সোমবার কলিকাতা হতে কোঠার আসিবে, আর এক সপ্তাহ বাদে পুরী আসিতে পারে, রাম এইরূপ লিখেছে। আমার শরীর ভাল আছে। তুমি কেমন আছ লিখিয়া সুখী করিবে। তোমার সঙ্গে কযেক দিন কি আনন্দে ছিলাম। এখন বুঝিতেছি। তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। আর সকল ভক্তকে ও রুদ্রকে ভালবাসা ও নমস্কার কহিবে।

ইতি

দাস বাবুরাম

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

৫. ৬. ১৯০৭

পুরী

ভাই শশী,

তোমার দু'খানি কার্ড পেয়েছি। মঠের বাড়ীর কাজ হচ্ছে শুনে মহারাজ বড় খুশী। শ্রীশ্রীপ্রভুর কাজে খুব লেগে যাও, মহারাজের এই বাণী। রুদ্র বেশ আছে শুনে আমরা বড় আনন্দিত। শুনিলাম এবার ওদেশে আঁব ভাল হয় নাই। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না। স্বামীজীর মন্দিরও কতকটা হয়েছে, ক্রমশঃ হবে। এন. সুব্বারাও-এর পুত্র-পরিবার আসিবে কবে, সেটা যেন আগে আমরা খবর পাই। তাহলে Station-এ গাড়ী পাঠাই। এখানে রামেদের কেহ নাই। যাইহোক আমরা তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করে দিব। ২।৫ দিন পরে এলে ভাল হয়। এখানে যাঁরা আছেন শীঘ্র তাঁরা যাইবেন।

আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে।

ইতি

দাস বাবুরাম

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

পুরী

২৭. ১১. ১৯০৭

ভাই শশী,

মঠবাটীর সম্বন্ধে তোমার বিস্তৃত বিবরণ সহ পত্র পাইয়া পরম পুলকিত হইলাম। আমি গত শনিবারে রাজার ইচ্ছায় এখানে এসেছি। বোধহয় আগামী রবিবারের মধ্যেই মহারাজ প্রভৃতি সকলকেই কলিকাতা অভিমুখে যাইতে হইবে। মধ্যে ভুবনেশ্বর ও ভদ্রকে কিছু দিন কাটাইবার ইচ্ছা। এ বাটী ১লা ডিসেম্বর হইতে জয়পুরের মহারাজা ৩ মাসের জন্য ভাড়া লইতেছে।

তুমি কোঠার ঠিকানায় রামের care এ চিঠি লিখ। সকল দেশে শ্রীশ্রীপ্রভুর স্থান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ইহাপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল সকল দেশে সকল গ্রামে প্রত্যেক গৃহে প্রত্যেক লোকের হৃদয়ে শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক. প্রত্যেক বালক-বালিকা নরনারী ঠাকুরের ভাবে অনুপ্রাণিত হউক। তাঁর উদারতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, নিষ্ঠা, আচার সকলের আদর্শ হউক—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ভাই। এ যুগের প্রত্যেক ব্যক্তির ঠাকুরের সেই কথা মন্ত্র হউক—"এগিয়ে যা, এগিয়ে যা"। দক্ষিণদেশে ভাই কেন, সকল দেশেই বড় বড় মন্দিরের ঐশ্বর্যের অভাব নাই, সম্প্রদায়ে তো দেশ প্লাবিত, কিন্তু আসল বস্তু লাভের জন্য ব্যাকুলতা বৈরাগ্য কই। সে স্থান একদম ফাঁক। ভাই, তুমি আশীর্বাদ কর যেন তোমার মতো শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস একটু আসে—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ভাই, আমি যেন মোহ মায়ায় না ডুবি, অহংকার-অভিমানে আবৃত না হই, একঘেয়ে অন্ধকারে না পড়ি – তাঁর ভক্তের কাছে আমার সদা এই মিনতি। কত সাজে, কত ভাবে মোহ যে ফিরচেন, তা কি আর বলিব। তাই কাতর হয়ে জানাচ্ছি—প্রভু, রক্ষা করুন, প্রভু, রক্ষা করুন। ভাই ভক্ত ভগবান এক, তাই তোমার কাছে নিবেদন – রক্ষা কর ভাই, এ আঁধারে। মহারাজ ভাল আছেন, আমরা ভাল আছি। তোমার শরীর কেমন আছে জানাইয়া বাধিত করিবে। পরমভক্ত গিরিশবাবুর বাটীতে এ পূজায় মা এসেছিলেন, তাই দর্শনে গিয়াছিলাম। যা দেখিলাম, তা তো অত্যদ্ভুত, আশ্চর্য। যত ভক্তের মেলা। গিরিশবাবুর উপমা গিরিশবাবু। প্রায় রাত্রির ২॥টার সময় পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাকে বলরাম বাবুর বাটী হইতে সন্ধিপূজায় আনিবার জন্য পাল্কি ফিরিয়া আসিল। তার ৫ মিনিট পরে ঠিক সন্ধিপূজার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আসিয়া হাজির। আমরা অবাক। গিরিশবাবু আনন্দে অধীর। আবার অন্য দিকে সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অতি ঘৃণ্য আর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী একসঙ্গে। এও এক অভিনব দৃশ্য। অঘটনঘটন এক গিরিশবাবুর বাটীতেই সম্ভব দেখিলাম। পূজার সময় হইতেই গিরিশবাবু হাঁপানি ও জ্বরে মাসাধিক খুব ভুগিয়া কিছু ভাল আছেন দেখে এসেছি। দেখিলাম কি সহিষ্ণুতা! কি ধৈর্য! আগামীকল্য মঠের জ্ঞান, সালিখার সুরেন, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শাশুড়ী ও তাঁরা একসঙ্গে ৺রামেশ্বর-দর্শনে যাইতেছে। তুমি যে সকল

সুবিধা নিজেই করিয়া দিবে জানিয়া লিখিতেছি, ইহা বাহুল্য মাত্র। সকল ভক্তগণকে আমাদের ভালবাসা প্রীতিসম্ভাষণ নমস্কারাদি জানাইবে ও তুমি জানিবে। ইতি

দাস বাবুরাম

রবিবার দিন ১১।১২টার সময় এরা পৌছাইবে। ২।৪ জনের প্রসাদ ঐদিন রাখিয়া দিও। গোঁসাইজীর শাশুড়ীর কোন কষ্ট না হয় দেখিও। ইতি

(৪)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

কলিকাতা

ভাই শশী, ২৪. ২. ১৯০৮

তোমার ভালবাসাপূর্ণ কার্ড কাল পাইয়াছি। আমি শ্রীশ্রিপ্রভুর উৎসব উপলক্ষে এখানে কয়েক দিন আছি। মহারাজ ও শরৎ ভায়াও এখানে আছে। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী জয়রামবাটীতে আছেন। শান্তি ও রাম কিছুদিন হইল শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিল। মঠের সকলে ভাল আছে। সকল ভক্ত ভাল আছেন। কাল নবগোপাল বাবুর বাড়িতে মহোৎসব হয়ে গিয়েছে। আমরা সকলে গিয়াছিলাম। ১২।১৩ দিন হইল এ বাটীতে চণ্ডীর গান হচ্ছে। অনেক ভক্ত আসে। শ্রীশ্রীমার এখন কলিকাতা আসিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁর জন্য বাটী হচ্ছে। তুমি আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি—

দাস বাবুরাম

(৫)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

The Math, Belur P.O. (Howrah)

ভাই শশী, Dated 22 7 1908

তোমার কার্ড পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের চরণে আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইবে। ওদেশের জলবায়ু তাঁর সহ্য হয়েছে এবং তিনি ভাল আছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি এখন কেমন আছ ও মঠের আর সকলে কেমন আছে লিখিয়া সুখী করিবে। বসন্তের প্রেরিত পুস্তক পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তাহাকে আমার ভালবাসা ও স্নেহসম্ভাষণ জানাইবে। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার মঙ্গল করুন, এইমাত্র প্রার্থনা।

দেবমাতা কেমন আছেন? যোগিন, কৃষ্ণলাল, নীরদ, সৎবন্ধু প্রত্যেককে আমার ভালবাসা জানাইবে। বৈরাগ্যানন্দ এখানে এসেছে, বেশ ছেলে। কদিন তার একটু অসুখ হয়েছে, শীঘ্রই সেরে যাবে। এখানকার সকলে ভাল আছে। এবার ম্যালেরিয়া খুব কম। কেবল বামুনের ভাই গোপীর ম্যালেরিয়া হয়েছে। গোপালদাদা, তারকদাদা প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বোধ হয় আগামী ২১শে অগ্রহায়ণ এখানে আসিবেন।

তাঁর জন্য কলিকাতায় প্রায় ১০,০০০৲ টাকায় বাড়ি তৈয়ারী হয়েছে। খড়েশ্বর কেদারবাবু জায়গা দিয়াছে। কিন্তু সে বেচারার বড় অসুখ বোধ হয় ক্ষয়কাশ। মহারাজকে বলিও যে তার রোপিত কাঞ্চনগাছে ২।১টি ফুল হয়েছে। কেলেনডিউলা খুব ফুটেছে—বড় বড় গাছ, খুব বাহার। নানাবিধ সাদা ও বকফুল বিস্তর ফুটেছে। তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা জানিবে ও মহারাজজীকে ও আর সকলকে জানাইবে। ইতি

দাস বাবুরাম

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

The Math, P.O. Belur
Howrah,
Sunday, Dated, 20th. Spt. '08.

ভাই শশী,

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি কতদিনে পুরীতে আসিবে? ভাই, আমার এখন ওদেশে যাইতে ইচ্ছা নাই। যখন তুমি পুরী আসিবে সেই সময় যদি একবার মঠ দর্শন করে যাও তবে আমরাও তোমার দর্শনে পুলকিত হই। তোমার প্রেরিত প্রসাদী বস্ত্র পাইয়াছি। Sister দেবমাতা আমায় এক চিঠি লিখিয়াছেন যে, আমার প্রার্থনায় তিনি খুব বল পাইয়াছেন। এখন তিনি কেমন আছেন? তুমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাইবে। তিনি যাঁর কার্যে মন প্রাণ অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বকালে ও সকল অবস্থায় তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। আমার প্রার্থনা কিছুই নয়। তবে ভাই, প্রভুর ভক্তের অসুখ শুনিলে মন চঞ্চল হয়। যাহারা নিজের দেশ বন্ধু-বান্ধব আচার-ব্যবহার সব ত্যাগ করে শ্রীশ্রীপ্রভুর শরণ নিয়েছে তাহাদের রক্ষার ভার তাঁকে নিতেই হবে, নিশ্চয় নিয়েছেন। ভাই, আমি ভক্তের দাসানুদাস চিরদাস যেন হতে পারি, এই তোমাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা। তুমি Sisterকে আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কারাদি জানাইবে।

তুমি কেমন আছ? আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিবে। তারকদাদা দার্জিলিং-এ আছেন। ব্রহ্মচারী সকলকে আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানাইবে। মঠের সকলে ভাল আছে। ইতি

দাস বাবুরাম

ভগিনী নিবেদিতার সমাজচিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

নিবেদিতা ভারতে এই সমন্বয়-প্রতিভা, যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করবার প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও বিচার করে দেখে 'নেশন'গঠন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত গড়ে তোলেন। তাঁর মতে প্রত্যেক নেশন দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ঠিক যেমন স্তরের পর স্তর, পলির পর পলি জমে জমে অবশেষে অনেকদিন পর একটি শক্ত পাহাড় গড়ে ওঠে, সেই রকম জাতির পর জাতি এক সভ্যতার পলির উপর অপর সভ্যতার পলি জমে, এক সংস্কৃতির স্তরের ওপর অপর সংস্কৃতির স্তর পুঞ্জীভূত হয়ে ক্রমে একটি নেশন রূপ নেয়।[১০] সেজন্য প্রত্যেক নেশনেরই মূলে আছে বহু বিচিত্র উপাদানের সমাবেশ। আধুনিক মার্কিনজাতিও ইংরেজ, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির সমাবেশে গঠিত। প্রাচীন মিশরীয় জাতির ভিত্তি অনুসন্ধান করলেও এ প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে।

প্রাচীন বা আধুনিক প্রতিটি জাতির মূলে এইরূপ বিচিত্র উপাদান থাকলেও তাদের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যই বৈচিত্র্যের মধ্যে তার ঐক্যের পরিচায়ক। প্রাচীন মিশরীয় জাতি, ভারতীয় জাতি, আধুনিক আমেরিকান জাতি এদের সকলেরই নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাই এদের প্রত্যেকটিই এক একটি মহান ঐক্যবদ্ধ মহাশক্তিশালী জাতি। এ ঐক্যের স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন নিবেদিতা—"For as surely as the descent of man is a long story of the gradual dominance of the many parts of the animal body by the specialised brain, so surely does the history of the corporate life reveal a similar process of the growing co ordination of parts in an organic whole". মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন বহুদিন ধরে গড়ে উঠে মস্তিষ্কের পরিচালনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, একটি জাতির জীবনও তেমনি ধীরে ধীরে গড়ে উঠে একটি জৈবিক সমন্বিত জীবনে পরিণত হয়।

নিবেদিতার মতে পূর্বোক্ত বিচিত্র উপাদান সহায়ে একটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ একটি 'নেশন' গড়ে তোলার কাজে প্রধান প্রভাব স্থানের। বিচিত্র উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে স্থান—"These miracles of human unification are the work of the place. Man only begins by making his home. His home ends by re-making him[১১] একটি জাতি-গঠনের মূল বিধান (fundamental law of nation-birth) এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে—"Any country which is geographically distinct has the power to become the cradle of nationality[১২]। জাতীয় ঐতিহ্য যা জাতিকে স্বাতন্ত্র্য দেয়, গৌরব মহিমা দেয়, দেশবাসীর হৃদয়কে

---

১০ Civic And National Ideals—p. 34-36

১১ Civic and National ideals, p. 35

১২ Ibid, p. 36-37

উদ্বুদ্ধ করে তারও স্রষ্টা স্থান। এ বিষয়ে নিবেদিতার মত অত্যন্ত দৃঢ়—"Among all the circumstances that go to create that heritage which is to be the opportunity of the people, there is none so determining, so welding, so shaping in its influence as the factor of the land to which their children shall be native".[১৩]

কোন একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর স্থানের অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন Prof. P Geddes, যাঁর কথা আমরা পূর্বাধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। Geddes তাঁর নগর ও সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে এ তত্ত্বের বিস্তার করেছেন।[১৪] তাঁর এই তত্ত্ব আজকের দিনে নগর-পরিকল্পনা ও সমাজ-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার পথে অপরিহার্যরূপে সহায়ক বলে বিবেচিত। নিবেদিতা এ তত্ত্বের প্রয়োগকে প্রসারিত করেছেন তার জাতিতত্ত্বের বিশ্লেষণে। ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বিবেকানন্দও তাঁর 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ'-সূচক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রচনায়। তাতে তিনি এক-স্থানে বলছেন—"দেখা গেল এক মানব-গোষ্ঠী, তাহাদের উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়, দক্ষিণে দক্ষিণাপথের উষ্ণতা, মধ্যে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ সমতল, সীমাহীন অরণ্য-অঞ্চল, আর তাহারই মধ্য দিয়া দুবারগতি নদীসমূহ প্রবাহিত। .. ভারতীয় আবহাওয়া এই জাতির প্রতিভাকে উন্নততর লক্ষ্যে চালিত করিয়াছিল। এ দেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু-ফলপ্রদ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে সচেষ্ট হইযাছিল। ফলে দার্শনিক ও পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।"[১৫] এখানে বিবেকানন্দ দেখিযেছেন কিভাবে জাতীয় চরিত্রের উপর স্থান প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে বিশেষত্ব মণ্ডিত করে।

বিবেকানন্দকে অনুসরণ করেই বোধ হয় নিবেদিতা ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের এক অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় চরিত্রগঠনে স্থানের প্রভাব নির্দেশ করবার প্রয়াস পেয়েছেন—"Around her (India's) feet the sapphire seas, with snow-clad mountain-heights behind her head, she sits enthroned. And the races that inhabit the area thus shut in, stand out, as sharply defined as herself, against the Mongolians of the North-east and the Semites of the North-west". —নিবেদিতার বহুবর্ণময় অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যানুসারে পদতলে নীলসিন্দুবেষ্টিত, মস্তকে হিমগিরিচূড়ার তুষার-মুকুট-পরিহিত ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এ দেশের অধিবাসীদের চিন্তায়, ধ্যান ধারণায়, জীবনাদর্শে একটি বিশিষ্ট ডৌল এনে দিয়েছে। সেই বিশিষ্ট ধারাতেই ভারতীয় জাতির জাতিত্ব নিহিত। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়েছে, কালান্তরের প্রক্রিয়া কত কিছুকে ধ্বংস করেছে, বিপুল রূপান্তরের প্রলেপ কত পরিববর্তন এনেছে, কিন্তু ভারতীয় জাতির বিশিষ্ট ভাবধারা আজও অব্যাহত

১৩ Ibid, p. 36-37

১৪ Cities in Evolution, P. Geddes.

১৫ বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩–৩৮৭

আছে। জৈন কিংবা মুসলমানগণ বেদ মানেন না, কিন্তু তাঁরাও ভারতের অধ্যাত্মমুখী জীবন-ধারার দ্বারা প্রভাবিত। ভারতের সকল গোষ্ঠী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাবধারা অনুস্যূত হয়ে আছে। এবং ভারতের সমাজ-বিন্যাসে, জন-জীবনযাপনের ধারায়, সকল মানব গোষ্ঠীর জীবন চর্যায় এই ভাবধারার প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছে। বস্তুতঃ বেদ-উপনিষদের উদার মানবিক ভাবধারার পরিমণ্ডল এ দেশের সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ঘিরে আছে। শ্রেয়- ও প্রেয়বোধের মধ্যে সংগ্রামই যে মানব-জীবন এবং শ্রেয়োলাভই যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য—এ মত সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই এক। সামাজিক নীতিবিধান এ ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। সেজন্য উচ্চ-নীচ, হিন্দু, মুসলমান, জৈন যেকোন সম্প্রদায়ের লোক-গোষ্ঠীর জীবনচর্যায় ঐক্য এসেছে। নিবেদিতার অপূর্ব ব্যাখ্যা তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় নিম্নোক্তরূপ—"Neither Jaina nor Mahomedan admits the authority of the Vedas or the Upanishads, but both are affected by the culture derived from them. Both are marked, as strongly as the Hindu, by a high development of domestic affection, by a delicate range of social observation and criticism and by the conscious admission that the whole of life is to be subordinated to the ethical struggle between inclination and conscience".[১৬] বেদ একমাত্র হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র, কিন্তু সকল ভারতীয়ের জীবন-বেদ এক ও অভিন্ন। শাস্ত্রের মন্দিরের দেবতার পার্থক্য, বিশ্বাস আচরণ রীতির পার্থক্য—সকল পার্থক্যকে অতিক্রম করেছে এই অভিন্ন জীবন দৃষ্টি। সেজন্যই ভারতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মিলে মিশে একজাতির সৃষ্টি অতি সহজেই সম্পাদন করতে পেরেছে। নিবেদিতার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তির কাছে তাই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ভেদ-বৈষম্যই বড় হয়ে দেখা দেয়নি, তার এক অখণ্ড মহিমময় জাতিরূপও ধরা দিয়েছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে আমাদের নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা বিভ্রান্ত, নিবেদিতার এই বিশ্লেষণ আমাদের সকল বিভ্রান্তি দূর করতে সহায়তা করে। নিবেদিতা অতি সুন্দর করে দেখিয়েছেন যে জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যও এক—এ ঐক্য পরিলক্ষিত হয় হৃদয়-বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে এবং উচ্চ-নীচ সকল মানুষের মধ্যে সংযম ও বিবেক-নিয়ন্ত্রিত জীবনের অভিব্যক্তিতে। এ দেশের মানুষের মধ্যে শুধু উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শই ছিল না, ছিল জীবনচর্যায় তার বাস্তব রূপায়ণ, ছিল উচ্চ নৈতিক জীবন সর্বস্তরে সর্বপর্যায়ের মানুষের মধ্যে। আজ আমরা সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শও যেমন হারাতে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক আদর্শ হতেও আমরা বহুলাংশে চ্যুত হয়েছি—কারণ যেখানে এ সকল উচ্চ আদর্শই নেই, সেখানে তার বাস্তব রূপায়ণের কোন প্রশ্নই তো ওঠে না। সামাজিক আদর্শও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ধরনের ছিল—যেমন পরিবারে মাতার সম্মান ছিল অতি উচ্চ, গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অতি সম্মানীয় স্থান ছিল, নারীর শুচিতা, পবিত্রতা, ত্যাগ, মহিমামণ্ডিত উচ্চ আদর্শও সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে একই ছিল। এইভাবে অনুসন্ধান করে নিবেদিতা তাঁর অপূর্ব সমীক্ষা 'Unity of Life and Type in India'-তে একের পর এক ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের সূত্র ও অভিজ্ঞানগুলি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। আজকের

[১৬] Civic And National Ideals, p. 40

বিভ্রান্ত ভারতীয় জাতি তার নিজ ঐক্য-ও সংহতি-সন্ধানে ব্যাহত। ভগিনী নিবেদিতার এই সমীক্ষা তাই তার পক্ষে বড় প্রয়োজন। দেশের দৃষ্টি আজ এই সকল আলোচনার ওপর নেই। হয়ত সেজন্য আরও ঘোর দুর্দিন আমাদের ঘিরে ফেলবে। কিন্তু যতদিন পরেই হোক, যখনই হোক, যদি জাতি হিসাবে আমাদের বিনাশ না ঘটে যায়, যদি এ জাতির পুনরুজ্জীবন- ও পুনরুত্থান-প্রয়াস আবার কোন দিন সফলতার সঙ্গে করতে হয়, তাহলে এ জাতির ঐক্যসূত্রের সন্ধানে এই সকল চিন্তা আলোচনা সমীক্ষা ও ব্যাখ্যা পুনরুদ্ধারের কঠিন ব্রত আমাদের নিতে হবে, নূতন করে সেদিন আমাদের নিবেদিতাকে, তাঁর সমাজ-চিন্তা-ধারাকে আবিষ্কার করতে হবে।

জৈবিক বিবর্তন-তত্ত্ব :

নিবেদিতার মতে কোন একটি জাতি একটি জীবদেহের অনুরূপ—একথা প্রসঙ্গক্রমে ইতি-পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য রাজনীতিশাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যেও অনুরূপ ধারণা পাওয়া যায়। প্লেটো, সিসিরো থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে John of Salisbury, Marsiglio, Johannes Althusius প্রভৃতি লেখকেরা রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা করেছেন। ১৮৫২ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে এ তত্ত্বকে চরমে নিয়ে যান Bluntschli নামক তদানীন্তন খ্যাতনামা লেখক, যাঁর মতে "State is the very image of human organism".[১৭] তবে এ তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন Herbert Spencer তাঁর 'Principles of Sociology'তে। Spencer-এর এ গ্রন্থখানিতে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বলে আজ মনে করা হয়। Spencer-এর লেখার প্রভাব তখন সুবিস্তৃত। নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ উভয়েই Spencer-এর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অবশ্য মৌলিক চিন্তায় অনন্যচিন্তাবিদ্ বিবেকানন্দের Spencer-এর সঙ্গে মত-পার্থক্যও ছিল। ছাত্রজীবনে এ বিষয়ে Spencer-এর সঙ্গে তাঁর কিছু পত্রালাপও হয়েছিল বলে জানা যায়। Spencer একটি সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা একটি 'নেশন'কেও জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নেশনের জীবনের বিবর্তন যে জৈবিক, তা যে যান্ত্রিক নয়, এ বিষয়ে নিবেদিতার নিকট বিবেকানন্দ নিজস্ব মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করেছিলেন নিম্নোক্তরূপে: "কোন জাতির উন্নতি যদি 'ক' রেখায় হতে থাকে আর বহিরাগত শক্তির গতি যদি 'খ' রেখায় হয়, তাহলে তৃতীয় মধ্যবর্তী রেখা 'গ' উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন জ্যামিতিক। জাতীয় জীবনের বিবর্তন এরূপ নিয়মে ঘটে না, কারণ যে-কোন জাতির জীবন জৈবিক শক্তির (organic forces) বশবর্তী। সেজন্য যে কোন জাতির জীবনস্রোতকে তার নিজস্ব গতিপথ ধরেই চলতে দিতে হয়, তাতে তার স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয় বিকাশ ঘটে। সেজন্য যে-কোন জাতির জীবনকে উন্নতির পথে পরিবর্তিত করতে হলে তাকে তার নিজস্ব গতিপথেই বলাধান করতে হয়।[১৮]

নিবেদিতা 'নেশন'কে একটি জীবদেহ বলেই শুধু মনে করতেন না, তাঁর মতে একটি নেশন মানবদেহের অনুরূপ। বিষয়টি ব্যাখ্যা

১৭ Garner—Political Science and Govt —p. 215

১৮ বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ: ৩১১

করে একস্থলে তিনি বলেছেন—"Many persons use the word unity in a way that would seem to imply that the unity *of a lobster*, with its *monotonous* repetition of segments and limbs, was more perfect than that of the human body, which is not even alike on its right and left sides. For my own part, I cannot help thinking that the scientific advance of the nineteenth century has enabled us to think with more complexity than this." আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ, রাষ্ট্র বা নেশনকে একটি জীবদেহ বলে মনে করেন না। তাঁরা এরূপ মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। Herbert Spencer নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে, জীবদেহের সঙ্গে সমাজের তুলনা কোন কোন বিষয়ে করা চলে না, কারণ জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাধীন বা স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই, তাদের অস্তিত্ব সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অংশ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সামগ্রিক জীবন ব্যতীত তাদের একটি স্ব স্ব ক্ষেত্র আছে, সম্পূর্ণ নিজস্ব জীবনের ক্ষেত্র আছে। যে-কোন প্রকার যৌথ জীবন সম্বন্ধেই Spencer-এর একথা সত্য। নেশনের জীবনও সেজন্য সম্পূর্ণ একটি জীবদেহ নয়। কিন্তু Spencer এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানুষের যৌথ জীবন একটি জীবদেহ না হলেও, তার বিকাশ জীবদেহের মতো অভ্যন্তরীণ বিকাশ; এবং এ বিকাশ সামান্য আরম্ভ হতে শুরু হয়ে ক্রমশ: জটিলতার পথে চলে, ঠিক যেমন Protoplasm হতে আরম্ভ করে একটি জীবদেহ ক্রমশ: জটিলগঠনসম্পন্ন হয়ে ওঠে।[১৯] আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা এটুকু স্বীকার করেন যে, যে-কোন সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ একটি নেশনের অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তি। বহিঃশক্তিও অবশ্য সে বিকাশকে প্রভাবিত করে। কিন্তু যদি সকল বহিঃশক্তি কোন একসময়ে স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে কোন সমাজদেহের পরিবর্তন বন্ধ থাকবে না, আপন নিয়মেই তা পরিবর্তিত হবে।[২০] এই অভ্যন্তরীণ বিকাশধর্মিতাই জৈব-বিকাশের অভিজ্ঞান। সেজন্য Spencer এবং তাঁর অনুবর্তিগণ, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা কারও মূল বক্তব্য ভ্রান্ত নয়। একটি সমাজ-জীবন বা নেশনের জীবনকে যদি উন্নতির পথে পরিচালিত করতে হয় তাহলে তাকে তার নিজস্ব গতিপথে বলাধান করতে হবে। ভারতে এ তত্ত্বের পরীক্ষা বারবার হয়ে গিয়েছে। বৌদ্ধযুগে ভগবান বুদ্ধ ভারতকে ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে ভারতে শুধু আধ্যাত্মিকতারই পুনরুজ্জীবন ঘটল না, ঘটল তার সর্বাঙ্গীণ অভ্যুত্থান—ধনে সম্পদে শিল্পে, সাহিত্য-কৃতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায়, শিক্ষাবিস্তারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ব সাংগঠনিক বিন্যাসে। স্বামী বিবেকানন্দ এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বোঝাবার প্রয়াস করেছেন—ত্যাগ ও মুক্তির আদর্শ, সেবাব্রতই ভারতের জাতীয় আদর্শ।[২১] যদি ভবিষ্যতে ভারতকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে হয়, তাহলে তার জাতীয় জীবনের এই মূল আদর্শ—ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে, এবং আর সব কিছু স্বয়ংসাধিত হবে। এর পরীক্ষা আমরা উনিশ শতাব্দীর নব-জাগরণের কালেও দেখেছি। রামমোহন,

১৯ Spencer—Principles　Sociology, Vol I, Part II, Chapters 3 and 4.

২০ এ তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন P. Sorokin তাঁর Social and Cultural Dynamics-এ।

২১ বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ. ৩১১

শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সকলেই ভারতের জীবনাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস করেছিলেন এবং তারপরেই ভারতে এক অভূতপূর্ব নবজীবন দেখা দিয়েছিল, যার ফলেই আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটেছে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধ

নিবেদিতা-প্রমুখদের এই জৈবিক বিবর্তন-তত্ত্বের ফলশ্রুতি হল এই যে, অতীত ঐতিহ্যের পথ ধরেই একটি জাতিকে অগ্রগতির পথে চলতে হয়। অতীতকে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলা মানে বর্তমানের অগ্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করা। স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মতে অতীত জীবন-ধারাকে পুনঃসঞ্জীবিত করাই নূতনের সৃষ্টির পথে প্রথম কাজ। নিবেদিতা এ তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Comte-এর একটি সুবিখ্যাত উক্তি—"By the past, through the present, to the future" উদ্ধৃত করে নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন যে, যে-কোন জাতিকেই অতীতের উপাদান দিয়ে বর্তমানে বসে ভবিষ্যৎ রচনা করতে হয়। একটি জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এদিক দিয়ে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধযুক্ত। সেজন্য এক অর্থে ভবিষ্যৎ হল অতীতের পুনরাবৃত্তি—"The future repeats the past, in new combinations and in relation to changed problems".[২২] কিন্তু তৎসত্ত্বেও নূতন যুগ সম্পূর্ণ নূতনই, তা না হয়ে সে যদি কেবল পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি হত, তা হলে সে জাতির পক্ষে মৃত্যুর সামিল হত—"That age which is discovering nothing new, is already an age of incipient death.'[২৩] কিন্তু নূতনের আগমন সত্ত্বেও পুরাতনের অবসান ঘটে না, নূতনের মধ্যেই পুরাতনের পুনরাবর্তন ঘটে। নূতন যুগে পরিবর্তিত অবস্থার দরুন উদ্ভূত সমস্যাসকল সমাধানের প্রয়াসে যেমন একদিকে নূতন চিন্তার উদ্ভব ঘটে, আবার তেমনই পুরাতন সংস্কৃতির নূতন প্রয়োগও ঘটে, তার মধ্যে নূতন আলো, নূতন অর্থ আবিষ্কৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন বিবেকানন্দ পুরাতন বেদান্তধর্মের মধ্যে নূতন যুগোপযোগী নূতন অর্থ আবিষ্কার করলেন দেখা যায়। তাঁর পূর্বে বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদের বাস্তব প্রয়োগ বৈষম্যহীন এক নূতন সমাজ-গঠনের কথা কেউ চিন্তা করেননি। তিনি এ তত্ত্বকে সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনে প্রয়োগ করবার কথা বলেন। বেদান্তের এ অর্থ পূর্ব পূর্ব যুগে অনাবিষ্কৃত ছিল, নূতন যুগে নূতন সাম্য-সমাজ-প্রতিষ্ঠার সন্ধিক্ষণে যুগপ্রয়োজনেই এর এই নূতন অর্থের আবিষ্কার ঘটলো। এর থেকে নিবেদিতা দেখিয়েছেন যে নূতন যুগে পুরাতন সংস্কৃতির এক নবজাগরণ ঘটে, পুরাতন এই নূতন বেশে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ভারতে উনিশ শতকের নব-জাগরণের প্রাক্কালেও ঠিক তাই ঘটেছিল। ঘোর অন্ধকারময় মধ্যযুগের অবসান ঘটলো রামমোহনের আবির্ভাবে। সেইকালে রাম-মোহনের নূতন চিন্তার দিগন্ত আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু তাঁরও আবির্ভাব পুরাতনের গর্ভ হতেই, পুরাতন ধারায় শিক্ষাদীক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন এবং তিনি যা দিয়েছেন তা নূতন হলেও বেদপ্রতিষ্ঠিত ধর্মই। খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মতে রামমোহন ভারতের নব্যন্যায়-চিন্তাধারার ফলশ্রুতি।[২৪] রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যে সমগ্র পুরাতন সংস্কৃতি আরও পূর্ণতর রূপে নূতন

২২ Civic And National Ideals—p 3

২৩ " " " "

২৪ মোহিতলাল : বাংলার নবযুগ—রামমোহন অধ্যায়

কলেবর ধারণ করে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠলো। সেই চিরপুরাতন অথচ সম্পূর্ণ নূতন সজীবের প্রাণচাঞ্চল্য জগৎ প্রত্যক্ষ করল বিবেকানন্দের মধ্যে। তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা অতীতকে অতিক্রমে করে বর্তমানে পৌঁচেছি এবং ভবিষ্যতের পথে উত্তরিত হয়েছি। কিভাবে এটি ঘটেছে এ সম্বন্ধে নিবেদিতার বিস্তাবিত আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। তৎপূর্বে শুধু আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। তা হল এই যে, অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সম্পর্কে নিবেদিতার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ মনীষী এমন কি বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিনও একমত। এ সম্পর্কে লেনিনের অভিমত উল্লেখ করে জনৈক রুশ লেখক মন্তব্য করেছেন, "According to Lenin, Soviet culture is not an invention of experts, but a logical development of cultural heritage which the proletariat received from the previous generations. Lenin relentlessly flayed the so-called proletkuts who spurned the fixed cultural creations of the past solely on the ground that they were produced in a state-owning landlord or bourgeois society. He called them utopians, detatched from real life and said that their 'queer ideas' were capable of doing irreparable damage of the Soviet State and the people." যারা অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিজেদের বিযুক্ত করতে চান, লেনিন তাদের রুশদেশের নূতন সমাজব্যবস্থার শত্রু বলে অভিহিত করেছেন। অতীতকে মুছে ফেলবার যে-কোন প্রয়াস তাই আত্মহত্যার সামিল। এ কথা বোঝা খুব কঠিন নয়। আদি যুগ হতে ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে এসেছি, অতীতে নানা আয়াসে, নানা সাধনায় আমরা বহু সম্পদ লাভ করেছি, সেইসকল সম্পদকে অস্বীকার করার অর্থ হল আবার নূতন করে শুরু করা। এ কি পশ্চাদপসরণ-প্রয়াস নয়? অতীতের আলেখ্য পশুজীবনের স্মৃতিতে থাকে না, কিন্তু মনুষ্য-জীবনের সেইটিই খুব বড় সম্পদ। ইতিহাসের চেয়ে বড় সম্পদ তার আর নেই। অতীত ঐতিহ্যের চেয়ে বড গৌরবের কিছু নেই। একথা আজ আমাদের স্মরণ রাখা একান্ত কর্তব্য। (ক্রমশঃ)

পঞ্চবটীমূলে

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার কালীমন্দিরে নিযুক্ত হয়ে ভরণপোষণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেও কনিষ্ঠের নির্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতা লক্ষ্য করে চিন্তিত হন। তিনি দেখতেন—"বালক সকাল-সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পাদচারণ করিতেছে, পঞ্চবটীমূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা পঞ্চবটীর চতুর্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহুক্ষণ পরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে।"

দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বে কামারপুকুরে অবস্থানকালে তিনি নির্জন শ্মশানে অনেক সময় ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। বাল্যকালেই তিনি বুঝেছিলেন, সংসার অনিত্য—দুঃখকষ্টে পূর্ণ —এর অতীত এক নিরাপদ অচ্যুত আনন্দময় পরম ধাম আছে। তিনি সংকল্প করেছিলেন —এই অনিত্য, দুঃখময় অবস্থার অতীত সেই নিত্য পরম অবস্থা লাভ করতে হবে। মথুরবাবুর একান্ত আগ্রহে তিনি শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা করতে সহসা সম্মত না হলেও ঘটনা-পরম্পরায় পূজকপদে নিযুক্ত হন। পিতৃতুল্য অগ্রজের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর শুদ্ধমনে বৈরাগ্য প্রদীপ্ত করে দিল। "দেখা যায় এই সময় হইতেই তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশপূর্বক, মানব তাঁহার দর্শনলাভে বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কিনা তদ্বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।" বৃথা বাক্যালাপে তিলমাত্র সময় অপব্যয় না করে এবং "রাত্রে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইলে লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইযা জগন্মাতার ধ্যানে কালযাপন করিতেন।" জগজ্জননীর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বর্ধিত হয়ে তীব্র ব্যাকুলতায় পরিণত হল। ঈশ্বরানুরাগের অপরিসীম ভাবাবেগে বাহ্যজগৎ ও নিজদেহ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হলেন। দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে 'মা দেখা দে' বলে পঞ্চবটীমূলে বা গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ করতেন। সে-আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা বোঝা মানবের সাধ্যাতীত। মায়ের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের পর এই পঞ্চবটীতলে মাকে কত রূপে দেখেছেন তিনি।

এই সময়েই শাস্ত্রানুযায়ী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন হওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েক খণ্ড মাটির ডেলা ও টাকা হাতে নিয়ে তিনি বিচার করেছিলেন— "আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকাই মাটি এই বিচার করতে করতে গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম।"

ধর্মপ্রবণ হিন্দুজাতির নিকট জগৎ অনিত্য হওয়ায় ইহজীবনের প্রতি তার স্বাভাবিক অনাসক্তি। তার জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল ভোগবিমুখ সরল অনাড়ম্বর জীবন। মুসলমান রাজত্ব যা করতে সক্ষম হয়নি, ইংরেজ রাজত্বে তা সম্ভব হয়েছে। মুসলমানসভ্যতা আমাদের জীবনের নানাদিক প্রভাবান্বিত করলেও মূল সুর নষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু দু'শ বছর ধরে পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাব মেরু-মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা অনর্থক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছি—ভোগসর্বস্ব জীবনকে সার্থক বলে মনে করছি। কাম এবং কাঞ্চন বর্তমানকালের পরমার্থ।

"টাকা না থাকলেই সব মাটি"—এই হল আমাদের এখনকার জীবন। পাশাপাশি মনে পড়ল—পঞ্চবটীর সামনে গঙ্গার ধারে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবের মতো উজ্জ্বলকান্তি এক ব্রাহ্মণ যুবক, তাঁর তিরোধানের পরবর্তী শতকের ভারতের জীবনের বিপরীতমুখী গতিকে লক্ষ্য করেই যেন বলছেন—"টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি।" তাঁর এরূপ করার অর্থ মনে আশা জাগায়—আবার ভারত স্বস্থানে ফিরবে, অর্থের যথাযথ ব্যবহার শিখবে, অর্থের মোহ হতে মুক্ত হবে।

"ভাবভক্তির প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানাপ্রকার অদ্ভুত বিকার-পরম্পরা ও দর্শনাদি উপস্থিত হইয়াছিল।" সাধনার প্রারম্ভ হতে গাত্রদাহ ক্রমে অসহ্য হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসা হয়। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসে থাকার সময় দেখলেন—আরক্তলোচন ভীষণাকার এক পুরুষ এবং সৌম্যমূর্তি গৈরিক- ও ত্রিশূল-ধারী এক ব্যক্তি তাঁর শরীর থেকে বহির্গত হল। সৌম্যমূর্তি, ভীষণাকারকে সবলে আক্রমণ করে নিহত করতেই ঠাকুরের ছমাসের বিষম গাত্র-দাহ একেবারে প্রশমিত হল।

দাস্যভক্তি-সাধনকালে পঞ্চবটীতে বসে থাকা অবস্থায় একদিন তাঁর অদ্ভুত দর্শন হয়। লোকললামভূতা, নিরুপমা, জ্যোতির্ময়ী এক প্রতিমা প্রসন্নদৃষ্টিপাতে ঠাকুরের দিকে ধীরপদে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় এক হনুমান তাঁর পদপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিত হওয়াতে তিনি উপলব্ধি করলেন 'ইনি রামময়-জীবিতা সীতাদেবী'। সীতাদেবী চকিতে ঠাকুরের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন।

অবতারবরিষ্ঠ হয়ে উত্তরকালে যিনি বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার বারি সিঞ্চন করবেন—বিভিন্ন ধর্মের মূল সুর যে একই, ইহা যিনি প্রমাণ করবেন তিনি তাঁর ইষ্টদেবীর মনোহর দর্শনাদিলাভে ক্ষান্ত থাকতে কখনই পারেন না। সুতরাং 'যত মত তত পথ' নিজে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন সাধনায় উদ্যোগী হলেন। তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমি নির্দেশ করে বর্তমান সাধন-কুটীরের পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বত্থচারা রোপণ করেন। হৃদয় বট, অশোক, বেল ও আমলকীর চারা ঠাকুরের নির্দেশে রোপণ করেন। তুলসী ও অপরাজিতার চারা দিয়ে সমগ্র স্থানটি বেষ্টন করান। শ্রীঠাকুরের কথা—'পঞ্চবটীতে তুলসী-কানন করেছিলাম জপ-ধ্যান করব বলে। ব্যাকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হল। তার পরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি ব্যাকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে।'

তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরের আহ্বানে কালীবাড়ীতে অবস্থান করেন। "ব্রাহ্মণী নিজকণ্ঠগত রঘুবীরশিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটীতলে রন্ধনে ব্যাপৃতা হইলেন।" ব্রাহ্মণী নিজ ইষ্ট-দেবতাকে ভোগ নিবেদন করার সময় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। ঠাকুরও ঐ সময় অর্ধবাহ্যদশায় পঞ্চবটীতে উপস্থিত হয়ে নিবেদিত অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে এই অবস্থায় দেখে অতীব তৃপ্ত এবং আনন্দিত হন, তাঁর ঈশ্বরীয় ভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। পঞ্চবটীতলে কয়েক দিন ধরে ঠাকুর আধ্যাত্মিক দর্শনাদি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করেন। ব্রাহ্মণীও বিভিন্ন শাস্ত্রোল্লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর সংশয় ছিন্ন করতে লাগলেন। এইভাবে তাঁদের উভয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গভীর

আলোচনায় পঞ্চবটীতলে 'দিব্যানন্দের প্রবাহ' বইতে লাগল। শ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন তন্ত্রসাধনায় রত হন। স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণীর নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করেন। পঞ্চবটীতলে জপ, পুরশ্চরণ, ধ্যানাদিতে ঠাকুরের সময় অতিবাহিত হতে লাগল। কয়েক মাস দিনরাত কোথা দিয়ে চলে গেল, এই অদ্ভুত সাধকের তার কোনও হুঁশ রইল না। এই সময় তাঁর বিচিত্র দর্শন এবং অনুভূতি হয়েছিল। শ্রীজগন্মাতার মোহিনীমায়া দর্শন করার ইচ্ছা হওয়াতে দেখেন, এক অপূর্ব সুন্দরী নারী গঙ্গা-গর্ভ হতে পঞ্চবটীতে উঠে এসে ঠাকুরের সম্মুখেই সন্তান প্রসব করে, স্নেহময়ী জননীরূপে আদর করে, পরক্ষণে করালবদনা হয়ে শিশুকে গ্রাস করে গঙ্গাগর্ভে মিলিয়ে গেলেন।

তন্ত্রসাধনায় সকল সিদ্ধি তাঁর করতলগত হল। কিন্তু এই অদ্ভুত যোগীর সকল কাজই অদ্ভুত প্রতিপন্ন হয়েছে। এত বড় অসাধারণ যোগৈশ্বর্যশালী মহামানব অনায়াসে অত্যন্ত সহজভাবে সাধনালব্ধ অনুভূতি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন—বহিঃপ্রকাশ তার কিছুই রইল না। যদিও দু-চারটি যোগজ সিদ্ধির প্রকাশ আমরা জানতে পারি।

এসময়ে তিনি উপলব্ধি করেন—ভবিষ্যতে বহু লোক ধর্মলাভের জন্য তাঁর সমীপাগত হবে। সন ১২৬৭ সালের শেষ হতে ১২৬৯ সালের শেষ পর্যন্ত তিনি তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। এই পঞ্চবটীতলে মাত্র একশ বছর পূর্বে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কত অলৌকিক ঘটনা-সংঘাত, দিব্যদর্শন, ভাবসমাধি, ঈশ্বরবিরহ, জড়ের মতো নির্বিকল্প সমাধি, জগজ্জননীর সহিত বাক্যালাপ—মধুর গদ্‌গদ ভাষণ প্রভৃতি একটির পর একটি চিত্র সৃষ্ট হয়েছিল। সাধনাকালে সমস্ত মন একাগ্র থাকায় বাহ্যজগতের জ্ঞান তাঁর থাকত না। পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে সে অবস্থার দু-একটি উল্লেখ বা আভাসমাত্র সাধারণ্যে প্রচারিত। অবশ্য তাঁর সাধনার তীব্রতা ও ঐকান্তিকতা এবং তাঁর ফলাফল অধিকারিভেদে বিভিন্ন অন্তরঙ্গকে জানিয়েছেন।

কালীবাড়ী-প্রতিষ্ঠার সংবাদ ক্রমে ক্রমে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় গঙ্গাসাগর- ও ৺জগন্নাথ দর্শনপ্রয়াসী পথিক সাধুকুল ক্রমে এস্থানে এসে দু-চারদিন করে রানীর আতিথ্য গ্রহণ করতে লাগলেন। দিশাজঙ্গলের সুবিধা থাকায় এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বহু সাধু সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতি দলে দলে পদার্পণ করতে থাকেন। তাঁরা সকলেই পঞ্চবটীতলেই আসন করতেন। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে জটাধারী নামে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন। জটাধারী পঞ্চবটীতেই আসন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহটি সাধুর অত্যন্ত প্রিয় বস্তু—প্রাণের জিনিস। ভাবরাজ্যে গভীরতাপ্রাপ্ত জটাধারী তাঁর ইষ্ট-দেবতার দর্শনাদি পেতেন। কিন্তু তাঁর উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়নি তখনও। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসায় তিনি সাধনার চরম অবস্থা লাভ করেন এবং 'রামলালা' বিগ্রহটি ঠাকুরের হাতে দিয়ে সজলনয়নে বিদায় নেন। পঞ্চবটীতলায় ঐ ছোট্ট কুটীরে এবং সংলগ্ন স্থানে এক এক সময় এক এক সম্প্রদায়ের সাধুসন্তর আগমন হত। শ্রীভগবানের নামকীর্তন, সাধুদের ধ্যানধারণার দ্বারা তখন পঞ্চবটীতল গমগম করত, বোঝা যায়। মনে হয়, পবিত্র ওঙ্কার-ধ্বনি-শ্রবণপ্রিয় সুরধুনী, যুগযুগান্তর ধরে ভারতের সাধককুলের মুখনিঃসৃত শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্যে প্রতিধ্বনিত জাহ্নবী পুনরায় সেই নাম শোনার জন্য যেন দক্ষিণেশ্বর গ্রাম বিধৌত করে চলেছেন।

সমস্ত সাধনার চরম হল অদ্বৈত-সাধনা। জগজ্জননীর নির্দেশে অদ্বৈতভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আরোহণ করেন এই পঞ্চবটীতেই। সে এক আশ্চর্য ইতিহাস। বিরলবৃক্ষলতা বর্তমান পঞ্চবটীকে দেখলে সে ইতিহাস বিশ্বাসই হয় না। ইতিহাসপূর্ব যুগে, জানি না সে কতকাল আগে, সন্দীপন মুনির আশ্রমে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, শিষ্য শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মবিদ্যা উপলব্ধি করিয়েছিলেন, তার আনুপূর্বিক তথ্য কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ভগবান শঙ্করের অদ্বৈত-সাধনার ঐতিহাসিক সত্যতা কাহিনীতে পরিণত। তথাগতের বোধিলাভের ঘটনা বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্য দিয়ে নির্গলিত হয়ে যতটুকু আমাদের কাছে আসে তা অসম্পূর্ণ। যেমন আমাদের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক আক্রমণে লুপ্ত হয়ে যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত-সাধনার ইতিহাস 'লীলাপ্রসঙ্গে' রাখা আছে—যদিও যথাযথ বিস্তারিত বহু বিবরণ যা সাধারণের বোধগম্য নয় এবং অপ্রকাশ্যতা অলিখিতই রয়ে গেছে।

সাধনার প্রথম হতেই পঞ্চবটীই সব সময়ের শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়স্থান। দিব্যোন্মত্ততায় জগজ্জননীর দর্শন পান। তারপর তাঁর দ্বারা দেবীর বাহ্যপূজা আর সম্ভব নয় দেখে বুদ্ধিমান মথুরামোহন কালীমন্দিরে অন্য পূজকের ব্যবস্থা করেন। সে-ঈশ্বরতন্ময়তার পরিমাণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। হয় সারাদিন-রাত ভাবে প্রেমে গদ্গদ, না হয় পঞ্চবটীতে গভীর ধ্যানে মগ্ন। অদ্বৈত-সাধনার পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু তাঁর সাধন, সব পঞ্চবটীতেই। কারণ পঞ্চবটী নির্জন স্থান—সাধারণলোক-চক্ষুর অগোচর। কালীমন্দিরের কর্মচারিবৃন্দ এবং সাধারণ স্নানার্থী গ্রামবাসী ভূতপ্রেতের বাসস্থান পঞ্চবটীর আকাট জঙ্গলে সহসা প্রবেশ করতে সাহসী হত না। "ও হ'ল মাথাপাগলা ভট্চাজের পাগলামির জায়গা।" সুতরাং ঠাকুরের পক্ষে নির্বিবাদে নিশ্চিন্তচিত্তে পঞ্চবটীতে থাকা সুগম হয়েছিল। এখনকার পঞ্চবটী হলে কিছু করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

যথাসময়ে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী এসে উপনীত হলেন। নির্বিকল্প-সমাধিমান ব্রহ্মজ্ঞ গুরু অসাধারণ শিষ্যের সুলক্ষণযুক্ত জ্যোতির্ময় ভাবঘনতনু দৃষ্টে নিজ সাধনালব্ধ সত্যবস্তুরক্ষার হিরণ্ময় পাত্ররূপে তাঁকে লাভ করে উল্লসিত হ'লেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী তিনরাত্রি একাদিক্রমে কোথাও বাস করেন না, সেজন্য শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যাদানের পর সত্বর চলে যাবেন সংকল্প করে ঐ পঞ্চবটীতেই আসন বিস্তার করলেন। যথাসময়ে সন্ন্যাস-গ্রহণের যথোপযুক্ত অনুষ্ঠানাদি গোপনে সমাপন করে সাধনকুটীরে গুরু-শিষ্যে অবস্থান করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্তে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করে গুরু শিষ্যকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিলেন। ভারতের তথা সমগ্র জগতের পথনির্দেশ যিনি করবেন তাঁকে ঋষি-সম্প্রদায়-আচরিত সন্ন্যাসের দীক্ষায় দীক্ষিত করলেন এক ব্রহ্মজ্ঞ গুরু। ভবিষ্যৎ ভারত তার গৌরবময় অতীতের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। স্বামীজীর বাণী—"ভারত তার গৌরব পুনরায় ফিরে পাবে"—ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার দৃষ্টিতে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সম্ভবতঃ তা দেখেছিলেন। বিষয়বিমুখ, ত্যাগব্রতী, ভগবদ্ভাবে পূর্ণ মানবপ্রেমিকের দল এই প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখা হতে নিজ নিজ দীপবর্তিকা জ্বালিয়ে নিয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে—সংসারের দুঃখ-জ্বালায় জর্জরিত মানুষকে শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী শোনাবে, আপাতরমণীয়তার মোহে মুগ্ধ

যারা, তাদের দৃষ্টি স্বস্থানে ফিরিয়ে আনবে। সে কোন এক শুভদিনে পরম লগ্নে সেই পুরাকালের মতোই অতি সামান্য এক পর্ণকুটীরেই যে পরম জ্ঞান ও মহাবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, মূক নির্বাক স্থবির পঞ্চবটীই তার একমাত্র সাক্ষী। আরও আশ্চর্যের কথা—মাত্র একদিনেই তাঁকে সমাধিস্থ হতে দেখে গুরু অতীব বিস্মিত হয়েছিলেন। এর পর তিনি এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেছিলেন গুরু-শিষ্যের আলাপ-আলোচনা, শাস্ত্রবিচার যে ঐ পঞ্চবটীতেই প্রতিদিন বহুক্ষণ ধরে চলত তা লীলাপ্রসঙ্গেই উল্লিখিত আছে। তোতাপুরীর পঞ্চবটীই বাসস্থান, সুতবাং তিনি যে সদাসর্বদা সেখানেই কাটাতেন, ধ্যান-ধারণা, সমাধি সবই তাঁর ঐ স্থানেই হত তা বোঝা যায়।

বেদান্তসাধনার পর ইসলামধর্ম-সাধন। তাঁর নিজ মুখের কথা—"বটতলায় ধ্যান করছি, মা দেখালেন—এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন, তিনিই জীবজগৎ সমস্ত হয়েছেন।" ইসলামধর্ম-সাধনার গুরু সুফী গোবিন্দ পঞ্চবটীতেই থাকতেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার বলছেন—রানী রাসমণির কালীবাটীতে তখন হিন্দু, সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত।

ঠাকুরের কালীবাড়ীতে থাকাকালে পঞ্চবটীতলা সকল ধর্মসাধনার সাধক, সিদ্ধ, পরমহংস প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল হয়েছিল। বৈরাগ্যবান যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিকের দল কী এক অজ্ঞাত আকর্ষণে দলে দলে আসতেন, ঠাকুরের প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে নিজ নিজ সাধনার পথ সুগম করে নিতেন—ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে বিভিন্ন জায়গায় কথাপ্রসঙ্গে সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধর্মের উদারচরিত চিন্তাশীল ভাবুকমাত্রেই তাঁর চিন্তাধারার অংশ গ্রহণ করবেন বলেই বোধ হয় এই পঞ্চবটী বহু ধর্মসাধনার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল তাঁর সময়ে। ভগবান যীশুর ভাবে তিনদিন অনুপ্রাণিত থাকার পর পঞ্চবটীতেই তাঁর দিব্যদর্শন লাভ করেন।

এই আশ্চর্য উদারচরিত মানুষটির মনের প্রসারতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিজ্ঞানের প্রভাবে বিরাট পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে, ভবিষ্যতে আরও ছোট হয়ে যাবে—দূরদূরান্তর মানুষের পক্ষে দূরত্ব কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। বহুদূর-প্রসারিত দৃষ্টির দ্বারা ধার্মিক, চিন্তাশীল উচ্চহৃদয়, মানবের জাতিগত, ভাষাগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও উন্নত চিন্তার জগতে ঐক্য-সম্পাদনের জন্য মনে হয় পঞ্চবটীকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বধর্ম-সাধনার মঙ্গলঘট স্থাপন করে বিশ্বজননীর উপাসনা করেছেন।

দক্ষিণের দাক্ষিণ্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমিয় দত্ত

মাদ্রাজ শহর ছাড়িয়ে মহাবলীপুরমের দিকে মাইল কুড়ি-পঁচিশ আসার পর রাস্তা হঠাৎ যেন সমুদ্রের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে তার গা ঘেঁষে সোজা দক্ষিণে ছুট লাগিয়েছে। কালো ফিতের মত পথের বাঁদিকে অনন্তনীল মহাসমুদ্র আর ডানদিকে গ্রামীণ সাধারণ মানুষদের নারকেল-পাতায়-ছাওয়া কুটীর ও ঢেউখেলানো বালির ওপরে কাজু-বাদামের গাছ এবং তাদের ছায়া দেখতে দেখতে এক সময় মহাবলীপুরমে পৌছে গেলাম। আগে এর নাম ছিল 'মামল্লপুরম', এটি ঐতিহাসিক নগরী। পল্লববংশীয় বিখ্যাত রাজা নরসিংহ বর্মন্ সপ্তম শতকে এই নগরীর গোড়াপত্তন করেন। শহরের কিছুই এখন তেমন অবশিষ্ট নেই। সমুদ্রচুম্বিত 'মামল্লপুরম' এখন তার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর সবকিছু খুইয়ে কয়েকটি অমূল্য ভাস্কর্য-চিহ্নকে কেবল বুকে ধরে অস্তিত্ব বজায়ের জন্যে মহাকালের সঙ্গে পাঞ্জা কষে চলেছে।

বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে খুদে গাইডের দল ছেঁকে ধরলো। তাদের একজনকে সঙ্গে নিলাম। খুব চালাক ছেলে। মুখে ভাঙা ইংরেজীর খই ফুটছে। সেই আমাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালো। দেখলাম একটা গোটা পাহাড় কেটে মহাভারতীয় এবং ধর্মীয় কোন কোন কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'কম্পোজিশন'টির নাম 'গঙ্গাবতরণ', পৃথিবীর বুকে নেমে আসছেন গঙ্গাদেবী জলপ্রপাতের মত রূপ নিয়ে। তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঔৎসুক্য, উৎসাহ ও উল্লাস নিয়ে চারদিক থেকে ছুটে এসেছে পশু-পাখি দেব-দানব ও মানব। সকলের নিচে আছে দুটো বৃহদাকার হাতী। তাদের একটা কি ঐরাবত? আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সব-কিছুর রূপ দিয়ে মূক পাথরকেও জীবন্ত করে তুলেছেন পল্লবীয় শিল্পিগণ, এই কম্পোজিশনটিকেই কেউ কেউ 'অর্জুনের তপস্যা' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর বিষয়-বস্তু প্রথম নাম-করণেরই সমর্থক বলে আমাদের বিশ্বাস।

এরপর চারটে সাইকেল ভাড়া করে আমরা গাইডের সঙ্গে গেলাম কয়েক ফার্লং দূরে অবস্থিত 'পঞ্চপাণ্ডবের রথ' দেখতে। [প্রসঙ্গত বলে রাখি, দক্ষিণভারতের সর্বত্রই দূরত্ব বোঝাতে 'ফার্লং' শব্দটি ব্যবহার করে;— আমাদের মত 'মাইল' দিয়ে বোঝায় না।] এক একটি রথের এক একটি নাম—যেমন, 'ধর্মরাজ-রথ', 'ভীম-রথ' ইত্যাদি। প্রত্যেকটি রথ একটি বড় আকারের পাথর কেটে নির্মিত। সাধারণ মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ শিল্প-কৌশল এই রথগুলিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে. এগুলি পল্লব আমলের সুদক্ষ ভাস্করদের স্মৃতিসাক্ষ্য এখনো বহন করে চলেছে।

রথগুলি দেখে আমরা এলাম সমুদ্রের কাছে। এখানে আর একটি দেখবার মত জিনিস আছে, সেটি 'সমুদ্র-সৈকতের মন্দির'। কালো পাথর কেটে তৈরী এটি। দুই চূড়া-বিশিষ্ট এই মন্দিরের দেবতা হলেন বিষ্ণু। সমুদ্রের সফেন ঢেউ এই মন্দিরের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। অনেক সময়েই মন্দিরটিকে

সমুদ্রের বুকে ভাসমান বলে মনে হয়। ঢেউ-এর ওঠা নামার জন্যে কখনো বা আবার মন্দিরটি নাচন্ত বলে ভ্রমও জন্মায়।

মহাবলীপুরমের আর একটা জিনিস ভালো লেগেছে। সেটা হ'ল এখানকার মানুষদের সততা। গাইডের কথা অনুসারে ভাড়া-করা সাইকেলগুলো ফাঁকা রাস্তায় চাবি খোলা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা পাহাড়ের ওপর দ্রষ্টব্য বিষয় দেখে বেড়ালাম। বারবার ভয় হচ্ছিল পাহারাহীন অরক্ষিত সাইকেলগুলোর জন্যে। পরে ফিরে এসে সবগুলোকেই যথাযথ অবস্থায় বহাল-তবিয়তে থাকতে দেখে এখানকার মানুষদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

সন্ধ্যের দিকে ফিরে এলাম মাদ্রাজ শহরে। ছাত্র বন্ধুটি রাত্রের গাড়ীতে বিদায় নিল। আবার আমরা তিনজন হ'য়ে গেলাম।

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে জুড়ে মাদ্রাজ শহরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালাম। কখনো গাড়ীতে, কখনো পদযাত্রায়। দেখলাম পৌরভবন, স্টেডিয়াম, চিড়িয়াখানা, প্যারীর মিঠাই তৈরীর কারখানা, বিধানসভা-ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যারিনা সমুদ্র-সৈকত, এবং ঘর, বাড়ী, অফিস, বাগান ও দোকান। সমস্ত কিছুতেই রুচি ও পরিচ্ছন্নতার ছাপ। বিশেষ করে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় মনে দাগ কেটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাল ইটের তৈরী রং বেরংয়ের কাঁচ-বসানো গম্বুজওলা বাড়ীগুলো মন্দির ও গীর্জার আদলে যেন নির্মিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনে ভারতীয় স্থাপত্যের ছাপ। আধুনিক আমেরিকান স্থাপত্য-শিল্পের একঘেয়েমির ঔদ্ধত্য তাকে স্পর্শ করতে পারে-নি। সামনেই সমুদ্র দুলছে। যেন সমুদ্রের সতর্ক প্রহরার সামনে বেড়ে উঠেছে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। পরিবেশ ও রূপের দিক থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর কোন অংশেই মিল নেই। মাদ্রাজের আর একটা বস্তুও মন কেড়েছে। সেটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই কাছাকাছি বড় রাস্তার 'আইল্যাণ্ডে' রাখা দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর তৈরী একটি বিখ্যাত ব্রোঞ্জ মূর্তি: নাম 'শ্রমের জয়'।

এ তো গেল মাদ্রাজের বস্তু দর্শন। এবার মানুষ। আমরা রিক্সাওয়ালা, দোকানদার, হোটেলমালিক থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক পর্যন্ত অনেকের সঙ্গেই আলাপ করেছি। আলাপের মাধ্যম ইংরেজী,—মনে হয়েছে এখানকার শতকরা নব্বইজনই হিন্দী জানে না, এমন কি বোঝেও না। হিন্দীর বিরুদ্ধে এদেশীয়দের তাই এত উত্তাল বিদ্রোহ। আমাদের সঙ্গে যাঁদের আলাপ হ'ল তাঁরা প্রত্যেকেই সদালাপী। বাঙালী ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের অনেকেই অনন্ত আগ্রহ ও কৌতূহল প্রকাশ করলেন। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বাংলাদেশের মানুষদের মত মাদ্রাজবাসীরাও একটু বেশীকরেই রাজনীতি-সচেতন।

দক্ষিণভারতে সবচেয়ে যেটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হ'ল বরবর্ণিনীদের পুষ্পপ্রীতি ফুল এদেশী মেয়েদের কাছে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ করে মাদ্রাজের মেয়েদের কাছে। রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, বাড়ীতে-রেস্তোরায় সর্বত্রই এদেশী মেয়েদের পুষ্পাভরণা দেখেছি। ছোটমেয়ে থেকে বৃদ্ধা সধবা রমণী পর্যন্ত রঙীন ফুলের মালা তাদের নিত্য কেশ-প্রসাধনের কাজে লাগায়। জানি না, এই পুষ্পপ্রীতি মদ্র রমণীদের হার্দিক সুষমা-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতখানি

সহায়ক? এখানকার মেয়েদের বৈশিষ্ট্য তাদের চোখ, চুল ও ভ্রূতে। চোখগুলো টানা টানা। কাজল টেনে আরো বড় করে। ঘনকৃষ্ণ তারা। অপর্যাপ্ত পিঠ-ছাপানো গভীর চুলের রাশি। কালো চিকণ চমৎকার ধনুক-ভ্রূ এদের ঐশ্বর্য। রঙ সাধারণতঃ ময়লা। সব মিলিয়ে দেখলে অবশ্য সৌন্দর্য-শ্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা যায় না।

এখানকার পুরুষদের চুল বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি পাকে। কারণ ঘুরে বেড়ানোর সময় অনেক অল্পবয়স্ক পুরুষদের চুলেই রূপোলী রঙের আভাস ঝিকিয়ে উঠতে দেখেছি। এ-দেশীয় পুরুষ ও নারী উভয়েই পরিশ্রমী। শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে ওরা। সকলেই প্রায় নিরামিষাশী, আগের তুলনায় কুসংস্কারকে অনেক বেশী কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সভ্যতার আলোকে মাদ্রাজ এখন ঝকমকে। বহু পুরুষই লুঙ্গির মত কাপড় না পরে প্যান্ট-সার্টে নিজেদের ঢেকেছে। আর অনেক যুবতীকে দেখলাম কাছা দিয়ে কাপড় না পরে বাঙালী মেয়েদের মত সর্বভারতীয় ঢঙে শাড়ী পড়ছে। ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে মদ্রবাসীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুরাগী। চারিত্রিক ও মানস উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের প্রভাবকে এঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে চলেছেন। রামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দকে এঁরা প্রাণের মন্দিরে বসিয়েছেন,—আমাদের মত কেবল ঘরের দেওয়ালে ছবি-টাঙানোতেই তার সমাপ্তি নয়। ভারতবর্ষের দু-জন মহাপুরুষ নির্বাচন করতে দিলে এরা অবশ্যই বিবেকানন্দকে বাদ দেবেন না। মহারাষ্ট্রের মানুষেরা যেমন বড় মানুষ বলতে বোঝেন শিবাজী ও নেতাজীকে, এখানকার মানুষজন তেমনি মহাপুরুষ হিসেবে ধ্যান করেন বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের।

মাদ্রাজ দর্শন শেষ। রাত্রে নীলগিরি এক্সপ্রেসে ভীড় ঠেলে হুড়-মুড়িয়ে উঠলাম, এবার আমাদের গন্তব্যস্থল উটাকামণ্ড। সারা-রাত ট্রেনে কাটলো, সকাল সাতটায় পৌছলাম কোয়েমবাটুরে। মাদ্রাজ প্রদেশের অভিজাত নগর কোয়েমবাটুর। সাজানো-গোছানো শহর। শিক্ষিতের সংখ্যা এখানে বেশী।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় মেত্তুপালায়িয়াম স্টেশনে নামলাম। কিছুটা দূরে নীলগিরি পর্বতশ্রেণী আকাশ মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। মেত্তুপালায়িয়াম পর্যন্ত বড় গাড়ীর গতি, এরপর চেপে বসলাম মিটার গেজে। ঝিক্ ঝিক্ করে নীল রঙের গাড়ী নীলগিরির বুকবেয়ে ক্রমশঃ ওপরে উঠতে লাগলো। এতদিন ভূগোলের ম্যাপে নিলগিরিকে দেখেছি। মাদ্রাজের মধ্য পশ্চিম জুড়ে এর অবস্থান। আজ স্বচক্ষে দেখলাম নীলগিরিকে। গাছপালায় আপাদমস্তক ঢাকা পর্বতশ্রেণী দূর থেকে নীলরঙের ব্যঞ্জনা আনে, নীলগিরির নাম সার্থক বলেই মনে হ'ল।

মেত্তুপালায়িয়াম থেকে উটাকামণ্ডের দূরত্ব মাইল বত্রিশেক। পাহাড়গুলোর কোল বেড় দিয়ে এই রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লাগলো প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। এই পথে যেতে প্রচুর চা বাগান চোখে পড়লো। পথ-চলতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দু চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দিয়ে সব কিছুকে অপূর্ব করে তুললো যেন। ক্রমশই মনে এই অনুভূতি জাগতে লাগলো,—আমরা যেন এক জগৎ ছেড়ে শান্তি-স্বর্গের অন্য এক জগতের বাসিন্দা হতে চলেছি। এই পথে যেতে প্রথম সাজানো পাহাড়ী স্টেশনের নাম 'কুন্নুর'। এইখান থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। গরমের জ্বালা-যন্ত্রণা কুন্নুরের দরজায় এসে কড়া নাড়তে সাহস পায়

না কখনো। শীতলতার হাত ধরে এখানকার মানুষদের নিত্য ঘরকন্না।

কুন্নুরের পর নামকরা স্টেশন 'আরভান-কাডু', 'ওয়েলিংটন', 'কেটি' এবং 'লাভডেল', তারপরই উটাকামণ্ড ওরফে উটি—ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কাশ্মীর। গাড়ী থেকে নামবার পরই ঠাণ্ডাটা অনুভব করতে পারলাম। জুন মাসের কলকাতার গরমের কথা মনে পড়াতে এখানকার সদ্য-অনুভূত ঠাণ্ডাকে অবিশ্বাস্য ও স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো। কোথায় এসেছি আমরা? সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। সমতল ভূমি থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে নীলগিরি পাহাড় তার বুকের ওপর মানুষকে জায়গা করে দিয়েছে থাকার ও খাওয়ার। আলু-ক্ষেতের পর আলুক্ষেত। থাক থাক সিঁড়ির মত সাজানো, চারদিক ঘিরে মাথা-উঁচানো পাহাড়ের সারি। অজস্র ইউক্যালিপটাসের ঠাস-বুনোনে ঘন সবুজের প্রাচুর্য। বাতাসে ইউক্যালিপটাস পাতার মিষ্টি গন্ধ। চারদিকে সবুজ—সবুজ আর সবুজ। তারই মাঝে নানা জাতের রঙবেরঙের ফুলের ছিটে আর লাল টালির ছাওয়া ঘর। এক কথায় অপূর্ব।

সুন্দরী উটি—ছবির শহর উটি—যৌবনবতী নগরী উটি। তার সুদীর্ঘ লেক, তার মনোরম বোটানিক্যাল গার্ডেন, তার ঘাস-কার্পেটে ঢাকা ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তার সুসজ্জিত দোকানপাট, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট ও আলো-কোজ্জ্বল হোটেল—এই সব-কিছুকে নিয়ে সে লাবণ্যময়ী। তেরদিন আমরা উটিতে ছিলাম। একবারও একঘেয়ে মনে হয়নি। মনে হ'ল, যেন পলক পড়তে না পড়তে দিনগুলো চলে গেল। প্রকৃতির অকৃপণ দানের ছোঁয়ায় যৌবনকে এখানে ফিরে পাওয়া যায়—প্রাণের স্পন্দনকে অনুভব করা যায়। মেঘেদেরও এখানে তাই চঞ্চল দেখলাম। দেখলাম জুনমাসের জলভর্তি ধোঁয়াটে মেঘের দল কখনো পাহাড়ের গা-গড়িয়ে নিচে নামছে, কখনো বা কোথায় কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে উধাও-লোকে যাত্রা করছে।

বাহান্ন হাজার মানুষের দেশ উটি। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল সব আছে। দুধের লিটার বাষট্টি পয়সা। আর আমাদের মতো সমতল-ভূমির মানুষদের কাছে পরমাশ্চর্য ব্যাপার যেটা, সেটা হ'ল এখানকার লেকের সরকারী মাছের দাম একটাকা পঁচিশ পয়সা কে. জি.। ভ্রমণ-কালীন নিরামিষ ভোজনের শোধ এখানে মাছ খেয়ে তুলে নিয়েছি।

উটাকামণ্ড থেকে মহীশূর। দূরত্ব একশো এক মাইল। যাত্রা করলাম বাসে। পশ্চিমে নীলগিরি পাহাড় ডিঙোতে মাইল ত্রিশেক পথ পাড়ি দিতে হ'ল। নাড়ুভক্তমের পর পাহাড়টা যেখানে প্রায় খাড়াই সাত হাজার ফুট নেমে গেছে, সেখানে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। জীবনে ও-ছবি বড় একটা দেখা যায় না। দুদিকের পাহাড়ের খাদে মেঘ আটকে গেছে। তার এদিক-ওদিকে সূর্যের আলো পড়ে রামধনু-রঙীন মায়াপুরী পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যে হ'লেও অনুভব করলাম, আমরা স্বর্গরাজ্যে এসে পৌঁচেছি।

সন্ধ্যেবেলা পৌঁছলাম মহীশূর শহরে। লাল মাটির দেশ—হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের দেশ মহীশূর। অতীতের রক্তাক্ত বিপ্লবের চিহ্ন যেন এর গাঢ় লাল রঙের মাটির বুকে আঁকা রয়েছে। এই মাটির ফসল হ'ল ভুট্টা আর ধান। এখানকার মানুষজনের অনেকেই ইসলামধর্মে দীক্ষিত। ভাষা এদের কানাড়ী। সামান্য হ'লেও হিন্দী কিছু কিছু

লোক বোঝে। পুরনো শহর বলে এর দিকে এখন অনাদরের দৃষ্টি, তেমন পরিচ্ছন্ন নয়।

পরদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত টুরিস্ট বাসে চেপে এই শহরের দর্শনীয় যা কিছু দেখলাম আর্ট গ্যালারী, মহারাজার প্রাসাদ, সরকারী সিল্ক কারখানা, চিড়িয়াখানা, ললিতা মহল, পাথরে তৈরী বিশালবপু ষাঁড়, চামুণ্ডী পাহাড়, টিপুর সমাধি, টিপুর দুর্গ, টিপুর গ্রীষ্ম-কালীন কাঠের তৈরী প্রাসাদ, কাবেরীসংগম, বৃন্দাবন গার্ডেন—কোন কিছুই বাদ দিইনি। শ্রীরঙ্গপত্তনম—টিপুর রাজত্বকালের রাজধানী এখন স্তব্ধ, অতীত ইতিহাসের মূক সাক্ষী। এইসব জায়গা মনকে বড় উদাস করে।

পরদিন আবার বাসে উঠলাম, এবার এলাম মহীশূরের রাজধানী চিরবসন্তের দেশ বাঙ্গালোরে। মহীশূর শহর থেকে নব্বই মাইলের পথ। নক্ষত্রের বেগে ছুটে বাস আমাদের পৌছে দিল। তারপর দুদিন ধরে আমরা বাঙ্গালোর শহর টহল দিয়ে বেড়িয়েছি। এর বিরাট প্রাকৃতিক উদ্যান লালবাগ দেখে আনন্দ পেয়েছি—ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের সৌন্দর্যশ্রী-সমুদ্ভাসিত সুবিপুল 'বিধান-সৌধ' দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিধানসভা-ভবন। সবচেয়ে গভীর আনন্দ অনুভব করেছি এই বিধান-সৌধের প্রধান ফটকের একদিকে সযত্নে রক্ষিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিরাট আকারের তৈলচিত্র দেখে। এখানকার মানুষেরা যে প্রাদেশিকতার বিষ-বাষ্পের স্পর্শে কাতর নয়, তা তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলোচনা করে বুঝেছি। বাঙ্গালোরের 'হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্' কারখানার বিশাল কর্মোদ্যম এবং বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রমনের সুসজ্জিত গবেষণাগার আমাদের গৌরব এবং বিজ্ঞান-চেতনা উদ্বোধনের সহায়ক। সুপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শহরটি বড় হয়ে উঠেছে। কলকাতার মত বাস্তবতার হাওয়ায় এই রাজধানী শহরটিও দোদুল্যমান। এখানকার নারী-পুরুষেরা গোঁড়ামি কাটিয়ে উঠেছে অনেক। আশ্চর্যের কথা কলকাতার মেয়েরা যা পারেনি, এখানকার মেয়েরা তা ক'রছে। অনেক মহীশূরের মেয়েই এখন বাসের কণ্ডাকটার।

ছুটি ফুরিয়ে এল। এবার বিদায় নেবার পালা। ঘরে ফেরার ডাক। আবার গতানুগতিক জীবন, ফিরতে মন উঠছে না। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ। তার কতটুকু অংশই বা দেখলাম। দক্ষিণভারতের অনেক কিছুই যে বাকি থেকে গেল। কেরলের মাটি ছুঁতেই পারলাম না। সবচেয়ে বেশী করে ডাক দিচ্ছে কন্যাকুমারিকা—বিবেকানন্দ শিলা। মানসচক্ষে তাকে দেখতে পাচ্ছি,—আলোড়িত ও স্তনিত সমুদ্রের মধ্যে তার উদ্ধত অথচ মৌন অটল রূপ। বিবেকানন্দের গোটা চরিত্রের চাপ যেন তাতে বাঁধা পড়েছে, মনে মনে বললাম আসবো, আবার আসবো, অদেখাকে দেখবো, অচেনাকে চিনবো, অরূপের রূপের সাক্ষাৎ পাবো। আজ হয়তো সময় নেই, কিন্তু সময় একদিন আসবেই। যে পরমের দর্শন এখন পেলাম না, একদিন সে-ই আমাদের হাত ধরে তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। কারণ পরমকে আবিষ্কার করতে হয় না, সে নিজে থেকেই ধরা দেয়। তাই আর একবার দাক্ষিণাত্যে আসতেই হবে—এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে, দক্ষিণের দাক্ষিণ্য-পুষ্ট পরিপূর্ণ মন-প্রাণ নিয়ে বাংলাদেশের কোলে ফিরে এলাম।

'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'

শ্রীগুরুদাস দাশ

ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়। তিনি দুই নন, বহুও নন। তিনি জন্মমৃত্যুরহিত। তবুও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"—গীতা

অর্থাৎ "জন্মহীন এবং অবিনাশিস্বভাব হয়েও এবং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত ভূতনিবহের ঈশ্বর (নিয়ামক) হয়েও আপন বৈষ্ণবী শক্তিকে বশীভূত করে আত্মমায়াবশে আমাকে 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্মসংস্থাপনার্থায়' যুগে যুগে জন্মপরিগ্রহ করতে হয় এই ধরাধামে।"

এঁদেরই আমরা যুগপুরুষ বা অবতার বলে অভিহিত করি। যুগোপযোগী আচার, নিষ্ঠা সব কিছুই এঁদের মধ্যে থাকে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এঁদের সৎপথাবলম্বিগণের পরিত্রাণ বা পরিরক্ষণ, পাপকারিগণের বিনাশ আর জগতে ধর্মের সম্যক সংস্থাপন। তাই অনুশীলন করলে দেখতে পাওয়া যায়, একাধিক যুগপুরুষ বা মহাপুরুষদের জীবনী, বাণী ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে এক অতি অপূর্ব মিল। অথচ তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণীর মধ্যে দেশকালের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে সাদৃশ্য রয়েছে তারও বহু প্রমাণ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।"

—গীতা, ১২।১৮

—'শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে সমভাবাপন্ন হও।' আবার যিশুখ্রীষ্ট বলেছেন:

"But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you."...

"That ye may be the children of your Father which is in heaven: for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust."

"Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect."

— St Matthew, 6।44-45,48

—'শত্রুকেও ভালোবাস, যাঁরা তোমাকে অভিসম্পাত করেন তাঁদেরকে আশীর্বাদ কর, যারা তোমাকে ঘৃণা করেন তাঁদের তুমি মঙ্গল কর।'

'তোমরা স্বর্গীয় পিতার সন্তান। তিনি সূর্যকে সদসৎ সকলের উপরই উদিত হতে (আলো বিতরণ করতে) বলেন এবং বৃষ্টিকে পাঠান ন্যায়-অন্যায়কারি-নির্বিশেষে জল দান করতে।'

'স্বর্গস্থিত পূর্ণ পিতার মতোই তোমরা পূর্ণ হও।'

তিনি আবার বলছেন—"Him that cometh to Me I will in no wise cast out."

—John, 6।37

—'যিনি আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি কোনক্রমেই তাঁকে ত্যাগ করি না।' এরই মর্মার্থ খুঁজে পাই সর্বশাস্ত্রসার গীতার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

—গীতা, ৯।৩১

—'(বাহ্য দুরাচারকে পরিত্যাগ করে আন্তরিক সাধু নিশ্চয়ের সাহায্যে) শীঘ্র ধর্মাত্মা-ই হন এবং নিত্য শান্তিকে প্রাপ্ত হন। হে কুন্তীনন্দন, তুমি পরমার্থ শ্রবণ কর। তুমি ইহা নিশ্চিতরূপে জান যে, আমার ভক্ত (যার অন্তরাত্মা আমাতে সমর্পিত হয়েছে, তিনি) কোন অবস্থাতেই নাশপ্রাপ্ত হন না।'

এখানে তাৎপর্য এই যে, যে-কারণে ধর্ম্যামৃতের অনুষ্ঠান করতে করতে সেই পরমেশ্বরের অতীব প্রিয় হওয়া যায়, সেই কারণে যাঁরা পরমেশ্বরের পরমপদ লাভ করতে ইচ্ছা করেন, এইপ্রকার মুমুক্ষু ব্যক্তিগণই সযত্নে এই ধর্ম্যামৃতের অনুষ্ঠান করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন,—"ধ্যান করবে মনে, কোণে আর বনে"। রামপ্রসাদ বলছেন—

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুই দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে॥"

এই প্রসঙ্গে যিশুখ্রীষ্টও বলছেন,—"When thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret."

—St Matthew, 6|6

—'প্রার্থনার সময় তুমি তোমার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর, তারপর দরজা বন্ধ করে তুমি তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা জানাও, কারণ তিনি অতি গোপন।'

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে,
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

—গীতা, ৯।২২

"যাঁরা অন্য কার্য থেকে বিরত ও অনবরত ধ্যানপরায়ণ হয়ে সদাসর্বদা আমার উপাসনা করেন, সেই (পরমার্থদর্শী) নিত্যাভিযুক্ত (অনবরত আদরের সহিত আমার ধ্যাননিরত) ব্যক্তিগণের 'যোগ' (যাহা নাই এমন অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি) ও 'ক্ষেম' (সেই লব্ধ বস্তুর প্রতিপালন)-এর ব্যবস্থা আমিই সম্পাদন করে থাকি।"

বাইবেল বলছেন,—"Take no thought saying—what shall we eat? or, what shall we drink? or, wherewithal shall we be clothed?

"(For after all these things do the Gentiles seek) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

"But seek ye first the Kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you."

—St. Matthew, 6|31-33

—'*কি খাব, কি পান করব, কে পরিধেয়* যোগাবে ইত্যাদি বলে চিন্তাযুক্ত হয়ো না। স্বর্গীয় পিতা (বিশেষরূপেই) অবগত আছেন যে, ঐসকল বস্তু মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন। কিন্তু তুমি সবাগ্রে অনুসন্ধান কর ভগবানের রাজ্য এবং তাঁর ন্যায়ধর্ম। তাহলে সবই তোমার প্রাপ্ত হবে।'

"যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

—গীতা, ১২।৬-৭

—শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যাঁরা সমুদয় কর্ম আমাতে সংন্যস্ত করে মৎপর হয়ে অনন্য যোগের সাহায্যে আমাকে ধ্যান করেন, উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে আবেশিতচিত্ত সেই উপাসকগণকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি।'

"মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"

—গীতা, ১৮।৫৮

—'আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার প্রসাদে সকল প্রকার বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করবে। আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শুন তাহলে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হবে।' যিশুখ্রীষ্ট বললেন,—

"He that believeth on the Son hath everlasting life : and he that believeth not the Son shall not see life , but the wrath of God abideth on him '

—John, 3/36

—'ঈশ্বরের পুত্রে যাঁর আস্থা আছে, তিনি অমর জীবন লাভ করেন, আর যাঁর সেই আস্থা নেই, তাঁর জীবন দেখা হয় না, পরন্তু তাঁর উপর ঈশ্বরের কোপই বর্ষিত হয়।'

"And I give unto them eternal life and thy shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand."

—John, 10/28

—'আমি তাঁদেরকে অনন্ত জীবন দান করি, কখনও তাঁরা বিনাশপ্রাপ্ত হবেন না, এমন কি আমার কাছ থেকে তাঁদেরকে ছিনিয়ে নিতে পারে এরূপ সাধ্য কারও নেই।'

"As many as received Him to them gave He power to become the Sons of God."

—John, 1/12

—'যাঁরা তাঁকে গ্রহণ করলেন (সবস্ব ত্যাগ করে তাঁকেই গ্রহণ করলেন), তাঁদের তিনি দান করলেন তাঁর পুত্র হবার শক্তি (অর্থাৎ মুক্তিলাভের চাবিকাঠি)।' মোক্ষলাভের চরম উপায় নির্ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

—গীতা, ১৮।৬৫-৬৬

ভক্ত শ্রীভগবানের সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব উপলব্ধি করে তাঁর উপর সর্বপ্রকারে আত্মসমর্পণরূপ ভক্তি আরোপ করলে মোক্ষরূপ ফল অবশ্যই লাভ করতে পারবে, ভগবানকেই আশ্রয় করবে, তাঁকেই পরমসহায় বলে অবধারণ করবে—এ জন্যই শ্রীভগবান বলছেন, 'আমাতে হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ কর, তাহলে আমাকেই পাবে, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি ; তুমি আমার প্রিয়। তুমি সবপ্রকার ধর্ম (ধর্মাধর্ম) পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, তুমি শোক করো না, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যখন যেখানেই তিনি এসেছেন, দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন, শুনিয়েছেন অভয়বাণী, তাকে দিয়েছেন পরম আশ্রয় আর তার সামনে তুলে ধরেছেন অমৃতের খনি। কী অপরিসীম করুণা! আমরা তার জন্য কতটুকু ভাবি? বৎসহারা গাভীর মতো তিনিই তো আমাদের পিছু পিছু ছুটছেন। কবে আমরা তাঁর অভিপ্রেত কর্ম করব। কবে আমরা তাঁর প্রিয় হব॥

নিবেদিতা

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

তুলসীতলায় জ্বলে
সন্ধ্যাদীপশিখা,
তার সেই আত্মনিবেদন
পেয়েছিল তোমার মনন।

কালবৈশাখীর মেঘে
দীপ্ত বজ্রালোকে
মুহূর্তের জ্বলন্ত উল্লাস,
পেয়েছে সে তোমারি প্রকাশ।

স্তব্ধ শিব-বক্ষোপরে
মৃত্যুরূপা শ্যামা,
জননীর পাদপীঠস্থান,
তোমারি তো হৃদয়শ্মশান।

নিবেদিতা-স্মরণে

শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী

জন্মসূত্রে বিদেশিনী তুমি
তবু তুমি আমাদেরি—
মনে ভ্রম হয় শিবগতপ্রাণা
সতী এলো দেহ ধরি।
শিবের লাগিয়া সতীর যে তপ,
সে তো পুরাণের কথা,
মুরতি ধরিয়া এলো বুঝি নামি
নব নামে—'নিবেদিতা'।
ভারতের সেবাযজ্ঞে যে দিলে
আত্ম-বিসর্জন,
আত্মাহুতির সেই হোম-শিখা
জ্বলিছে অনির্বাণ।
লোকমাতা তুমি—বিবেক-দুহিতা,
সার্থক তব নাম!
নিবেদিতা পদে নিবেদি' জীবন
ধন্য করি এ প্রাণ।

রত্ন-সঞ্চয় *

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

(১)

ব্যবহারিক জগতে অত্যন্ত প্রিয়জনকেই গোপনীয় ও আধ্যাত্মিক কথা বলা হয়—বাহিরের লোককে বলিলে গোপনীয়ত্ব গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। তাই, প্রভু, যে রচনাগুলি রচনা করাও, তুমিই অন্তরের অন্তস্তলে বসিয়া শুনিতে থাক— প্রকাশ করিয়া বাহিরের লোককে জানাইবার প্রবৃত্তি দিও না।

(২)

কাহারও প্রাণে যেন কষ্ট না দিই—যদি অজ্ঞানে দিয়া থাকি, তুমি অন্তর্যামী, তুমি সবই অবগত আছ। আমাকে শাস্তি দিয়া অপরাধ কাটাইয়া দিও—যদি কেহ না বুঝিয়া অন্যায় করিয়া আমাকে কষ্ট দিয়া থাকে, তাহাকে ক্ষমা করো।

(৩)

দুঃখ-কষ্টের সময় আমাকে যেন তুমি ছাড়া কেহ না দেখে- যদি কেহ দেখে তাহা হইলে তোমার উপর নিভরতা কমিয়া যাইবে, আমার তোমার পথে অগ্রসর হইতে দেরি হইবে। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

(৪)

আঘাতের উপর আঘাত। এই করিয়া জীবনের বন্ধনগুলি চূর্ণ করিয়া দাও—আঘাত পাইলেই তোমাকে বুঝিবার বা তোমার করুণা অনুভব করিবার শক্তিসঞ্চার হয়—না বুঝিয়া যেন মনে না করি অমঙ্গল হইল। হে মঙ্গলময়, তুমি কখনও অমঙ্গল কর না—আমি যেন মনে করি, যেন অনুভব করি তাহার ভিতরই চিরস্থায়ী মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে।

(৫)

প্রকৃতি দুই ভাবে তাহার সংহারলীলা সাধন করে—

(১) ছুরিকাঘাত করিয়া, (২) কৃপা করিয়া। ছুরিকাঘাত স্থূল শরীরকে কষ্ট দেয়, মনের ভিতরে খুব গভীরভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু কৃপার আঘাত মর্ম স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বহ্নির ন্যায় পোড়াইতে থাকে— বড় জ্বালাময় অনুতাপ।

(৬)

মৃত্যু না থাকিলে জীবনের মাধুর্য কখনই প্রস্ফুটিত হইত না।

(৭)

পুষ্প তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান। তাই তুমি ইহাকে সবাপেক্ষা বেশী ভালবাস—তোমার অর্ঘ্যরূপে নাও। পুষ্প ফোটে সকলকে আনন্দ দিবার জন্য, আপনাকে বলিদান দিয়া বিশ্বকে গন্ধে মধুময় করিয়া তোলে, শুকাইয়া ঝরিয়া যায়— কোন অশান্তি অনুভব করে না।

(৮)

পুষ্প শুকাইয়া ঝরিয়া যায়, কিন্তু বিশ্ববাসীর আনন্দের জন্য রাখিয়া যায় ইহার গন্ধ।- মানবকে ত্যাগ শিক্ষা দেয় না কি? বিশ্ববাসীর ত্যাগই শ্রেষ্ঠ—এই শান্তির পথ।

(৯)

শরণাগতি। দিন মাস, বর্ষ—জন্ম, মৃত্যু আসিবে ও চলিয়া যাইবে। যখনই বিচার বন্ধ হয়—বুদ্ধি ও অভিমান সংগ্রাম করিয়া পরাজিত হয়, তখনই তোমার কৃপায় তোমার খোঁজ করিতে বাধ্য কর, তবে তুমি তাহা তোমার সময়মত করাও—নিয়তি তোমারই ইচ্ছামত সকলকে চালায়। তোমার শরণাগত না হইলে শান্তির কোন উপায় নাই। প্রভু, দয়া করিয়া শরণাগতি দাও।

---

* Amiel's Journal হইতে

ভারতপ্রেমিকা ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমতী সুচরিতা সেনগুপ্তা

এ মহান বিশ্বে যে-সকল নরনারী ত্যাগ, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শে বরেণ্য ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন ভারতপ্রেমিকা ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের অন্যতম।

সুদূর আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বদেশী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ, উন্নত এক পরিবারের কন্যাই যে একদিন ভারত-কল্যাণার্থে উৎসর্গিতা হয়ে জগতে আদর্শ স্থাপন করবেন, একথা সেদিন কেউ জানত না। জেনেছিলেন শুধু একজন। জহুরী জহর চিনেছিলেন। সে জহুরী জগৎপূজ্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। সত্যানুসন্ধিৎসু, প্রতিভাময়ী সংশয়ব্যাকুলা একটি নারীর সুপ্তপ্রাণকে জাগ্রত করতে, প্রেরণায় উদ্দীপিত করতে তিনি মহা আহ্বান জানিয়েছিলেন: 'হে মহাপ্রাণ, ওঠো জাগো। তোমার মধ্যে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে। তোমার নিদ্রা সাজে না।' এ আহ্বান মার্গারেটের মনে প্রাণে মহাশক্তি সঞ্চারিত করেছিল। ঈপ্সিত যাত্রাপথের মহৎনির্দেশ পেয়ে পাপুরোধাকে গুরুরূপে মনে মনে সে মুহূর্তেই বরণ করে নিয়েছিলেন।

মার্গারেটের ধ্যানের জগৎ ভারতভূমি। গুরুর দেশই তাঁর সাধনার পীঠস্থান। কিছুকাল ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর একদিন তিনি ভারতের মাটিতে এসে নামলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ, ভিন্ন ধর্ম রীতি-নীতি, ভিন্ন আচার-ব্যবহার ভাষা ও সংস্কার বিদেশিনী মার্গারেটকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। তাঁর মানস চিন্তার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষকে কাছে পেয়েছেন। এই তো তাঁর পরম পাওয়া, পরিতৃপ্তি, আনন্দ।

এক শুভ মুহূর্তে দীক্ষাদানের পর বিবেকানন্দ মার্গারেটের নতুন নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। জানিয়ে দিলেন—"ভারতকে ভালবাসতে হলে আগে তোমাকে হতে হবে ভারতীয় নারী।" বললেন-"ভারতের জন্য এখানকার নারীসমাজে একটি শক্তিমতী নারীর প্রয়োজন। তুমিই সেই যোগ্য সিংহীসম মহিলা। তুমিই একাজ পারবে।"

নারী-প্রাণ স্বভাবতই কোমল এবং স্নেহপূর্ণ। নিবেদিতার হৃদয় দয়া, স্নেহ, তেজ, নির্ভীকতা ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ-রাশিতে ছিল পরিপূর্ণ। বিবেকানন্দের অভয় বাণী, অনুপ্রেরণা এবং আশীর্বাদ আর নিবেদিতার চারিত্রিক ঐশ্বর্য -এই দুই এ মিলে যেন অপূর্ব মণিকাঞ্চন সংযোগ হল। এরই উত্তম ফল স্বরূপ নিবেদিতা এক ভারতীয় নারীতে রূপান্তরিতা হয়েছিলেন।

তাঁকে আমরা দেখেছি সহাস্যমুখে সম্মার্জনীহস্তে ভয়াবহ-প্লেগরোগাক্রান্ত মহানগরীর পথে আবর্জনা পরিষ্কার করছেন। কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে কুটিরে প্রবেশ করে মৃতশিশুর শোকাকুলা জননীকে গভীর মমতায় কাছে টেনে নিয়ে অশ্রু মুছিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মৃত্যুপথ-যাত্রী শিশুর মাতৃসম্বোধনে অভিভূতা, ব্যথাতুরা নিবেদিতা অশ্রু বিসর্জন করছেন। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, নিদ্রামগ্ন মজুরটির যাতে নিদ্রাভঙ্গ না হয় সেদিকে তিনি নিজে সতর্ক থেকে ছাত্রীদেরও সজাগ করে দেন। বিদেশিনী ভগিনী ছিলেন এমনই মমতাময়ী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আচার-ব্যবহার

রীতিনীতি ধর্মীয় সংস্কৃতি ইত্যাদিতে—অর্থাৎ জীবনধারায় পার্থক্য অনেক। সে দেশের আদর্শের সঙ্গে আমাদের আদর্শের তফাতও কম নয়। বিদেশিনী মার্গারেটের জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে একটি খাঁটি ভারতীয় নারীতে পরিণত হওয়ার মূলে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও শিক্ষা সার্থক প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছিল, একথা অতি সত্য। তেমনি সত্য—নিবেদিতার চরিত্র ছিল বহুগুণ-রাশির একটি সুন্দর সমন্বয়। তাঁর সঙ্গে অল্প পরিচয়ের পরই স্বামীজীর মতো প্রবলব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, সত্যসন্ধানী মহামানব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেছিলেন, "She is the finest flower of my work in England."

তৎকালীন ভারতের নারীসমাজের শিক্ষা-সংস্কারের কাজে নিবেদিতা যে অপূর্ব কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কাছে তখন নারীশিক্ষা মূল্যহীন, অর্থহীন। বরঞ্চ অন্যায়ও দোষাবহ। বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে অদ্ভুত ধৈর্য ও সংযম সহকারে, অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি এ কাজে ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হন। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি যেভাবে মেয়েদের শিক্ষাদানের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তা এক মহৎ উদাহরণ। বদ্ধ ঘুপচি ঘরের মধ্যে দারুণ গ্রীষ্মের তাপে ও গুমটে ঘেমে নেয়ে উঠতেন। তবু সর্বংসহা, সুখ স্বার্থত্যাগিনী নিবেদিতার সহাস্য মুখখানি সর্বদাই উজ্জ্বল ও মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে থাকত। বিদগ্ধসমাজের, নেতৃস্থানীয় এদেশীয় বিদেশীয় সকলেরই আগমন হত নিবেদিতার ঐ ক্ষুদ্র ঘরটিতে। অনেকে তাঁকে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে স্থানান্তরের উদ্দেশ ও অনুরোধ করলেও তিনি সেকথায় কর্ণপাত না করে হাসিমুখে উত্তর দিতেন, "This lane has adopted me and I must stay here and nowhere else."

হিন্দু রমণীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরম রমণীয় ও বিনম্র ভাবটি নিবেদিতার চরিত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল। স্বামীজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি একান্তভাবেই এদেশের ধর্ম, কৃষ্টি, দোষবিমুক্ত সংস্কৃতিকে নিজস্ব বলে গ্রহণ করেন। জপ ধ্যান-ধারণা করতেন নিষ্ঠাভরে। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে প্রণিপাত করা তার প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। শ্রীশ্রীসারদামায়ের চরণ স্পর্শ করে এ দেশের মেয়েদের মতো প্রণামও করেছেন ভক্তি সহকারে। শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক জীবনাদর্শ তাঁর ত্যাগপূত জীবনে অত্যুজ্জ্বল মহনীয় দৃষ্টান্ত-স্বরূপও ছিল। শ্রদ্ধাভরে বলেছেন, "To me it has always appeared that she (Sarada Devi) is Sri Ramakrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood." —ভারতীয় নারীর আদর্শের পরম ও চরম অভিব্যক্তি ছিলেন শ্রীশ্রীমা। তাঁর সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছিলেন—স্বর্গীয় মাধুর্যের জীবন্ত প্রতিমা। কত শান্ত, নম্র ও কত স্নেহপ্রবণ! তাঁর সরল ও সুসমঞ্জস আচরণ আমার নিজের ভবিষ্যৎ কার্য সম্ভাবনাকেও যতখানি সফল করে তুলেছে ততখানি আর কিছুতেই সম্ভব হতে পারত না।

ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা ছিল তাঁর কাছে বড় পবিত্র, যেন একান্ত নিজস্ব। তার ভাল মন্দ দুই দিক বিচার করে সর্বদাই ভালটুকু গ্রহণ করেছেন। অতিসূক্ষ্ম ও উদার দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে এ দেশের অস্পৃশ্যতা, জাতিবিচার ইত্যাদি নানা কুসংস্কারের মূল অনুসন্ধান করেছেন। "এ দেশের প্রত্যেকটি আচার-

অনুষ্ঠানের মধ্যে, শত বাধানিষেধের অন্তরালে কোন যুক্তিসঙ্গত কার্য-কারণ-সম্পর্ক আছে কিনা সেটি আবিষ্কার করতেই সচেষ্ট হতেন নিবেদিতা। লোকাচারের গোঁড়ামি বাহ্যত: যত উৎকট বলেই প্রতিভাত হোক, তার পশ্চাতেও যে একটি বহুযুগ-আশ্রিত অপরিহার্য-প্রায় সংস্কারবোধ কাজ করে, সেটি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হতেন।" পূতসলিলা গঙ্গার পবিত্রতার ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে করতে অভিভূত হতেন।

এদেশের পারিবারিক ধারার নিগূঢ় বিশ্লেষণও করেছেন অপরূপ স্নেহ মমতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। বাঙলা 'ঝি' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পরিচারিকাও এদেশের পরিবারের কন্যারূপে আদৃতা। 'গোধূলি' শব্দটির নিগূঢ় তথ্য ও ধ্বনিব্যঞ্জনা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন বহু প্রবন্ধে। তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে ভারতের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ভাষা পর্যন্ত। ভারতের সব কিছুই তাঁর কাছে প্রিয়।

প্রিয় যে, সে প্রিয়ের অতি অবহেলা বা ত্রুটি সহ্য করতে পারে না। ভারতের প্রিয় ভগিনী নিবেদিতাও পারতেন না। ইংরেজী 'line' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ছাত্রীরা বলতে না পারায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—"হায়, তোমরা নিজের মাতৃভাষা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছ।" অবশেষে জনৈকা ছাত্রী অর্থ উদ্ধার করে 'রেখা' বলতে পারায় নিবেদিতা আনন্দ-চঞ্চল কণ্ঠে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, "হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছো—রেখা। রেখা।"

ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্য দিয়েও মেয়েদের সহজাত স্নেহকোমলতা বা ত্যাগস্বীকার প্রকাশ পেতে দেখলে তিনি খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠতেন। তাঁর একটি কিশোরী ছাত্রী সকলের মধ্যে খাদ্যবণ্টনের পর নিজের জন্য অবশিষ্ট কিছু রাখেনি দেখে প্রথমত: বিস্মিত হয়েছিলেন। পরক্ষণেই মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "এমনি ত্যাগ আর লজ্জা ভারতীয় মেয়েদেরই সহজাত গুণ।"

এমনি ছোট বড় অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়েই না নিবেদিতা ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন, ভারতবাসীর বড় কাছের—বড় আপন হয়েছিলেন। তাঁর 'Web of Indian Life' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি এই পরিচয়েরই নিবিড়তম অন্তরতম নির্মল স্বাক্ষর। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'Nivedita uttered the vital truths about Indian life She lived and came to know us by becoming one of ourselves'. বলেছিলেন, 'আমাদের সঙ্গে প্রেম-প্রীতিতে একাত্ম হয়ে এই মনস্বিনী নারী আমাদের একান্ত অন্তর পুরেও প্রবেশ করেছিলেন '

নিবেদিতার মধ্যে আমরা সকল প্রকার উৎকৃষ্ট গুণেরই সমাবেশ দেখেছি। তাঁর চরিত্র যেমন ছিল কোমল স্নেহপূর্ণ মধুর তেমনি ছিল নির্ভীক তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অতি উজ্জ্বল স্মরণীয় অধ্যায়ে বিশিষ্ট অবদান ছিল তাঁর। আইরিশ বিপ্লবের জ্ঞানসম্পন্না মার্গারেট নোবল এ দেশের বিপ্লবেও নীরব থাকতে পারেননি। ভারতভূমি যে তাঁরই অন্তরাত্মা। স্বামীজীর স্বদেশচেতনা, বীর্যবত্তা এবং তেজস্বিতা নিবেদিতার মনে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে গুপ্তবিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ঋষি অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, সরলাদেবী, বাঘাযতীন, তিলক, গোখেল প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাঁর দেশপ্রেম আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির বিশিষ্ট নেত্রীপদ অধিকার করে লিখতেন স্বদেশী আন্দোলনের কথা, জাতীয়তা-বাদের মর্মবাণী। রচনায় থাকত শিক্ষাপ্রচারের আলোচনা, ভারতের জনসাধারণের নানাসমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অদ্ভুত কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছেন তখনকার ভারত-জন-নায়কগণ। লর্ড কার্জনের ভারতবাসীর প্রতি বিদ্রূপ ও মিথ্যাভাষণের যথোচিত প্রতিবাদ পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তেজস্বিনী ভারতপ্রেমিকা ভগিনী নিবেদিতা। বজ্রনির্ঘোষে প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন—'এ কথা মিথ্যা। সর্বৈব মিথ্যা।' এ প্রসঙ্গে মতিলাল ঘোষ মহাশয় অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলছিলেন, "এই একটিমাত্র ব্যাপারের জন্যই নিবেদিতার কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধনীয়।" নিবেদিতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নোক্ত উক্তিও মহামূল্যবান এবং বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য: ···"ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি না, তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকট করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি না।" কবি গভীর শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন, "সতী নিবেদিতা দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল।··শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ—ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না।"

ভারতের নব জাগরণের হোতা ছিলেন ভারতজননীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা নিবেদিতাও গুরুর কর্মের, ধর্মের ও মানস চিন্তার প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছেন প্রতিক্ষেত্রে, প্রতিমুহূর্তে। এমনকি ইংলণ্ডে নিজের দেশ পরিভ্রমণের সময়ও তিনি তথাকার নানা পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, সে-সকলই ভারতকে কেন্দ্র করে। "ভারতবর্ষের জীবনদর্শন, পুরাণ, মহাকাব্য তার ইতিহাস, তার সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে।·কি এদেশে, কি বিদেশে উত্তর-বিবেকানন্দ যুগে নিবেদিতার ধ্যানের বস্তু ছিল ভারতবর্ষ, রচনার বিষয় ছিল ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি, কর্মলক্ষ্য ছিল তার শিক্ষা স্বাধীনতা ও নবজাগরণ।"

নিবেদিতার জীবন ছিল সর্বত্যাগিনী তপশ্চারিণীর। ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি সারা বিশ্বের, বিশেষভাবে ভারতের প্রয়োজনে নিবেদিত হয়েছিলেন। নিষ্কাম "জীবনের ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য ও পবিত্রতারক্ষার উদ্দেশ্যেই ঐ নাম। ভারতবর্ষকে তিনি প্রাণা-পেক্ষা বেশী ভালবেসেছিলেন। ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়েছেন: "শ্বাসে শ্বাসে জপ কর নাম—ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ। মা, মা, মা।"

সীতার শুদ্ধ পবিত্রতা, গান্ধারী-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব, ভারতীয় রমণীর ক্ষমা, প্রেম, নিষ্ঠা, নম্রতা, ক্ষত্ররমণীর তেজ, অসীম সাহসিকতা, বলবীর্য নিবেদিতা-চরিত্রের ঐশ্বর্য ছিল। পাথেয় ছিল গীতার উপদেশ—গুরু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥' এ মন্ত্র নিবেদিতার ছিল ধ্যান জ্ঞান জপ তপস্যা। হৃদয় ছিল ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, প্রেম মাধুর্য ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। তাঁর অন্তর যে মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো—মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধুরম্।

কামারপুকুরে আসা

স্বামী বুধানন্দ

গোঘাট, আরামবাগ ছাড়িয়ে তবে কামারপুকুর।

ঘুরে এসো দেশে দেশে, দেখে এসো দুনিয়াটা, হোক না অনেক তাক-লাগানো অভিজ্ঞতা, সব তীর্থাটনের শেষে যখন এসে লুটিয়ে পড়বে শ্রীঅঙ্গনে, মনে হবে, ভাই, কি জানো: যেন একটা কিছু পেয়েছি জীবন্মুক্তির খুব কাছাকাছি।

এসে দেখি ঠাকুর তেমনি বসে আছেন—সাত বছর আগে যেমনটি দেখে গিছলুম—কামারপুকুরে নিজ ঢেঁকিশালের আসনে। ভাবমুখে থাকার মজা এই যে, মুখে আর কিছু বলতে হয় না, ভাবেই সব বলে। প্রেমে আড়ষ্ট-ঝংকৃত দেহ। কথা না বলে এমন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-স্বাগত জানাতে আর কেউ জানে না। সব জায়গাতেই তো ছায়া-কায়া হয়ে সঙ্গেই ছিলেন। তবু কামারপুকুরে ঠাকুরকে যেন ঘরোয়া ভাবে পাওয়া যায়। যেন শুধু তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন।

বেলুড় মঠের ঠাকুর যেন দরবারে বসে আছেন। লক্ষ ভক্তের মাঝে তুমি এক ভক্ত। প্রণাম কর, চরণামৃত ধারণ কর। তারপর প্রসাদ নাও সারিতে দাঁড়িয়ে। পাওনাটুকু মিলে, উপরিটুকু পাওয়া ভার।

বেলুড় মঠের সেই সব দিন যখন ঠাকুর বাবুরামরূপে প্রেমের আগুন হয়ে "গঙ্গার ধার আলো করে" বেড়াতেন, প্রসাদ নিয়ে ভক্তের পিছু ছুটতেন। সেইসব দিন কি ফিরে আসবে না, ভাই?

কিন্তু কামারপুকুরে, ভাই, তুমি যেন ছোট ছেলেটি। তাই নয় শুধু, ঠাকুরও যেন অল্প বয়সের বয়স্যটি। মুখের ভাবটি এমন, যেন কোন দিন কলকাতা দেখেননি।

শিব-শীর্ষ মন্দিরটি যেন খ'ড়ো ঘরের মর্মর-সখা। হাতে-হাতটি ধরে আম্রছায়ে ধ্যানস্থ।

আর সেই অঙ্গন। বিশ্বপাবনের কত পদস্পর্শ এ অঙ্গনে পড়েছে। ঐ মাটিতে আছে অবস্তুর মাঝেকার বস্তু-স্পর্শটি। সে কি রহস্য-কথা—ভাবতে বসলে বিশ্বাস হয় না। সব হয়েও যিনি কিছুতে ধরা দেন না, যিনি অপরিণামী, সেধে এসে বেঁধে গেলেন তোমার জন্যে। ঐ ধারা, বেদ-নিশ্বাস-নির্ঝর বয়ে চলছে মানুষের পতিত জমির ধার দিয়ে। কেউ দেখেছে, কেউ দেখে না।

চন্দ্রামণির ফাই-ফরমাস খাটতে ঐ পা দুখানি কত শতবার ধরিত্রীর বুকে তুলেছে হিল্লোল। ঐ কাব্যকথা আজো মুদ্রিত হয়ে আছে ঐ ধূলিতে। পুরান কবির নব্য-ছন্দ, স্বচ্ছন্দ আসা-যাওয়ার রহস্য-রস, অঙ্গীকার-রক্ষার আগ্ন-স্বাক্ষর সব স্তব্ধ মুখর হয়ে আছে ঐ প্রাঙ্গণে।

এমন কোথায় ফেলবে তুমি পা যেখানে মুক্তি রেখে যাননি লুকিয়ে?

শ্রীঅঙ্গন পেরিয়ে রঘুবীর শীতলা মন্দির। দেশে দেশে দেখে এসো বহু বিরাট মন্দির আর বিপুল বিগ্রহ। রঘুবীর-মন্দিরের মতো[1] শান্ত-

কিশোর কান্ত নধর মন্দির আর দেখতে পাবে না। মন্দিরের নীচু ভদ্র দেহলীতে মাথা লুটালে প্রাণ-মন ভরে যায়। মনে হয় দূরের ভগবান থেকে বহু দূরে, নিভৃতে, এখানে এসেছি আত্মীয়ের কাছে।

আপনার করিয়ে দিতেই এসেছিলেন ঠাকুর, মানবকে ভগবানের কাছে, ভগবানকে মানুষের কাছে, মানুষকে মানুষের কাছে। তাই সাধ্য হয়েও সাধন করে দেখালেন: দেখো, কত কাছে আমি, সব চেয়ে কাছে, সব ছেয়ে কাছে। দূরে সরিয়ে দিয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন, কষ্ট দিচ্ছ কেন? এমন কথাও দিব্যি করে বলেছেন: ··কখনো ভক্ত হয় চুম্বক, আর ভগবান সূচ। "ভদ্রলোক" হতে পর্যন্ত রাজী হলেন না। ভয়, আপন হওয়ায় যদি কমতি পড়ে।

আমাদের জড়তার উত্তরীয়ে জড়িয়ে আমরা যেন ঠাকুরকে পাথর করে না ফেলি। ঠাকুরকে আমরা বসিয়েছি পাথরের অজ্ঞাসনে। তবু একথা যেন ভুলে না যাই যে, আমাদের ঠাকুর মেঝেতে-বিছানো মাদুরের ওপরে প্রাণের কাছে বসে রস-রঙ্গ করার ঠাকুর।

বাপরে। এমনটি কেমন করে সম্ভব হয়েছিল—এই স্বয়ং-সূর্যের শুকনো ঘাসের ওপরে পা বিছিয়ে বসা? আমাদের স্বভাব যাবে না ম'লে। আমপাতা আমরা গুণবই।

এমনটি হয়, অসম্ভব যখন হন সম্ভব। রস-স্বরূপ রসিয়ে রেখে গেছেন ছোঁয়া দিয়ে প্রতীক-প্রতিমাতে। ভীষণাকে করেছেন শীতলা, রঘুবীরকে কোলের ছেলে, কালী-করালীকে "আমার মা"। শ্মশানে মশানে শবাসনে অনশনে হুতাশন-সাধন নয়, এ তিনটান একটান করে ডাকার সাধন। যিনি সাড়া দিবেন তিনিই ডেকে দেখালেন এমনি করে ডাকলে সাড়া মিলে—আপনার লোক আর এর চেয়ে বেশী কি করে হওয়া চলে।

ঠাকুর সব কিছু কেমন স্নিগ্ধ-ভদ্র করে রেখে গেছেন। এ "দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি"-টানার ভদ্রতা নয়। বৈদিক মন্ত্রে ঋষি চোখে-কানে ভদ্র দেখা-শোনার আকুতি জানিয়েছেন। ঐ বৈদিক মন্ত্রার্থ-প্রাপ্তি তত্ত্বের সরায় স্ফটিক-স্বচ্ছ ধারে রেখে গেছেন রঘুবীরের মন্দিরে। এক গণ্ডূষ খেলে মনে হয় আমার মনে-প্রাণে সার এসেছে—কালান্তের সাধন-নির্যাসের ভূমা-ভূতি-বিন্দু।

তারপর, আহা ঠাকুরের শয়ন-ঘরটি!

খড়ের ছাউনি— আরণ্যকের অবগুণ্ঠনে ভারতের শাশ্বত আত্ম-স্থিতি কূটস্থ হয়ে আছে। শেষ-শয়ান অশেষের যোগ-নিদ্রা, হয়ে আছে যোগ-জাগৃতি—ক্রান্তদর্শনের একান্তে, ছায়া-আলোর উদ্বেল দোলার সৈকতে। মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে: "সাগরের মা" আজো তার (পাঁচকুড়ি আরো কত বয়সের) প্রাণ ঢেলে ঢেলে লেপে। কি বলব, ভাই, এমন ঘর কোথাও দেখিনি—কাঁচ নেই, মোজায়েক নেই, সিমেণ্ট নেই, চুণ নেই, রঙ নেই—তবু কি আভিজাত্য।

মাটির মত সুন্দর যে আর কোন বস্তু নেই—ঠাকুরের শয়ন-ঘরটি দেখলে এ কথাটি প্রাণে গেঁথে যায়। পুষ্প-স্বপ্না মাটির সৌরভ-গাথা এখানে নিবিড় শান্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ঘরে ঢুকতে বাঁ দিকে ঐ যে অতটুকুন বারান্দা—বসে পড়, ভাই, বসে পড় ঐ জায়গাটিতে। ধ্যান দিয়ে গড়া ঐ জায়গাটি—অনন্ত এসেছেন সান্তের অতিথি। ভগবান সহজ হয়ে পড়ে আছেন মানুষের দুয়ারে ধন্না দিয়ে।

মানুষ নিরাপত্তা এত খোঁজে, খুঁজে খুঁজে সব আপদ ডেকে আনে। বোঝে না—শান্ত হয়ে ভগবৎ-অঙ্গনে বসতে হয়। সহজকে আমরা কঠিন পথে পেতে চাই—বুদ্ধির আমাদের এত ঔদ্ধত্য। ঠাকুরের শয়নঘরের বারান্দায়, ঘরের কোণটিতে ধ্বনিত হচ্ছে সে কী এক প্রাণ-বাণী: সরল হও, সহজ হও, খাঁটি হও, মাটির মানুষ হও।

ঠাকুর টাকা-মাটি মাটি-টাকা করলেন কেন? বুঝিয়ে দিলেন অবস্তু নিলে বস্তু খোয়াবে। বস্তু যদি নাও, অবস্তু বলে কিছু নেই। তাঁকে পেলে জানা যায় তিনিই সব হয়েছেন। মা-কে পেলে মায়া হচ্ছে মায়ের আসা, মায়ের ভাষা, মায়ের হাসা।

ঠাকুর কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে রেখে গেলেন না কেন? কারণ মাটিই যে সোনা। হয়ে দেখো মাটি, সোনায় তোমার মূল্য ধরে কি না। যদি হতে চাও, পেতে চাও, পুঁতে রাখতে চাও সোনা, সব মাটি করবে। মাটির মানুষ হও—সব পাবে।

উঁচু জমিতে কি কৃপার জল জমে?

নীচু হয়েছিলেন নাগ মহাশয়। একেবারে মাটির মতো। তাতেই হয়েছিলেন অমন মহাশক্তিধর পুরুষ। ঠাকুরের দেহের রোগ টেনে নিতে উদ্যত হয়েছিলেন নিজ দেহে। "তুমি পারবে" বলে ঠাকুর থামলেন। লীলা বানচাল করে দিয়েছিলেন আর কি মাটির মানুষ নাগ মহাশয়। এমন খাঁটিই হয়েছিলেন যে, ঘরের পাশে গঙ্গা হলেন স্ফুরিত তাঁর বাণীর মূল্য দিতে।

ঠাকুরের ঐ বনে-পাওয়া খড়ে ছাওয়া মাটির শয়নঘরে ঢুকেছে আজকের এক ফাজিল ছেলে—ফচকেমি করতে। বিজলি-আলোটির কথা বলছি। ক্ষুদিরামের ঘরের স্বয়ম্প্রভটি, আলো-আঁধারের পারে "বস্তু"টি বড়ই ছন্দ-বিলাসী আধুনিক।

সব কিছুকে সুন্দরে বিন্যাস-চয়নে ধরে দেয় যা, কিছুকেই বাদ দেয় না, তাই ছন্দ। যিনি ধ্যানলীন শান্তং শিবং, তিনিই নটরাজ সুন্দরম্।

কি নেবে, কি ফেলবে? "আমি সব নিই"—প্রভুর নব্য বেদবাক্য। তা না হলে ওজনে কম পড়বে যে! আর তাতেই তো তোমার-আমার ভরসা। এখন ক্ষ্যাপা মায়ের বাউণ্ডুলে ছেলের মতো চোখ পিট পিট করে বলতে পারি: এখন কথা রাখ, বলেছিলে না, —"আমি সব নিই"—এখন ফেলবে কি করে।

সব না নিলে কৃপার অর্থ হয় না। তাঁকে সব নিতে—পালতেই হবে।

নিজেই তো বলেছেন—পাড়ার লোক এসে পালবে নাকি তোমার ছেলেদের?

আর এক দিক আছে। অনেকে ভারিক্কি হয়ে ভাবেন ওজন বাড়াচ্ছেন। পান খাইনে, তাই বড় তপস্বী হয়েছি। মাছ খাইনে, তাই শুদ্ধসত্ত্ব! ঠাকুর একটু হালকা ভাবের আমেজ মিশিয়ে বাণীপূর্তি করলেন।

এইটুকু করেছেন বলেই ঠাকুরের কথা হয়েছে অমৃত। পরন্তু অনেক ধর্ম-শিক্ষকের কথা যেন পাচনের মতো—নাক না টিপে গেলার উপায় নেই। ঠাকুরের কড়া কথাও কড়া-ভাজা জিলিপির মতো—মিষ্টি, মচমচে।

আমাকে যে চোখ রাঙাও, আমি করি কি? একপো ঘটি নিয়ে যে সব "কারবার"।

আমাদের এ দুঃখটি ঠাকুরের মতো আর কেউ বোঝেন নি। "হালকা ভাবে"র অঙ্গীকারটি যে আমাদের ত্রস্ত ললাটে প্রভুর নিজ হাতে দেওয়া কৃপার অভ্র-তিলক।

এইটি ভুল বুঝে আমরা যদি ইতর ব'নে না যাই, আদার ব্যাপারী হয়েও আমরা • মহা

সমুদ্রের খোঁজ রাখবার স্পর্ধা করতে পারবো।

"কালোঙিস্মি" বলেছেন প্রভু কৃষ্ণাবতারে। শেওলা-পরা "পোদোর" সেই প'ড়ো মন্দিরেই কি শুধু বসে অছেন ভগবান, নেই কি তিনি ঐ বনভোজনে যেখানে ফড়িং-এর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে অশান্ত কিশলয়গুলি? নেই কি তিনি কলকারখানার হট্টগোলে?

ঐ যে বারুদের কারখানার পাশে পঞ্চমুণ্ডীর আসন পেতেছিলেন, তার অর্থ আছে। গঙ্গা-তীরে বাস, কিন্তু আনাগোনা কলকাতায়। এই হল পুরানো কবির আধুনিকতা।

বনানীতে তত্ত্বমসি নয়। হেঁশেল আগলে বসে রইলেন অর্ধ-শতাব্দী ধরে আমাদের মা—ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিতে বেঁধে খাওয়ালেন পরমান্ন। "পিঁপড়ে"র মুখের কাছে সস্নেহে সগৌরবে তুলে ধরলেন অমৃত-কণা। এমনটি আর কে করেছে?

দেব-নন্দিতা অলকানন্দা যদি স্লুইস গেটের ভেতর দিয়ে এসে আমাদের ধানের ক্ষেতে শস্য ফলায়, তার পাবনী শক্তির কি হানি হয় তাতে?

অন্নপূর্ণা না হয়ে মা কি মোক্ষদ্বার-কপাট-পাটনকরী হতে পারেন?

"ছায়া-কায়া" হয়ে ঠাকুর আছেন তাই দোকানে, দেবালয়ে, কারখানায়, রঙ্গালয়ে, মানুষের সকল জীবিকা-শিক্ষা আর রসায়তনে। সব নিয়েছিলেন বলেই সবাই তাঁকে নিতে পেরেছে।

শুধু ভারতেই নয়। গিয়ে দেখ দেশে দেশে: ঠাকুরকে ওঁরা কি ভালই বাসছে।

নৃত্য, রসিকতা, সমাধি, মশলার বেটুয়া, বার্নিসের চটি, লালপেড়ে ধুতি, পান খেয়ে লাল-করা ঠোঁট: এ কেমনতর অবতার? দেখতে পাও না এ আপনার হওয়ার, আপনার করে নেওয়া'র ফিকির? মিশে যাওয়াই শুধু কথা নয়। মিশে গিয়ে উঠিয়ে নেওয়াটি কথা। "পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে"ও কেমন করে হাসতে হয়, সে কৌশল শেখাতেই এ অবতারে এসেছেন তিনি।

আগের যুগে যুদ্ধ করে ধর্মস্থাপন করতে হয়েছিল। এবার হল নেচে, হেসে, কেঁদে, ভালবেসে।

ভগবান কত সহজ হয়ে এসেছেন ভাবতে বসলে মূর্ছা যেতে হয়। আজকের দিনকে পেছনে রেখে বিগত দিনের জন্যে আক্ষেপ করো না: এই যে এসেছেন তাঁকে চোখভরে, প্রাণভরে, জীবনভরে দেখতে হয়। নিজেই বলেছিলেন: "ঘরে আনতে হয়।"

ঘরে চড়াও হয়ে বলছেন: "ঘরে আনতে হয়।" তবু আমাদের চোখ খোলে না। সহজ কেন কঠিন হয়ে আসেননি সে জন্যে তর্ক জুড়াই। বিপরীত বুদ্ধি আর কাকে বলে। বগলতলায় কাপড় নিয়ে বেড়ালেন, একটু আব্রু রাখলেন না, তবু বুঝলে না, চিনলে না এ দিগম্বর কে?

রস-স্বরূপ কি বেরসিক হতে পারেন? হাত-পাখা জলে ভিজিয়ে হাওয়া করতে বলায় অশ্বিনীকুমার টিপ্পনী কেটেছিলেন: "আপনার দেখি আবার সখও আছে।" "কেন থাকবেনি সখ," বলেছিলেন তিনি।

ঠাকুরের শয়নঘরে বিজলিবাতি দেখলে পান খেয়ে লালকরা ঠোঁটে ফোটা ঐ হাসির সৌরভটির কথাই মনে পড়ে। "কেন থাকবেনি সখ।"

ভব্যকে নব্যকে যারা সন্দেহের দ্বিধা-কুঞ্চিত দৃষ্টিতে দেখে, তারা ভুলে যায় যে, তিনি সব কিছু হয়েছেন—নিয়েছেন। তিনি যদি সব কিছু হয়ে নিয়ে থাকেন, আমরা বাদ দেবার কে?

এক দর্শন আছে যার আদি-অন্ত কথা: সব

ঠিক হ্যায়। তিনি সব হয়েছেন বলেই "সব ঠিক হ্যায়"। ক্ষুদ্রতার জ্বালা সমস্যা ক্ষুদ্রতার ওষুধে ঘুচবে না। সংঘাতকে আঘাত করো অভীঃ-ঔদার্যে। ক্ষুমাচ্যুত হয়ে স্বারাজ্যের অধিকারী আস্তানা পেতেছি ক্ষুদ্রতার খুপড়িতে ভয় দুঃখ যাবে কি করে? চলবে না, নড়বে না, ভালবাসবে না নূতনকে, অজানাকে করবে না স্বাগত, —দুঃখ তোমাদের যাবে কি করে? আহা! স্বামীজীকে কি ক্রান্ত কমনীয় প্রেম দৃষ্টি দিয়ে গেলেন ঠাকুর। বললেন কিনা: আমার মূর্খ ভগবান, লোচ্চা ভগবান। স্বামীজীর কী সর্বগ্রাসী ভক্তি।

লোচ্চামি যে করে বেড়াচ্ছে সে ভগবানই, এটি না বুঝলে বিশ্বনাটকের প্রথম অঙ্কও বোঝা চলে না। তা ছাড়া আরো তো রয়ে গেছে কত রহস্য।

অনন্তকে আমরা অজ্ঞানের ক্ষুদ্রতায় বন্দী করার ব্যর্থ প্রয়াস করে ভাবি ধ'কে আমরা বুঝেছি। ঠাকুর ভেঙে রেখে গেছেন সব আগল-পাঁচিল। সবকে নেবেন বলেই এমনটি করা হয়েছে। লীলাবসানের পূর্বে হীরানন্দের কাছে পায়জামা পরতে চাওয়া হয়েছিল।

এই সখের ঠাকুরকে বুঝতে হলে সবার হাত ধরতে হবে, সবাইকে প্রেম দিতে হবে, প্রাণ দিতে হবে অঞ্জলিভরে সবার পায়ে। যিনি নিজ কুন্তলে মেথরের পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন, তাঁর প্রেমের অন্নে সবার অবাধ অধিকার। যদি ভাবো ঠাকুরের পাথরের বেদীর খুব কাছে ঠেসে বসেছ বলে তাঁর প্রেমের অন্নে তোমার বেশী অধিকার, ভুল বুঝবে।

বেড়াচ্ছেন সবার অন্ন জুগিয়ে। মানিক রাজার আমবাগানে প্রভুর রঙ্গ-কাননে আজ বসেছে বিদ্যাবন। সাঁওতাল-ছেলেরা মহুয়া-বনের পলাশপথ বেয়ে এসে পৌঁচেছে এই বিদ্যাবনে, শিক্ষায়তনে। চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে নিজে নিলেন না তবু সারা দেশময় তার ব্যবস্থা করে বেড়াচ্ছেন। কেন? কারণ, খালি পেটে ধর্ম হয় না। ধর্ম করাতে হলে আগে পেটে দিতে হবে ক্ষুধার অন্ন। ক্ষুধা যাদের মেটেনি ক্ষুরধার বর্ষে তারা চলবে কি করে?

পেটে অন্ন পড়লে চালও বদলাবে, বাড়বে সৌষ্ঠব। ঐ যারা খেতে পায় না পড়তে পায় না, লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু শিশু নরনারী যারা পেটে পিঠে এক হয়ে ভ্রাম্যমাণ কঙ্কালের মতো দিশেহারা হয়ে দেশময় ঘুরে বেড়ায়—তাদের কাছে বেদ-বেদান্তের চেয়ে, নৃত্যকলার চেয়ে অন্নের দাম যে অনেক বেশী প্রভুর মতো হৃদয় দিয়ে একথা কেউ অনুভব করেননি—তাই পেটের অন্ন জোগাতে এত তৎপর।

তা না হলে সবই যে হবে সরষে ফুল।

যাদের অন্ন নেই, ক্রমে তারা চোখে কানে ভদ্র দেখাশোনার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এ শক্তিনাশের চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর কিছু নেই। তাই সর্বহারাদের অন্ন পাইয়ে দেওয়ার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। ধর্মক্ষেত্র কামারপুকুরে আজ তাই বহুমুখী নানা বিদ্যায়তনের উদ্গতি।

এরা আগে কলরব করতে শিখুক। তারপর শান্ত হবে। এদের খেতে দাও, পরতে দাও, পড়তে দাও, দাও একটু ভোগবিলাস করতে—অশনে, ব্যসনে, দেহে-মনে এরা জাগুক, এদের হোক অভ্যুদয়।

মৃত্যুর শৃঙ্খলায় এদের ভব্য করে রেখো না। জাগরণের প্রাণপ্রাচুর্যে এদের হতে দাও বে-পরোয়া। জীব যদি সজীবই না হয় শিব হবে কি করে? শিবকে যদি স্বীকার করে থাকো, জীবের ভোগের অন্ন যোগাও।

ঠাকুরের 'জীব শিব' মন্ত্রটিই যুগধর্ম।

কত করুণা করে বলেছেন: ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না। আর তুমি কেন ছুটছ পুতুলঘর ভাঙতে, ছিনিয়ে নিতে রঙীন বেলুন, শিশুর মুখের চুষি আর কিশোর হাতের মুরকির মোয়া?

চাল-কলা বড় কথা নয়। কিন্তু চাল-কলা না জুটলে বড় কথা বলবার জো নেই।

ঠাকুর-স্বামীজীর এ শিক্ষাটি যদি স্বাধীন ভারত মেনে নিত সকাল-বেলায়, আজ দিন-দুপুরে দেশের হত না এত দুঃখ দুর্গতি। এখনো শিখে নাও, মেনে নাও, বেঁচে যাবে। তা না হলে মরে তো আছোই।

ঠাকুর সুরে নাবলেন না, অথচ দূরেও রইলেন না সরে। ভগবানকে ছোট করা চলে না, হতে হয় না। কণাতেও তিনি বিভু হয়ে আছেন। অণুর অন্তরাত্মায় ঝলমল সহস্র সূর্যকে স্তুতি করলেন কী সুগভীর সমবেদনায়: খালি পেটে ধর্ম হয় না।

পেটের খবরটি আত্মীয়ই শুধু নেন। সাধন-চতুষ্টয়ের কথা বলে মেরুদণ্ড সোজা করে নাসাগ্রে দৃষ্টি রেখে বসে রইলেন না। হেঁশেলে ঢুকে তত্ত্ব করলেন চালডাল আছে কিনা হাঁড়িতে। দরদী না হলে এ খোঁজটা কে করে? এই প্রেমিকের জন্যে এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হয়। একেই বলেছেন সাধন।

তুমি যদি বন্দিশালায় থাক, না খেতে দিলে তোমার হবে মুক্তি না মৃত্যু? খেতে দিয়ে তোমার পেশীতে শক্তির জোয়ার বইয়ে দিলে একদিন তুমি আপন দুর্ধর্ষতায় বন্দিশালার পাঁচিল ভেঙে বেরিয়ে আসবে মুক্তির উন্মুক্ত প্রান্তরে।

তার জন্যেই এত ফন্দি-ফিকির, বন্দিশিবিরে নানা হানা। চালকলাবাঁধা বিদ্যের ব্যবস্থা।

এমন আসে অনেক ভক্ত হাজারে হাজারে দেশদেশান্তর থেকে যারা চাল-কলার সন্ধানী নয়। তারা আসে সংসারের সঙ দেখে হদ্দ হয়ে সার খুঁজতে। আমগাছটির ছায়ায় একটু বসতে-জুড়োতে। ঠাকুরের নিজের হাতের লাগানো আমগাছের ছায়ায়।

কিছু তারা চায় না চিন্তামণির নাচদুয়ারে। শুধু একটু ভক্তি-প্রসাদ, একটু ভালবাসার শক্তি, একটু সন্মতি, একটু ঊর্ধ্বগতি। জ্বালা নিয়ে আসে, শান্তি নিয়ে ফিরে যায়, শ্রান্তি নিয়ে আসে, নিয়ে যায় কান্তি, ভ্রান্তি নিয়ে আসে, ফিরে যায় স্মৃতি-ধৃতি নিয়ে। দিশারী কোন দিশেহারাদের কোত্থেকে ধরে নিয়ে আসেন। কুঠির ওপর থেকে ঐ যে বলা হয়েছিল: ওরে, তোদের ছাড়া থাকতে পারিনে, তোরা সব আয়। ভগবানের সে ডাক উদাসী প্রেমিক মানুষের মানস-নগরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, দিন-দুপুরে সাঁঝে রাতে প্রাতে, অনুপ্রেরণা হয়ে ধরে নিয়ে আসে মহাপ্রাপ্তির ঊর্ধ্ব মার্গে।

দায় কি আর তোমার আমার। যাঁর দয়া তাঁর, যাঁর মায়া তাঁর। তাই কৃপার এত ছড়াছড়ি। একবারটি এসে যাও দেখবে যে, বাসে চড়েও বৈকুণ্ঠে আসা চলে।

কামারপুকুরে একবার এসে গেলে শুধুহাতে কেউ ফিরে যায় না। তবে এসে যাওয়া চাই।

মা বলেছেন ধ্যান করতে না পারো ঠাকুরের ছায়া-কায়ার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেই চলবে। ঠাকুর নিজেই বলেছেন: সবটা মন গুটিয়ে যদি এটির ওপর দিলে, আর বাকি রইল কি? ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে মুখের কাছে ধরে দিচ্ছেন—এত আকুতি।

ধ্যান করতে পারিনে—এটাই সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য নয়। এই যে ধেয়ে ধেয়ে ধেয়ে আসেন

আর তবু তাঁকে দিই না আন্তর-স্বীকৃতি—এটাই হল নিদারুণ দুর্ভাগ্য।

কোন কোন ভক্ত এত সেয়ানা যে, চাতালে বসে বসে শুধু চেয়ে থাকে ঠাকুরের দিকে। ভক্তের ভগবানের দিকে ঐ চেয়ে-থাকাটুকু এমনি এক অলিখিত মহাকাব্য যে, পড়ে শেষ করা যায় না। আন্তর-জীবনে কত লঙ্কাকাণ্ড, কত কুরুক্ষেত্রের পর এই চেয়ে-থাকাটুকু পাওয়া গেছে তার ইতিহাস কে জানে। তুচ্ছতার তেপান্তরে ব্যর্থতার চোরা বালিতে আটকে-পড়া অসহায়কে কৃপা-ঘূর্ণি হয়ে উড়িয়ে নিয়ে আসেন ভক্তিহীন অছিলায়। ধরে এনে বসিয়ে রেখে এই যে চেয়ে-থাকাটুকু করিয়ে নেন, এই হল উত্তম-বৈদ্যের বুকে-হাঁটু-দেওয়ার ব্যাপারটি। কিন্তু কি মিষ্টি।

*

ভূতির খালের শ্মশানের আজ দেখো বিভূতি। ভূত-প্রেতের আড্ডা ছিল যেখানে, যেখানে ছিল শিবার চারণ ভূমি, শবের শয়স্থান, আজ সেখানে জলাশয়ে জমানো হচ্ছে চাষের জল। শ্মশানে এত সাধন করেছিলেন বলেই আমাদের আজ মিলছে চাষের জল। কত ফসল চাও, সোনালী ফসল। নাও না উঠিয়ে। কর-না আবাদ পতিত জমিন, নালায় নালায় জল বইয়ে দাও। রাসায়নিক সারের দরকার নেই। নাও না কত নিবে অমৃতের ধারা—জীবনকে করো উজ্জীবিত। বাঁচো, সমৃদ্ধ হও, আনন্দ করো—নাও না কত নিবে চাষের জল। অনন্তবিহারী গোমুখী থেকে আসছে এ জল, ফুরোবে না কোন কালে। 'কথামৃতের' প্রতিকথা ভূতি-সম্ভবা।

*

সাধন-ভজন করোনি, তাতে হয়েছে কি? এসে বলোই না ঐ কথাটি। জানেন না নাকি তোমার কয় ছটাকের ফুঁটো ঘটিটি। ঐ কথাটির জন্যেই হয়ে আছেন ব্যাধাতুর প্রাণের দোর গোড়ায়। যেমন তেমন করে একবার এসে যাও।

পবিত্র তিনিই করে নেবেন, তাঁর নাম যে কপাল-মোচন।

ভগবান যখনই জীবকে ডাক দিয়েছেন কখনো বলেননি স্নান করে নয়া কাপড় পর, গঙ্গাজল স্পর্শ করে কপালে ভস্ম মেখে এসো। শুধু বলেছেন: ওরে ওরে, তোরা সব আয়।

তাই ঝটপট এসে পড়তে হয়। কাপড় সামলাতে দেরি করলে আর বান দেখা হয় না।

পাঁচ-সিকে পাঁচ-আনা তোমার আমার নাই বা থাকল। নেই বলেই তো এসেছি। এসেছি চাইতে। চেয়ে থাকতে, চেয়ে থাকতে মুখের দিকে। আ। সে কী মুখ। দেখেছ চেয়ে? আবার চেয়ে দেখ। আবার, আবার আবার শুনবে ধ্বনিত হচ্ছে নিস্তব্ধতার, তোমার রিক্ততার মহাশূন্যে, তাঁর পূর্ণতার মহাকাশে।

কত সহজ করে দিয়েছেন। অচিন দেশের আত্মীয় কি-না। বলেছেন, মনটি ভগবানে ফেলে রাখতে হয়। ভাগ্যবান পারে। একটু ভালবাসলেই ভাগ্যবান। শুধু চাওয়াটুকু চাই। টান-টুকু নিতে বলেছেন।

দুর্ভাগা। কিছু-না-করার বিকর্মও করোনি? কুকর্ম-অকর্ম? পাপ—এইসব? কিছু-না-থাকার অর্ঘ্য নিয়েও আসোনি? তবে এসে বলোই না চেঁচিয়ে, জান ফাটিয়ে: এবে আমি যাই কোথা।

একদিন এক ভক্ত পঞ্চবটীতে গেয়েছিল একান্তে: "আমি সাধন-ভজন-হীন।" শুনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে কেঁদেছিলেন।

ঐ যে সুরধুনীর তীরে অকিঞ্চনের আর্তির সুরে অশ্রুবিবশ হয়ে চাওয়া—ভগবানের অসহায়তাটুকুর কি এতটুকু সম্মান দিতে নেই, ভাই ?

নৈরাশ্যে তা হলে তোমার কি অধিকার ? আকুল হয়ে এসে বলেছেন : ব্যাকুল হতে হয়। ব্যাকুল হতে পারো না ? এসে বলোই না শুধু ঐ কথাটি। বলেছেন : নির্জনে কাঁদতে হয়। কিন্তু কান্না যদি না আসে, করি কি ? তা হলে বলো না এসে সাহারার হাহাকারে : কাঁদতে বলেছো। শুধু দুফোটা চোখের জল বই তো নয়। হায়! তাও যে নেই আমার মরু-অন্তরে, এবে আমি যাই কোথা !

দেখবে আচম্বিতে স্ফটিক-স্বচ্ছ ধারার উৎস-মুখ খুলে দিয়েছেন আপন প্রেম-উক্তির অঙ্কুশ হেনে। ঐ করে বেড়াচ্ছেন। অবহেলিত বাগানে লুকানো জলের কলের মুখ খুলে খুলে দেওয়ার ব্যাপৃতি।

সাধন করতে পারো ভালো। না পারো আরো ভালো। ঐ না পারার ভালোটিতেই বাসা বাঁধো। একটু ভালবাস। ভালবাসাটি দাও। দেখছ না, বকলমা নিতে চেয়ে সেধে বাঁধা পড়ে আছেন। বন্ধনমুক্ত করবার কত প্রেম-কৌশল।

দিব্যি দিয়ে বলছেন : কলিতে অন্নগত প্রাণ। দেখেন না না-কি বাসের পিছনে বাদুরের মতো ঝুলে ঝুলে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে লোকে কি কষ্টে অফিসে যায়, দেহময় কি অবসাদ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এসে দেখে ছোকরার হয়েছে দাস্ত-বমি, কয়লা নেই এককণা ঘরে, আত্মীয় এসেছে বাড়ী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। জানেন না না-কি কয়টি প্রাণীকে ঐ ছোট ঘর দুটিতে থাকতে হয়, হাঁড়ি কুড়ি, শেলাইয়ের কল, দোলনা, পড়ার বই, জপের মালা, আর কবিরাজী ওষুধের বটিকা নিয়ে ? জানেন না না-কি সাড়িতে দাড়িয়ে পাঁচ-ভেজাল আহার্য-সংগ্রহের দৈনন্দিন গঞ্জনা ?

সব জানেন, সব দেখছেন। তাই লজ্জায় আর কড়ায় কড়া গিরি না করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হন্যে হয়ে, দীন হয়ে, কাঙাল হয়ে। উত্তুঙ্গ শিখরে দাড়িয়ে তোমায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ হ'য়ে উঠে আসতে হুঙ্কার দিচ্ছেন না। তুমি যেখানে যে অবস্থায় আছো সে অবস্থার সঙ্গে মিশে গিয়ে বলছেন : অন্নগত প্রাণীর অতশত করতে হবে না। একটি বার শুধু হরি বলো। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলছেন একথা।

মানুষের অসক্ততায় এ মর্যাদাদান, ভগবানের ফতুর হয়ে, ফকির হয়ে, দীনের দীন হয়ে সব দেওয়ার সাধনাটুকু তোমার আমার জন্যে করা এই বেদন যজ্ঞটির তিলক অন্ততঃ ললাটে ধারণ করতে হয় তো ভাই।

তারপর আর ভয় কি ?

বলেছেন কতবার : একবার ভগবানকে আন্তরিক ডাকলে এসে যেতে হবে তাঁর কাছে। ডেকেছি কিনা জানিনে। তবু মজা দেখো নিজেই কত কাছে এসে বলছেন সব শাস্ত্রের বস্তুনির্যাস ঐ কথাটি। যেথানেই থাকো না কেন, ধাপে ধাপে তরতর অবতরণ করে তোমাকে তরিয়ে নেবেনই নেবেন—এই হল অবতার।

জীবের পাপের শক্তি কি প্রভুর পাবনী শক্তির চেয়ে বেশী হতে পারে ? তবে হতাশ হয়ে বসে আছ কেন ? একটু হাসো খেলো।

অনবধানীর ধর্ম হয় না, অর্থ হয় না। কাম হয় তার কাল। মোক্ষবার্তা তার কাছে যেয়ে পৌছায় না। আধিকারিক পুরুষের দেখা যে পাইনি, সেটাই সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য নয়। মন-

মাথায় যে সুব্যবহার করিনি, এটাই হল কৃপাচ্যুতি। অচ্যুত অন্তরে নিগূঢ়, কাঁহারে তাঁকে খুঁজে বেড়াই।

পানা সরিয়ে গণ্ডূষভরে জল খেতে হয়। আনমনে সব মনে নিগূঢ় রসধারে ডুবে যেতে হয়। পানা সরিয়ে ধরে দু-হাতভরে অঞ্জলি অঞ্জলি অমৃত মুখের কাছে ধরছেন—তবু আমরা খাইনে।

জয়রামবাটী থেকে ভক্তেরা যখন বিদায় নিয়ে যেত, মা গাঁয়ের সীমা অবধি সঙ্গে এসে বলতেন: বাবা, সাবধানে পথ চ'লো। এই হলো মোক্ষদায়িনীর আদিমন্ত্র। একজনকে আরো স্পষ্ট করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। বাবা, ঠাকুরের দিকে চেয়ে পথ চ'লো।

এই হল ঠাকুরের জ্ঞানাঞ্জন। হলেন বিভু দিশারী। দিলেন নিশানা—কৃপার সে কি দুর্বার অভিযান। তাতেও হল না শান্তি। এলেন আবার মা হয়ে চোখে জ্ঞানাঞ্জন দিতে। দেননি শুধু। নিতেও শিখিয়েছেন। আসেননি শুধু, এসে বলেছেন: ওগো এসেছি। চেয়ে দেখো গো, কেমন এসেছি। দিলেই শুধু হয় না, পাইয়ে দেওয়া চাই। তাই কামারপুকুরের ভিটেতে নুন ভাত খেয়ে, ঐশ্বর্য আগলে থাকতে বলেছিলেন জগদ্ধাত্রীকে। শ্রান্ত, ভ্রান্ত, জিজ্ঞাসু, পিপাসু সব আসছে, আসবে। পাইয়ে দিতে হবে তাদের সব কিছু।

ঠাকুরের দিকে চেয়ে যারা পথে চলে, ঠিক থাকে তাদের মতি ও গতি, পথ চ্যুতি হয় না। একদিন তারা পৌছায় পথের শেষে—জ্ঞান-শান্তি-আরামে।

"ঠাকুরের কথা যারা ভাবে তাদের সব দুঃখ দূর হয়।"– বলেছেন মা।

নিজের দিব্যি দিয়ে বারবার-কওয়া কথা ঠাকুরের: "আমার চিন্তা যে করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।"

এই হল কামারপুকুরে আসা।

গো-ঘাট আরাম বাগ ছাড়িয়ে তবে কামারপুকুর।

আবেদন

উড়িষ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের বাত্যাত্রাণ-সেবাকার্য

সকলেই অবগত আছেন, ভীষণ বন্যায় উড়িষ্যার কয়েকটি জেলা কী ক্ষতিগ্রস্তই না হইয়াছিল। এ দুর্দশা কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই কটক ও বালেশ্বর জেলা বাত্যার কবলে পড়িয়া পুনরায় নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, বহু লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। কয়েকটি সংস্থা এবং সরকার পক্ষের লোক আর্তজনগণের দুঃখমোচনে ব্রতী হইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনও ভুবনেশ্বর হইতে ৭৫ মাইল দূরবর্তী পাটামুণ্ডাইকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া সেবাকার্য শুরু করিয়াছেন। এই সেবাকার্যের পরিধি অনেকগুলি গ্রাম জুড়িয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

ক্ষতির বিপুলতার তুলনায় এই কার্যে প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর প্রয়োজন। বলা-বাহুল্য, দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের নিকট সাহায্য পৌছাইয়া দিতে হইবে অবিলম্বে। সহৃদয় জনগণকে এই সেবাকার্যে অবিলম্বে অর্থ ও দ্রব্যাদি সাহায্য করিবার জন্য আমরা আবেদন জানাইতেছি।

এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত যে-কোন ঠিকানায় প্রেরিত অর্থ ও দ্রব্যাদি সাদরে গৃহীত হইবে ('রামকৃষ্ণ মিশন'—এই নামে চেক লিখিবেন):

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯
৫। রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নয়া দিল্লী-১
৬। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই-৫২
৭। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট
৮। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৪
৯। রামকৃষ্ণ মিশন, ভুবনেশ্বর-২, উড়িষ্যা
১০। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী, উড়িষ্যা
১১। রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাসবাঙ্গুডি, ব্যাঙ্গালোর-১৯
১২। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বাণীবিলাস মহল্লা, মহীশূর-২
১৩। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর-১, বিহার
১৪। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মোরাবাদী, রাঁচি-৮, বিহার

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৩ই নভেম্বর, ১৯৬৭

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

আমাদের নিবেদিতা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু-লিখিত ও নিত্যানন্দ ভকত-চিত্রিত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। পৃঃ ৮৬, মূল্য : ছয় টাকা।

ভাবের রঙে ও তুলির রঙে মেশানো, অপরূপ সজ্জায় শোভন প্রসারিত আকৃতির এই নবীন গ্রন্থখানি সববয়সীর মনোহরণের যোগ্য; যদিচ লেখক প্রধানতঃ কিশোর মনের উপযোগী করেই ভগিনী নিবেদিতার অমৃতজীবনকথা পরিবেশনে প্রয়াসী। হয়তো সেই কারণেই সমগ্র বইটির ভাষা এত সরল, অথচ গভীর কবিত্বে মণ্ডিত। পড়া শেষ হ'লে মনে যা জেগে থাকে, তা তথ্য বা বর্ণনা নয়, আসলে তা গুণীর কণ্ঠের তানবিস্তারের মতো অনির্দেশ্য অনুভবের স্মৃতি।

প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার ইংরেজী ও বাংলা জীবনীদুটি এবং সর্বোপরি শ্রীমতী লিজেল রেমঁর সুলিখিত জীবনীগ্রন্থ শঙ্করীপ্রসাদকে উপকরণ জুগিয়েছে, সেই সঙ্গে মিলেছে তাঁর নিজের সংগৃহীত তথ্য ও মনন। সব মিলিয়ে নিবেদিতাচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যমণ্ডিত উদাহরণ এ গ্রন্থটি পরবর্তী বিস্তৃততর প্রয়াসের সার্থক ভূমিকা।

নিবেদিতাব্যক্তিত্বের লোকমাতা-স্বরূপটি লেখককে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। জননী সারদাদেবীর বিশ্বমাতৃত্বের পটভূমিতেই নিবেদিতার ভারতবর্ষের আত্মিক উন্মোচন। তাঁর এই লোকমাতা-স্বরূপটিও 'নারীজাতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকথা'র জাতীয় অভিব্যঞ্জনা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের "কালী" নিবেদিতার হৃদয়স্পর্শে আমাদের জাতীয়চিত্তের প্রেরণাশক্তি হয়ে উঠেছিলেন। অধ্যাত্মপ্রেরণার জাতীয়তায় রূপান্তরের এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী মেলে না। এদিক থেকে ফ্রান্সের জোয়ান অফ আর্কের কথা নিবেদিতা-শতবর্ষে বিশেষভাবে স্মরণে জাগে। ভারতের ইতিহাসে জোয়ান অফ আর্কের মতোই নিবেদিতাও ভগবৎপ্রেম ও দেশপ্রেমের মহৎ সমন্বয় সাধন করেছেন। আর, নিঃসংশয়ে এদেশের ভাষায় তিনি 'সন্ত'—ওদেশের ভাষায় যা 'saint'।

জাতিগড়ার শিক্ষার ভার নিতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তাই সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সর্বোপরি অধ্যাত্মসাধনায় সর্বত্র নিবেদিতা আমাদের জাতীয়জীবনবেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান জটিল জীবনবোধের যোগসূত্র-স্থাপনে তাঁর প্রতিভার পরিচয় একদিকে তাঁর কর্মসাধনায় আর একদিকে তাঁর অমর রচনাবলীতে। নিবেদিতাজীবনের এই দুই প্রান্ত থেকেই উপাদান ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর সারস্বত কর্তব্য সুসম্পন্ন করেছেন।

লেখার সাথে রঙের মেলায় শিল্পী নিত্যানন্দ ভকতের কৃতিত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ চিত্রণ ও অলংকরণই নয়নাভিরাম। কয়েকটি ছবি সম্বন্ধে পরবর্তী সংস্করণে আরো অভিনিবেশ বাঞ্ছনীয়।

মুদ্রণকৃতিত্বের দিক থেকে আনন্দ পাবলিশার্সের সাধুবাদ মুক্তকণ্ঠে করণীয়। এমন

আদ্যন্ত-অলঙ্কৃত একটি গ্রন্থের মূল্য বর্তমানে এর চেয়ে কম হতে পারে না। তবে অধিকাংশ দেশবাসীর জন্য একটি সুলভ সংস্করণের কথা আশা করি তাঁরা অবশ্যই ভেবে দেখবেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হিমালয়তীর্থমালা (পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-সমন্বিত)—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়-গ্রথিত। প্রকাশক: শ্রীস্বর্ণকমল মুখোপাধ্যায়, ১৪নং পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা-১৯। পৃষ্ঠা ২২৪, মূল্য ৩৮০।

উত্তরাখণ্ডের যাত্রাপথের বিষয় লইয়া বহু পুস্তক রচিত হইলেও 'হিমালয়তীর্থমালা' পুস্তকখানির কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পাঠক মাত্রেরই চোখে পড়িবে। তীর্থযাত্রীদিগের যাত্রাপথে যাহাতে সুবিধা হয়, সেইদিকে সর্বাধিক দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থখানি রচিত।

কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের এবং এই দুই মহাতীর্থের পথে তীর্থরাজি সম্বন্ধে এমন সব দুর্লভ প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, যাহা সংগ্রহ করিতে হইলে বহু পুস্তক পাঠ করা দরকার হয়। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, অমরনাথ, কৈলাস, মানসসরোবর প্রভৃতি তীর্থের পরিচিতি সুন্দরভাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক তীর্থের যে পৌরাণিক কাহিনী বিদ্যমান তাহা চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হওয়ায় তথ্যবহুল গ্রন্থখানির সরসতা অক্ষুণ্ন আছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত বাস-রুট ও হাঁটা-পথের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যাত্রী-সাধারণের খুবই কাজে লাগিবে। আমাদের মনে হয়, গ্রন্থখানি নিজ বৈশিষ্ট্যেই হিমালয়তীর্থযাত্রীদিগের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিবে ও বহুল-প্রচারিত হইবে।

শ্রীম-দর্শন (প্রথম ভাগ) —স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। প্রকাশক: জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩৯৮ + ৩৩, মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকার দীর্ঘকাল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার মহাভক্ত 'শ্রীম' অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পূত সান্নিধ্যে তাঁহার অমূল্য ভগবৎপ্রসঙ্গ দিনলিপিতে রক্ষা করিয়াছিলেন, 'শ্রীম-দর্শন' তাহারই গ্রন্থরূপ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সন্তানগণের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে গীতা উপনিষদ্ ভাগবত পুরাণ ও বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে বলিয়া গ্রন্থখানি যে ভক্তগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে, বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণই তাহা প্রমাণ করে।

সমীক্ষাপঞ্চক—ডক্টর শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৩।১।এ, যোগীপাড়া মেন রোড, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ৭৬, মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও একখানি মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ। সুধী গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ৫৭পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন। আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্টের সময়, শ্রীভট্টজীর সময়, শ্রীহরিব্যাসদেবজীর আবির্ভাবকাল এবং শ্রীগীতগোবিন্দকার কবি জয়দেবের সময় ও তাঁহার নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্তিত্ব। নিম্বার্ক-মতের পোষকতা-ও প্রতিষ্ঠা-কল্পে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে—এই ধারণা হয়তো পাঠকচিত্তে জাগিতে পারে, সেইজন্য ভূমিকায় গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন: 'কেবলমাত্র পরমতখণ্ডনই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু নিরপেক্ষ শাস্ত্রবিচারের দ্বারা সত্যনির্ণয়ের জন্যই এই চেষ্টা।' পাঠকগণের আনন্দবিধান ও সংশয়নিরসন—এই উভয়কার্যেই গ্রন্থখানি সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

গত অক্টোবর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন-অনুষ্ঠিত সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়:

খরাত্রাণ সেবাকার্য

১। **বিহারে** — হাজারীবাগ জেলায় প্রতাপপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৪১,০৮৯ কেজি, জোয়ার ৫৭০ কেজি, চাল ১০০ কেজি, ডাল ৭৫ কেজি, গুঁড়া দুধ ৬,৩৮২ পাউণ্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ১,২০০টি, শিশুদের খাদ্য ৪ টিন, কম্বল ৪,৮৩৪টি, ধুতি ও শাড়ী ৩৩৩ খানি এবং ৪,৮৩৮টি বাসন বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৩,৯৮৭।

২। **পশ্চিমবঙ্গে**—পুরুলিয়া জেলায় পারা, হুরা, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, বালিতোড়া ও নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে, বাঁকুড়া জেলায় হাট-আসুরিয়া, দধিমুখা, খাণ্ডারী, ও রামহরিপুর সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মালদহ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৩৮,৪৩৬ কেজি, চাল ৩,৭২৫ কেজি, ভুট্টা ১,৮০০ কেজি, বার্লি ২০ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮,৮২৬ পাউণ্ড, ধুতি ও শাড়ী ১০,৫৮০ খানি এবং ১১,৬০৭টি শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২১,৬৫৩।

বন্যার্ত-সেবাকার্য

১। **পশ্চিমবঙ্গে**—মেদিনীপুর জেলায় পিংলা, পিচাবনী, আলাদারপুট, রাইপুর ও ছত্রধরা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চাল ১,০৫,১০৮ কেজি, গম ২১,৭২৫ কেজি এবং ৬০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২০,৩৬১।

২। **উত্তরপ্রদেশে** — **দিল্লী** কেন্দ্রের মাধ্যমে যমুনানদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সেবায় ১,২০০টি শিশুদের পোশাক, ৪০টি কম্বল, ১০টি লেপ, ৪২টি বাসন এবং নগদ ২,২৫০৲ টাকা বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা—১৩৬।

দুর্গতদের সেবা

বিহারে—রাঁচিতে দুর্গতদের মধ্যে রাঁচি আশ্রমের মাধ্যমে গম ৯৬১ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮০৭ পাউণ্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ১২,১৮০টি, ধুতি ও শাড়ী ৩৪৩ খানি এবং ২২৮টি শিশুদের পরিচ্ছদ বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৯৫৬।

ঘূর্ণিবাত্যা-পীড়িতদের সেবা

উড়িষ্যায়—কটক জেলায় নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ঘূর্ণিবাত্যা-বিধ্বস্তদের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ১১টি গ্রামে সেবাকার্য শুরু করিয়া ক্রমশঃ কার্যের পরিধি বিস্তৃত করা হইতেছে।

উৎসব-সংবাদ

জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ৯ই অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত চারদিন এবং ১০ই নভেম্বর হইতে দিবসত্রয় আশ্রম উৎসব-মুখরিত ছিল।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

বেলুড় বিদ্যামন্দির এবং **রহড়া** বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের যে-সকল ছাত্র এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. এবং

বি এসসি. পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণী ও কয়েকজন ডিস্‌টিংসন লাভ করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে সাধারণ ভাবে এই কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে নিজস্ব স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করা হইয়াছে। খেতড়ি, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, নীলগিরি, উতাকামণ্ড, কোটাগিরি, কোয়েম্বাতুর, বিজয়ওয়াদা, হায়দরাবাদ, মালাকপেট, গোয়ালিয়র, আগ্রা, সম্বর হ্রদ, ফুলেরা, আলোয়ার, অমৃতসর, বিকানীর, সোনপাট জলন্ধর প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেওয়া হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-সমিতিতে এবং অন্যান্য সংস্থায় সাপ্তাহিক ক্লাস করা হয়।

তুলসী-রামায়ণ অবলম্বনে হিন্দীতে ৪৭টি আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মোট ২৫,৯৫০ জন শ্রোতা যোগদান করেন।

দিল্লী কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, অবৈতনিক যক্ষ্মা-ক্লিনিক ও হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় আছে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা (শিশুবিভাগসহ) মোট ১৭,৪৮৭, আলোচ্য বর্ষে ১,৬৬৮ খানি গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে। পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১৭,৪১১। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি-সংখ্যা ৩৮৩। পাঠাগারে ১৫টি সংবাদপত্র এবং ৭১৫টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

গ্রন্থাগারের বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্র-বিভাগটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করা হয়। এখানে ২,৪০২ খানি মূল্যবান পুস্তক রাখা হইয়াছে। দৈনিক গড়ে ৮০ জন বিদ্যার্থী এখানে পড়াশুনা করে। আলোচ্য সময়ে ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার করিয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৩৬,৬৬২ (নূতন ৭,৬৮৫) জন রোগী চিকিৎসিত হয়।

যক্ষ্মা-ক্লিনিকে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৩৩,৮৪২ (নূতন ১,৮৮০), অন্তর্বিভাগে ২৬৫ জন যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

সারদা মহিলা-সমিতির উদ্যোগে প্রতি রবিবার সারদা-মন্দিরে ৬ হইতে ১২ বৎসরের বালকবালিকাদিগকে ভজন, অভিনয়, সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গড়ে ৪০টি বালক-বালিকা এই ক্লাসে যোগদান করিয়াছিল। সারদা মহিলা-সমিতির সেবা- ও কৃষ্টিমূলক কার্যও প্রশংসনীয়ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, গুরু নানক ও আচার্য শঙ্করের জন্মদিন সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি- ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ২,২৫৭ জন অংশগ্রহণ করিয়াছিল, উহাদের মধ্যে সফল প্রতিযোগীদিগকে ১,১১১৲ টাকা মূল্যের ২৩১টি পুরস্কার দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে নারায়ণসেবা-দিবসে আনন্দগ্রাম কুষ্ঠকলোনীর প্রায় ৬৫০ জন রোগীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো

হইয়াছিল। রোগীদিগকে এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের নূতন কাপড় জামা ইত্যাদি দেওয়া হয়।

ভুবনেশ্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৫—মার্চ ১৯৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কর্তৃক মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে নিত্য পূজাপাঠ, ধ্যান-ধারণা, ভজনাদি এবং সাময়িক উৎসবাদি ও প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথিগুলি বিশেষ পূজা, জীবনী ও বাণী-আলোচনা এবং অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি অবতারগণের জন্মদিনগুলিও পাঠ-আলোচনাদি দ্বারা উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন স্থানে ও মফস্বলে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

আশ্রমিকদের জন্য সুনির্বাচিত পুস্তকাবলী-সমন্বিত একটি গ্রন্থাগার আছে। ইহা ছাড়া জনসাধারণের জন্য একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময় স্থাপন করা হইয়াছে, এই গ্রন্থাগারে স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রগণকে পড়াশুনার সুবিধাদানের জন্য পাঠ্য-পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৭,৫৮৪। পাঠাগারে ৭টি দৈনিক এবং ৩৩টি সাময়িক পত্রপত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য সময়ে ছাত্রগণ ২২,৬৩০ খানি পাঠ্যপুস্তক পড়িতে লইয়াছিল। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য নূতন ভবন-নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

আলোচ্য সময়ে ওড়িয়াভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

মিশনের দাতব্য এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালিত হইতেছে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের দরিদ্র জনসাধারণ এবং তীর্থযাত্রিগণ এই চিকিৎসালয়টির মাধ্যমে উপকৃত হইতেছেন। ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৫,৭৯৩ এবং ২৩,৩৭১। গড়ে দৈনিক প্রায় ৭০ জন রোগী এখানে চিকিৎসা লাভ করে।

বিবেকানন্দ অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় দরিদ্র ছেলেদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৩৪ বৎসর ধরিয়া ইহা শিক্ষাদানকার্যে রত রহিয়াছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর শতবার্ষিকীর সময় এই বিদ্যালয় মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। ১৯৬৭, ৩১শে মার্চ উচ্চপ্রাথমিক বিভাগে মোট ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২৬৪ জন, তন্মধ্যে ১৯৪ জন বালক ও ৭০ জন বালিকা, মধ্যইংরেজী বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৫। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ 'বিবেকানন্দ স্কুল বিল্ডিং'-এর উদ্বোধন করেন।

বক্তৃতা-সফর

গত ৪.৯.৬৬ হইতে ২৬.১২.৬৬ পর্যন্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ কর্তৃক নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়:

বিষয়	স্থান
বর্তমান ভারতের নির্মাতা স্বামী বিবেকানন্দ	থাই ভারত হল, ব্যাঙ্কক
মহাপুরুষগণের স্মৃতি	সিঙ্গাপুর হল, নরিস রোড
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী	" "
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী	শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, সিঙ্গাপুর
মহাপুরুষগণের স্মৃতি	কুয়ালালামপুর
"	মাদ্রাজ মঠ
বেদান্ত ও বিশ্বশান্তি	গভর্ণমেণ্ট কপার প্রজেক্ট, রাজপুতানা

বিষয়	স্থান	বিষয়	স্থান
কর্মযোগ	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হল, খেতড়ি	যে মহাপুরুষগণকে দেখিয়াছি	রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম আঁটপুর
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা	কনখল সেবাশ্রম	পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ	এস. ই. রেলওয়ে হেড অফিস
বেদবাণী ও ইহার রূপায়ণ	রোটারী ক্লাব, হরিদ্বার	মরণের পারে জীবন	৯৭বি, হরিশ মুখার্জি রোড কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা এবং মহাপুরুষগণের কথা	হাউজ খাস, নিউ দিল্লী	নিবেদিতা জয়ন্তী	বাগবাজার, কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম "	ভারত ও তাহার আদর্শ	এস ই. রেলওয়ে হল, শালিমার
স্বামী অভেদানন্দ শতবার্ষিকী	" "	শিক্ষা	বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির আরিট, মেদিনীপুর
মহাপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি	" "	পুনর্জন্ম	পাঠচক্র, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা
বর্তমান ছাত্রগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপায়	বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসভা দিল্লী	স্বামী প্রেমানন্দ	রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর
মহাপুরুষগণের স্মৃতি	নিউ দিল্লী	মহাপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি	
স্বামী অখণ্ডানন্দ	"	পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রমাণ	পাঠচক্র, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা
ভক্তগণের নিকট ধর্মপ্রসঙ্গ	"		
শক্তিপূজা	প্যাটেল নগর, নিউ দিল্লী		
বিজয়া সম্মিলনী	মহাবিদ্যালয়, বারাণসী		
আমার বিদেশ-ভ্রমণ	সুরক্রিক্ত হল, কলিকাতা		

বিবিধ-সংবাদ

ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী ***নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে*** গত ২৮শে অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার একাধিক শততম জন্মদিবসে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে আশ্রমের ঠাকুরঘরে সারদা-মন্দিরের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণ এবং ছাত্রী-বৃন্দ সমবেত হইয়া মঙ্গলারতি ও ভজনে যোগদান করেন। পরে বিদ্যালয়ের প্রবেশপথের সম্মুখে শ্বেতপদ্ম ও রজনীগন্ধায় সুসজ্জিত ভগিনী নিবেদিতার নূতন প্রতিকৃতির সম্মুখে একশতটি প্রদীপ-প্রজ্বালনের পর শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা ভারতীপ্রাণা (নিবেদিতার ছাত্রী) কর্পূরারতি ও প্রতিকৃতিতে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। বিদ্যালয়-ভবনটির বহির্ভাগও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

সকাল ৭-২৫ মিনিটে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শাস্ত্রপাঠ, স্তব, আবৃত্তি ও ভগিনী নিবেদিতার জীবনীপাঠ ও হোম অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। অনুষ্ঠানান্তে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা-হোমাদির ব্যবস্থা ছিল। সারাদিনই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ উৎসবে সমাগত শত শত নর-নারীর আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ ছিল। সারাদিনব্যাপী যে

আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে একটি জনসভা আহুত হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ সোসাইটি: ভগিনী নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে, ১৫১ বিবেকানন্দ রোড-স্থিত বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী (বর্ষব্যাপী) উৎসবের প্রাথমিক অধ্যায়ের উদ্বোধন হয় গত ২৮শে অক্টোবর তারিখ। ঐদিন সকালে স্বামী জীবানন্দজীর পৌরোহিত্যে বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৫টার সময় বিবেকানন্দ সোসাইটির সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সোসাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশাশ্রয়ানন্দজী ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। জাতির এই সঙ্কট-মুহূর্তে এই মহীয়সী নারীর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য তিনি দেশের তরুণসমাজকে আহ্বান জানান। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষাল।

পরদিন রবিবার ২৯শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শতদীপ-প্রজ্বালনের পর শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও ডঃ রমা চৌধুরী নিবেদিতার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। উদ্বোধনী ভাষণে বিচারপতি মুখোপাধ্যায় ভগিনী নিবেদিতার মহৎ জীবনের আনুপূর্বিক আলোচনা করিয়া তাঁহার জীবনে স্বামীজীর প্রভাব ও অনুপ্রেরণার কথা সবিস্তার বর্ণনা করেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ মজুমদার নিবেদিতার নানা অবদানের কথা, বিশেষ করিয়া ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তাঁহার অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার ৪ঠা নভেম্বর প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার নেতৃত্বে। প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে নিবেদিতার জীবনদর্শনে তাঁহার অলৌকিকত্ব ও মানবপ্রেমের মূর্ত মহিমার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভানেত্রীর ভাষণে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা নিবেদিতার জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার বাণী ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাশেষে 'নিবেদন'-এর সৌজন্যে "নিবেদিতা গীতি-আলেখ্য" অনুষ্ঠিত হয়।

রবিবার ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডঃ ত্রিগুণা সেন। ডঃ সেন তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার জীবনে ত্যাগ, নিষ্ঠা, প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সমাবেশের এক উজ্জ্বল রূপ বর্ণনা করেন। সভাপতির ভাষণে প্রধান বিচারপতি বলেন, নিবেদিতার ভক্তি ও দেশপ্রেম কোন ভারতীয়ের অপেক্ষাও অনেক বেশী।

কার্যবিবরণী

আগরতলা (ত্রিপুরা) গাংগাইল রোড-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন ১৩৭১-৭৩ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই আশ্রম কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যধারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। (১) শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে নিত্যপূজার্চনা ও সাময়িক উৎসব-অনুষ্ঠান, (২) বিদ্যামন্দির ও ছাত্রাবাস-পরিচালনা, (৩) হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে আর্তসেবা।

১৩৭৪ সালে আশ্রমে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা-মতে শারদীয় দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সপ্তমী পূজার দিন সকালে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পরলোকে শ্রীদয়াময় মিত্র

লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত রীডার শ্রীদয়াময় মিত্র (ভুলু বাবু) গত ২৫শে আগস্ট লক্ষ্মৌ-এ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা পূজনীয়া যোগীন-মার দৌহিত্র ছিলেন।

ভুলুবাবু ১৮৯৪ সালে মহালয়ার দিন কলিকাতায় তাঁহার পৈতৃক বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালের মধ্যেই তাঁহার পিতামাতা উভয়েরই দেহান্ত হয় এবং তাঁহার ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার ভার তাঁহাদের মাতামহী যোগীন-মার উপর পড়ে। ফলতঃ তখন হইতেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও স্বামী সারদানন্দজী কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভার গ্রহণ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে একমাস ভুবনেশ্বরে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন।

ভুলুবাবু ১৯১৫ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর নিকটে তাঁহারই ঘরে থাকিতেন। এখানে থাকিয়াই তিনি এম. এ. পাস করেন। বি. এ পরীক্ষায় তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বঙ্কিম স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯২৪ সালে যোগীন-মার দেহত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দজী তাঁহাকে লক্ষ্মৌ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে দুই বৎসর পরে পুনরায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়া ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি অধ্যাপনার কাজ করিতে থাকেন। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে তিনি বার্লোগঞ্জে স্বামী অতুলানন্দজী মহারাজের নিকট গিয়া থাকিতেন। ভুলুবাবু স্বল্পভাষী ও নির্বিরোধ লোক ছিলেন। তিনি পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর দেহত্যাগের পর 'উদ্বোধন' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধন-পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৬০৪ পৃঃ, ২য় কঃ, ১৭শ লাইনে 'কাটে' স্থলে 'আঁটে' এবং ৬১৭ পৃঃ, ২য় কঃ ২২শ ও ২৪শ লাইনে 'লজিত' স্থলে 'পুলিন' পড়িবেন, ৬১১ পৃঃ ২য় কঃ ১৩শ লাইনে 'বেলভেডিয়ার' স্থলে 'উডল্যাণ্ডস্' পড়িবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৮ই মাঘ, (২২. ১. ১৯৬৮) সোমবার, কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৬তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬৯তম বর্ষ

(১৩৭৩-মাঘ হইতে ১৩৭৪-পৌষ)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য ৬৲ প্রতি সংখ্যা ৬০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭৩ হইতে পৌষ—১৩৭৪)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ-জয়ন্তী প্রকাশিত

: গ্রন্থসমূহ :

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ-প্রণীত

শিশুদের বিবেকানন্দ

২৮ খানি রঙিন ছবিসহ স্বামীজীর জীবনালেখ্য। প্রাণবন্ত ছবিগুলি শিশুদের মহা আকর্ষণ॥ মূল্য— ১'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। মূল্য— ১'০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ-প্রণীত

ছোটদের বিবেকানন্দ

নিম্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠোপযোগী। মূল্য— ০'৫০

স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত

যুগাচার্য বিবেকানন্দ

ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজী যে নূতন যুগের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ও যাহার আভাসমাত্র দিয়াছেন তাহা কতটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে এই পুস্তকখানি অপরিহার্য। মূল্য— ২ ৫০

স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত

দিব্যগীতি

এই পুস্তকে স্বরলিপিসহ ১০১টি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে ৫১টি স্বামী বিবেকানন্দ গান করিতেন। অন্যান্য গানগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও দেশদেশী-বিষয়ক। মূল্য— ৮ ০০

স্বামী চণ্ডিকানন্দ-প্রণীত

বিবেকানন্দ লীলাগীতি

সুরে কথকতা করিবার উপযোগী। মূল্য— ১ ০০

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা উদ্বোধন

মূল্য—৫৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪৲

একমাত্র পরিবেশক—**উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ৩**

৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাষ্টীগণের পক্ষে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত

সম্পাদক—**স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।**

বার্ষিক মূল্য ৬·০০ প্রতি সংখ্যা